KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, যাদবপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 23/4 24/1 26/1 26/2	Year of Publication : Sep - 2002 Oct - 2002 Oct - 2004 May - 2005
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রাজুল সেন	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

শারদীয় সংখ্যা ১৪১১

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ॥ রাহুল সেন

আরো পথ এগোতে হবে

দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আজ অগ্রগতির নতুন পর্যায়। দারিদ্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে এই রাজ্যে। একদিকে কৃষি. ভূমি-সংস্কার, গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ — অন্যদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ পরিস্থিতি, নগর উন্নয়ন ও আবাসন গড়ার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের ছবি স্পষ্ট। মৎস্যচাষ, বনসৃজন, খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথমে। শিল্পায়ন ও পুঁজি বিনিয়োগে অগ্রগতি রাজ্য সরকারের সঠিক শিল্পনীতির ফল। আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্প খুলে দিচ্ছে নতুন দিগন্ত — যেমন তথ্য প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পেট্রোকেমিক্যালস।

যে সাফল্য অর্জন করেছি, তাকে আরও সংহত করে উন্নততর কর্মসূচি রূপায়নের লক্ষ্যে সর্বাত্মক ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে মানুষের ঘরে এখনও আলো পৌঁছোয়নি সেখানে আলো নিয়ে পৌঁছোতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে **পশ্চিমবাংলা**।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আই.সি.এ. ৩৭৮০/২০০৪

পশ্চিমবঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

বঙ্গাব্দ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

১৪১১

সূচি

সম্পাদকীয়

গবেষণা-নিবন্ধ

'রাজনৈতিক সাধু' ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং আরো দু-একটি সংগঠন
❑ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী ১

ক্রোড়পত্র

গল্প

ভূমি এবং আকাশ ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩
সরকারমশাই ❑ স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৫
নীহারিকা নিয়ে খেলা ❑ সুনীল দাশ ২১
ইতিহাসের এক টুকরো ❑ বিজনকুমার ঘোষ ৩১
জনৈক হরিজনের মৃত্যু ❑ বিপুল দাস ৩৭
বিশ্বরূপ ❑ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৫৩
বিশ্বায়ন ❑ শচীন দাশ ৬৬

যন্তর মন্তর ❑ নবকুমার বসু ৭৩
যাপিত জীবন ❑ কল্যাণ মজুমদার ৯২
মাননীয় সম্পাদক ❑ রামকুমার মুখোপাধ্যায় ১১০
শুধু মালতীর জন্য ❑ অলোককুমার বসু ১১৬
কায়া ❑ কিন্নর রায় ১২২
প্ল্যাটফর্ম ❑ সুব্রত সেনগুপ্ত ২০৯

বিদেশি সাহিত্য

বড়োমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (Los funerales de mama grande : 1962)
গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্ : অনুবাদ ❑ অমিতাভ রায় ৭৯

উপন্যাস

আমাদের জরুরি দিনগুলি ❑ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৩

সম্পাদকীয়

বিভাবের শরৎকালীন সংখ্যা প্রকাশিত হল। 'চিত্রনাট্য সংখ্যা'-র পর স্বল্প ব্যবধানে আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারলাম আমাদের এই সাম্প্রতিকতম সংখ্যা।

বাংলায় বিপ্লববাদের আনুপূর্বিক ইতিহাস এতদিনে আমাদের অনেকটাই জানা। কিন্তু যা আমাদের অনেকটাই অজানা, তা হল বিপ্লববাদের পটভূমিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এই মহীয়সী মহিলার সমর্থনের কথা আমরা জানি। কিন্তু আজ অবধি মূলত ধর্ম এবং একই সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকার প্রকৃত তাৎপর্য, এ-যাবৎ অনুদ্ঘাটিতই ছিল। এই প্রথম, ব্রিটিশ-গোয়েন্দা দপ্তরের অত্যন্ত গোপনীয় রিপোর্টসমূহ বিভাবে প্রকাশিত হল।

গবেষক শ্রী ল্যাডলীমোহন রায়চৌধুরী দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে এই সুদীর্ঘ গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করেছেন। তাঁর এই গবেষণা, পাঠক-সমক্ষে এই প্রথম প্রকাশিত হল। স্বাধীনতাপূর্ব বিভিন্ন সময়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের গোপন রিপোর্টগুলিই শুধু নয়, তাদের পূর্বাপর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে, রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এ-বিষয়ে একটি প্রাথমিক ভাষণেরও আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। ভাষণটি ল্যাডলীমোহনই দিয়েছিলেন। আমাদের সন্ধিৎসার সেটিই ছিল আগ্রহসঞ্চারী-সূত্র।

বাংলার বিপ্লববাদে, বিভিন্ন সময়ে সন্ন্যাসীদের যোগাযোগ নতুন নয়। অতীতে বাংলা সাহিত্যে এই প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্রিটিশ-অত্যাচার, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ-সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ এখনো আমাদের স্মৃতিধার্য।

এই গবেষণা-নিবন্ধটি পাঠ করলে বোঝা যায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখায় বিপ্লবীদের অনুপ্রবেশ ছিল সত্যিই কত ব্যাপক।

ব্যয়বহুল, এই সুদীর্ঘ গবেষণা-নিবন্ধটির মুদ্রণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সম্ভবই হত না। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ-ছাড়াও এই সংখ্যায় রয়েছে বাংলাভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা গল্পসম্ভার এবং একটি উপন্যাস। রয়েছে বিদেশি-সাহিত্যের অনুবাদ।

এই সংখ্যার প্রস্তুতিপর্বে সাহায্য করেছেন অভিজ্ঞান সেন। তার সঙ্গে আমাদের কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক নয়। তাকে ধন্যবাদ।

আশা করি অন্যান্য সংখ্যার মতো এই সংখ্যাটিও পাঠকদের আনুকূল্য লাভ করবে। বিভাবের আগামী সংখ্যাই 'বিশেষ কবিতা সংখ্যা'।

সবাইকে জানাই শরৎকালীন প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিনীত নমস্কারান্তে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রধান সম্পাদক — বিভাব

সম্পাদকমণ্ডলী
কলকাতা
পবিত্র সরকার । প্রদীপ দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায় । অনাথনাথ দাশ । স্বপনকুমার ঘোষ

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক
রাহুল সেন

যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল) । কলকাতা - ৬৮ ।
দূরভাষ : ২৪৭৩ ৩৬০০
চলমান : ৯৮৩১৩ ০৯৪০৯

প্রচ্ছদ : অভিজিৎ নাথ

বাঁধাই : আতোয়ার হোসেন,
লিপিরাজ বাইন্ডিং ওয়ার্কস

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
ইস্টার্ন বুক এজেন্সি
৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৬৮ থেকে প্রকাশিত,
'বর্ণনা', ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে অক্ষরবিন্যস্ত ও
'বর্ণনা প্রকাশনী', এ/১২৫ বাঘাযতীন আই ব্লক ক্রশিং, কলকাতা-৯২ থেকে মুদ্রিত।

ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত এই সমগ্র গবেষণা-নিবন্ধটি
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মুদ্রিত

'রাজনৈতিক সাধু'
ও
রামকৃষ্ণ মিশন
এবং
আরো দু-একটি সংগঠন

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

‘রাজনৈতিক সাধু’ ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং আরো দু-একটি সংগঠন

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

এই রচনাটিতে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীরা এবং বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশন ও মিশনের সন্ন্যাসীসমাজ কীভাবে এবং কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিলেন সে-বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান সরকারি নথিতে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এই নথিগুলির মধ্যে টেগার্টের রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ ‘পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন’, ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছাড়া বর্তমান রচনায় অন্য যে-সব নথির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি কোনোভাবেই অন্যত্র কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য কয়েকটি গবেষণাপত্রে ‘রেফারেন্স’ হিসাবে এইসব নথি থেকে ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উদ্ধৃতি প্রয়োগ করা হতে পারে, তবে তা বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়ার নয়।

বর্তমান রচনাতে উল্লিখিত নথিগুলি যথাসম্ভব বঙ্গানুবাদ করে এবং সেই সঙ্গে পরিশিষ্টাংশে এগুলির প্রত্যেকটির মূল ইংরেজি টেক্সট-সহ পাঠকের দরবারে পেশ করা হয়েছে। তবে যে-হেতু টেগার্টের রিপোর্টের টেক্সটি এখন সহজলভ্য, সেই কারণে সেটি এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ-রচনা পাঠে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, মূল রচনার সাবলীলতা অনুবাদিত লেখার মধ্যে প্রায়শই খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রন্থের আলোচ্য লেখাগুলি বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার আমলের রচনা। তখনকার দিনের জটিল বাক্যবিন্যাস (syntax) পদ্ধতি এবং সরকারি আমলাদের ততোধিক জটিল রচনাশৈলী (gobbledegook) ও নথিগুলির পঞ্জিধর্মী (almanac) বর্ণনা প্রভৃতি নানা কারণ পাঠকের প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধা ঘটাতে পারে। তথাপি এইগুলি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং সেই হিসাবে আলোচ্য বইটির তথ্যসজ্জা (documentation), ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের প্রয়োজন মিটাতে পারে এই ভরসা।

শ্রীমান অভীপ্সিত ভট্টাচার্য এই লেখাটির প্রস্তুতিপর্বে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাকে এই সুযোগে স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

সম্পাদকীয় সংযোজন

- যে-সব সরকারি নথি, পুলিশ রিপোর্ট এই লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির রচনাকালে অবিভক্ত ‘BENGAL’-এর বঙ্গীকৃত রূপ ছিল ‘বাংলা দেশ’। লেখক তৎকালীন এই বঙ্গীকৃত রূপটিকেই ব্যবহার করেছেন।
- এই লেখাটিতে ব্যবহৃত নথিগুলি যে-সময়কার, বোম্বে বা বোম্বাই তখনো ‘মুম্বাই’ বা ‘মুম্বই’ হয়নি।

সূচি

প্রথম অধ্যায় : ১. গোয়েন্দা রিপোর্টে সন্ন্যাসীসমাজ : স্টিভেন্সন-মুরের রিপোর্ট ৫
২. আর্যসমাজ ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ১. রামকৃষ্ণ মিশন : স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের তিনটি রিপোর্ট ৪২
২. স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের প্রথম প্রতিবেদন ৪৪
৩. স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের দ্বিতীয় প্রতিবেদন ৬৩
৪. স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের তৃতীয় প্রতিবেদন (পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ) ৭৩

তৃতীয় অধ্যায় : ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ফাইল ও রামকৃষ্ণ মিশন ৮৪

চতুর্থ অধ্যায় : টেগার্টের 'রেড বুক' ও রামকৃষ্ণ মিশন ১০২

পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার ১৫০

পরিশিষ্ট

গোয়েন্দা রিপোর্টে সন্ন্যাসীসমাজ : স্টিভেন্সন-মুরের রিপোর্ট

ভারতবর্ষের বিদেশি শাসনের চেহারাটি ছিল বিশেষ বৈচিত্র্যময়। প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা দেশ (Bengal) থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে এদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। ইতিহাসে সেই আমলকে কোম্পানির যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। তারপর ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (মতান্তরে সিপাহী বিদ্রোহের) শেষে কোম্পানির শাসনের যুগের অবসান হয় এবং কালক্রমে ভারতবর্ষের শাসনভার সরাসরি কুইন ভিক্টোরিয়া তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত হয়। কোম্পানির শাসন ও ব্রিটিশ রাজার শাসন, দুয়ে মিলিয়ে ভারতবর্ষে প্রায় দুশো বছর ধরে বিদেশি শাসন অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতবাসীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলেও তার পরাধীন অবস্থার কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ভারতবাসীরা নিজেরাও বিদেশি শাসক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও চায়নি। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল তা বহুদিন যাবৎ কেবল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও শাসক সম্প্রদায়ের নানা ক্ষেত্রে অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিকার প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনেই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের তরফে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয়েছিল। তার আগে প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষের পরাধীনতার অবসানের জন্য কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। অবশ্য 'হোমরুল' এবং 'কলোনিয়াল সেল্ফ গভর্নমেন্ট' জাতীয় নানা দাবি যে উত্থাপিত হয়নি তা নয়, কিন্তু বিদেশি শাসনের নিঃশর্ত অবসান বা পূর্ণ স্বরাজের কথা কখনও বিশেষ উচ্চারিত হয়নি। অন্তত এদেশের মধ্যবিত্ত ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ও পরিচালনাধীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান ধারায় সেই দাবি ছিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, ১৮৫৭-এর অভ্যুত্থানকে, এই আন্দোলনের অনেক সুপরিচিত নেতাও অনাবশ্যক আতিশয্য বলে ধিক্কৃত করেছিলেন।

সে-যুগের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে আন্দোলনকারী ভারতবাসীদের পক্ষে এই রকম সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়তো একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না এবং এই খামতির জন্য সেই সীমিত-পরিসর আন্দোলনের অনুপম মাহাত্ম্যকে বিন্দুমাত্রও খর্ব করে দেখা চলে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে উল্লিখিত প্রধান ধারার রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি; দেশের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে যে অগণিত সাধারণ মানুষের বসবাস ছিল, তারা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেনি। কোম্পানির আমলের একেবারে গোড়া থেকেই তারা অত্যাচারী বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে লড়াই শুরু করেছিল। হয়তো অনেক সময়েই তারাও সোচ্চারভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলতে পারেনি। কিন্তু অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ছিল সর্বদাই আপসহীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বা তারও পরে সচরাচর যেমনটি হত সেভাবে কোনো সর্বভারতীয় নেতার অধীনে

এবং একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়নি। তবু তাদের আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা, পরাক্রান্ত বিদেশি শাসকদেরও টনক নড়িয়ে দিয়েছিল।

কোম্পানির শাসকেরা লক্ষ করেছিলেন যে, এইসব আন্দোলনে সাধু ও সন্ন্যাসীসমাজ অনেক ক্ষেত্রেই রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় গ্রামাঞ্চলের নানা স্থানে যে লুটপাট এবং তথাকথিত অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, সেগুলি বহু ক্ষেত্রেই ভেকধারী সন্ন্যাসীদের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এইসব সন্ন্যাসীরা সবাই যে হিন্দুধর্মের সাধনমার্গের উচ্চকোটির মানুষ ছিলেন তা নয়। কিন্তু যে-হেতু তাঁরা অনেকেই হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো বেশভূষা পরতেন সেই কারণে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে সেই হিসাবেই পরিচিত হয়েছিলেন এবং আমাদের দেশের প্রচলিত ইতিহাসে এদের বিদ্রোহকেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ বলা হয়ে থাকে। এ-ছাড়া ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহেও অনেক ভবঘুরে সাধু-সন্ন্যাসীদের উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছিল। আর তারও পরে আর্যসমাজী ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু ও সন্ন্যাসীসমাজও যে ভারতবাসীদের ধর্মীয় তথা জাতীয় চেতনা বহুলাংশে উসকে দিয়েছিল সে-কথা এখন আর কারো অজানা নেই। ধর্মীয় কারণ বা গরিব সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ইত্যাদি, যে-কারণেই হোক না কেন মানুষজনের উপর এদের প্রভাবও ছিল অপরিসীম। আর তাই সরকারি কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ইংরেজ-বিরোধী এইসব আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হলে সর্বপ্রথমেই ভারতের সন্ন্যাসীসমাজকে নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। কিন্তু কাজটি যে খুব সাবধানে করা দরকার সে-বিষয়ে তাঁরা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কেন না সন্ন্যাসীদের নিয়ে সাধারণ মানুষের আবেগের প্রশ্ন জড়িত থাকে। অতএব তাঁদের রাশ টানবার জন্য এমন কিছু করা উচিত হবে না যার ফলে প্রজাসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই সব দিক গভীরভাবে বিবেচনা করে সরকার সাধুদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ রাজদ্রোহের প্রসার বন্ধ করবার জন্য সরকার যেমন সাধারণ মানুষের গতিবিধি সম্পর্কে নজরদারির ব্যবস্থা করেছিল, তেমনই একই সময়ে, সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের উপরেও সতর্ক প্রহরা বজায় রাখার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এই কারণে বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই অনেক সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট প্রস্তুত করা হত। এই রিপোর্টগুলির অধিকাংশ ভাগই গোয়েন্দা অফিসারদের নির্দেশে রচনা করা হত। এইগুলির মধ্যে যে-সব তথ্য এবং সংবাদ পরিবেশন করা হত সেগুলি যে সব অভ্রান্ত বা কতকাংশে অতিরঞ্জিত ছিল না, এমন নয়। গোয়েন্দা রিপোর্টের মধ্যে সাধারণত অতিশয়োক্তি থাকেই। আর ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশবাহিনী তো সত্যবাদিতার জন্য কখনোই সুবিদিত ছিল না। কিন্তু এই সব অনিবার্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা এগুলি কখনোই একেবারে বাতিল করে দিতে পারেন না, কেন না এইসব রিপোর্ট পাঠ করলে ভারতবর্ষের নিরীহ সন্ন্যাসীসমাজ সম্পর্কে রাজশক্তি যথার্থই কতটা ভীত ছিল এবং তাঁদের সম্পর্কে সরকার কী ধারণা পোষণ করত তার একটা আভাস পাওয়া যায়। এই সব রিপোর্টের এটাই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

দিল্লি ও কলকাতার মহাফেজখানা (Archives) এবং পুলিশের বিভিন্ন দপ্তর অনুসন্ধান করে ভারতবর্ষের সাধুসমাজ এবং তাঁদের তথাকথিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ইংরেজ

পুলিশের সব চেয়ে পুরোনো কয়েকটি গোয়েন্দা রিপোর্টের সম্প্রতি হদিস পাওয়া গিয়েছে। এই রিপোর্টগুলি ছিল নানা ধরনের—কোনোটি স্মারক প্রতিবেদন (Memorandum), আবার কোনোটি বা একান্ত গোপনীয় নির্দেশিকা (strictly secret / confidential official circular) হিসাবে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তৃপক্ষের দপ্তরে পেশ করা হয়েছিল। এ ছাড়া পুলিশের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিভিন্ন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যগুলির যে সারণী (Intelligence / Special Branch Abstract) প্রস্তুত করা হত সেইগুলিকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের (Bengal) গ্রামাঞ্চলে পুলিশ থানাগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ কেস ডায়েরি এবং অপরাধমূলক ঘটনার বিবরণী (Village Criminal Records) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সেগুলির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে আরো বলা দরকার যে পুলিশ রিপোর্টগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যগুলি বড়ো এলোমেলো ও অগোছালোভাবে লেখা হয়েছিল এবং সেগুলিতে অনেক সময় একই কথা অনাবশ্যকভাবে বার বার লিখিত হতে দেখা যায়। এই জটিল তথ্যস্তূপের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ খুঁজে পাওয়া বড়ো সহজ কর্ম নয়। তবে আশার কথা এই যে, যে-সব রিপোর্টগুলি ছাপা হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হত সেগুলি গবেষণার পক্ষে অনেক বেশি সহায়ক বলে মনে হয়। এগুলি সেই আমলের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এবং প্রশাসনিক আমলা কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, সি.জে. স্টিভেন্সন-মুর (C.J. Stevenson-Moore; Director of Criminal Intelligence), চার্লস অগস্টাস টেগার্ট (C.A. Tegart; Deputy Commissioner of Police, Calcutta), এফ.সি. ড্যালি (F.C. Daly; D.I.G. of Police, Special Branch, Bengal), জি.সি. ডেনহ্যাম (G.C. Denham; Assistant to the D.I.G. of Police, Special Branch, Bengal), সি.জি.ডব্লু. ক্লগস্টন (C.G.W. Clogston; D.I.G. of Police Crime & Railways Madras), এইচ. কানিংহ্যাম (H. Cunningham; Special Branch, Bengal Calcutta) ইত্যাদি। এঁরা ছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগের যে-সব ভারতীয় ইন্সপেক্টর পুলিশ অ্যাবস্ট্রাক্টের জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যথা, প্রমোদ মুখার্জী, নরেন্দ্রকুমার মল্লিক, সমরেন্দ্রনাথ মিত্র, শশিভূষণ দে, ললিতমোহন সেন, এফ. আহ্‌মেদ, এম. হুসেন ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে উল্লেখিত রিপোর্টগুলির মধ্যে দু-একটি ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও বেশিরভাগই কিন্তু আজো লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছে। এই রকম কয়েকটি এ-যাবৎ কাল অপ্রকাশিত নথির বিষয় নিয়েই বর্তমানের এই আলোচনা।

প্রথমেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম গোয়েন্দা রিপোর্টটি নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করা যায়। এটি ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সালে সর্বপ্রথম ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি রচনা করেছিলেন ভারত সরকারের ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর, সি. জে. স্টিভেন্সন-মুর। রিপোর্টটি ছাপা হওয়ার পরে ওই অফিস এটিকে গোপন সার্কুলার হিসাবে চিহ্নিত করে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অবগতির জন্য নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে যে মূল রিপোর্টটি বাংলা সরকারের কাছে এসে পৌঁছেছিল সেটি এখন কলকাতার মহাফেজখানায়

(West Bengal State Archives) সংরক্ষিত আছে। এই রেকর্ডের ফাইল নম্বর Government of Eastern Bengal and Assam 274/1909. এই গোপন সার্কুলারটির শীর্ষনাম *Note on Political Sadhus* অর্থাৎ রাজনৈতিক সাধুদের বিষয়ে প্রতিবেদন। এই সার্কুলারটির বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে ভারতের বড়োলাট ডাফরিনের (১৮৮৪-৮৮) নির্দেশে এ-দেশের নানা স্থানে ক্রমশ প্রসারিত ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য ১৯০৪ সালে দিল্লিতে যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা Central Criminal Intelligence Office খোলা হয়েছিল সেই কেন্দ্র থেকেই দেওয়ানি লাভের সময় বা ১৭৬৫ থেকে পরবর্তী প্রায় ১৩০ বছর সময়কালের মধ্যে সাধু ও সন্ন্যাসীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কীভাবে নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তার একটি বিবরণী তথা সরকারি ভাষ্য পেশ করা হয়েছিল। রিপোর্টের প্রথম অংশটি হান্টারের লেখা *দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল* শীর্ষক গ্রন্থের গোড়ার দিকের যে-অধ্যায়ে বাংলার কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা হয়েছিল। হান্টারের বিবরণী-সমেত উপরোক্ত গোয়েন্দা রিপোর্টের যথাসম্ভব বঙ্গানুবাদ (বা adapted Bengali version) এখানে পেশ করা হল।

১৭৭৩ সালে কাউন্সিলের (অর্থাৎ ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলার গভর্নর জেনারেলকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে চার সদস্যের কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল) লেখা একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সন্ন্যাসী বা ফকির নামধারী একদল আইন ভঙ্গকারী দুর্বৃত্ত (banditti) বাংলা দেশের (Bengal) বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ধর্মীয় তীর্থযাত্রার অছিলায় তারা সেই অঞ্চলের প্রধান প্রধান স্থানে উপস্থিত হয়ে সুযোগ ও সুবিধামতো ভিক্ষা, চুরি এবং লুটতরাজ চালিয়ে যেত। দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে বীজ ও উপযুক্ত কৃষি সরঞ্জামের অভাবে যারা চাষের কাজ শুরু করতে পারেনি সেই রকম উপবাসী কৃষকের দল এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৭৭২ সালের শীতের সময় দক্ষিণবঙ্গের আবাদি অঞ্চলগুলিতে হানা দিয়েছিল। এদের দলে ৫০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত মানুষ জমায়েত হয়ে আগুন লাগানো ও লুটতরাজের কাজে লিপ্ত হত। জেলার কালেক্টরগণ এদের দমন করবার জন্য সৈন্য নামিয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িকভাবে এই কাজে সফল হলেও সেনাবাহিনীকেও শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিতে হয়েছিল এবং বাহিনীর নেতা ক্যাপ্টেন টমাস এদের আক্রমণের দাপটে একসময় নিজেই তাঁর গোটা সেনাবাহিনী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য শীতের শেষে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর (Board of directors) কাছে এই মর্মে একটি আশ্বাসবার্তা পাঠানো হয়েছিল যে, অন্য আর একজন অভিজ্ঞ সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে আর একটি বাহিনী নাকি এদের অচিরেই দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই আশ্বাসবাণীটি যে নিতান্তই অতিরঞ্জিত তা অল্প কিছুদিন পরেই বোঝা গিয়েছিল। অতঃপর ১৭৭৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখের প্রেরিত একটি বার্তায় ওয়ারেন হেস্টিংস খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন

যে, ক্যাপ্টেন টমাসের পর যাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল তিনি নিজের চার ব্যাটেলিয়ন সৈন্যদের কাজে লাগানোর পরেও তাঁর পূর্বসূরির মতো একইরকম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এইসব দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করবার জন্য তিনি স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে একটি অতিরিক্ত বাহিনীও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এদের সম্মিলিত অভিযানও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এলাকার স্থানীয় মানুষজন এইসব দুর্বৃত্তদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় রাজস্ব আদায় করাও সম্ভব হয়নি। বস্তুত বাংলা দেশের (Bengal) তথাকথিত অঞ্চল জীবনপ্রবাহে এই রকম হানাদারি একটা বাৎসরিক ঘটনার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের আগের যুগেও এই রকম একই ধরনের আরো একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। মিরাটের কমিশনার, উইলিয়ামস (Williams) সেই সময় যে-সব ধর্মীয় প্রতিনিধি বা প্রচারকগণ সর্বাধিক পরিচিতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের কথা লিখতে গিয়ে এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন যে দেশীয় সৈন্যদলকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করার জন্য মিরাট থেকেই সব চেয়ে জোরদার প্রচার শুরু করা হয়েছিল। বন্দুকের কার্তুজে হারামের চর্বি এবং ময়দায় হাড়ের গুঁড়ো মিশেল দেওয়ার কথা চাউর করে এই রকম প্রচার করা হয়েছিল যে সরকার নাকি স্থানীয় মানুষদের ধর্মনাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেই সময় দেশের সর্বত্র যে-সব পরিব্রাজকেরা ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাতির পিঠে চেপে এবং অশ্বারোহী অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে ফকিরের বেশে এপ্রিল মাস নাগাদ মিরাটে এসে হাজির হয়েছিলেন। দেশীয় রেজিমেন্টগুলির মানুষেরা প্রায়শই এঁর কাছে যাতায়াত করছেন দেখে পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে ওই এলাকা ছেড়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বাহ্যত তিনি এই নির্দেশ পালন করেছিলেন বলেও মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে জানা যায় যে তিনি ২০ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ধারে কাছে অনেকদিন ধরেই বসবাস করেছিলেন।

চল্লিশ বছর বাদে ওই রকম আরো একটি ঘটনার কথা জানা যায়। ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ বাংলা দেশের (Bengal) পুলিশের সেই সময়কার ইন্সপেক্টর-জেনারেল (অধুনা নাইটহুড খেতাবপ্রাপ্ত) ই.আর.হেনরি, সাধু-সন্ন্যাসীরা কীভাবে ধর্মীয় এবং অন্যান্য নানা ধরনের প্রচারকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন সেই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, মাত্র চার পাঁচ বছর আগেও এঁরা এতটা সংগঠিতভাবে কাজ শুরু করতে পারেননি। তিনি বলেন যে গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনের সময়েই এঁদের কর্মোদ্যম লক্ষ করা গিয়েছিল এবং এই আন্দোলনের সুবাদে নানা স্থানে যেসব হাঙ্গামা ঘটেছিল তার অব্যবহিত প্রাক্কালে এই সকল সাধুদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতিও চোখে পড়েছিল।

হেনরির অনুসন্ধানের রিপোর্ট একটি স্মারকপত্রের (Memorandum) আকারে ১৮৯৪ সালের মে মাসে পেশ করা হয়েছিল এবং সেন্ট্রাল স্পেশাল ব্রাঞ্চের সার্কুলার হিসাবে এটি প্রচার করবার সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও এই রকম অনুসন্ধান আরম্ভ করে দেওয়ার জন্য অভিমত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু অনুসন্ধানের ফল হয়েছিল নঞর্থক। কেননা সাধুরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গো-রক্ষা আন্দোলনে সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন বলে জানা গেলেও গোপন অনুসন্ধানের ফলে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বোঝা সম্ভব যে, কোন অঞ্চলের আবাসিক বা ভ্রাম্যমান কোন সাধুর দল যথার্থই এইসব রাজনৈতিক তথা ধর্মীয়

আন্দোলনে গোপনে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, সন্ন্যাসীসমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ বিষয়ে, এ-যাবৎ নিশ্চিতভাবে প্রায় কিছুই জানা যায়নি এবং এ-সম্পর্কে খুব সতর্ক না হয়ে খোঁজখবর করা আদৌ সমীচীন হবে না। বস্তুত এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করা বড়োই কঠিন কাজ বলে মনে করা হয়েছিল।

১৮৯৪ এবং ১৮৯৫ সালে নেপালের সীমান্ত-সংলগ্ন জেলাগুলিতে এবং তারপরে গোটা বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের কোনো কোনো স্থানে গাছের গোড়ায় চুল এবং কাদা লেপার মতো কয়েকটি রহস্যজনক ঘটনা লক্ষ করা গিয়েছিল। তখন সাধারণভাবে সকলের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, এই কাজ ভ্রাম্যমান সাধুদেরই কীর্তি। কিন্তু এইসব ঘটনার গূঢ় উদ্দেশ্য বহুদিন যাবৎ অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল। তারপর কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার জন ল্যাম্বার্ট, চন্দননগর নিবাসী হীরালাল মুখার্জী ওরফে পরমানন্দ নামক জনৈক শিক্ষিত সাধুর কাছ থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা জানতে পেরেছিলেন। পরমানন্দ জানিয়েছিলেন যে, 'এজ অফ কনসেন্ট অ্যাক্ট' (অর্থাৎ হিন্দু সহবাস আইন) জারি হওয়ার পরে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হয়েছিল, সেখানে বাছাই করা কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী একত্রিত হয়ে কীভাবে এই নতুন আইনের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করবার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা যায় এবং সরকারকেই বা কীভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কাজে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, সেই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেছিলেন। অতঃপর এই হরিদ্বারে বসেই স্থির করা হয় যে সর্বপ্রথম মুসলমান কর্তৃক গো-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দেওয়া হবে। প্রধানত দুটি কারণে এই কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। প্রথমত, এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা ছিল সব থেকে সহজ কাজ। দ্বিতীয়ত, অন্য কোনোভাবে ঝামেলা শুরু করার চাইতে এই কর্মসূচির সপক্ষে সব চেয়ে বেশি পরিমাণ জনসমর্থন লাভ করা সম্ভব হবে বলে ভাবা গিয়েছিল। এইসব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের উপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করা যাতে 'এজ অফ কনসেন্ট অ্যাক্ট' সহ হিন্দুদের ধর্মরক্ষা-সংক্রান্ত অপরাপর বিষয়ে তাদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া হয়। এক হিসেবে এই আন্দোলন সফলও হয়েছিল কেননা এ-সবের ফলে দেশের সর্বত্রই অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অন্যভাবে বলা যায় যে, গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনের সুবাদে যে-সব হাঙ্গামা হয়েছিল তার ফলে আন্দোলনের অভীষ্ট সিদ্ধিই ব্যাহত হয়েছিল। সরকারের বিচারে হিন্দুরাই আক্রমণকারী বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের যথোচিত নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কসাইখানাগুলির সংখ্যা বাড়ানোর ফলে গো-হত্যার কাজেও কোনো ভাঁটা পড়েনি। এমনকী যে-সব জায়গায় আদৌ কোনো কসাইখানা ছিল না, সেখানেও এইগুলি খোলার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল।

সুতরাং এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত পরের মাঘ মেলার সাধু-সম্মেলনে বিষয়টি আবারও বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। এই আলোচনায় এই রকম সিদ্ধান্ত হয় যে, গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন যে কেবল প্রত্যাশিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছিল তাই নয়, এর ফলে সুনিশ্চিত ক্ষতিসাধনও হয়েছিল। কিন্তু তবুও সরকারের মনে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটা ব্যাপক

অস্থিরতার ভাব জিইয়ে রাখার জন্য যা হোক একটা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করা হয়েছিল। এই রকম কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে মানুষের মনে আগামী দিনগুলি সম্পর্কে একটা দুর্ভাবনা সৃষ্টি করা যাবে। ফলে গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনের সুবাদে জনমানসে উদ্ভূত দুশ্চিন্তা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হবে। আর তখন হিন্দুদের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে তোলার কাজেও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে।

মিউটিনির সময়কার চাপাটি বিতরণের পুরোনো কর্মসূচির অনুকরণেই এলাহাবাদ সম্মেলন থেকে এখন নতুন একটি পরিকল্পনার ছক তৈরি করা হল। চাপাটি বিলোনোর কর্মসূচি যেমন ত্রাস সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনই গাছে গাছে কাদা ও চুল লেপার ঘটনাকে একটা সংকেত হিসেবে মনে করলে সরকার জন-অসন্তোষের ফলে সৃষ্ট আসন্ন বিপদ সম্পর্কে একটা বার্তা লাভ করতে পারবেন বলেও ভাবা গিয়েছিল। গাছগুলির গায়ে মৃত্তিকা অবলেপন, হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী ইউরোপীয়ান ও মুসলমানদের কাছে একটা বিপদের ইঙ্গিত বলে অবশ্যই মনে হবে। গাছে লেপা কাদায় সাঁটানো চুলগুলির মতো এই সব হিন্দু-বিদ্বেষীদেরও সহজেই উপড়ে ফেলে ঝুরো মাটির মতো নিক্ষেপ করতে হবে—এটাই ছিল এই প্রতীকের নিহিত অর্থ। একেবারে প্রথম দিকে সাধু-সম্মেলনের নির্দেশ মতো অন্য কয়েকজন সাধুই কাদায় চুল সেঁটে আসতেন। যে-সব সাধুরা বাঘ এবং হরিণের চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন সেই সব নিহত পশুদের লোম কাদায় লেপার চুল হিসাবে ব্যবহার করা হত। রাস্তার ধারে অথবা গ্রামের সীমান্ত এলাকার গাছগুলিতেই সাধারণত মাটি লেপা হত। তবে কোনো সময়েই গ্রামবাসীদের সাহায্যে অথবা তাদের বিশ্বাস করে এই কাজের ভার তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হত না। এমনকী বিশেষ লেখাপড়া না-জানা যে-সব সাধুরা গুরুর নির্দেশে এই কাজ করতেন, তাঁরা নিজেরাও গুরুদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত থাকতেন না। তাদের কেবল গাছে মাটি লেপার হুকুমই দেওয়া হত এবং তাঁরাও সেই নির্দেশ মতো কাজ করে আসতেন। এই কর্মসূচি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রথমদিকে কেবল সেই জেলাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, যেখানে গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে নানারকম হাঙ্গামা দেখা দিয়েছিল। এইসব অঞ্চলে এই ধরনের কর্মসূচি সফলভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় পরে অযোধ্যা এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানেও এর প্রসার ঘটানো হয়েছিল।

উল্লিখিত বিবরণীর সত্যতা বহুলাংশেই পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৮৯৪ সালে এহ্‌টা জেলার কোনো এক জায়গায় গাছে মাটি মাখানোর সময় জনৈক সাধুকে হাতেনাতে পাকড়াও করা গিয়েছিল। আর সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, পরমানন্দ নামক এই শিক্ষিত সাধুটির বিবৃতি থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, কিছু একটা ধোঁয়াটে এবং বিপজ্জনক বিষয় প্রচার করার জন্য এবং জনমানসে একটা অস্থিরতার বোধ জাগিয়ে তুলবার জন্যই এই ভাবে সাধুদের ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে এই বিষয়ে কিছু লেখার অবকাশে স্যার জন ল্যাম্বার্ট মন্তব্য করেছিলেন যে, রাজনৈতিক সন্ন্যাসীরা সকলেই হাল আমলের সৃষ্টি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে সামাজিক জীব হিসেবে এঁদের অতীত রেকর্ড বেশ খারাপই ছিল। তবে এটা বোঝা গিয়েছিল যে এঁরা ছিলেন সকলেই শিক্ষিত মানুষ এবং সেই কারণেই এঁদের খুব সাবধানে

নজরে রাখার দরকার বলে মনে করা হয়েছিল। ল্যাম্বার্টের বিবৃতিতে যে-চারজন রাজনীতি-প্রচারক সাধুর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকেরই অতীত রেকর্ড রীতিমতো কলঙ্কময় ছিল এবং তাঁরা সকলেই হয় নিজেদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন নয়তো ফৌজদারি আদালতের বিচারে দণ্ড লাভ করেছিলেন। এঁরা ছাড়া অন্য যে-সব সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁদের তো কোনো রকম শিক্ষালাভও ঘটেনি। আর গাছে মাটি লেপা বা গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনে সামিল হওয়া ভিন্ন তাঁদের নিজেদের মধ্যেও আর কোনো বিষয়ে কোনো রকম মিল ছিল না।

১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেন্ট্রাল স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি সার্কুলার মারফত জানানো হয়েছিল যে, হিন্দু পুনর্জাগরণের যে-কর্মসূচি সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে তদনুযায়ী আগেকার তুলনায় আরো অনেক বেশি প্রকাশ্যভাবে সন্ন্যাসী এবং সাধুদের প্রচারের কাজে নামানো হয়েছে। এই সকল প্রচারকের দল, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় উভয়বিধ উদ্দেশ্যেই কাজ করতেন। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সার্কুলারে বলা এই তথ্যও একটু খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলও নেতিবাচক হয়েছিল কেননা পরবর্তী দশ বছর, সাধুদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের চিহ্নমাত্রও আবিষ্কার করা যায়নি।

১৯০৭ সালে বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে নতুন করে আবারও এই প্রশ্নটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে; হরিদ্বার, মথুরা, এলাহাবাদ এবং বেনারসে যে-সব প্রকৃত হিন্দু সাধুদের বিপুল জমায়েত দেখা যেত তারা আগেকার তুলনায় রাজনীতিতে অধিকতর আগ্রহ দেখাননি। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগকেই ক্ষতিকারক বলে মনে হয়নি। এঁদের চাহিদা ছিল শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছুটা খাদ্য এবং নেশা করার জন্য খানিকটা চরস। কিন্তু এঁদের মধ্যেও কয়েকজন প্রকৃত সাধুর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা গত বছরে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেদের সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত করেছিলেন। এঁরা কোনো ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা সেনাবাহিনীতে যাতে স্থায়ীভাবে অসন্তোষ সৃষ্টি করা যায়, সে-জন্য এঁদেরই নিয়োগ করেছিলেন। সংখ্যায় খুব বেশি হওয়ার দরুন এঁরা রীতিমতো বিপদের কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যাই হোক এইভাবে ধর্মকে ভিত্তি করে সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টার কোনো বিরাম ছিল না।

ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রয়োজনে নতুন ধাঁচের একদল সাধুকে প্রশিক্ষিত করার পরিকল্পনাটি কিন্তু মোটেই অভিনব ছিল না। বাংলা দেশের (Bengal) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এই পরিকল্পনার আভাস দেওয়া ছিল এবং পাঞ্জাব ও ডেকানের আন্দোলনকারীদের, এই পরিকল্পনার সাম্প্রতিক প্রবক্তা হিসাবে মনে করা হয়েছিল। পুনায় শ্রীযুক্ত গোখলের 'সার্ভ্যান্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি' এইভাবে রাজনৈতিক সাধুদের ট্রেনিং দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। লালা লাজপত রাইও গোখলের অনুকরণে লাহোরে একটি কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব করেছিলেন। হরিদ্বার ও কাঙ্গনিতে আর্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত এইরকম কয়েকটি কেন্দ্র গড়েও উঠেছিল। ১৯০৪ সালে টহলরাম গঙ্গারাম নামে ডেরা ইসমাইল খানের জনৈক ক্ষুদ্র ভূস্বামীও

রাজনৈতিক কাজের প্রয়োজনে সাধুদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা গিয়েছিল বলে মনে হয় না। মথুরার স্বামী শিউগন আচার্যও একইভাবে কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। আর হরিদ্বারের দর্শনানন্দ তো সম্ভবত তাঁর শিষ্যদের রাজনীতির বার্তাবহ (emissaries) হিসাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। তবে বাংলা দেশের (Bengal) হাওড়া জেলার বেলুড় মঠেই সব চেয়ে সফলভাবে একদল নবীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তৈরি করে তাঁদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত করা গিয়েছিল।

রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা সাধুদের দিয়ে রাজনৈতিক কাজ করিয়ে নেওয়ার সুবিধা সম্পর্কে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। সাধুরা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারেন, তাঁদের ব্যয়ভার যৎসামান্য কেননা তাঁরা যে-অঞ্চল পরিভ্রমণ করতেন সেখানকার মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া ভিক্ষা থেকেই জীবিকানির্বাহ করতে পারতেন। তাঁদের সর্বস্তরের হিন্দু, বিনা সন্দেহে স্বাগত জানাতেন এবং ধর্ম ব্যাপারে কর্তৃত্ব করার সুবাদে তাঁদের শিক্ষা ও প্রচারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা সহজেই প্রভাবিত হতে পারত। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা বুঝেছিলেন যে, যে-অগণিত জনগণের কাছে তাদের নিজেদের ভাষার খবরের কাগজও পৌঁছতে পারত না, তাদের কাছেও এইভাবেই পৌঁছে গিয়ে তাদের প্রভাবিত করা সম্ভব হবে। তা ছাড়া সরকার ধর্মীয় চরিত্রের বা ধর্মীয় আদলের কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ না করার যে-নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে এইসব পরিব্রাজক সাধুরা সহজেই কর্তৃপক্ষের প্রহরা এড়িয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারতেন। সাধু সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পরমানন্দ, আনন্দানন্দ ইত্যাদি বিশেষত্বহীন (colourless) নাম গ্রহণ করার ফলেও তাঁরা বাড়তি কিছু নিরাপত্তা লাভ করতেন। এই রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের পুলিশ মারফত পাওয়া এইসব সন্দেহ-উদ্রেককারী সাধুদের নানা কীর্তির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় প্রচারকগণ প্রধানত বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার অঞ্চল উত্তর ভারতকেই তাঁদের কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রধান পীঠস্থান এই অঞ্চল থেকেই দেশীয় বাহিনীতে সৈন্য নিয়োগ করা হত। এই কারণেই এতদঞ্চলেই হাল আমলের যাবতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ করা গিয়েছিল। তবে সাতারা জেলার বাঈ এবং বেলগাঁও জেলার সংকেশ্বরেও রাজনৈতিক প্রয়োজনে সাধুদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে বলে খবর এসেছিল। তা ছাড়া কয়েকজন সুশিক্ষিত দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বিভিন্ন হাটে ও মেলায় ঘুরে ঘুরে জনতার মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও শোনা গিয়েছিল। তিলক এই প্রচার অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনিই এই আন্দোলনে সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়েছিলেন।

এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট অংশটি পাঠ করলে জানা যাবে পাঞ্জাব ও সীমান্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ এই সব অধিকাংশ রাজনৈতিক সাধুর দল যদি প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার না-ও করে থাকেন তা হলেও অন্তত জনমানসে অসন্তোষ সৃষ্টি করার কাজে তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন। কেউ কেউ তো অনর্গল ইংরেজি বলতেও পারতেন। দু-একজনের পুরোনো রেকর্ড ঘেঁটে জানা গিয়েছে যে তাঁরা সরকারের বা অন্যত্র কোথাও ভাল চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। এই বিবরণী

পাঠ করলে আরো বোঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা যেমনটি দাবি করেছিলেন সেই রকম সত্যি সত্যিই যদি এইসব রাজনৈতিক সাধুরা গোটা দেশ ছেয়ে ফেলতে পারতেন তা হলে তাঁদের উপর নজরদারি বেশ কঠিন কাজ হয়েই দাঁড়াত। আরো দেখা গিয়েছে যে, এই রকম কয়েকজন সাধু হঠাৎ হঠাৎ এক জায়গা থেকে বেশ কয়েকমাস উধাও হয়ে আবার অন্য এক জায়গায় আবির্ভূত হয়েছেন। এর থেকে এমন অনুমান করা সম্ভব যে, এঁরা মাঝের এই সময়ে সবার অগোচরে অন্য কোথাও হাজির হয়ে সেই এলাকার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে গিয়েছেন। অবশ্য উল্লিখিত পরিশিষ্টাংশে যে, সব কিছুর পূর্ণাঙ্গ সংবাদ পরিবেশন করা গিয়েছে এমন নয়। আসলে প্রাদেশিক স্পেশাল ব্রাঞ্চগুলিও যাতে এই সাধুদের গতিবিধির উপর নজর রেখে তাঁদের সম্পর্কে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত (complete histories) তৈরি করতে পারে সেই কারণেই এই প্রাথমিক প্রস্তুতির (groundwork) অংশটুকু সংযোজন করা হয়েছে।

১৯০৭ সালে, বিশেষত বছরের গোড়ার দিকে এইসব ধর্মীয় ব্রহ্মচারীদের, দেশীয় সৈন্যবাহিনীর বিপুলাংশের আনুগত্যে ফাটল ধরানোর মতো বিপজ্জনক কর্মে লিপ্ত হতে দেখা গিয়েছিল। ব্যাপারটি প্রথমে সংযুক্ত প্রদেশ ও ইস্টার্ন কম্যান্ডের নজরে আসে এবং তারপরে নানা রকম বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সূত্র মারফত এইসব তথ্যের সমর্থনেই খবর আসতে থাকায় সেনা-লাইনের ভিতর সাধুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে বহু রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এইভাবে সৈন্যদের কাছে যেতে বাধা পাওয়ায়, রাজদ্রোহ-প্রচারকদের তখন হরিদ্বার এবং অমৃতসর প্রভৃতি যে-সব জায়গায় সৈন্যরা ছুটি কাটাতে যেত, সেইসব এলাকাতেই হাজির হয়ে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। সাধুরা সেনাদের মধ্যে কী ধরনের সর্বনাশা-চিন্তা (pernicious ideas) ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তার একটি উদাহরণও উল্লেখ করা যেতে পারে। হরিদ্বারের সন্দেহভাজন সাধুদের সঙ্গী এই-রকম একজন সন্ন্যাসী আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সংবাদদাতার কাছে বেশ কিছু অসন্তোষজ্ঞাপক মন্তব্য করেছিলেন। এই ব্যক্তিটি প্লেগের মড়কের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন যে, সেই সময় বেশ কয়েকজন ইংরেজ ডাক্তারকে ইচ্ছাকৃতভাবে কূপের জল দূষিত করার সময় হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছিল। সে আরো বলেছিল যে, এইসব ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে প্লেগের প্রকোপ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় মানুষকে এখনই সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে যাতে কোনো একজন ব্রিটিশও পালিয়ে না যেতে পারে। হয়তো এ-সবের ফলে এ-দেশে অল্প কিছুদিনের জন্য মুসলমান রাজত্বও ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তার পরেই ভারতবর্ষে এমন এক রাজার আবির্ভাব হবে যিনি হিন্দু রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন।

কলকাতার মানিকতলা বাগানে অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির (Anarchist Society) ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার সময় এই প্রতিষ্ঠানটিরও অভিধর্মীয় (semi-religious) চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল। এটিকে আশ্রম তথা সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের স্থান বলা হত। যাঁরা এখানে যাতায়াত করতেন তাঁরা ভগবদ্গীতা পাঠ করবার জন্যই মিলিত হতেন। আর সেই সঙ্গে তাঁরা বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ বানানো ছাড়াও নিজেরা রিভলভার ছোঁড়া অভ্যাস করতেন।

এটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাস 'আনন্দমঠ' বা Abbey of Bliss-এর একটি জীবন্ত ও বাস্তব অনুকৃতি। তফাত শুধু এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দেশাত্মবোধক

সঙ্ঘটি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে দেশকে মুসলমানী অপশাসনের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পক্ষান্তরে মানিকতলার আশ্রমটি ব্রিটিশ স্বৈরাচারের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। তবে উভয়ক্ষেত্রেই সদস্যগণের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার লক্ষণীয় প্রভাব অনুভব করা গিয়েছিল। এই আশ্রমের সভ্যরাও সাধুদের বেশ পরিধান করে ভগবদ্গীতা পাঠ করতেন এবং দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করার পুণ্য সঙ্কল্পে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

মানিকতলা আশ্রমের জনৈক বিশিষ্ট সদস্য উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন যে, এই ধরনের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় তিনি শেষপর্যন্ত কলকাতায় ফিরে এসে এই আশ্রমটি স্থাপন করার জন্য বারীন্দ্র-র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইও আদালতকে জানান যে, সন্ন্যাসী হবার শপথ না নিয়েই তিনি একজন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং তাঁদেরই মতো বেশভূষা ধারণ করার ফলে তাঁর মধ্যেও একটা পবিত্র ভাব দেখা যেত। যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওরফে নিরালম্ব স্বামী নামে এই দলের আর একজন সাধু; পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং কাশ্মীর পরিভ্রমণ করার আগে বরোদার সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়ে গাইকোয়াড়ের দেহরক্ষী ফৌজের সদস্য রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, অরবিন্দ ঘোষকে তিনিই নিজের বৈপ্লবিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই মামলার সুবাদে শিবজ্ঞানজী তথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত শিউগন আচার্য নামে জনৈক রাজদ্রোহী সন্ন্যাসীর দিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইনি একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু পরে সাধু হয়ে গিয়ে মথুরাতে 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অংশত ধর্মীয় ও সামাজিক ছদ্মবেশের আড়ালে তিনি রাজনৈতিক প্রচার চালাতে সচেষ্ট ছিলেন।

পুনাতে একটি সন্দেহজনক বিস্ফোরণের ঘটনার সূত্র ধরে কোলাপুরে সম্প্রতি তদন্ত করার অবকাশে জনৈক আপাতদৃষ্টিতে খাঁটি সাধুর সঙ্গে একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক সংগঠনের কথা জানতে পারা গিয়েছে। ১৯০৪ অথবা ১৯০৫ সাল নাগাদ কোলাপুরের শিবাজী ক্লাবের কয়েকজন সদস্য 'বেলাপুর স্বামী ক্লাব' নামে একটি নতুন সংগঠন গড়েছেন বলে জানা গিয়েছিল। আহমদনগর জেলার গোদাবরী নদী-তীরবর্তী বেলাপুরের জনৈক স্বামীজির নামানুসারেই এই ক্লাবের নামকরণ হয়েছিল। এই স্বামীজি অতীব পূত চরিত্রের মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি নাকি মিউটিনিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ক্লাবের সদস্যগণ স্বামীজির একটি ছবির সামনে উপবিষ্ট হয়ে নানা রকম আধা ধর্মীয় (quasi-religious) অনুষ্ঠান পালন করতেন। অবশ্য স্বামীজি নিজে এইসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অথবা আদৌ জড়িত ছিলেন কি না সে-বিষয়ে কিছু জানা না গেলেও এটা ঠিক যে কোলাপুরের বেশ কয়েকজন বিপজ্জনক উগ্রপন্থী ব্রাহ্মণ তাঁরই নামের মহিমায় পরস্পর একসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

কলকাতার কাছে বেলুড়ে এই রকম আর একটি সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এখানকার এই মঠটি ছিল বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়। এই কেন্দ্রের প্রচলিত ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থায় একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। এখানকার সন্ন্যাসী-নিবাসটির মালিক ছিলেন বাবু রসিকলাল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ

নামে জনৈক বদরাগী বৃদ্ধ এখানকার মোহান্ত ছিলেন। এই জায়গায় যে-সব সাধুদের বসতি ছিল তাঁরা ছিলেন সবাই বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ এবং এঁরা রাজনৈতিক প্রচারক হিসাবে দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। তবে ১৯০৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে খবর আসে যে, সম্ভবত সরকারি নজরদারি শুরু হওয়ার কারণে গত মাস থেকে এখানকার প্রচার-ভ্রমণের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই জায়গাটি যে বিপ্লবের আখড়া হিসাবেই পরিকল্পিত হয়েছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়, কেননা, বিবেকানন্দর ভাই এবং যুগান্তর দলের প্রথম দণ্ডপ্রাপ্ত সদস্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এখানেই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আবার বরোদার দেশীয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও এই ধরনের আধা-ধর্মীয় একটি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। কলকাতার অ্যানার্কিস্ট দলের সঙ্গে এই কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে বরোদার একটি মারাঠি ভাষার কাগজে নিম্নলিখিত সহানুভূতিসূচক মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল।

গঙ্গানাথ ভারতীয় বিদ্যালয়

এখান থেকে প্রায় ২০/২৫ মাইল দূরে নর্মদা নদীতীরের চান্নোড়ের কাছে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। দুই বছর আগে এটি চালু হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে এই সময়ের মধ্যে এটি একটি সমৃদ্ধিশালী বিদ্যালয়ে পরিণত হবে। কিন্তু যে-হেতু কর্তৃপক্ষ এইসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখেন সেই কারণে এবং অনিষ্টকারী নানা লোকের মন্দ কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে অনেক রকম সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অবশ্য কয়েকজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিও এই প্রতিষ্ঠানে সাহায্য পাঠিয়েছেন। তবে গত বছর অরবিন্দ ঘোষ এই জায়গা ঘুরে যাওয়ার পর, হয়তো সেই কারণেই গোয়েন্দা পুলিশের দল এই কেন্দ্রে খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। গতকাল এখানকার বেশ কয়েকজন ছাত্র বরোদায় এসে হাজির হয়েছিলেন। উল্লিখিত নানা পদ্ধতিতে এই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে-ভাবে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এটিকে অনতিবিলম্বেই বরোদাতে স্থানান্তরিত করার কথা ভাবা হচ্ছে।

এই স্কুলটি খোলার কথা যাঁদের মনে প্রথম উদয় হয়েছিল তাঁরা হলেন কে.জি. দেশপান্ডে, (তিলকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ব্যারিস্টার এবং কেমব্রিজের স্নাতক এই ভদ্রলোক ১৮৯৭ সালে রাজদ্রোহের মামলায় তিলক অভিযুক্ত হলে, তাঁর পক্ষে ব্যবহারজীবী হিসাবে কাজ করেছিলেন) এম. বি. যাদব, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ এবং এ.বি. দেওধর। এঁরা সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই স্কুল খোলার উদ্দেশ্যে কেশবানন্দ নামে জনৈক সন্ন্যাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। চান্নোড় থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরবর্তী গঙ্গানাথ টিলার শীর্ষে মহাদেব মন্দিরে ১৯টি বালককে সংস্কৃত শেখানোর জন্য তিনি এই বিদ্যালয়টি খুলেছিলেন। এই কাজে বেনারস প্রত্যাগত জনৈক ব্রহ্মানন্দ তাঁকে সবিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

কেশবানন্দ প্রধানত কয়েকজন ধনী ভাটিয়া এবং সম্ভবত বরোদার মহারাজার কাছ থেকেও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে গঙ্গানাথ পাহাড়ের উপরে শ্রীগঙ্গানাথ ভারত শ্রীবিদ্যালয়ের

নতুন ভবন নির্মাণ করিয়ে ১৯০৫ সালের ১৭ই মে তারিখে এর দ্বারোদঘাটন করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ছিল চার। বরোদা জেলার সরকারি উকিল এম.বি. তলোয়ারকর; বি.এ., এল.এল.বি., এই স্কুলের কার্যনির্বাহী সচিব ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কে.জি.দেশপান্ডের উদ্যোগে ১৯০৮ সালের জুন মাসে বরোদাস্থিত মহাদেবের কাশী বৈষ্ণেশ্বর মন্দিরে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ে বৈদিক ও ব্যবহারিক শাখায় সর্বমোট ৩৭ জন ছাত্র পঠনপাঠন করত। এখানকার বৈদিক শাখায় বেদ-সহ আধুনিক বিজ্ঞানও পড়ানো হত। দশ থেকে চোদ্দো বছরের অবিবাহিত বালকদেরই কেবল এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যেত। তবে ভর্তি হওয়ার পর ছয় থেকে দশ বছরের মধ্যে যাতে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেওয়া না হয় সে-জন্য অভিভাবকদের প্রতিশ্রুতি দিতে হত।

স্কুলের সর্বশেষ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এর পরিচালকমণ্ডলীতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পরিচালকবৃন্দ (Directors)

১) শ্রীকেশবানন্দ গুরু ব্রহ্মানন্দ
২) মান্ডবের মেহেরান রানা শ্রীজিৎ সিংজি
৩) বরোদার মগনভাই পুরুষোত্তমভাই
৪) আমেদাবাদের চিনুভাই মাধবলাল, সি.আই.ই.
৫) বরোদার রাও বাহাদুর কৃষ্ণরাও বিনায়ক ষড়ঙ্গপাণি, বি.এ., এল.এল.বি.
৬) কোলাপুরের অধ্যাপক বিষ্ণুগোবিন্দ বিজাপুরকর, এম.এ.
৭) বরোদার উকিল রামচন্দ্র হরি গোখলে, বি.এ., এল.এল.বি.

কার্যনির্বাহী সমিতি (Managing Board)

১) বরোদার প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সকরলাল দেশাই, এম.এ., এল.এল.বি.
২) বোম্বাইয়ের ডা. মোরেশ্বর গোপাল দেশমুখ, এম.ডি.
৩) বরোদার ব্যারিস্টার রাও বাহাদুর কেশব গণেশ দেশপান্ডে, বি.এ.

কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)

১) বরোদার শ্রীমন্ত চিন্তামন রাও নারায়ণ ওরফে ভান সাহেব মজুমদার

সচিববৃন্দ (Secretaries)

১) বরোদার উকিল হরি বালকৃষ্ণ তলোয়ারকর, বি.এ., এল.এল.বি.
২) যোগ স্টেট, জওহর স্টেটের ব্যবসায়ী, রামচন্দ্র মোরেশ্বর
৩) বরোদার উকিল, গণেশ ভাস্কর সানে, বি.এ., এল.এল.বি.

উপরোক্ত আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে লাহোর থেকে একটি রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। তিলকের দণ্ডাদেশ সংবাদটি জানাজানি হওয়ার পরেই লাহোরের অজিত সিংহ, সুফি অম্বাপ্রসাদ সহ আরো কয়েক ব্যক্তি সাধুর ছদ্মবেশে 'তিলক আশ্রম' গড়ে তোলার জন্য সর্বত্র চাঁদা সংগ্রহের আবেদন করে বেড়াচ্ছেন। প্রস্তাবিত এই আশ্রমে রাজনৈতিক সাধু বানাবার জন্য যুবকদের শিক্ষিত করে তোলা হবে বলে মনে হচ্ছে। আশ্রমের জন্য ইতিমধ্যেই বেশ

কিছু পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা গেলেও, এ-ব্যাপারে অধিক আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এ-ছাড়া 'সার্ভ্যান্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি'-র অনুকরণে লাজপত রাই পরিকল্পিত 'দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে কিছু কাজ হলেও এ-ক্ষেত্রে আগের মতোই অধিক আর এগোনো সম্ভব হয়নি।

সি. জে. স্টিভেন্সন-মুর
অফিশিয়েটিং ডিরেক্টর অফ ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স

পরিশিষ্ট

(পুলিশ-পঞ্জি এবং অন্যান্য সূত্র মারফত সংগৃহীত কয়েকজন সন্দেহভাজন সাধুর কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী)

অমিধর প্রসাদ রুশিরাজ ওরফে হরভজন : বরগুদার মহিকান্ত এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত অমিধর প্রসাদকে চারজন চেলা সমভিব্যাহারে প্রথম ১৯০৮ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে ব্রোচ এলাকায় দেখা গিয়েছিল। এঁর মতাদর্শ—বয়কট এবং স্বদেশি-জারিত ধর্ম। তবে পরবর্তীকালের একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, ইনি ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা এবং ভজন গানের মধ্যেই এখন নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এঁকে ঠগ এবং দুশ্চরিত্র বলে সন্দেহ করা হয়।

আনন্দানন্দ ওরফে অমূল্যপ্রসাদ / আশুতোষ সুর : হুগলি জেলার খাসারি-নিবাসী আশুতোষ সুরের পুত্র এই সন্ন্যাসীর প্রকৃত নাম অমূল্যপ্রসাদ সুর। পিতার মৃত্যুর পর এবং গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপনান্তে ইনি কলকাতার একটি নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। কিন্তু এই কাজে ক্লান্ত হয়ে তিনি অচিরেই বোম্বাইয়ের এক জহুরির কাছে শিক্ষানবিশি শুরু করেন। তারপরে এই কাজেও অসন্তোষ বোধ করায় তিনি অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এঁর দুটি ভাইয়ের মধ্যে একজন মন্মথনাথ সুর, যিনি কলকাতার একটি সওদাগরি অফিসে চাকরি করেন। সুরেন্দ্রনাথ সুর নামে অপর একজন ভাই হাওড়ার জনৈক উকিলের কাছে মুহুরি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। আনন্দানন্দ বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি এবং গুজরাটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ইনি স্বদেশি, বয়কট, স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়ে প্রচারের কাজ করতেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় ইনি কুষ্ঠিয়া জেলার আলমপুর-নিবাসী জনৈক বরেন্দ্রনাথ রায়-এর সংস্পর্শে আসেন। বরেন্দ্রনাথ বোম্বাই, বরোদা এবং মধ্যভারতের রেল কোম্পানিতে কেরানির চাকরি করতেন। কিন্তু ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইনিও ব্রহ্মচারীর জীবন বরণ করেন। ১৯০৭ সালের মে মাস নাগাদ আনন্দানন্দ, ব্রহ্মচারী বরেন্দ্র রায় সমভিব্যাহারে স্বদেশি প্রচারের কাজে সমগ্র গুজরাট পরিভ্রমণ করেন কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিশেষ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এইভাবে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশে তাঁরা সুরাট, বালসার, পর্দি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। ১৯০৭ সালের জুন মাসের শেষদিকে তাঁরা উভয়েই বোম্বাইয়ে ফিরে এসে বিভিন্ন জনসভায় স্বদেশি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এইসব জনসভায় প্রধানত ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক এবং ছাত্রের দলই জমায়েত হত। কয়েকটি সভায় বি.জি. তিলক, খারে,

অধ্যাপক রানাডে এবং জি. কে. গ্যাডগিলের মতো লোকেরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। ১২ই জুলাই তারিখে তাঁরা যাতে জনসমক্ষে আর রাজদ্রোহ প্রচার না করেন সেই ব্যাপারে তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের 'হালাই ভাটিয়া মহাজনওয়াড়ি'-র একটি জনসভায় এঁদের দুজনকেই বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই সভায় তাঁরা স্বদেশি আন্দোলন ও বিদেশি পণ্য বয়কটের সমর্থনে ওজস্বী ভাষণ দেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আনন্দানন্দ 'স্বদেশি' বিষয়ে বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দিতে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। তবে কিছুদিন আগে তাঁকে যে চেতাবনি দেওয়া হয়েছিল সে-কারণে তিনি এবার সংযত ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে তিনি ব্রোচের নানা স্থানে 'ভারতের বর্তমান অবস্থা' ও 'স্বদেশি' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তবে পুলিশের মতে এইগুলি ছিল সংযত মেজাজের ভাষণ। এই সময় তিনি নানা রকম প্রচলিত উদাহরণ সহযোগে বিদেশি চিনির উৎপাদন প্রক্রিয়া ও তার ব্যবহারজনিত কু-ফলের কথা বর্ণনা করতেন। ২৩ জানুয়ারি (১৯০৮) তিনি আমেদাবাদে ফিরে আসেন এবং তারপরে ১৯০৮ সালের ৩১ মার্চ তারিখে তাঁকে আবারও নারাইদাতে এসে 'স্বদেশি' বিষয়ে বক্তৃতা করতে দেখা গিয়েছিল। ৭ মে তারিখে তিনি এই নারাইদাতেই ফিরে এসে, 'স্বরাজ্য' বিষয়ে আবার একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একই সময়ে তিনি থানা অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশের করনীতি, অস্ত্র আইন এবং বিচার-ব্যবস্থার সমালোচনা করে বয়কটের সপক্ষে ভাষণ দেন।

বিবরণ পঞ্জি (Descriptive Roll) : আনুমানিক বয়ঃক্রম—২৩ বৎসর; নিবাস—হুগলি জেলার জনাই ডাকঘর এলাকার খরসরাই গ্রাম; বাম হাতের উল্কিতে লেখা A.N.K.P.।

আনন্দ মনিরাম ওরফে আনন্দানন্দ স্বামী : জুনাগড়ের গুজরাটি ব্রাহ্মণবংশীয় ১৬ বছর বয়সের এই কিশোর 'স্বদেশি' বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার অপরাধে জুনাগড় হাইস্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। এরপরেও তাকে ১৯০৮ সালের ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমেদনগরের রাছড়িতে 'স্বদেশি' বিষয়ে ভাষণ দিতে দেখা গিয়েছিল। এই জায়গায় সে 'জাতীয় শিক্ষা', 'মরিশাস থেকে আমদানি করা চিনি', 'ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ' প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা করে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। মে মাস নাগাদ সে তিলকের সঙ্গে আকোলাতে ফিরে এসে স্বদেশি, স্বরাজ্য, জাতীয়তাবাদ, সুরাপান নিরোধ এবং ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেয়।

পূর্ব খান্দেশের জেলাশাসকের মতে 'নিতান্ত নাবালক এই ছেলেটি সন্ন্যাসী হিসাবে শ্রদ্ধেয় বলে গণ্য হবার যোগ্য ছিল না।'

আনন্দস্বামী/ গুরু স্বামী রামতীর্থ : লাহোর নিবাসী জয়পুরের এই রাজপুতটি সেখানকার মহারাজার কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে এঁকে ব্রোচে স্বামী আনন্দানন্দের সঙ্গে 'শরীর চর্চা' বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দেখা গিয়েছিল। তবে এটি বেশ সংযত ধরনের ভাষণ (of a mild character) বলে রিপোর্ট করা হয়েছিল।

আত্মানন্দ : এই সন্ন্যাসীটি কথাবার্তার সময় কিছুটা ইংরেজি প্রয়োগ করতে পারতেন এবং তাঁকে বেশ শিক্ষিত বলেই বোধ হত। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে তাঁকে নৈনিতালে দেখা

গিয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে তাঁর আগমন হয়েছিল সে-খবর তিনি কিছুতেই প্রকাশ করেননি।

অভিরুদ্দ মিশ্র / বিদ্যানাথ মিশ্র : মধ্যপ্রদেশের (Central Provinces) সম্বলপুরের বাসিন্দা এই সন্ন্যাসীটিকে ১৯০৮ সালের ২৪ শে মার্চ তারিখে ধারওয়াড়ে প্রথম দেখা গিয়েছিল। ইনি ইংরেজি ও সংস্কৃত জানতেন এবং 'স্বদেশি' ও 'ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করে বেড়াতেন।

বৈশাখী রাম : জলন্ধরের কর্তারপুর অন্তঃপাতী খাতরি-নিবাসী হরনাম দাসের পুত্র এই ঘোর অবাধ্য ও রাজদ্বেষপ্রবণ (disloyal and inclined to be seditious) সন্ন্যাসীটি বিগত দুই বছর যাবৎ ১৯ টাকা মাসিক বেতনে আর্যসমাজ কর্তৃক হোসিয়ারপুরে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আর্যসমাজই তাঁকে রাজনীতি এড়িয়ে থাকার জন্য সাবধান করে দিয়েছিলেন। এখন তিনি খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করার কাজেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছেন।

হোসিয়ারপুরে সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদেরও যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন (জুন, ১৯০৭)।

১৯০৭ সালের ২১ জুলাই তারিখে তিনি হোসিয়ারপুরের একটি জনসভায় 'আর্যধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি গোটা হোসিয়ারপুর জেলাতেই বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন। এই সময় তিনি এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, সরকার জনশিক্ষার বিষয়টি অবহেলা করে চলেছেন। ১৯০৭ সালের ২৭ নভেম্বর তিনি হোসিয়ারপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ২৯ নভেম্বর ওই স্থান ত্যাগ করে আবার লাহোরের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

বলদেও সহায় : এই ভেকধারী সাধুটির সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির যোগাযোগ ছিল। এই ধনী সন্ন্যাসীটি আসলে একজন উগ্রপন্থী প্রচারক ছিলেন। ইনি বরোদা, বোম্বাই এবং পুনায় ঘুরে ঘুরে দিন কাটাতেন। নিজের খরচে তিনি বেশ কয়েকজন ছাত্রকে জাপানেও পাঠিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ১ জুনে তাঁকে দিল্লিতে দেখা গিয়েছিল।

ভগ সিং ওরফে **'মেরা প্যারা'** ('My dear') ওরফে **'মৌলবি সাহেব'** : ইনি ছিলেন অমৃতসরের চাউলমন্ডির জনৈক দয়াল সিং অরোরার পুত্র। পুলিশের খাতায় অসাধু চরিত্র (bad character) হিসাবে তাঁর নাম নথিবদ্ধ ছিল। চারজন সন্দেহভাজন সাধু সমভিব্যাহারে এঁকে একবার জলন্ধরেও দেখা গিয়েছিল। এই পাঁচজনের মধ্যে চারজন, যথা পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মচারী এবং ভগ সিং স্বয়ং ইংরেজি জানতেন। ১৯০৭ সালের ১৯ জুন তারিখে ভগ সিং জলন্ধর ছেড়ে লাহোরে এসে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে আবার ২ জুলাইয়ে অমৃতসর এসে পৌঁছান। ১৪ নভেম্বরে তিনি পুনরায় জলন্ধরে আসেন এবং ১৬ নভেম্বরে ফের অমৃতসর হাজির হয়েছিলেন।

বিহারী দাস : মথুরা জেলার বৃন্দাবন-নিবাসী ভানু রামের পুত্র এই ব্যক্তিটি ফকিরের বেশে ১৯০৭ সালের ৩০ এপ্রিলে ডেরা ইসমাইল খাঁ-তে এসে পৌঁছান। ইনি অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেন। তবে এঁকে সন্দেহজনক বলে ভাবা হলেও এঁর বিরুদ্ধে সে-রকম আপত্তিজনক কিছুই জানতে পারা যায়নি।

বিশ্বম্ভর দাস : ইনি জনৈক তুলসীরামের পুত্র। ইনি আর্যসমাজের হয়ে পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ এবং বোম্বাই ঘুরে বেড়াতেন। পর্যটনকালে তিনি কখনো ইউরোপিয়ান পোশাকে এবং কখনো

বা ফকিরের বেশে আবির্ভূত হতেন। ইনি রাজদ্রোহমূলক (seditious) আলোচনাতেই বেশির ভাগ সময় নিমগ্ন থাকতেন। ১৯০৭ সালের ৩১ আগস্ট তাঁকে হোসিয়ারপুরে দেখা গিয়েছিল।

বিষেণ দাস : ইনি ফিরোজপুরের গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জলন্ধরে বক্তৃতা সেরে ২৩ জুলাইয়ে আবার ফিরোজপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০৭ এর ২৮ জুলাইয়ে তিনি অবশেষে লুধিয়ানাতে এসে পৌঁছান।

ইনি ইংরেজের তৈরি ওষুধ ও চিনি ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। তিনি বলতেন যে, সরকার ভারতবাসীর ধর্মনাশ করতে সচেষ্ট ছিল এবং সেনাবাহিনীর লোকেরা ১৮৫৭ সালে যদি আত্মবলি না দিত, তা হলে এতদিনে সবাইকেই খ্রিস্টান করা হয়ে যেত। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই এই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

৩০ জুলাই তারিখে ইনি ফিরোজপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরোজপুর বাজারে তাঁকে এই মর্মে প্রচার করতে শোনা যায় যে, ভারতবাসীরা নাকি ইংল্যান্ডে গিয়েই তরবারি হাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হবে। অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকেও তিনি একটি জনসভা করেছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত হবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। গো-হত্যা বিষয়ে আমিরের একটি মন্তব্য শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন যে, ঐক্যের প্রথম ধাপ হিসাবে উভয় সম্প্রদায়কেই এখন সমবেতভাবে গো-হত্যা নিবারণ করতে হবে।

চৈতন্যস্বামী : ১৯০৮ সালের ২০ মে তারিখে হোসিয়ারপুরে এই বাঙালি যুবকটিকে দেখা গিয়েছিল। এঁর কাছে সর্বদাই নানা রকমের রসায়নাগারিক পাত্র (crucibles) থাকত। ইনি বলতেন যে, তিনি নাকি বোমাও বানাতে জানেন। তাঁকে বেশ ধনী বলেই মনে হত এবং সম্ভবত তাঁর অনেক টাকাও ছিল। তিনি ১৯০৮ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর নাগাদ কলকাতাতেই থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁকে প্রত্যহ রাত ৮টা থেকে ১০ টার মধ্যে কালীমন্দিরে পাওয়া যাবে বলে শোনা গেলেও তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি।

স্বামী দর্শনানন্দ : ইনি মাসিক ২০ টাকা বেতনে সংযুক্ত প্রদেশের হরিদ্বারে আনারকলি সমাজ' কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছিলেন এবং আর্যধর্মের সপক্ষে লেখালেখি করতেন। ১৯০৭ সালের ২১ আগস্টে তিনি জাতীয় ঐক্য বিষয়ে বুদায়ুনে একটি ভাষণ দেন। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে পাওয়া একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তিনি সাধুদের লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হরিদ্বারে নিজেরই প্রতিষ্ঠিত 'সাধু আশ্রম'-এর ম্যানেজারি করেছিলেন। পরবর্তীকালের আর একটি রিপোর্টে জানা যায় যে তিনি ঝাঁসির ৮৭ নং পাঞ্জাবি রেজিমেন্টের জনৈক সিপাই মারফত সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে বিফল হন।

দত্তাত্রেয় গণেশ ঘানেকর : অকালকোটের পরলোকগত স্বামীজীর এই শিষ্যটিকে ১৯০৮ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে নাসিকে দেখা গিয়েছিল। নিজের গুরুর জন্মোৎসবের জন্য চাঁদা সংগ্রহের আপাত উদ্দেশ্যেই ইনি এখানে এসেছিলেন। তবে রাজনীতির বিষয় নিয়েও যে তিনি এখানে আলোচনা করেছিলেন সে-খবরও পাওয়া গিয়েছিল।

দৌলত গিরি : এই সন্ন্যাসীটিকে ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে হরিদ্বারে দেখা গিয়েছিল। তিনি সবাইকে প্রশ্ন করতেন যে তারা অন্তত যে-সব নিরীহ ইংরেজ প্রত্যাঘাত করতে অপারগ

তাদের উপর প্রতিশোধ চরিতার্থ করছে না কেন? তিনি আরো বলতেন যে, তাঁদের ধর্ম ও মর্যাদা অপহরণ করা হয়েছে। তাঁর মতে লাজপত রাই ও অজিত সিং-কে যদি মুক্তি দেওয়া না হয় তা হলে আবার একটি বিদ্রোহ দেখা দেবে।

দেবকী আনন্দ শংকরাচার্য : ইনি ১৯০৮ সালের মে মাসে দিল্লিতে এসেছিলেন, অল্পবিস্তর ইংরেজি জানতেন এবং এঁকে দেখেও বেশ শিক্ষিত বলে মনে হত। ইনি বলেছিলেন যে তিনি কোনো এক সময়ে যোধপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, কিন্তু পরে সাধু হয়ে যান। ৫ জুন তারিখে ইনি গুরগাঁওয়ের গাড়ি হাসান অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। এখানে তিনি মাংসভোজী মানুষ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং এই কারণে তাঁকে সি.পি.সি. ১০৭ ধারা মোতাবেক চেতাবনি পাঠানো হয়েছিল।

স্বামী দেবস্বরূপ : ইনি কপুরথালার সর্দার প্রতাপ সিং-এর সঙ্গে জলন্ধরে বসবাস করছিলেন এবং সেখান থেকে ১৯০৭ সালের ২৪ ডিসেম্বরে লাহোরে এসে উপস্থিত হন। নিজেকে কাশ্মিরের মহারাজার গুরু বলে তিনি দাবি করতেন। বিগত ১০ বছর ধরে তিনি লাহোরে বাস করছেন এবং তিনি জম্মু থেকে নিয়মিত ভাতাও পেয়ে থাকেন। তিনি প্রায়ই সাকেত রাজ্যে পরিভ্রমণে যেতেন এবং স্বয়ং জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের সর্বত্র বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। ১৯০৪-৫ সালে তিনি কাশ্মিরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালটি তিনি ছাম্বা রাজ্যে অতিবাহিত করে ১৯০৭ সালে সিমলাতে এসে উপস্থিত হন। এঁর সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজে বিশেষ অনিষ্টজনক না হলেও নানা রকমের মতলববাজ লোকের পাল্লায় পড়ার ব্যাপারে তাঁর একটা প্রবণতা ছিল। এইসব লোক তাঁর মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করত।

ধর্ম সিং : শিয়ালকোটের এই বাসিন্দাটি নিজে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং প্রায় ৪০ জনকে নিজ সম্প্রদায়ের সদস্য করান। তিনি নিজেকে গুরু গোবিন্দ সিং-এর অবতার বলে দাবি করে জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে তিনি পাঞ্জাবের শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করবেন (৩ আগস্ট ১৯০৭)। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি অস্ত্র আইনের বিধান অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হন এবং দু-বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

দক্ষিণানন্দ ব্রহ্মচারী : হরিদ্বার-নিবাসী এবং বি.এ. পাশ এই সাধুটি ইংরেজি, হিন্দুস্থানি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ১৯০৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর তিনি তদবধি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ইনি স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবনচর্যা সম্পর্কে এঁর প্রায় কোনো ধারণাই ছিল না এবং বিজ্ঞান ও তড়িৎশক্তি বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল যৎসামান্য। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে তাঁকে দুইজন চেলার সঙ্গে গৌহাটিতে প্রথম দেখা গিয়েছিল। এঁর কাছে প্রায়শই অনেক বাঙালি দেখা করতে আসতেন।

গণপতি আইয়ার : ১৯০৮ সালের মে মাসে এই সাধুটিকে সালেম অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। উগ্র মতাবলম্বী এই সাধুটি যে রীতিমতো বিপজ্জনক সে-খবরও পাওয়া গিয়েছিল। তিনভেলিতে দাঙ্গা বাধানোর কাজে ইনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এই দাঙ্গায় অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য তিনি ১৫০ টাকার মতো চাঁদাও সংগ্রহ করেছিলেন।

গয়ানন্দ : ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে এই সন্ন্যাসীটিকে ফৈজাবাদ জেলা হয়ে বেনারস থেকে হরিদ্বারে উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছিল। ইনি বলতেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টি করিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে রেখেছে। (এই বক্তব্যের সমর্থনে) ইনি উদাহরণস্বরূপ বঙ্গবিভাগের কথা উল্লেখ করতেন। ইনি আরো বলতেন যে, এমনটি যদি না হত তা হলে হিন্দু অথবা মুসলমানদের মধ্যেই যে কেউ ভারতবর্ষ শাসন করতে পারত।

হরদাস : পুনার অধিবাসী এই ব্রাহ্মণ ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর জেলায় এসে উপস্থিত হন। ইনি একজন ধর্ম ও নীতিজ্ঞান প্রচারক বলে বাহ্যত প্রতীয়মান হলেও এঁর বক্তৃতা একেবারে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত ছিল না।

হরিচন্দ্র ওরফে হরি মুখার্জী : ইনি ছিলেন হুগলি জেলার বালির অন্তর্গত ব্যানার্জীপাড়ার অধিবাসী গুরুদাস মুখার্জীর পুত্র। পুলিশ এঁকে একজন সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষ বলেই চিনত এবং আপাতদৃষ্টিতে ইনি অপরাধমূলক কাজ করে বা অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশা করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। ১৯০৫ সালে ইনি বালি ছেড়ে চলে যান এবং তারপরে ১৯০৭ সালের ১০ আগস্টে গুরুদাসপুরের বাতালাতে এসে পৌঁছান। এখানে ইনি সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করেন এবং অমৃতসরের দায়রা বিচারকের অফিসের বড়োবাবু ভবানী সিং নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। এই ব্যক্তিটির (অর্থাৎ ভবানী সিং) উদ্যোগেই অজিত সিং বাতালাতে ভাষণ দিয়েছিলেন।

জগানন্দ সরস্বতী : ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে এঁকে হাওড়ায় দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে ২২ মে তারিখে ইনি বেনারসে এসে পৌঁছান। ইনি এম.এ. পাশ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের উপায় উদ্ভাবন করার সংকল্প নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

যমনাদাস, মিত্রাদার ওরফে সরপাদাস ওরফে রামদাস : পাতিয়ালার এই ফকিরটি ছিলেন আসলে একজন ভণ্ড শিখ। করাচিতে ১০৫ নং মাদ্রাজ লাইট ইনফ্যান্ট্রির কাছে ঘোরাফেরা করার সময় এঁকে পাকড়াও করা হয়েছিল। ১৯০৭ সালের ৯ই জুলাই তারিখে ইনি সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। আগস্ট মাসে তিনি মুলতানে ফিরে এসে ২৭ নং পাঞ্জাবি রেজিমেন্টের কাছে ঘোরাঘুরি করছিলেন। সেই সময় অফিসার কম্যান্ডিং-এর ইচ্ছানুসারে তাঁকে নজরে রাখা হয়েছিল। ৯ আগস্ট তিনি করাচির দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে পরে আর তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

জানকী দাস : ইনি ছিলেন লাহোরের শ্রী স্বামী দ্বারকা দাসের একজন চেলা। ১৯০৭ সালের ১৩ আগস্ট তারিখে তিনি নবগঞ্জে এসে উপস্থিত হন। শোনা যায় যে ৩৭ নং ডোগরা বাহিনীর খড়গা নামে একজন সিপাই তাঁর অন্যতম চেলা ছিলেন।

যোগীন্দ্র পাল : খেতরির গান্ডা মলের পুত্র এই সন্ন্যাসী ফকিরটি মূলত গুরুদাসপুরের দীনানগরের বাসিন্দা হলেও বেশ কয়েকবছর ধরেই জলন্ধরে বসবাস করছিলেন। জলন্ধর এবং তার নিকটবর্তী গ্রামের যে-সব এলাকায় আর্যসমাজের শাখা রয়েছে সেই সব জায়গাতেই ইনি প্রচারের কাজ চালাতেন। ইনি খুব উগ্র মেজাজের প্রচার ও বক্তৃতা করতেন এবং আর্যসমাজ ভিন্ন অপরাপর সব ধর্মেরই বিরোধিতা করে ভাষণ দিতেন। ইনি যে-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন

সেখানকার সব শিখ ও মুসলমান তাঁর প্রচারের ফলে সাধারণত আর্য সমাজপন্থীদেরই প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বদেশির ঘোর সমর্থক এই সন্ন্যাসী নিজের শ্রোতাদের বিদেশি চিনির ব্যবহারে নিবৃত্ত করার জন্য বলতেন যে, এই চিনি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াতে গরু ও অন্যান্য পশুদের হাড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইনি প্রধানত জলন্ধরের সবচেয়ে নিকটবর্তী এলাকাতেই নিয়মিত প্রচার করতেন। ইনি 'প্রতিনিধি সভা'র[২] কাছ থেকে মাসিক ৩০ টাকা হারে বেতন পেতেন।

কীর্তন দাস : ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে হরিদ্বারে এই বৈরাগীটিকে দেখা গিয়েছিল। সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি একটানা অনেকক্ষণ বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজে কোথা থেকে এসেছেন সে-বিষয়ে কোনো খবর দিতে চাইতেন না।

কুমার আনন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে **কুঁয়ারানন্দ** : এলাহাবাদ নিবাসী এই সন্ন্যাসীটি ইংরেজি, সংস্কৃত এবং উর্দু জানতেন বলে শোনা গিয়েছিল। ৯ নং ভোপাল ইনফ্যান্ট্রির পাঞ্জাবি সিপাইদের সঙ্গে এঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। এই সেনা লাইনেরই একটি মন্দিরে ইনি বসবাস করছিলেন (মে. ১৯০৭)।

মহেশানন্দ : এই সাধুটি গোয়ালিয়র এবং দাতিয়া পরিদর্শনকালে সেখানকার সাধারণ নাগরিক এবং রাষ্ট্রীয় অফিসারদের (State officials) ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য প্রচার করেছিলেন (২৪ মে, ১৯০৮)।

মোতিরাম : এলাহাবাদের বাবু বেণীমাধব উপাধ্যায়ের পুত্র এই ব্যক্তিটিকে ১৯০৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে শিবিতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে দেখা গিয়েছিল। ইনি ভালো ইংরেজি বলতে পারতেন এবং এঁকে একজন সন্দেহজনক মানুষ বলেই মনে করা হয়েছিল। শিবিতে যে-সব হিন্দু করণিক ছিলেন তাঁরাই চাঁদা তুলে এঁর রেলভাড়া জুগিয়েছিলেন। এলাহাবাদে এঁর সম্পর্কে আর বিশেষ কোনো খবর সংগ্রহ করা যায়নি।

মুক্তানন্দ স্বামী ওরফে **সন্ত কর্তার সিং** : ১৯০৭ সালের ৫ মে তারিখে এঁকে পেশোয়ারে দেখা গিয়েছিল। সমকালীন কয়েকটি বিষয় প্রসঙ্গে শিখ সেনাদের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি এখানে হাজির হয়েছিলেন। ইনি নাকি বেশ কয়েকবারই তাঁর ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন। এক সময়ে ইনি আর্যসমাজীও হয়েছিলেন। তবে পরে আবার সনাতন ধর্মপন্থী হয়ে যান। বর্তমানে ইনি শিখ গুরুদের অনুগামী।

নারায়ণ দাস : এই বৈরাগী সাধুটি জমৌকার বাসিন্দা। বান্নু থেকে মৈনাবালিতে ফেরার পর সেখানেই তাঁকে ১৯০৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে দেখা গিয়েছিল। ইনি রাশিয়া ও আফগানিস্তান ঘুরে এসেছেন বলে দাবি করেছিলেন। ইনি উর্দু এবং গুরুমুখি লিপিতে লিখতে পারতেন এবং রুশ, তুর্কি, ফারসি ও পুস্তু ভাষায় কথোপকথনে সক্ষম ছিলেন। ১৯০৮ সালের ১৪ মার্চে ইনি দুই জন সাধু সমভিব্যাহারে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঝিলাম অঞ্চলে এসে পৌঁছান।

নরাঞ্জন দীয়া : ১৯০৮ সালের ১৯ জুন তারিখে ইনি সতীশ ব্রহ্মচারী নামে একজন চেলার সঙ্গে লখনউ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নরাঞ্জন ছিলেন রামতীর্থ নামে জনৈক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার অনুগামী ও উত্তরসূরি।

স্বামী পরিচানন্দ ওরফে **ফতে সিং** ওরফে **নারায়ণ দাস** : বুলান্দশরের জগৎপুরের বাসিন্দা দুলি সিং নামে জনৈক জাঠের পুত্র এই ব্যক্তিকে ১৯০৮ সালের ১২ জুন তারিখে ঝাঁসিতে

দেখা গিয়েছিল। এখানে তিনি ৩০ নং ল্যান্সার-এর (30th Lancers) সওয়ার খামিল সিং-এর সঙ্গে বাস করছিলেন। কিন্তু এখানকার সেনাপ্রধান (Officer Commanding) কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ায় তিনি কিছুদিন পরেই গোয়ালিয়র চলে যান। সম্ভবত ইনি নিরক্ষর ছিলেন। কোথাও বক্তৃতা করেননি।

পরমানন্দ/ব্রহ্মানন্দ/ভগ সিং : বোম্বাই ধানগোড়ার অধিবাসী এবং জাহাঙ্গিরার বাঙালি দ্বারকানন্দর পুত্র পরমানন্দ এবং ছত্রির রানি-খাতরা মহল্লার দ্বারকা দাসের পুত্র ব্রহ্মানন্দকে, ভগ সিং প্রমুখ আরো কয়েকজনের সঙ্গে জলন্ধরে প্রথম দেখা গিয়েছিল। এঁরা সকলেই ইংরেজি জানতেন। ১৯০৭ সালের মে মাসে এঁদের সঙ্গে নারায়ণ দাসের যোগাযোগ হয়। এঁরা তিনজনেই আর্যসমাজের প্রচারক ছিলেন। ২৯ মে তারিখে এঁরা সাহারানপুরে এসে পৌঁছান। এঁরা সরকারবিরোধী বক্তৃতা দিতেন। ৩ জুন তারিখে তাঁরা বেরিলি থেকে নৈনিতালের হলুদবনিতে এসেছিলেন। ১৪ জুলাইয়ে ব্রহ্মানন্দ দেরাদুনের পথে হরিদ্বার ছেড়ে চলে যান। সেখান থেকে ১৬ তারিখে ফিরে এসে আবার ২৬ তারিখে আম্বালার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এঁরা দু-জনেই (অর্থাৎ পরমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ) সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন।

স্বামী প্রেমানন্দ : ইংরেজিতে পণ্ডিত এই ব্যক্তি নানা ধরনের গুহ্য বিদ্যাতেও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। শোনা যায় যে তিনি দু-জন মাড়োয়ারি এবং জনৈক আমেরিকান সাহেব সমভিব্যাহারে বাংলা দেশের (Bengal) নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছিলেন। এইসব স্থানে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের অভিপ্রায়ে 'স্বদেশি' প্রচার করে বেড়াতেন।

রামদাস : পাতিয়ালার নারাউল পুলিশ থানার অন্তর্গত কারোহিয়া গ্রামের অধিবাসী নানকের পুত্র এই উদাসী ফকিরকে মূলতানের ২৭ নং পাঞ্জাবি রেজিমেন্টের লাইনে ১৯০৭ সালের আগস্ট মাস নাগাদ ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। বেশ কয়েকজন সিপাইও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত এবং তাদের তিনি শিখ-ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। ৯ আগস্টে ইনি করাচি অভিমুখে যাত্রা করেন।

রামদাস ঠাকুরদাস : আগ্রার এই সাধুটি এলাহাবাদে 'স্বদেশি'-র সমর্থনে বক্তৃতা করতেন। তিনি বলতেন যে, যতই রক্তপাত হোক না কেন, এ-দেশের মঙ্গল হবেই হবে (মে, ১৯০৭)।

রতন গিরি : বেনারসের বাসিন্দা এই বাঙালি সাধুটিকে গয়ার তীর্থযাত্রীদের কাছে ইংরেজ খেদানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল (এপ্রিল, ১৯০৮)।

রতন দাস ওরফে **ছাতার সিং** : ফিরোজপুরের মোগা পুলিশ থানার অন্তর্গত দাওয়ার নিবাসী সেবা সিং নামে জনৈক জাঠের পুত্র এই সাধুকে ১৯০৭ সালের জুন মাসে জলন্ধরে দেখা গিয়েছিল। ইনি জানিয়েছিলেন যে তিনি বিগত সাত বছর যাবৎ ফকির হয়েছেন এবং তারও সাত বছর আগে তিনি গাইডদের রেজিমেন্টে চাকরি করেছিলেন। এঁকে সন্দেহজনক লোক বলে মনে করা হয়েছিল।

সামানন্দ : ১৯০৭ সালের ১৪ জুনে এই ফকিরকে একজন আর্যসমাজী প্রচারকের সঙ্গে গুজরানওয়ালায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। ইনি রাওয়ালপিন্ডির দিকে চলে গেলেও সেখানে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায়নি।

সঞ্চায়েৎ ওরফে **সুচেৎ** ওরফে **ভগৎ রাম** : ডেকানের চেলারির (?) বাসিন্দা এই ফকিরকে ১৯০৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের অল্প কিছুদিন আগে পুলিশ প্রহরায় হাসান আব্দালে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরে তিনি অমৃতসরে এসে পৌঁছেছিলেন।

ওঙ্কারেশ্বর সচ্চিদানন্দ ওরফে **ত্রিম্বক** : মালবের উজ্জয়িনীর ধারানগরীর বালকিষেণ নামে জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র এই সাধুটিকে ১৯০৫ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে শাহবাদে সনাতন ধর্মের বাণী প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল। ১৯০৬ সালের ২২ এপ্রিলে তিনি শাহবাদ ছেড়ে শাহজাহানপুর জেলার কোনো এক স্থানের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর পৌঁছানোর সংবাদ পাওয়া না গেলেও তিনি যে ফের এলাহাবাদের দিকে রওনা হয়েছিলেন সে-খবর জানা গিয়েছিল। ১৯০৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে আবার মুর্শিদাবাদে 'স্বদেশি' বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে অক্টোবর মাসে, আবার তিনি বেনারস গিয়ে 'স্বদেশি' বিষয়ক প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে তিনি কামালগঞ্জে (ফতেপুর) বোম্বাইয়ের চিনি এবং লবণ বয়কট করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সংযুক্ত প্রদেশের আখনিরে 'স্বদেশি' ও 'গো-রক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময় তিনি পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার রহুতে, একটি অনাথ আশ্রমে ম্যানেজারের কাজ করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু পরে এই সংবাদটি ভুল ছিল বলে জানা যায়।

১৯০৭ সালের ২ জুলাইয়ে তিনি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের একটি জনসভায় বৈদিক ধর্ম বিষয়ে ভাষণ দেন। এই সভায় কুখ্যাত লিয়াকৎ হোসেন সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৮ জুলাইয়ের কিছু আগে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ ৭ নং নেবুতলা লেনের একটি বাড়িতে তাঁর সন্ধান পেয়েছিল।

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি এলাহাবাদে যান এবং সেখান থেকে লখনউ হয়ে ২০ অক্টোবরে উনাওতে এসে হাজির হন। এখানে তিনি কোনো ভাষণ না দিলেও তাঁর কথাবার্তায় ভারতবর্ষ যে কেবল ভারতবাসীদেরই জন্য এই রকম একটা ধারণা প্রকাশ পেয়েছিল। উনাও থেকে তিনি ফতেপুর জেলার একটি গ্রামে এসে পৌঁছান। এখানে অবস্থানকালে তিনি আমদানি করা চিনির অশুদ্ধ প্রস্তুতপ্রণালীর কথা উল্লেখ করে দেশি চিনি ব্যবহারের গুরুত্ব প্রচার করেন।

১৯০৭ সালের ৮ নভেম্বরে তিনি আবার উনাও-তে ফিরে এসে স্বদেশি চিনির মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। এক সপ্তাহ পরে তিনি কানপুরে যান। এখানে সকলেই তাঁকে একজন প্রগতিপন্থী আর্যসমাজী, কট্টর স্বদেশিওয়ালা এবং উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের সমর্থক বলে চিনত।

১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে তাঁকে মোরাদাবাদের কুম্ভ-এ দেখা গিয়েছিল। এখানে তিনি ইংল্যান্ডে প্রস্তুত চিনি ব্যবহারের বিরোধিতা করে বক্তব্য প্রচার করেছিলেন। মার্চ মাসে তিনি সীতাপুর যাওয়ার পথে কয়েকটা দিন হরদইতে অতিবাহিত করেন এবং একটি কি দুটি সভায় ধর্ম বিষয়ে ভাষণও প্রদান করেন।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি লখনউতে এসে তারপর সেখান থেকে ফৈজাবাদে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে, তিনি একজন নিরাসক্ত সন্ন্যাসী এবং জনসাধারণের মঙ্গলের

জন্যই সত্য এবং ধর্ম বিষয়ে প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন। ১৮ মে তিনি তাঁর ঘোষিত গন্তব্যস্থল নেপাল যাওয়ার জন্য ফৈজাবাদ ত্যাগ করেন। পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত আর্যসমাজ সম্পর্কে ১৯০৭ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আর্যসমাজের লাহোর-স্থিত বাচ্চাওয়ালির নিরামিষভোজী সম্প্রদায়টিই সম্ভবত মাসিক ২০ টাকা বেতনে সচ্চিদানন্দকে নিযুক্ত করেছিল। বিভিন্ন রিপোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে যে ইনি ছিলেন রাজদ্বেষী এবং স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক।

সতীশচন্দ্র মুখার্জী : কলকাতার বালিগঞ্জের রামলাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র এই ব্যক্তিকে ১৯০৭ সালের মে মাসে হোসিয়ারপুরে দেখা গিয়েছিল। এখানে তিনি একটি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত দাড্ডা-শিবার রাজা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সরকারি চাকরির বিরুদ্ধে এবং 'স্বদেশি'-র সপক্ষে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেছিলেন যে, রাওয়ালপিন্ডির দেশপ্রেমিকদের স্বার্থে তিনি কাংড়া অঞ্চলের পার্বত্য এলাকাগুলি পরিভ্রমণ করে চাঁদা সংগ্রহের কাজে উদ্যোগী হয়েছেন।

সেবানন্দ স্বামী ওরফে **মন্মথনাথ দাস** : ২৫ বছর বয়সী এই স্বামীজি প্রবেশিকা পরীক্ষার মান অবধি লেখাপড়া করেছিলেন এবং এক সময়ে কলকাতার টেলিগ্রাফ অফিসে কেরানির চাকরি করতেন। এঁকেও স্বদেশিওয়ালা বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি ওই অফিসেরই বিপিনবিহারী দে নামে ছুটিতে যাওয়া আর একজন কেরানির সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে বেনারসের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

শঙ্করানন্দ স্বামী ওরফে **রাম নারায়ণ** : গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত ভিন্দ-এর অধিবাসী এই হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের পিতা, গোয়ালিয়র স্টেট সার্ভিসে একজন অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও ওই স্টেটেরই পুলিশ বিভাগে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। ওই চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরেও তিনি পিতৃপ্রভাবের সুবাদে বরোদার অশ্বারোহী বাহিনীতে দফাদার হিসাবে পুনরায় বহাল হয়েছিলেন। কিন্তু দু-বছর আগেই তিনি চাকরির পাওনা গ্র্যাচুইটি তুলে নিয়ে সাধু হয়ে যান। ইনি ইংরেজি, বাংলা, মারাঠি, হিন্দি এবং উর্দু ভাষা জানতেন। ইনি বাংলা, সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নানা স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯০৮ সালের ১৭ জুন ইনি হরিদ্বারে এসে পাওয়া-র রাজা ফতে সিং-কে ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের জন্য ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বলেন এবং জানা যায় যে রাজাও তাঁর মতবাদে আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন। ১৯০৮ সালের ২৮ জুন তারিখে তিনি ইন্দোরে ছিলেন এবং সেখান থেকে ৪ জুলাইয়ে বারনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। পাঞ্জাবের আনারকলি সমাজ তাঁকে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেছিল। ইনি ছিলেন প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষ এবং 'স্বদেশি'-র প্রচারবক্তা।

শঙ্কর দাস : গুজরানওয়ালার এই সন্দেহজনক উদাসী সাধুটিকে ১৯০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরে রাওয়ালপিন্ডিতে ২৫নং পাঞ্জাবি সেনা লাইনের কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। শিক্ষিত এবং মোটামুটি ইংরেজি বলতে ও লিখতে জানা এই মানুষটি এক সময়ে রাজপুতানা-মালব রেলওয়েতে চাকরি করতেন। ১৯০৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে তিনি রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগ করে ঝিলাম যাওয়ার পথে অদৃশ্য হয়ে যান। গুজরানওয়ালাতে খোঁজ নিয়ে জানা

গিয়েছিল যে তিনি তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। আসলে তিনি উত্তর-পশ্চিম রেলপথের কর্মী (plate layer) জনৈক রাল্লা রাম নামক গোঁড়া আর্যসমাজীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শিউ দত্ত ওরফে **পরমানন্দ** : গয়া বক্সের পুত্র এই সচ্ছল মানুষটি বেনারস থেকে এলাহাবাদ এসে প্রায় সাত বছর আগে সাধু হয়ে যান। ৯ নং ভোপাল পদাতিক বাহিনীর সেনারা এবং অপর একজন সুবাদার মেজর, এঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসেন। কিন্তু ইনি রাজনীতি প্রসঙ্গে কোনো রকম আলাপ-আলোচনা করতেন বলে শোনা যায়নি। ১৯০৭ সালের রিপোর্টে তাঁকে একজন অরাজনৈতিক মানুষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছিল (জুন, ১৯০৭)।

শিবচেতন ওরফে **বলদেও** ওরফে **রাম সুখ** : এই সন্ন্যাসী ফকিরটি ছিলেন এলাহাবাদ জেলার মোবাস থানার অন্তর্গত মুর্খামাই গ্রামের বাসিন্দা। ইনি ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে কোহাট এবং বান্নু পরিদর্শন করতে যান। কিন্তু এখানে তিনি নিজের পূর্ব জীবন ও গতিবিধি সম্পর্কে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর মধ্যে রাজদ্রোহের প্রবণতা রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগে তিনি তাঁর জন্মস্থান ত্যাগ করে মাদ্রাজে তিন বছর অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি অল্পবিস্তর চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে, মাদ্রাজ ছেড়ে কাশ্মির, ঝিলাম এবং জম্মু অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতেই বসবাস করছেন।

শ্রীচাঁদ ওরফে **শ্রীরামচাঁদ** ওরফে **ব্যানার্জী** : এই হিন্দু সন্ন্যাসী ফকিরটি ইংরেজি বলতে পারতেন। এঁকে দেখে একজন সন্দেহজনক মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। ১৯০৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ এঁকে পেশোয়ারে ৫৯ নং রাইফেল লাইন পরিদর্শন করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছিলেন তা জানা যায়নি। তিনি অ্যাটকে হিন্দুস্তানি মোটর ড্রাইভারদের লাইনও পরিদর্শন করতে যান এবং সেখান থেকে ১৫ তারিখে ক্যাম্পবেলপুর ছেড়ে হাসান আব্দালের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ২১ জুন তারিখে তিনি ভিক্ষা করতে করতে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে যান। তারপর ২৪ তারিখে লাহোর হয়ে হরিদ্বার পৌঁছে আবার ৪ জুলাইয়ে অমৃতসর ও লাহোর অতিক্রম করেন। ১৩ জুলাই তারিখে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে উপস্থিত ছিলেন। আবার ৪ আগস্টে রাওয়ালপিন্ডি ছেড়ে কাশ্মিরে চলে যান এবং সেখান থেকে ১১ তারিখে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ওই একই দিনে অমৃতসরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এখানে আসার পর তিনি ৬ নভেম্বরে লাহোরের পথে যাত্রা করেন এবং সেখানে ৭ তারিখেই পৌঁছে যান। তারপর এখান থেকে নানকানার মেলা দেখে ১৯ নভেম্বরে আবার লাহোরে ফিরে আসেন।

পরবর্তী তিন মাস যাবৎ তিনি রাওয়ালপিন্ডিতেই ছিলেন এবং সেই সময় তাঁর সম্পর্কে বলবার মতো কিছুই ঘটেনি। ১৯০৮ সালের ৮ এপ্রিলে তিনি পেশোয়ারে যান এবং তখন ৫৯ নং রাইফেলসের একজন জমাদার ও হাবিলদার ১২ তারিখে তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেন। ২৭ এপ্রিল তারিখে তাঁকে আবার অ্যাটকে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে তিনি ১৯০৮ সালের ৯ মে কোয়েটার পথে যাত্রা করেন।

শ্রী কিষেণ দাস ওরফে **আনন্দ দাস** : রামনগর স্টেটের অধিবাসী শ্রীরামচন্দ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র এই ব্যক্তি ১৯০৮ সালের ৩ জানুয়ারিতে লাহোরে এসে ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী তিনি সংস্কৃত, গুরুমুখি, নাগরি ভাষা এবং উর্দুও জানতেন। তিনি সনাতন ধর্মসভা এবং থিওসফিকাল সোসাইটির অনুগামী ছিলেন এবং শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তেরও শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি পদব্রজে অধুনা ভারত পরিভ্রমণ করে চলেছেন।

শ্রী সবনন্দ ব্রহ্মচারী (?) : ইনি একজন শিক্ষিত ভক্ত মানুষ বলে পরিচিত। ৯ নং ভোপাল ইনফ্যান্ট্রি লাইনের কাছে ইনি ডেরা বেঁধেছিলেন (এলাহাবাদ, ৬ এপ্রিল, ১৯০৭)।

সুন্দর সিং : ইনি ছিলেন ২ নং শিখ বাহিনীর একজন প্রাক্তন সিপাই। এঁর সঙ্গে জনৈক সুবাদারের ঝগড়া হওয়ার ফলে এঁকে দুই মাসের জন্য কারাবাস ছাড়াও চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছিল। শোনা যায় যে তিনি প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালের জুন মাসে এঁকে কাংড়ার হরিপুরে দেখা গিয়েছিল।

তেজা সিং : ইনি ছিলেন ঝিলামের চকবাল এলাকার মাগওয়ানের বাসিন্দা। ১৯০৭ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে অমৃতসর থেকে পেশোয়ারে এসে হরিদ্বার ভ্রমণ করার পর ইনি ১ আগস্টে আবার পেশোয়ারে ফিরে যান। ইনি সাধারণত ধর্মকথা ব্যাখ্যা করার প্রসঙ্গে রাজদ্রোহের মতাদর্শ প্রচার করতেন।

টোগানন্দ : ইনি নিজেকে বেনারসের ব্রহ্মচারী বলে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এঁর উচ্চারণভঙ্গি শুনে এঁকে বাঙালি বলেই মনে হয়। ইনি ইংরেজি এবং সংস্কৃত জানতেন। তবে নিজের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে চাইতেন না। ১৯০৭ সালের ২৬ অক্টোবরে ইনি মূলতানে ধর্মীয় নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দেব : কলকাতা নিবাসী সন্দেহজনক এই মানুষটি যোগীদের মতো সাজপোশাক করতেন এবং অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেন। ১৯০৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বরে ইনি মথুরা থেকে দিল্লিতে এসে হাজির হয়েছিলেন।

ওয়ারিয়াম দাস : লুধিয়ানার এই আর্যসমাজী ১৯০৭ সালের ৯ জুন তারিখে জলন্ধরের ব্যারিস্টার শান্তিরামের সঙ্গে ফকিরের বেশ ধরে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ১৮ জুলাইয়ে আবার দেখা করে তিনি লুধিয়ানায় ফিরে যান। ২২ তারিখে সেখান থেকে ফিরে এসে ২৩ তারিখে উকিল নিহালচাঁদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সন্দেহজনক এবং দুশ্চরিত্র এই মানুষটির প্রকৃত নাম বংশীলাল। ইনি কয়েকজন সুপরিচিত আর্যসমাজীদের সঙ্গে প্রায়শই দেখা করতে যেতেন।

[G.M. Press, Simla. No.28 Cr. 27.2.09. 200 J.D.]

উপরে প্রদত্ত স্টিভেন্সন-মুর-এর দীর্ঘ রিপোর্টটি পাঠ করার অবকাশে এই সময়কার আরো একজন তথাকথিত রাজনৈতিক সাধুর বৃত্তান্ত এখানে পেশ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এঁর কথা উপরোক্ত রিপোর্টে না থাকলেও বাংলা দেশের (Bengal) আর একটি গোয়েন্দা অফিসের ফাইলে সবিস্তার লেখা হয়েছিল। এই ফাইলটির নম্বর D.I.G., I.B. 3593/1910. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন আশুতোষ-অধ্যাপক পরলোকগত নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের

সভাপতিত্বে গঠিত 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস (বাংলা অঞ্চল) সঙ্কলন কমিটি-র (State Committee for Compilation of History of Freedom Movement in India, Bengal Region) উদ্যোগে সংগৃহীত ৪৯ নং পেপারেও উত্তরপ্রদেশের পুলিশ ডায়েরি থেকে সঙ্কলিত এই সাধুটির চমকপ্রদ জীবনপঞ্জি বর্ণিত হয়েছে। কোলাপুর অঞ্চলের চিন্তাপুরী সাধু নামে একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণের পুত্র রাজেশ্বরানন্দ নামক এই সাধুটিকে পুলিশের খাতায় একজন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী (political agitator) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। চম্পারনের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিয়ে ইনি বলেন যে, তিনি দ্বারকার সরস্বতী মঠের পৃথ্বীধরাচার্য শঙ্করাচার্য মহারাজের শিষ্য। ধরা পড়ার সময়, তাঁর দুই কাঁধে উলকির কালি দিয়ে আঁকা চারটি বিন্দু সদৃশ দ্বারকা চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। সংযুক্ত প্রদেশ পুলিশের কাছে এই চিহ্নটি অজানা ছিল না। সাধুটিকে সর্বপ্রথম ১৯০৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে আবু রোড স্টেশনের এক জনসভায় ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে দেখা গিয়েছিল। এরপর ওই বছরের ১১ এপ্রিল তারিখেও তাঁকে চম্পারন জেলার রক্সৌলে অন্য আর একটি জনসভায় একই রকম আবেগাপ্লুত ভাষায় বক্তৃতা করতে দেখা যায়। এইসব ভাষণে তিনি ভারতবাসীর উপর ইংরেজের বিবিধ অত্যাচারের কথা বর্ণনা করে দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ওই মাসের ১৭ তারিখেও তিনি কানপুরের একটি সভায় অনুরূপ একটি ভাষণ দেন। সেখান থেকে তিনি আবার আজমিরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আজমির থেকে ফেরার পথে ভরতপুর রেল স্টেশনে এসেও তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। এই জায়গায় সেদিন সরকারের স্থানীয় পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্নেল ইম্পের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় সমাগত অভ্যাগতদের সম্বোধন করে এই সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একটি সরকার-বিরোধী ভাষণ প্রদান করেন। ২১ এপ্রিল তারিখে সংযুক্ত প্রদেশের পুলিশ বিস্তর কসরত করে অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ধরা পড়ার পর রাজেশ্বরানন্দ পুলিশের কাছে যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন সেটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> আমি রাজদ্রোহ নয়, 'স্বদেশি' বিষয়েই বক্তৃতা করে থাকি। আমি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর কল্যাণসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের মধ্যে জনা বিশেক লোক আমারই মতো বক্তৃতা করে বেড়ান। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন তিলক, লাজপত রাই, অজিত সিং এবং স্বয়ং আমি। আমার দায়িত্ব ছিল পাঞ্জাব, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, মাদ্রাজ, বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্যভারত অঞ্চলে বক্তৃতা করা।

রাজেশ্বরানন্দকে সে-যাত্রায় বেশিদিন জেলে রাখা যায়নি। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি অচিরেই মুক্তি লাভ করেন। ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আবার আগের মতো আজমির, পালানপুর, মারওয়াড় এবং মধ্যভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দেশের স্বাধীনতা ও স্বদেশি বিষয়ে বক্তৃতা করে বেড়ান। বোম্বাইয়ের পুলিশ পরবর্তীকালে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, দ্বারকার যে সরস্বতী মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে রাজেশ্বরানন্দ স্বীকারোক্তি করেছিলেন সেখানে ওই নামের সন্ন্যাসীর আদৌ অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর আচরণ এবং গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহ নিরসন হয়নি।

স্টিভেন্সন-মুর সংকলিত রাজনৈতিক সাধুদের জীবনপঞ্জি সমেত মূল রিপোর্টটি পাঠ করলে দেখা যায় যে, এখানে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রমুখ ধর্মভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে-সব সাধু-সন্ন্যাসীর উল্লেখ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারত তথা সংযুক্ত প্রদেশ (United Province), রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ডেকান, পাঞ্জাব এবং লখনউ, মিরাট, বেনারস, সিমলা, হরিদ্বার, মথুরা, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, জুনাগড়, পুনা, বরোদা প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দা। এইসব অঞ্চলেই তাঁদের প্রচার এবং উদ্যোগ বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। আনন্দানন্দ, চৈতন্যস্বামী, সতীশ মুখার্জী, সেবানন্দ স্বামী এবং উপেন্দ্রনাথ দেব প্রমুখ মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন বাঙালির নাম এই তালিকায় পাওয়া গিয়েছিল। বাংলা বাদে গোটা পূর্ব ভারত অর্থাৎ বিহার এবং আসাম, মায় উড়িষ্যা এবং তেলুগুভাষী অন্ধ্রপ্রদেশের কোনো ব্যক্তির নাম এই তালিকায় বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সমগ্র দক্ষিণ ভারত থেকে একমাত্র জনৈক গণপতি আইয়ারের নাম এই পঞ্জিতে স্থান পেয়েছিল। এইসব সাধুদের সঙ্গে যে-সব সর্বভারতীয় নেতাদের যোগাযোগ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একমাত্র তিলক এবং কদাচিৎ লাজপত রাইয়ের নামেরও উল্লেখ দেখা যায়।

স্টিভেন্সন-মুর 'পলিটিক্যাল সাধু' বলতে সঠিক কাদের বোঝাতে চেয়েছেন সেই প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর মেলে না। তাঁর কনফিডেন্সিয়াল সার্কুলারে ব্যক্তি সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকাণ্ডের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীসমাজের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত তিনি মিশন সম্পর্কে মাত্র কিছুদিন পরেই আরো বিস্তারিতভাবে দুটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন এবং যথা সময়ে আমরা সেই বিষয়েও আলোচনা করব। লক্ষ করার বিষয় যে, বর্তমানের এই রিপোর্টে ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ বা থিওসফিকাল সোসাইটির মতো ধর্মীয় এবং সামাজিক সংগঠনগুলির কোনো কর্মীর নাম উল্লিখিত হয়নি। হয়তো এঁদের মধ্যে কারোকেই মুরের প্রচলিত অর্থে সংসারত্যাগী ও গার্হস্থ্যধর্ম-বিমুখ সন্ন্যাসী বলে মনে হয়নি। কিন্তু আর্যসমাজের ক্ষেত্রে এই বিচার খাটে না। কেননা এই গোষ্ঠীর বহু কর্মীই ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশিয়ানা ও সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত ছিলেন। মুর এঁদের সম্পর্কে আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে না পারলেও তাঁর রিপোর্টে বহু আর্য সন্ন্যাসীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। বস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের মতো আর্যসমাজও যে বিপ্লবীদের একটি আশ্রয়কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সে-কথা গোয়েন্দা স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এফ.সি. ড্যালি (F. C. Daly) তাঁর ১৯১১ সালের ৭ আগস্ট তারিখের একটি রিপোর্টে স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন। ড্যালির মতে রামকৃষ্ণ মিশন তবুও তো, মিশন যাতে রাজনীতি এড়িয়ে চলে, সে-ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আর্যসমাজের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছার (political intention) কথা শোনা যায়নি। ড্যালির রিপোর্টে এলাহাবাদের জনৈক আলারাম সন্ন্যাসীর স্বীকারোক্তিমূলক একটি বিবৃতি সংযোজিত হয়েছিল। এটির মধ্যে আর্যসমাজের সরকার-বিরোধী নানা ক্রিয়াকাণ্ডের কথা লেখা ছিল।[৩]

হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা বেদাশ্রয়ী হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই নগরীতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর মাত্র আট বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে (সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, বাংলা ও আসাম) আর্যসমাজের অনেকগুলি প্রাদেশিক কেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন ১৩১টি শাখাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সমাজের কর্মসূচি রূপায়ণ করার জন্য সংগঠনের ভিতরে প্রান্তীয় সভা, প্রতিনিধি সভা, উপদেশক বা ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি ছাড়াও বেশ কয়েকটি স্কুল, বালকাশ্রম (গুরুকুল), কলেজ, বিধবা-আশ্রম প্রভৃতিও গড়ে তোলা হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন আর্যসমাজের মতাদর্শ, লিখিত আকারে প্রচার করার জন্য অনেক রকমের বই ও পত্রিকাও প্রকাশ করা হত। এইগুলির মধ্যে দয়ানন্দের নিজের লেখা *সত্যার্থ প্রকাশ* ছিল সর্বজনমান্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা।

ভারতবর্ষের সর্বত্র অর্থাৎ সব কয়টি প্রদেশে আর্যসমাজের কেন্দ্র ও শাখা সংগঠন ছড়িয়ে পড়লেও প্রধানত উত্তর ভারতেই এই আন্দোলন সব চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আবার উত্তর ভারতের মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক স্থায়িত্ব ও প্রসার লাভ করেছিল। এই দুই স্থানে আর্যসমাজের যথাক্রমে ৭৪ এবং ৩৫টি শাখা সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের আর কোনো প্রদেশে আর্যসমাজের এত অধিক শাখা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর্যসমাজের সাধারণ সদস্য বা তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যদিও সর্বস্তরের মানুষদের দেখা মিলত, তবুও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তালিকায় কিন্তু শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদেরই প্রাধান্য ছিল। এঁদের মধ্যে সরকারি চাকুরে, আইনজীবী, বিভিন্ন বৃত্তিধারী (professionals), বড়ো ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। এই সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্যরা হলেন গুরুদত্ত বিদ্যার্থী, অজিত সিংহ, লালা লাজপত রাই, হংসরাজ, সাঁই দাস, মুলিরাম (পরবর্তীকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ), জীবন দাস, দুর্গাপ্রসাদ, রামদেব, ভাই পরমানন্দ, লেখরাম, কৃপারাম (স্বামী দর্শনানন্দ), আত্মারাম, অমৃতসরী, শিবানন্দ, সর্বদানন্দ, গণপতি শর্মা এবং রামভুজ দত্ত। স্টিভেন্সন-মুরের পূর্বোক্ত রিপোর্টে এঁদের অনেকেরই নাম দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারগুলি দূর করে তাকে বেদভিত্তিক একটি মহান ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আর্যসমাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। দয়ানন্দ অনেকটা শ্রীঅরবিন্দের মতোই বেদ-বিশ্বাসী ছিলেন এবং বেদই যে ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একমাত্র উৎস, সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে আচ্ছন্ন ব্রাহ্মসমাজ বা প্রার্থনাসমাজের আন্দোলন এই বেদাশ্রয়ী ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে না। গো-হত্যাকারী মুসলমান ও ধর্মান্তরকরণপন্থী খ্রিস্টান মিশনারিগণ সম্পর্কে দয়ানন্দর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব গোপন ছিল না।

কিন্তু প্রধানত ধর্মের প্রয়োজনে গঠিত হলেও আর্যসমাজের ইংরেজ সরকার বিরোধী মনোভাব ও রাজনীতি সচেতনতা তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। আসলে স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের তাগিদেই দয়ানন্দ তাঁর আর্যসমাজের পরিচালনায় বেদাশ্রয়ী হিন্দুধর্মের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন। এই কারণেই দয়ানন্দ বিরচিত *সত্যার্থ প্রকাশ*-এ নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা হয়েছিল:

> স্বরাজ্যই হচ্ছে সব সময়ের জন্য সর্বাপেক্ষা হিতকারী। কোনো বিদেশি সরকার ধর্মীয় একদেশদর্শিতা বা জাতিবিদ্বেষমুক্ত হলেও অথবা যতই কেন না উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন হোক কিছুতেই বিজিতের পক্ষে মঙ্গলময় হতে পারে না।

ওই একই গ্রন্থে বেদাশ্রয়ী হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য অটুট রাখার জন্য দয়ানন্দ সরকার-বিরোধী যে তিনটি অনুজ্ঞা জারি করেছিলেন সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

> ১) সব রাজারই উচিত এমন সাত/আট জন সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রী নিয়োগ করা যাঁরা স্বদেশ ও স্বরাজ্যে জন্মেছেন এবং যাঁরা বেদে সবিশেষ বিশ্বাসী।
> ২) বেদে অনভিজ্ঞ মানুষ দ্বারা রচিত কোনো আইন কারো মানা উচিত নয়।
> ৩) বেদের মহিমা সম্পর্কে অনবহিত সম্রাটের উচ্ছেদের জন্য সকলেরই সর্বশক্তি প্রয়োগ করা উচিত।

এইসব অনুশাসনগুলির তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়। এগুলির নিগূঢ়ার্থ এই যে, ভারতবর্ষে বিধর্মী ও বেদবিরোধী বিদেশি শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীদের আশু ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত *সত্যার্থ প্রকাশ*-এর প্রায় গোটা ষষ্ঠ অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ের অন্তত দুটি অংশ ব্রিটিশ-বিরোধী উত্তেজক বিদ্রোহবাণীতে পূর্ণ ছিল। গোয়েন্দা পুলিশের মতে আর্যসমাজের প্রচারকগণ জনসভায় বক্তৃতা করার সময় প্রায়শই এই বই থেকে নানা অংশ উদ্ধৃত করে শ্রোতাদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করতেন। পুলিশ অভিযোগ করে যে, সম্রাট বনাম আলারাম মামলার সময় (২৬ নভেম্বর ১৯০২) আদালতে প্রমাণ হয়েছিল যে, এই মামলায় সনাতন ধর্মের প্রচারক বিবাদীপক্ষ, জনমানসে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য *সত্যার্থ প্রকাশ*-এর বহু অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন।

কিন্তু ভারত সরকারের হোম মেম্বার এবং প্রখ্যাত সেন্সাস বিশারদ স্যার হার্বার্ট রিজলে, আর্যসমাজের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত অভিযোগটি অস্বীকার করে বলেছিলেন যে, জনগণনা কার্যে অনুসন্ধান চালানোর সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আর্যসমাজ যথার্থই একটি ধর্মীয় ও সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠান। অবশ্য বেশ কয়েকজন রাজনীতি করা লোকও এই সংগঠনের সদস্য হয়েছিলেন এবং সেই কারণে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এই সংগঠনকে কম-বেশি ব্যবহার করাও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এভাবে দেখলে তো ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমবায়ে গঠিত যে-কোনো ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যেই রাজনীতির ছায়া খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে এই অবশ্যম্ভাবী সংস্পর্শটুকুর কথা বাদ দিলে আর্যসমাজকে কোনোক্রমেই একটি গুরুতর রকমের রাজনীতি করা গোষ্ঠী হিসাবে মনে করা চলে না। রিজলে বলেছিলেন:

> I am not qualified to speak with authority on the subject of the *Samaj*, but the impression which I have formed from enquiries made during the Census and from the Census Reports is primarily a religious and social one and that it is only political in the sense that many of its members are also politicians and that in the event of any political agitation being started the organisation of the *Samaj* would be utilised by the agitators if

> they were influential members of the sect. To this extent any religious movement that is started by the English educated men is bound to be political... But I do not think that *Samaj* can fairly be described as a political organisation.

আর্য সমাজের মতাদর্শে যেখানে যতটুকু গোঁড়ামি ও রাজবিদ্বেষ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, স্যার হার্বার্টের মতে তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। বস্তুত দার্শনিক মহামিলনের শুকনো বুলি আউড়িয়ে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং সক্রিয় জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণ করার জন্য হিন্দুধর্মকে কিছুটা রক্ষণশীল সংহতিবোধ সৃষ্টি করতেই হয়েছিল। রিজলের ভাষায়:

> ...the flame of patriotism will not readily arise from the cold grey ashes of philosophic compromise and that before Hinduism can inspire an active sentiment of nationality it will have to undergo a good deal of stiffening and consolidation.[৪]

কিন্তু রিজলে আর্যসমাজের সপক্ষে যাই বলুন না কেন, ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের চোখে তা কখনোই সন্দেহমুক্ত বলে প্রতিভাত হয়নি। এই সন্দেহের কারণ ব্যাখ্যা করার অবকাশে সংযুক্ত প্রদেশের সরকার পুলিশের গোপন রিপোর্ট থেকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছিল:

১) পাঞ্জাব পুলিশের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ১৮৯৯ সালে গুজরাট, শিয়ালকোট এবং গুজরানওয়ালায় আর্যসমাজের গুরুকুল আশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে লালা মুন্সিরাম, অমৃতসরের পণ্ডিত রামভুজ দত্ত সমভিব্যাহারে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিষোদগার করে জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলেছিলেন। এই সময় তিনি বলেছিলেন যে, মাসিক মাত্র সাত আট টাকা বেতনের বিনিময়ে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য সিপাইরা নির্বোধের মত সেনাবাহিনীতে গিয়ে নাম লেখায়। ১৯০৩ সালে পাঞ্জাবের জঙ্গ অঞ্চলেও মুন্সিরাম একই রকম বক্তৃতা দিয়ে অনেক মানুষের চিত্তবিক্ষোভ ঘটিয়েছিলেন।

২) দৌলত রাম নামে আর্যসমাজের অপর একজন প্রচারক ঝাঁসিতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় *সত্যার্থ প্রকাশ*-এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করে সৈন্যদলে রাজদ্রোহ সৃষ্টি করার জন্য উসকানি দিয়েছিলেন। এই অপরাধের জন্য ১৯০৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরে দৌলত রাম ঝাঁসির জেলাশাসক কর্তৃক ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়োর কোডের ১০৯ নং ধারা মোতাবেক দণ্ডপ্রাপ্তও হয়েছিলেন।

৩) ১৯০৯ সালে পণ্ডিত রামভুজ দত্ত প্রচারের উদ্দেশে বাংলা দেশে (Bengal) উপস্থিত হলে সেখানকার পুলিশ কমিশনার তাঁর আচরণে সন্দিগ্ধ হয়ে তাঁকে জনসভায় বক্তৃতা দিতে নিষেধ করে হুকুম জারি করেছিলেন।

৪) পণ্ডিত প্রয়াগ দত্ত নামে আর্য প্রতিনিধি সভার আর একজন প্রচারক হরিদ্বারের কয়েকটি জনসভায় রাজনীতি সম্পর্কিত একাধিক বিষয়ে ওজস্বী ভাষণ দেন। এই স্থানে ১৯০৮ সালের মে মাসে কোনো একটি সভায় তিনি সমবেত শ্রোতাদের, বাঙালিদের মতো উগ্রপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

৫) সংযুক্ত প্রদেশের মির্জাপুরের সুপরিচিত স্বদেশি আন্দোলন কর্মী পণ্ডিত বিষেণ দত্ত ১৯০২ সাল নাগাদ আর্যসমাজের প্রচারক হিসাবে কাজ করছিলেন বলে খবর এসেছিল। ১৯০৭ সালে তাঁকে বোম্বাইয়ে লালা লাজপত রাই ও মুন্সিরামের সঙ্গে একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিতে দেখা গিয়েছিল।

৬) ১৯০৮ সালে লালা লাজপত রাইয়ের যে-সব দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকর্মী বুন্দেলখণ্ড, মির্জাপুর এবং গোন্ডা অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকেই আর্যসমাজের হয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই কবুল করেছিলেন যে ত্রাণকর্মের নামে তাঁরা আসলে গ্রামবাসীদের, নিজস্ব অভাব-অভিযোগ এবং দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে আন্দোলন করছিলেন।

৭) ১৯০৫ সালে আগ্রার একটি জনসভায় মনোহরলাল নামে জনৈক পাঞ্জাব-নিবাসী প্রচারক বলেছিলেন যে, ভারতবাসীরা যাতে নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারে সে-জন্যে তিনি হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আলিগড় জেলার আলমপুরে টোডিমল নামে জনৈক প্রচারক এই একই উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালে একটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন।

৮) ১৯০৭ সালের মে এবং জুন মাসে পরমানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ নামে দুইজন প্রচারককে হরিদ্বারে সিপাইদের কাছে রাজদ্রোহমূলক কিছু প্ররোচনাধর্মী বক্তৃতা দিতে দেখা গিয়েছিল।

৯) বিজনৌরের আর্যসমাজ আলোচনা সভায় ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার বিষয় প্রাধান্য পেলেও রাজনীতি এবং বিশেষ করে 'স্বদেশি' নিয়েও বিতর্ক হতে প্রায়ই দেখা যেত। মান্দাওয়ারের সমাজ সভায় তো ধর্ম প্রসঙ্গের চেয়ে রাজনীতি বিষয়ের আলোচনাই প্রাধান্য পেত।[৫]

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ তথা অসামরিক মানুষদের খেপিয়ে তোলার পাশাপাশি আর্যসমাজ সেনাবাহিনীর মধ্যেও ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এই কাজ শুরু করার প্রথম পর্বে তাদের গোপন স্লোগান ছিল 'ভারতীয়দের জন্য ভারতবর্ষ'। এই লক্ষ্য সিদ্ধির প্রধান উপায় হিসাবে আর্যসমাজ সেনাবাহিনীতে সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই কাজে সমাজকর্মীরা এত দ্রুত সাফল্য লাভ করেছিল যে, ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীর ব্যারাকে আর্যসমাজীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতেও বাধ্য হয়েছিলেন ('No Arya is to be allowed to enter the precincts of regimental barracks.')। অতঃপর সৈন্যদলে আর্যসমাজীদের প্রভাব রুখবার জন্য সরকার আরো কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এইসব ব্যবস্থা অনুযায়ী সেনা-ব্যারাকের মধ্যে আর্যসমাজের কোনো সভা বা সাপ্তাহিক অধিবেশনের (সৎসঙ্গ) আয়োজন করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। সৈন্যদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে *সত্যার্থ প্রকাশ, কেশরী, হিতকারী* প্রভৃতি আর্যসমাজী বই এবং পত্র-পত্রিকাও যাতে না রাখা হয় সে-জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণ সিপাইদের যজ্ঞোপবীত ধারণে বাধা দেওয়া হত এবং নিরামিষভোজী হিন্দু সেনাদের মাংস ও অন্যান্য আমিষ খাদ্যসামগ্রী গ্রহণে উৎসাহিত করা হত। সেনাবাহিনীর বাইরে কোনো আর্যসমাজ গৃহে বা আর্যসমাজগন্ধী কোনো রাজনৈতিক সভাতেও সৈন্যদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সর্বোপরি সেনাবাহিনীতে ভবিষ্যতে

যাতে কোনো আর্যসমাজীকে নিয়োগ করা না হয় সেজন্য ১২৩ নং রাইফেল বাহিনীর অধ্যক্ষ-র (Commanding Officer) পক্ষ থেকে সেনাপ্রধানের দপ্তরে একটি প্রস্তাবও জমা দেওয়া হয়েছিল।

১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ এবং ১৯০৭ সালে পাঞ্জাবের অস্থিরতার সময় গোটা উত্তর-ভারতব্যাপী যে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছিল এবং সেই সুযোগে আর্যসমাজীরা সৈন্যদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব আরো বৃদ্ধি করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলত ১৯০৮ সালের আগস্ট মাস নাগাদ সেনাবাহিনীর সব অধ্যক্ষদের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠানো হয় যে আর্যসমাজী সাধুরা দেশীয় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যে ফাটল ধরানোর জন্য দেশের সর্বত্র বিপুল সংখ্যায় প্রচার অভিযানে বেড়িয়ে পড়েছেন এবং সেনা কর্তৃপক্ষ যেন এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। '...were warned concerning the report that large number of (*Arya*) *Sadhus* were on the move to tamper with the Native Army.' ১৯০৯ সালের মে মাস নাগাদ ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট গোপনে খবর দেয় যে, সেনাবাহিনীর যে-সব ঘাঁটিতে আর্যসমাজীরা প্রায়শই সভা-সমিতির আয়োজন করে থাকেন, সেইসব সভায় যাতে দেশীয় সিপাই ও নেটিভ অফিসারগণ নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারেন, সেদিকে নজর রাখার জন্য আর্যসমাজের গোষ্ঠীগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ('...the various *Arya Samajas* were being directed towards securing the attendance of Native Army at all meetings in places where troops were stationed.')। তাই সেনাবাহিনীর কেউ যাতে আর্যসমাজীদের এই রকম কোনো সভায় যোগ না দেয় সে-জন্য কম্যান্ডিং অফিসারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এত সব সাবধানতা সত্ত্বেও খবর পাওয়া গিয়েছিল যে কোহাটের ১২ নং ইনফ্যান্ট্রি এবং বাঙ্গালোরের ১২৫ নং রাইফেল বাহিনীর দু-জন সেনা ইতিমধ্যেই উপরোক্ত নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করেছেন এবং সেই কারণে ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাঁদের শাস্তিবিধান করা হয়েছিল।

তবে আর্যসমাজের প্রভাবে ১০ নং জাঠ বাহিনীতেই এই রকম বিদ্রোহী-মানসিকতার চূড়ান্ত প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। ১৯০৪ সালে এই বাহিনীর সিপাইরা কানপুরে বদলি হওয়ার সময় থেকেই রাজদ্রোহের বিষে জারিত হতে থাকে। সেই সময় তাদের অনেকের কাছে *সত্যার্থ প্রকাশ, কেশরী, জাঠ সমাচার* ও *জাঠ হিতকারী*-র মতো উগ্রপন্থী বই ও পত্র-পত্রিকা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ১৯০৫ সালের অব্যবহিত পরে বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি প্রচারের তরঙ্গ যখন কানপুরে প্রবেশ করে তখন সিপাইদের মধ্যে অনেকেই আর্যসমাজের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে ওইসব আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই সময় লালা লাজপত রাই কানপুরে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন (১৯০৭) সেখানে অনেক সিপাইকেই হাজির থাকতে দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত সেনাদের এই রকম উত্তেজনাময় পরিস্থিতি থেকে দূরে রাখার জন্য ১৯০৮ সালে এই রেজিমেন্টকে প্রথমে কলকাতার আলিপুরে এবং তারপর মেদিনীপুরে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সাবধানতায় ফল হয়নি। নতুন জায়গায় সিপাইদের অনেকেরই সঙ্গে বিপ্লবীদের গোপনে যোগাযোগ হয়েছিল এবং

কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ করে গোপনে গোয়েন্দা-নজরদারির ব্যবস্থা করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। আলিপুরে অবস্থানকালে সিপাইরা কর্তৃপক্ষের অগোচরে আর্যসমাজের মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং আর্যসমাজ-কর্মীরাও সঙ্গোপনে তাদের মধ্যে প্রচারের কাজ করতেন। এদের প্রভাবে বেশ কয়েকজন সিপাইয়ের সঙ্গে বাঙালি বিপ্লবীদের (যেমন শরৎচন্দ্র মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, ভুবনমোহন মুখার্জী, কৃষ্ণভান ওরফে ভুটান মুখার্জী, নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ললিতমোহন চক্রবর্তী এবং ননীগোপাল গুপ্ত) যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং গোয়েন্দা-বিভাগের মতে সিপাইদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির সদস্যপদও গ্রহণ করেছিলেন। ১০ নং জাঠ রেজিমেন্টের এইসব বিপ্লবী-মনোভাবাপন্ন সিপাইদের সাহায্য নিয়ে ১৯০৯ সালের বড়দিনে গভর্নরের প্রাসাদের একটি অনুষ্ঠানে বিপ্লবীরা বোমা ফেলার গোপন পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দলের ললিতমোহন চক্রবর্তী কর্তৃপক্ষের কাছে যথা সময়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেওয়ায় পরিকল্পনাটি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং পরিশেষে জাঠ রেজিমেন্টের অন্তত ৪২ জন সিপাইকে রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারের জন্য চালান করা হয়। এর ফলে দেশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আর্যসমাজ কী পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-কথা উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু শুধু সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে এবং সেনাদের মধ্যে স্বীয় মতাদর্শ প্রচার করেই আর্যসমাজের ইতিকর্তব্য শেষ হয়নি। ভারতবর্ষের সর্বত্র বিপ্লববাদী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, আর্যসমাজ একটি সর্বভারতীয় সংগঠন হলেও প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার এবং রাজস্থানেই এর সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এইসব স্থানে বিপ্লববাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে আর্যসমাজ এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। পাঞ্জাবে ভূমি-আইন বিলকে কেন্দ্র করে এই বৈপ্লবিক আন্দোলন সব থেকে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত লাজপত রাই, অজিত সিংহ, বিষেণ সিংহ, স্বর্ণ সিং, লালচাঁদ ফলক, ভাই পরমানন্দ, আমির চাঁদ, সুফি অম্বাপ্রসাদ, ভাই বালমুকুন্দ এবং বলরাজ ভাল্লা প্রমুখ অনেক নেতাই হয় নিজেরাই আর্যসমাজী ছিলেন নয়তো আর্যসমাজের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পাঞ্জাবে এঁদের নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব জন-জাগরণ দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে ১৮৫৭ সালের বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে লেফটেনেন্ট গভর্নর স্যার ডেনজিল (Sir Denzil Ibbetson) বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করেন এবং তিনি এই অবস্থার প্রতিকার বিধানের জন্য বড়োলাট মিন্টোর কাছে একটি জরুরি বার্তাও পাঠিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের এই সকল বিপ্লবীরাই বাংলার রাসবিহারী বসু, বসন্ত বিশ্বাস এবং উত্তরপ্রদেশের আবধ বিহারী প্রমুখ আরো অনেকের সঙ্গে একযোগে ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বরে দিল্লিতে বড়োলাট হার্ডিঞ্জের মিছিলে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত ছিলেন। পাঞ্জাবের মতো রাজস্থানেও আর্যসমাজের প্রভাবে ইংরেজ ও স্থানীয় রাজা ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। এখানকার এই আন্দোলনের প্রধান নেতা গুরু গোবিন্দ, ১৮৮০-৮১ সালে দয়ানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং অচিরাৎ তাঁরই আদর্শে প্রাণিত হন। কেশরী সিং ভারহোট নামে দয়ানন্দর অপর একজন শিষ্যও এই সময় উদয়পুর রাজ্যে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আবার

উত্তরপ্রদেশেও ডি.এ.ভি. স্কুলের শিক্ষক এবং আর্যসমাজের একনিষ্ঠ সদস্য গেন্ডালাল দীক্ষিত, ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে সবিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আর্যসমাজের সাধারণ সদস্য ও সাধুগণ এবং সমাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলেও আর্যসমাজের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা মেনে নেওয়ার অনেক অসুবিধা ছিল। কেননা সমাজ এই কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিলে সরকার হয়তো সেই অপরাধে গোটা সংগঠনটিকেই কোনো এক সময় নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে দিতে পারত এবং তেমন হলে সংগঠনটির ধর্মীয় ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গোটা কর্মসূচিই বাতিল হওয়ার উপক্রম হত। এমন একটা দোটানা অবস্থায় আর্যসমাজকে বাধ্য হয়েই অনেক সময়েই পরস্পরবিরোধী নানা রকম বিবৃতি দিয়ে সংকট এড়িয়ে চলতে হয়েছিল।

আশির দশকে (১৮৮০) কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব রক্ষা করার জন্য ন্যাশনাল লিগ, লাহোরের আর্যসমাজকে যৌথভাবে আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। এই অনুরোধের জবাবে সমাজের কার্যনির্বাহী সমিতি বা অন্তরঙ্গ সভা নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর স্থির করে যে, যে-হেতু ন্যাশনাল লিগ একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য আর্যসমাজকে তার সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচিতে আবদ্ধ করতে চায় এবং যে-হেতু রাজনীতি সর্বতোভাবে আর্যসমাজের এক্তিয়ার-বহির্ভূত, সে-হেতু লিগের আমন্ত্রণ তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় :

> The letter of the Secretary. National League in the matter of memorial to His Excellency the Governor-General and Vice-roy regarding representation in the Imperial Legislative Council was placed before the meeting. This is a political matter and politics is beyond the scope of the *Arya Samaj*. Hence resolved unanimously that the *Arya Samaj* can do nothing in this matter.[৬]

উপরোক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সংযুক্তপ্রদেশের আর্য-প্রতিনিধিসভায় আর্যসমাজের ১৮৮৮ সালের উপধারাগুলি (bye-laws) সংশোধন করে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, আর্যসমাজের সঙ্গে রাজনীতি অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির কোনো রকম সংস্রব রাখা হবে না।

কিন্তু এহ বাহ্য। প্রস্তাবগুলিতে যত প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হোক না কেন, বাস্তব পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। ১৯০৭ সালে লাজপত রাই গ্রেপ্তার হওয়ার পর গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে আর্যসমাজ এবং লাজপত রাই, অজিত সিংহ প্রমুখ উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সরকারকে জানানো হয়েছিল। পাঞ্জাবের গভর্নর ইবেটসনেরও আর্যসমাজের রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা অজানা ছিল না। এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার তাগিদে আর্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভার প্রেসিডেন্ট হংসরাজ, মুন্সিরাম প্রমুখের পক্ষ থেকে লাজপতকে আর্যসমাজের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। লাজপতও বৃহত্তর স্বার্থে এই অনুরোধে সাড়া দিয়ে আর্য প্রাদেশিক সভা এবং ডি.এ.ভি. কলেজের পরিচালক

সমিতি থেকে ইস্তফা দেন এবং আর্যসমাজ কর্তৃপক্ষও বিনা দ্বিধায় তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে। কিন্তু এই ইস্তফা বা বহিষ্কার যে নিতান্তই একটা লোক-দেখানো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দর অনুরাগী এবং বিপ্লববাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী নিবেদিতাও অনুরূপ কারণে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে স্বেচ্ছায় তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। এই অবকাশে আরো উল্লেখ করা যায়, লাজপতের মতো ভাই পরমানন্দও রাজদ্রোহের কারণে অভিযুক্ত হলে (১৯০৯) তাঁকে ডি.এ.ভি. কলেজের অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও এই অপসারণ ছিল সরকারকে দেখানো একটা সাজানো ব্যাপার। কেননা অপসারণের পরেও পরমানন্দকে নিয়মিতভাবে পূর্ণ বেতন দেওয়ার ব্যাপারে কিছু মাত্র কার্পণ্য করা হয়নি। এমনকী আদালতেও তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্য দ্বারকা দাস ও দুর্গা দাসের মতো খ্যাতনামা আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে সওয়াল করেছিলেন। মোট কথা রাজ সরকারের প্রশাসনিক ও গোয়েন্দাবাহিনীর নিরন্তর নজরদারি ও হুমকি সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে আর্যসমাজের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।[৭]

কিন্তু আর্যসমাজের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন মহলে এত রকম অভিযোগ সত্ত্বেও এবং সংগঠনটিকে কোনো এক সময়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং সেনাবাহিনীতে কোনো আর্যসমাজীকে নিয়োগ না করার জন্য দাবি জানানো হলেও ইংরেজ সরকার জনরোষের ভয়ে আর্যসমাজের বিরুদ্ধে কোনো রকম চূড়ান্ত ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বড়োলাট মিন্টোর একটি বিভাগীয় নোটে (১৭ জুন ১৯১০) ভারত সরকারের এই সাবধানী-নীতির পরিচয় মেলে:

> It would in my opinion be a grave political mistake to proscribe the whole *Arya Samaj* as seditious, which would be the interpretation placed upon a Government of India decision to forbid the recruting of *Arya Samajists* for the Army. I have not the slightest doubt that such a decision would raise dangerous opposition both in India and at home.[৮]

আর্যসমাজ সম্পর্কে মিন্টোর এই উদার মনোভাব তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজ সরকার মনে-প্রাণে আর্যসমাজকে দমন করারই পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝেই সমাজের উপর নানা রকম বিধিনিষেধও আরোপ করেছিলেন। সেনাবাহিনীতে আর্যসমাজপন্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব তো ছিলই। এ-ছাড়া পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশের সিভিল সার্ভিসেও আর্যসমাজীদের প্রবেশের সম্ভাবনা রুদ্ধ করার কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এত সব নিবর্তনমূলক (preventive) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, যে বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে সেই আশঙ্কাও সরকারকে ভাবিত করে তুলেছিল। বিশেষ করে আর্যসমাজের সব থেকে শক্ত ঘাঁটি পাঞ্জাব (যেখান থেকে দেশীয় সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সিপাইদের নিয়োগ করা হত), সংযুক্ত প্রদেশ ও রাজস্থানে আর্যসমাজ-বিরোধী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে যে তীব্র গণ-অসন্তোষ দেখা দেবে, সে-

কথা সরকারের অজানা ছিল না। সুতরাং এইসব ভাবনাচিন্তার নিরিখে সরকারকে অনেকটা বাধ্য হয়েই আর্যসমাজ সম্পর্কে সহিষ্ণুতার মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল।

আর্যসমাজের ধর্মীয় আন্দোলন এবং বিশেষ করে তার গোঁড়া বেদাশ্রয়ী মতাদর্শ (দয়ানন্দ বলতেন—*Go back to the Vedas*) ও 'শুদ্ধি' কর্মসূচি এদেশে নানা সময় নানা রকম অনর্থ সৃষ্টি করেছিল। কালের প্রভাবে এই আন্দোলনের প্রাথমিক উত্তেজনা অনেকটা স্তিমিত হয়েও এসেছিল। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে আদতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী (revivalist) এই আন্দোলনে রাজনীতির প্রভাব (political overtone) বড়ো ছিল না।

> Political independence was one of the first objectives of Dayananda. Indeed he was the first man to use the term *Swaraj*, he was the first to insist on people using only *Swadeshi* things manufactured in India and to discard foreign things.[৯]

স্টিভেন্সন-মুরের রিপোর্টে যে-সকল রাজনৈতিক সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা লেখা রয়েছে তাঁদেরই মতো আর্যসমাজের প্রচারক ও সন্ন্যাসীরাও পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তথা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১। আর্যসমাজের একটি গোষ্ঠী। আনারকলি সমাজের প্রধান ছিলেন মোহনলাল।

২। আর্যসমাজের মতাদর্শ প্রচার করার জন্য দয়ানন্দর জীবদ্দশাতেই 'প্রপাকারিণী সভা' গঠন করা হয়েছিল। পরে এই কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রধানত মহাদেব গোবিন্দ রানাডের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'প্রতিনিধি সভা' নামে কার্যনির্বাহী কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়।

৩। 'Both the Ramkrishna Mission and the Arya Samaj have been made considerable use of by the agitators for spreading their doctrines throughout India. The Ramkrishna Mission, with its headquarters at the Belur Math,... has been a favourite gathering place for the young missionaries of the revolutionary movement. There is reason to believe that the heads of the Mission are now beginning to take a stand against the use that has been made of their name in furthering the spirit of unrest... In regard to the Arya Samaj opinions differ as to its political intention and influence. In this connection I have discovered in the old records of the S.B. a letter written by one Alaram Sanyasi to the Bengal Government in 1895. It is headed *Disloyalty of the members of the Arya Samaj*.'

F. C. Daly লিখিত *Note on the Growth of the Revolutionary Movement in Bengal* শীর্ষক এই রিপোর্টটির জন্য দেখুন Ghose Sankar, *First Rebels*, Calcutta, 1981, p.21. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে আর্যসমাজের রাজনীতি-নিরপেক্ষতার সদিচ্ছা সম্পর্কে ড্যালি সন্দিহান হলেও সমাজ কিন্তু এ ব্যাপারে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তার ১৮৮৮ সালের সংবিধানের উপধারা (bye-laws) গুলি প্রয়োজন মত সংশোধন করেছিল।

৪। Risley H., *The People of India*, London, 1904, p.280. আরও দেখুন Yadav K.C. and Arya K.S., *Arya Samaj and the Freedom Movement*, Vol.1, 1875-1918, New Delhi, 1988, p.13.

৫। Govt. of India, Home Political (Confd.), Deposit no.7, Aug. 1910 দেখুন Sands C.E.W., *The Arya Samaj in the United Provinces*, Allahabad, 1910, pp.31, 46-49, 61, 109.

৬। *Selection from Native Newspapers*, Punjab, 1900, pp. 16,17.

৭। *Yadav K.C. and Arya K.S.*, পূর্বোক্ত pp. 196-97

৮। Govt. of India, Home Political, B. Nos. 798-800, July 1910.

৯। Majumdar R.C., *History of Freedom Movement in India*, Vol.1, Calcutta, 1971, p.298.

রামকৃষ্ণ মিশন : স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের তিনটি রিপোর্ট

পরাধীন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রাম ও সাধনায় সংসারী মানুষের পাশাপাশি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও যে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল, ইংরেজ সরকারের তরফে এই অভিযোগের কোনো বিরাম ছিল না। আর রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধেই সম্ভবত এই ধরনের অভিযোগ সব থেকে বেশি পরিমাণে জমা পড়েছিল। অবশ্য সাবধানী ব্রিটিশ সরকার মিশনের মতো একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধুসঙ্ঘের বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি প্রকাশ্যভাবে কোনো অভিযোগ আনতে সাহস করেনি। কিন্তু যে-হেতু কর্তৃপক্ষের মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছিল, সেই কারণে তারা গোপনে নানা ভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। এই চেষ্টার ফলে সরকার, গোয়েন্দা-পুলিশের সহযোগিতাক্রমে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় অবধি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে সত্যাসত্য-মিশ্রিত বহু রকমের সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। মিশনের বিরুদ্ধে আনীত এইসব অভিযোগগুলি ছাপিয়ে গোপন প্রতিবেদন (printed confidential reports) আকারে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের (official use) জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হত এবং সেই কারণে প্রশাসনিক মহলের বাইরে এগুলির খবর কখনো সাধারণ মানুষের জানা সম্ভব হয়নি। এই রকম গোপনীয়তার কারণ এই যে, মিশনের বিরুদ্ধে সরকারি নজরদারির খবর জানাজানি হয়ে গেলে মিশন-অনুরাগী এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভক্ত অসংখ্য সাধারণ মানুষের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। বিদেশি সরকারের কাছে এমন একটা পরিস্থিতি আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। বস্তুত ১৯১৬ সালের ১১ ডিসেম্বর, কলকাতার রাজভবনে আয়োজিত দরবার-বক্তৃতায় মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আনীত বাংলার গভর্নর কারমাইকেলের (১৯১২-১৬) অভিযোগের আগে মিশনের সন্ন্যাসীরা নিজেরাও সরকার যে তাঁদের উপর এমন সতর্ক প্রহরা বজায় রেখে চলেছে সে-কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং মিশন কর্তৃপক্ষ না জানলেও ১৮৯৭ সালে মিশনের জন্মলগ্ন থেকেই সরকার গোপনে গোপনে মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং মিশনের ঘনিষ্ঠ সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি শুরু করেছিল। এই নজরদারির ফলে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ সহ গোটা গোয়েন্দা দপ্তরে এবং গ্রামাঞ্চল ও মফস্বল এলাকার থানাগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত বহু ফাইল জমা হতে থাকে।

ব্রিটিশ সরকারের আমলে এইসব ফাইলগুলিতে যে গোপনীয়তার (Confidential/Secret ইত্যাদি) মার্কা দেগে দেওয়া হয়েছিল সেই কারণে মহাফেজখানায় (Archives) এইগুলি সাধারণ পাঠক এবং গবেষককে আর্কাইভসের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিনা বাধায় দেখতে দেওয়া হত না এবং সরকারের বিনা অনুমতিতে এগুলি থেকে গবেষণার প্রয়োজনে কোনো রকম নোটও নিতে দেওয়া হত না। ফলে এগুলি বহুদিন যাবৎ লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গিয়েছিল। আর ব্যবহার না হওয়ার জন্যই সম্ভবত এখন এই রকম অনেক মূল্যবান ফাইলের আর হদিস পাওয়া যায় না। তবে সুখের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আর্কাইভসের উল্লিখিত

বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং এই সুযোগে এতদিন যে-সব ফাইলগুলি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি এবং যেগুলি ইতিপূর্বে কখনো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করাও সম্ভব হয়নি ইতিহাসের সেই রকম কয়েকটি মূল্যবান আকর সম্পদ (primary source materials) কাজে লাগানোর চেষ্টা চলেছে।

এই রকম একটি এ-যাবৎ অপ্রকাশিত ফাইল হল Government of Bengal, Confidential, Special Branch, Bengal 8/9/1909, I.B. Serial No. 14/1909. এই নাতিস্ফীত ফাইলটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারের (West Bengal State Archives) সংগ্রহশালা থেকে সম্প্রতি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ফাইলটির পরিচয়পত্র থেকেই বোঝা যায় যে এটি ১৯০৯ সালের ব্রিটিশ আমলের গোয়েন্দা বিভাগ তথা বাংলাদেশের (Bengal) স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি ফাইল। প্রসঙ্গত এখানে বলে নেওয়া দরকার যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই এবং এ-দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অশান্তির কারণে বড়োলাট ডাফরিন এবং বিলেতের ভারত-সচিবের অনুমোদনক্রমে ১৮৮৮ সালে দিল্লিতে ও প্রদেশগুলিতে রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরির জন্য পুলিশের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক স্পেশাল ব্রাঞ্চগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১] বর্তমানে আলোচ্য, পূর্বে উল্লিখিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের এই ফাইলটিতে রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত মোট তিনটি রিপোর্ট গ্রন্থিত রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম দুইটি ছাপানো (printed) এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষেরটি ছিল টাইপ (type-script) করা। পূর্বতন অধ্যায়ে উল্লিখিত স্টিভেন্সন-মুরের রিপোর্টের শেষ পৃষ্ঠায় যেমন সেটির রচনাকারীর নাম, পদ-পরিচয় (designation) এবং রিপোর্টের একটি শীর্ষনামও (title) দেওয়া ছিল, আলোচ্য বর্তমান ফাইলের প্রথম রিপোর্টটিতে কিন্তু সে-রকম কোনো কিছু হদিস দেওয়া নেই। এমনকী রিপোর্টটি যে সঠিক কবে রচিত হয়েছিল এবং কোন দিনেই বা সেটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়েছিল সেই মর্মেও কোনো সংবাদ এখানে দেওয়া নেই। তবে রিপোর্টের একেবারে শেষে ছোটো হরফে যে মুদ্রাকরের মন্তব্য (printer's note) দেওয়া আছে (যথা G.C. Press, Simla,–No.C 20D, C.I.D.,–21.11.05.,–200–R.S.W.) তাই দেখে অনুমান হয় যে এটি সি.আই.ডি. অর্থাৎ ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ১৯০৫ সালের ২১ নভেম্বরে ছাপা হয়েছিল এবং সেই হিসাবে তার অনেক আগেই এটি রচিত হয়েছিল। সময়টি বঙ্গবিভাগ ঘোষণার বছর এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যের যুগ। লক্ষ করার বিষয় যে, ঠিক এমন একটি অস্থির সময়েই এ-দেশের জনপ্রিয়তম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিল। এই রিপোর্টের কোনো শীর্ষনাম (title) দেওয়া ছিল না। এটি একটি স্মারকপত্র বা Memorandum হিসাবে সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। এই স্মারকপত্র তথা উল্লিখিত স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের অন্তর্ভুক্ত প্রথম দলিলটির প্রায় মূলানুগ অনুবাদ (কেননা হুবহু তরজমা মূলানুসারী হলেও অনেক সময়েই জটিল ও দুর্বোধ্য ঠেকে) এখন পেশ করা হচ্ছে।

(২)

স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের প্রথম প্রতিবেদন

গোপনীয়

স্মারক

রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা দেশের (Bengal) ২৪ পরগণা জেলার বরানগর পুলিশ সার্কেলের অন্তর্গত রানি রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মঠের (মন্দির) পূজারী (পুরোহিত) রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন গোঁড়া হিন্দু। তিনি পরমহংস (উচ্চমার্গীয় সাধু) হয়ে এই মন্দিরে আমৃত্যু বসবাস করেছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি পরলোকগত কায়স্থ ভদ্রলোক বাবু বিশ্বনাথ দত্ত-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বামী বিবেকানন্দর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কলকাতার স্কটল্যান্ড চার্চ মিশন স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে তাঁর দ্বারা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁরই দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দ নামে তিনি এখন সর্বত্র পরিচিত।

ভারতবর্ষের সব তীর্থ ভ্রমণ করার পর তাঁকে ১৮৯৩ সালে কাথিয়াবাড়ের বিভিন্ন রাজ্য অতিক্রম করার সময় প্রথম দেখা গিয়েছিল। এখানকার কয়েকজন ভূস্বামী কর্তৃক তিনি আপ্যায়িত হয়েছিলেন। ধর্ম বিষয়ে তিনি যে-সব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলি শ্রোতাদের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারলেও, তিনি স্বয়ং যে রাজনীতির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন তা বোঝা গিয়েছিল।

১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে এসে পৌঁছোন। এই সময় শিকাগোতে একটি ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বিবেকানন্দর বক্তৃতা ইতিপূর্বে অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাই মাদ্রাজি হিন্দুরা এই মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য বিবেকানন্দকেই যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। এই কাজে তাঁর ব্যয়-নির্বাহের জন্য হিন্দুদের থেকে অর্থসংগ্রহ করা হয়েছিল। শোনা যায় যে, মহীশূরের মহারাজা এবং রামনাদের রাজা উভয়েই এই কাজে অর্থসাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু ১৮৯৩ সালের মে মাসে শিকাগোতে উপস্থিত হওয়ার পর স্বামী বিবেকানন্দ দেখেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হতে পারবে না। এই অন্তর্বর্তী সময়ে কয়েকজন বন্ধু তাঁর ভরণপোষণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিপুল সাফল্য অর্জন করে তিনি আমেরিকাতে বেদান্ত ধর্মের একজন অগ্রগণ্য প্রবক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৪-৯৫ সালের মধ্যে তিনি সে-দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং সকলের যথাবিধ দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তিনি সেখানে কয়েক মাস ধরে অবৈতনিক ক্লাস নিয়েছিলেন এবং এইভাবে বিশেষ পরিচিতিও অর্জন করেছিলেন। তিনি ডেট্রয়েট, বোস্টন, হার্ভার্ড এবং শিকাগোও পরিভ্রমণ করেছিলেন।

আমেরিকায় দু-জন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যথা (১) মারি লুইজি তথা অভয়ানন্দা নাম্নী ফরাসি ভদ্রমহিলা, (২) লিও স্যান্ডসবারি তথা স্বামী কৃপানন্দ নামে একজন রুশি-ইহুদি।

১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন এবং সেখানে ইংল্যান্ডের থিওসফিকাল সোসাইটির শ্রীযুক্ত স্টার্ডি নামক জনৈক সদস্যের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। এই স্থানেও তাঁর সমুদয় ভাষণ রীতিমতো সাফল্য লাভ করে এবং তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গেও পরিচিত হন। ইংল্যান্ড থেকে স্বামীজি জুরিখের নীতিশাস্ত্রীয় সম্মেলনে (Ethical Conference) উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে জার্মান বৈদান্তিক অধ্যাপক ড্যাসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরই সহযাত্রী হয়ে আবার লন্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর কয়েক শত অনুরাগী পিকাডেলির জলরঙ শিল্পীদের ইনস্টিটিউটের (Institute of Painters in Water-Colours in Picadilly) আলোচনাসভায় উপস্থিত থেকে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৮৯৭ সালে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী সেভিয়ার নামে দুজন আমেরিকান এবং শ্রীযুক্ত গডউইন নামে জনৈক ইংরেজ প্রমুখ শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বামীজি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে তাঁকে কলম্বোতে স্বাগত সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। ওই মাসের ২৬ তারিখে পম্বনেও তাঁকে রামনাদের রাজা রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮৯৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আইয়ার এবং অন্যান্য সকলে তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। নিরঞ্জনানন্দ এবং অভেদানন্দ নামে দুজন স্বামীজি এবং শ্রীযুক্ত হ্যারিসন নামে জনৈক বৌদ্ধও সম্ভবত কলম্বোর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় উপস্থিত হলে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি জনাকীর্ণ সভায় তাঁকে উদ্দেশ করে একটি স্বাগত অভিভাষণও পাঠ করা হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যগণও এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর কিছুদিন বাদে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজি যে-অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন সেখানে কংগ্রেসের এই সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন যথা, মাননীয় শ্রী গুরুপ্রসাদ সেন, শ্রী জে. ঘোষাল, শ্রী এন. এন. ঘোষ এবং কলকাতার *ইন্ডিয়ান মিরর* পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন।

স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়া জেলার বেলুড়মঠে অধিষ্ঠিত হয়ে ফলিত বেদান্ত ধর্ম (practical Vedantism) প্রচার করবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে তিনি শিষ্যদের বেদান্ত-দর্শন শেখানোর জন্য এবং তাদের বিনা ব্যয়ে বসবাসের জন্য একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। এই স্থানে তিনি কুমারী ম্যুলার নাম্নী একজন থিওসফিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় তাঁর পরের দিককার ভাষণগুলি বিশেষ জমেনি এবং সেগুলি থিওসফিস্ট ও ব্রাহ্মদের বিশেষভাবে আহতও করেছিল। ব্রাহ্মণরাও তাঁকে শূদ্র বলে অবজ্ঞা করেছিলেন এবং তাঁর 'স্বামীজি' অভিধা গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, রামকৃষ্ণর অপরাপর শিষ্যদের সঙ্গে ভিন্নমত হয়ে তিনি জাতিভেদ-প্রথা মানতে পারেননি এবং ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের ফলে খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও তিনি সব রকমের ছুঁৎমার্গ পরিহার করেছিলেন।

১৮৯৭ সালের মে মাসে স্বামী বিবেকানন্দ, অপর পাঁচজন স্বামীজি সমভিব্যাহারে কলকাতা ত্যাগ করে উত্তর ভারতের পথে দীর্ঘ পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি লখনউ, আলমোড়া, দেরাদুন,

নৈনিতাল, বেরিলি, আম্বালা, ধরমশালা, রাওয়ালপিন্ডি, জম্মু (কাশ্মিরের মহারাজা তাঁকে এই স্থানে আমন্ত্রণ করেছিলেন), শিয়ালকোট, লাহোর এবং অমৃতসর প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

পুলিশি প্রহরা এবং প্রচারমাধ্যমকে এড়িয়ে তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলমোড়ায় একটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্যই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এই কাজে তিনি দামু সাউ নামে এক ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেছিলেন। এই লোকটির সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ ছিল। ধরমশালায় সেভিয়ার দম্পতি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। এই দুজন আমেরিকানের তত্ত্বাবধানে এইখানে একটি আশ্রম খোলার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফেরার পথে রেওয়াড়ি হয়ে আলওয়ার যাওয়ার সময় বিবেকানন্দর শিষ্য খেতরির রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁর খোঁজখবর নিয়েছিলেন। আলওয়ার থেকে তিনি যোধপুরে গিয়েছিলেন।

১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ চারজন বাঙালি শিষ্য ও চারজন ইংরেজ ও আমেরিকান মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার উত্তর ভারত পরিভ্রমণে যান। শেষোক্ত দলে ছিলেন কুমারী নোবল ও কুমারী পিচার। তাঁরা সকলেই নৈনিতাল, আলমোড়া ও কাশ্মির ভ্রমণ করে, ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। লাহোর হয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে ওই ১৮৯৮-এর অক্টোবর মাসেই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পাঞ্জাব শাখা, গো-হত্যা নিবারণে আন্দোলন চালানোর জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে নাকি ৫০০ টাকা তুলে দিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তিনি দেওঘরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য চলে আসেন। কিছুদিন বাদে তাঁর কয়েকজন শুভার্থী স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য তাঁকে সমুদ্রযাত্রার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালের ২০ জুন তারিখে কুমারী নোবল ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা ত্যাগ করে আবার ইংল্যান্ডের পথে যাত্রা করেছিলেন। অতঃপর ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি স্বামী বিবেকানন্দর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। অবশেষে কলকাতার *দি বেঙ্গলী* কাগজের ১৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখা হয় যে, ইংল্যান্ডে অল্প কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি আমেরিকায় এসে উপস্থিত হলে সেখানে নিউইয়র্ক-নিবাসী তাঁর সকল অনুরাগী তাঁকে সাড়ম্বর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। এখানে তিনি একপ্রস্থ বক্তৃতা করার পর ক্যালিফোর্নিয়াতেও আরো কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিলেন। এই স্থানে তাঁর অসংখ্য অনুরাগীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে ১৬০ একর পরিমাণ জমি দান করেছিলেন। বিবেকানন্দ সান ফ্রান্সিসকোতেও একটি 'বেদান্ত-সোসাইটি' গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অতঃপর তিনি প্যারিস প্রদর্শনীতে আয়োজিত একটি ধর্মসভায় আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতাদানের জন্য ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

১৯০০ সালের শেষদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর আবারও স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে। সুতরাং তাঁকে সব রকমের শ্রমসাধ্য কাজ থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। ১৯০১ সালের মার্চ মাসে তিনি ফের ঢাকায় যান এবং তার পরের মাসেই চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যায় তীর্থযাত্রায় বেড়িয়ে পড়েন। সেখান থেকে শিলঙে এসে তিনি আসামের চিফ কমিশনার স্যার এইচ. কটন কর্তৃক সাদর সংবর্ধিত হন। এই স্থানে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি বেলুড়েই থিতু হয়ে বসেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যেরও যেন কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তারপর অকস্মাৎ ৩৯ বছর বয়সে ১৯০২ সালের ৪ জুলাইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর লেখা একখানি চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি ভারতীয় যুবকদের ফি-বছর জাপানে পাঠানোর জন্য সওয়াল করেছিলেন। তিনি স্বদেশবাসীদের এই বলে সমালোচনা করতেন যে, তারা অলস আলোচনায় কেবল নিজেদেরই শক্তিক্ষয় করে এবং জাতিপ্রথার একান্ত আত্মসর্বস্ব বিধানের জন্য সাগরপাড়ি দিতেও বিরত থাকে।

কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং এলাহাবাদে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে স্বামীজি খুবই আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়। আলমোড়ার কাছে হিমালয়ের কোলে মায়াবতীতে তিনি একটি বাড়িও বানিয়েছিলেন। এটি ছিল ভারতে আগত তাঁর সকল পাশ্চাত্য দেশীয় শিষ্যগণের নিবাসস্থল। বেলুড় এবং মায়াবতীর মঠ দুটি ছাড়াও তিনি ২৪ পরগণা জেলার কাঁকুড়গাছি এবং ঢাকায় ও মাদ্রাজে আরো কয়েকটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। এ-ছাড়া তিনি কনখল (হরিদ্বার) ও বেনারসে দুইটি সেবাশ্রম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভবদাতেও একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বর্তমানে (১৯০৫) কলকাতায় দুইটি বিবেকানন্দ সোসাইটি আছে। এদের মধ্যে যেটি প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল সেখানকার সাপ্তাহিক সভায় ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়ে থাকে। মেট্রোপলিটান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক বাবু অনাথনাথ পালিত এম.এ., এখানকার সভাপতি। দু-বছর আগে দ্বিতীয় যে সোসাইটির পত্তন হয়েছিল, গরীব ও দুর্গতজনের সাহায্য করাই ছিল তার প্রধান কর্মসূচির অঙ্গ। বেলুড়ের একজন সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে এখানে সাপ্তাহিক সভা ও দৈনিক ক্লাস নেওয়াও হয়ে থাকে।

সূচনায় এটি ধর্মীয় আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও বিবেকানন্দ নিজেই পরের দিকে একে কিছুটা রাজনৈতিক ধাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বলতেন যে, একমাত্র ধর্মের বন্ধন স্বীকার করেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা যেতে পারে। আর তাই মানুষকে সকলের আগে শিক্ষিত ও স্বধর্মে অভিজ্ঞ করে তোলা দরকার। বেদপাঠে ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদেরও সমানাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। স্বামীজি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠ থেকেই *উদ্বোধন* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও উপদেশাবলী প্রকাশিত হত। কলকাতার 'সারদা প্রেস' থেকে এটি আজও প্রকাশিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে প্রেসের মালিক বাবু লালচাঁদ দত্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করে থাকেন। মিশনের ঢাকা কেন্দ্রটিও অদ্যাবধি বেশ কর্মতৎপর রয়েছে। গত বছর এখান থেকেই স্বামী বিবেকানন্দর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, মিশনের মাদ্রাজ শাখা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামী সদানন্দ এবং মাদ্রাজের পঞ্চায়াপ্পার কলেজের আলসিঙ্গা পেরুমল নামে জনৈক বি.এ. পাশ শিক্ষক এই কাজে রামকৃষ্ণানন্দকে সহায়তা করেছিলেন। এ-ছাড়া গীতা, উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্র বিষয়ে নিয়মিত পড়ানোর জন্য ট্রিপ্লিকেন, মাইলাপুর এবং ব্ল্যাক টাউন নামে তিনটি কেন্দ্রে ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে '২নং লোটাস সার্কেল' নামে আরো একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি, তামিল এবং তেলুগুতে তিনটি ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অল্পদিন বাদে ট্রিপ্লিকেনে 'ব্রহ্মবাদিন্ প্রেস' নামে একটি ছাপাখানাও খোলা হয়েছিল। এখান থেকে *দি উইকলি রিভিউ* (ইংরেজি ভাষার এই কাগজে

প্রধানত নানা রকম উদ্ধৃতি বা extract প্রকাশ করা হত এবং এটি প্রায় ৫০০ কপি বিক্রয় হত) এবং *দি ব্রহ্মবাদিন্* (বেদান্ত দর্শন বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা) ছাপানো হত। শেষোক্ত পত্রিকাটি লন্ডন, নিউইয়র্ক এবং কলকাতাতেও বিক্রি হত। জানা গিয়েছে যে, এই পত্রিকাটিও প্রায় ১৫০০ কপি বিক্রি হত। ১৯০৪ সালে মাইলাপুরে একটি দরিদ্র ছাত্রনিবাস খোলা হয়েছিল। সাউথ মাডা-র কেশব পেরুমল কোবিলে, ডা. এম.সি. নাঞ্জুন্দা রাও-এর প্রযত্নাধীন সোসাইটির একটি বাড়িতে এই ছাত্রাবাসটি স্থাপিত হয়েছিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দই অদ্যাবধি মাদ্রাজ কেন্দ্রের পূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন। গত বছর তিনি কলকাতা, শোলাপুর, বাঙ্গালোর, মাসুলিপটম, বেজওয়াদা, তিনেভেলি, আলেপ্পি, কোচিন এবং এর্নাকুলাম প্রভৃতি স্থান ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই বছরের বসন্তকালে (১৯০৫) তিনি রেঙ্গুন পরিভ্রমণ করার সময় সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন। বর্তমানে উত্তর সরকার অঞ্চলে একটি কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা তাঁর বিবেচনাধীন রয়েছে। পবিত্র বেনারস শহরেও সমাগত দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য 'রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র' নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালানো হয়ে থাকে।

১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে কলকাতার বাগবাজার নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ, গঙ্গাধর ঘটক তথা স্বামী অখণ্ডানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুরেশানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলায় সেখানকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই এলাকার জনসাধারণ এবং জেলার কালেক্টর, স্বামী অখণ্ডানন্দর কাজের উদ্যম ও আত্মত্যাগের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। মহুলাতে এই স্বামীজি অনাথ বালকদের জন্য একটি স্কুলও খুলেছিলেন। এখানে তাদের ভরণপোষণ ছাড়াও বাংলা ভাষা পড়ানো হত। কিন্তু এত সব ভালো কাজ সত্ত্বেও তাঁর ভ্রষ্ট চরিত্রের জন্য লোকেরা নাকি তাঁকে সন্দেহ করত।

আলমোড়ার কাছে মায়াবতী মঠের এলাকায় যে-ছাপাখানাটি ছিল সেখান থেকে *প্রবুদ্ধ ভারত* নামক একটি অধ্যাত্মবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা হত। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন সোসাইটি ও অনুরাগীবৃন্দ এই পত্রিকাটির প্রকাশনায় সাহায্য করতেন। ১৯০১ সালে স্বামী বিরজানন্দ ও বিমলানন্দর সহযোগিতাক্রমে স্বামী স্বরূপানন্দ পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সভাপতি ও প্রধান কর্মকর্তা স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনি বাংলাদেশের হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেলুড় মঠেই এখন বসবাস করছেন। পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দর শিষ্যকুল সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন:

১। মাদাম মারি লুইজি (Marie Lousie) তথা অভয়ানন্দা : ইনি নিজেই জানিয়েছিলেন যে ইনি ফরাসি কুলোদ্ভবা একজন আমেরিকান মহিলা। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগোর ধর্ম সম্মেলনে ইনি স্বামী বিবেকানন্দর সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, স্বামীজি নাকি তাঁকে একজন শৈব পুরোহিত হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যই তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করে অভয়ানন্দা নাম নিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকার মিশনটিরও কর্মাধ্যক্ষা হয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে তিনি কলকাতায় এসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নামক জনৈক সলিসিটরের সঙ্গে বাস করছিলেন। তিনি বাঙালিদের অনেক সভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন এবং ভাষণও দিতেন। কংগ্রেস দলের অনেক সদস্যর

সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি জার্মানি এবং রাশিয়াও ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই তাঁকে পুরোহিত নিয়োগ (to ordain priests) করার অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি পাঁচ জন নিম্নবর্গীয় (to the lesser orders) পুরোহিত নিয়োগ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ হয়েও তিনি আপন উপলব্ধির মহিমায় হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অনুশাসনগুলি রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ তিনি নাগপুর থেকে বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার্চনায় যোগ দিয়েছিলেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। তবে হিন্দুদের গতিবিধির উপর নজরদারি করার জন্য সরকারের একজন গুপ্তচর হিসাবে তিনি কাজ করতেন বলেও লোকেরা তাঁকে সন্দেহ করেছিল (The people believed her to be a Government spy sent round to watch the doings of the Hindus)। ১৮৯৯ সালের ১ জুনে তিনি কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই হয়ে আমেরিকার পথে যাত্রা করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

২। কুমারী হেনরিয়েটা ম্যুলার (Henrietta Muller) : ইংল্যান্ডের থিওসফিকাল সোসাইটির অগ্রগণ্য সদস্যারূপে পরিচিত এই মহিলা ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। আলমোড়া জেলার মায়াবতী থেকে প্রকাশিত *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকার ইনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে ১৯০১ সালে খবর পাওয়া গিয়েছিল। এখন তিনি ভারতে উপস্থিত নেই।[২]

৩। কুমারী মার্গারেট ই. নোবল (Margaret E. Noble) : এই আইরিশ মহিলার আনুমানিক বয়ঃক্রম ৩৮ বৎসর। ১৮৯৬ সালে লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইনি তাঁর সঙ্গে ভারতে চলে এসেছিলেন। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর পর ইনি ৮২ নং রামকান্ত বসুর গলিতে অবস্থান করতেন এবং বাগবাজারের বোসপাড়ায় বাঙালি মেয়েদের কিন্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেকটা এ-দেশের ঢঙেই পোশাক পরতেন এবং খালি পায়ে থাকলেও মাথায় ঘোমটা দিতেন না। কলকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা তাঁকে মোটেও ভালো চোখে দেখতেন না। অনেকের মতে, তাঁর চরিত্র ভালো ছিল না এবং তিনি নাকি বেশ কয়েকজন বাঙালি যুবকের সঙ্গে একই ঘরে একত্র বসবাস করতেন ('She was not looked upon with much favour by the respectable natives of Calcutta, as from all accounts she did not bear a good moral character, and was living in a house with a number of young Bengalis.')। তাঁর কাছে কোনো টাকাকড়ি ছিল বলেও মনে হয় না। রামকৃষ্ণ মিশনই তাঁর ব্যয়ভার বহন করত। ১৮৯৮ সালের মে মাসে স্বামী বিবেকানন্দর নৈনিতাল ভ্রমণের সময় কুমারী নোবল তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন। তিনি এখনো ভারতবর্ষেই অবস্থান করছেন। মিশনের কলকাতা শাখায় তিনি ১৯০৪ সালে বছরভর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন *দি ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ* শীর্ষক গ্রন্থের সুপরিচিত রচয়িত্রী। বইটি গত বছরে লন্ডনের ডব্লু. হেনম্যান প্রকাশ করেছিল। ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার অন্তরঙ্গ বিবরণী এই বইতে দেখতে পাওয়া যায়। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের যে-সব মন্তব্য ছাপা হয়েছিল সেগুলি উচ্ছ্বসিত

প্রশংসায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু ১৯০৫ সালের ১২ মে *পাইয়োনিয়ার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় বলা হয় যে, গ্রন্থটি প্রধানত একটি ছদ্মবেশী রাজনৈতিক প্রচারপুস্তক ভিন্ন আর কিছু নয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রমাণ করা যে, ভারতবর্ষ কোনো বিক্ষিপ্ত কুল (race) বা ধর্মের সমবায় মাত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে এই দেশটিরও একটি অখণ্ড জাতিসত্তা আছে এবং এই গ্রন্থে স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য সেই বিধিনির্দিষ্ট জাতীয়তাবোধের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছিল। বইটি সম্পর্কে পুস্তক-সমালোচক তাঁর চূড়ান্ত অভিমত জানিয়ে লিখেছিলেন যে, 'কপটতাই ছিল এর মূল বৈশিষ্ট্য এবং এর বিষয়বস্তুও ছিল দুরভিসন্ধিমূলক'।

৪। **কুমারী পিচার (Miss Pitcher)** : এই ভদ্রমহিলা ১৮৯৮ সালের মে মাসে স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গী হয়ে নৈনিতালে গিয়েছিলেন।

৫। **গুডউইন (Mr. Goodwin)** : ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসছিলেন তখন ইনি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। স্বামীজি তাঁর কয়েকজন মাদ্রাজি বন্ধুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে এই ভদ্রলোকের বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন যে, অকৃতদার এবং সন্ন্যাসীপ্রতিম এই মানুষটি তাঁরই সঙ্গে একত্র বসবাস ও পরিক্রমা করছেন। অল্প কিছুদিন বাদে গুডউইন *মাদ্রাজ মেল* পত্রিকার কর্মী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালের ২ জুন উটকামন্ডে তিনি মারা যান।

৬। **হ্যারিসন (Mr. Harrison)** : বৌদ্ধ হিসাবে উল্লিখিত কলম্বো প্রত্যাগত এই ভদ্রলোকটি ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

৭। **জনসন (Mr. Johnson)** : আমেরিকান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এই অফিসার ১৯০০ সালে মায়াবতীতে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি ভারতীয়দের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন। তবে তিনি নিজের মতো করে একলাই দিনযাপন করতেন এবং মিশনের কোনো কাজেই অংশগ্রহণ করেননি। ১৯০১ সালের আগস্ট মাস অবধি তিনি মায়াবতীতে অবস্থান করলেও তারপর থেকে তাঁর সম্বন্ধে আর কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

৮। **লিও স্যান্ডসবারি (Leon Sandsbury)** : ১৮৯৫ সালে আমেরিকাতে, স্বামী বিবেকানন্দর কাছে যে কয়জন শিষ্যত্বগ্রহণ করেছিলেন ইনি তাঁদের অন্যতম। 'রুশ নাগরিক এই ইহুদির চোখ দুটিতে একজন যথার্থ ধর্মধ্বজীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যেত।' ইনি কোনোদিনই ভারতবর্ষে আসেননি এবং এঁর সম্পর্কে এইটুকু ছাড়া অন্য কোনো রকম সংবাদ পাওয়া যায়নি।

৯। **ক্যাপ্টেন ও শ্রীমতী সেভিয়ার (Captain and Mrs. Sevier)** : এই আমেরিকান দম্পতি, যুগলে স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংল্যান্ডে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। তিনি ১৯০০ সালে অর্থাৎ তার মৃত্যুকাল অবধি রামকৃষ্ণ মিশনের মায়াবতী শাখাটির এবং তৎসংলগ্ন প্রেসটিরও ব্যয়-নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রীমতী সেভিয়ার ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে তখন থেকে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার মায়াবতীতে তাঁর সব কিছু ঢেলে একটি স্কুলও খুলেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়টি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে না পারায় এটি অচিরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১০। **সি. টি. স্টার্ডি (Mr. C. T. Sturdy)** : ইংল্যান্ডের থিওসফিকাল সোসাইটির এই সদস্যটি ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি বছরভর অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ থিওসফি এবং নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা বিষয়ে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন। এই সময়েই পাঞ্জাবের লুধিয়ানা অঞ্চলের বাঙালি উকিল তথা স্থানীয় থিওসফিকাল সোসাইটির সভাপতি, রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী নামে জনৈক ভদ্রলোক তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন। বরদাকান্তর অনেক ছদ্মনাম ছিল যথা, পাওয়েল, সি.এন.পাল এবং পি.সি.রায়। ইনি দলীপ সিং ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং অনুমান করা হয় যে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের তরফে প্যারিসে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং প্রাক্তন মহারাজার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। লাহিড়ী ফরিদকোটের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে ১৮৯০ সালে ইংল্যান্ডেও গিয়েছিলেন। রাজার জায়গিরদারি সংক্রান্ত একটি মামলায় ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত, রাজার স্বার্থবিরোধী একটি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্যই তাঁকে ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছিল। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল অবধি স্টার্ডি, লাহিড়ীর সঙ্গে লুধিয়ানাতেই অবস্থান করেছিলেন। এই সময়টায় তিনি ভারতীয় রীতিতেই সাজপোশাক পরতেন। ১৮৯৪ সালে স্টার্ডি, শ্রীমতী বেসান্ত ও কর্নেল ওলকট নামে দুই থিওসফিস্টের সঙ্গে একযোগে সুরাট ও বরোদা ভ্রমণ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে ১৮৯৬ সালের বসন্তকালে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে স্টার্ডির আতিথ্য-স্বীকার করেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ১৩ ডিসেম্বরে স্বামীজির বিদায় সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১১। **স্বামী অখণ্ডানন্দ** : এঁর পূর্বাশ্রম-নাম গঙ্গাধর ঘটক। এঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে যে ইনি স্বামী সুরেশানন্দর সঙ্গে একযোগে ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলির মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছিলেন। এই লেখায় এঁর প্রসঙ্গ আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। **স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী ওরফে গোবিন্দজী** : ইনি কলকাতানিবাসী একজন কনৌজি ব্রাহ্মণ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট। ১৮৯৬ সাল নাগাদ ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি গুকুল তথা গুকুল মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯০৪ সালে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, তিনি পুরোপুরি ধর্ম বিষয়েই বক্তৃতা করতেন এবং সে-সবের মধ্যে আপত্তিকর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি বলতেন যে, বিদেশভ্রমণ নিষিদ্ধ করে বেদ যথার্থই কোনো বিধান দেয়নি এবং তিনি নিজেও ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণের সময় অনেক বক্তৃতায় বিদেশভ্রমণের সুফল উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নানা স্থানে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং কলকাতা থেকে বোম্বাই যাওয়ার পথে পুরী, মেদিনীপুর, নাগপুর, ভুসাওয়াল এবং নাসিকেও উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কোলাবা জেলার আলিবাগে উপস্থিত হয়ে সেখানে জলন্ধর প্রত্যাগত জনৈক পাঞ্জাবি বলে আত্মপরিচয় দেন এবং স্বয়ং আই. সি. এস. শ্রী ঘোষালের বিশেষ পরিচিতজন বলে রটনা করেন। কিন্তু আলিবাগের লোকেরা মনে করত যে, সরকারের গুপ্তচর হিসাবে তিনি তাদের রাজনৈতিক গতিবিধির উপর নজরদারির কাজে লিপ্ত রয়েছেন। ১৯০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি বোম্বাই ছেড়ে মাদ্রাজের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

বিবরণী (১৯০৪-এর রিপোর্ট অনুযায়ী) : বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। সাধারণ উচ্চতা, নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো; পরিধেয় : রক্তাভ আলখাল্লা, ইংরেজি বলায় পারদর্শী। মাদ্রাজে অবস্থিত ট্রিপ্লিকেনের রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি এখন কর্মরত রয়েছেন।

১৩। **স্বামী অভেদানন্দ** : এঁর পূর্বাশ্রম-নাম কালীচরণ চন্দ্র। ইনি কলকাতার আহিরীটোলা নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় শিক্ষক বাবু রসিকলাল চন্দ্রের পুত্র। বর্তমানে তাঁর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। লেখাপড়ায় ইনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাতে পাশও করতে পারেননি। তবে ইনি ইংরেজি ও সংস্কৃত জানতেন। ১৮৮৮ নাগাদ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরে আসেন। আমেরিকাতে পরবর্তীকালে অভেদানন্দ নামের যে স্বামীজীটি সকলেরই বিপুল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন মনে হয় ইনিই সেই ব্যক্তি ('He appears to be identical with the *Swami Avedananda* who afterwards went to America where he excited a considerable amount of attention.')। ইনি তাঁর ভাইকে বলেছিলেন যে, স্বামীজি হিসাবে তাঁর এই রকম জীবন বেছে নেওয়ার কারণ এই যে, এইভাবেই সব থেকে সহজে এবং সচ্ছলভাবে জীবিকানির্বাহ করা সম্ভব। অনুমান হয় যে, সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করেই তিনি গোটা পৃথিবী আরামে ভ্রমণ করার জন্য যথেষ্ট টাকাও উপার্জন করেছিলেন। ১৯০৪ সালের ২৪ এপ্রিল তারিখের *অ্যাডভোকেট* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, এই স্বামীজিটি ওই সময় নিউইয়র্কে ছিলেন এবং সেখানে ১০২ নং ফিফটি এইটথ স্ট্রিটের একটি বাড়িতে 'বেদান্ত-সোসাইটি' স্থাপন করেছিলেন। এই বাড়িতে যে পূজার ঘর তথা বক্তৃতাকক্ষ ছিল সেখানে তিনি স্বামী নির্মলানন্দর সহায়তাক্রমে বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। এই সোসাইটির যাঁরা প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন তাঁরা হলেন — (১) সভাপতি হার্সেল সি. পার্কার (Harschell C. Parker), যিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থশাস্ত্রের ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন, (২) সেক্রেটারি কুমারী কেপ (Miss Cape) নাম্নী জনৈকা রোমান ক্যাথলিক।

১৪। **স্বামী বিরজানন্দ এবং বিমলানন্দ** : ১৯০১ সালের আগস্ট মাসে এঁরা দু-জনেই *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে উল্লিখিত হয়েছিলেন।

১৫। **স্বামী ব্রহ্মানন্দ** : পুনার *মারাঠা* পত্রিকার সম্পাদকের নিকট মাদ্রাজের *ব্রহ্মবাদিন্* পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর লেখা যে-চিঠিখানি *মারাঠা*-তে ১৯০০ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল সেখানেই প্রসঙ্গক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠের প্রেসিডেন্ট পরিচয়ে অভিহিত করা হয়েছিল। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে মাদ্রাজে রামকৃষ্ণর জন্মোৎসব উপলক্ষে যে বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হয়েছিল সেখানে এই মর্মে উল্লেখ করা হয় — 'পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজির সুযোগ্য পরিচালনায় মিশনের কাজ পূর্বাপর একইভাবে চলছে।' এর থেকে বোঝা যায় যে বর্তমানেও তিনি এই সোসাইটির প্রধান হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন।

১৬। **স্বামী চিদানন্দ** : এঁর পূর্বাশ্রম, নাম গঙ্গাধর পেটার। এঁর পিতা উল্লাথদাথি পেটার, ১৫ বছর আগে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত, মালাবার জেলার ওয়ালানাড়ু তালুকে অবস্থিত পেরিন্টেল-মান্না তিরুমণ্ডনকুনরু মন্দিরের সংলগ্ন পাকশালায় পাচক হিসাবে কাজ করতেন। চিদানন্দর

মা এখনো জীবিত আছেন এবং সেই কারণে সন্ন্যাসী হিসাবে আপনার জন্মস্থান গ্রামে তাঁর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অল্প বয়সে তিনি ছিলেন ভবঘুরে এবং তখন তাঁর চালচলন মোটেও ব্রাহ্মণজনোচিত ছিল না। তিনি খুব সামান্যই লেখাপড়া জানতেন। তাঁর কাছে একজন শূদ্র রমণী ছিল এবং তার সঙ্গদোষে অশুচি হয়ে তিনি প্রয়োজনীয় শুদ্ধি অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ২০ বছর আগে বেনারসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে দু-বছর পরেই অঙ্গাদিপুরমের তারাঙ্গনরা তাঁকে সেই জায়গা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এখানে তিনি (নাকি উল্লিখিত তারাঙ্গনেরা?) তীর্থ করতে এসে সেখানকার মন্দিরে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন এবং সেখানে অল্প মাত্র আহার করে সারা দিন-রাত প্রার্থনা করেই কাটাতেন। এরপরেই চিদানন্দ ত্রিবান্দ্রমে যান এবং সেখান থেকে আবার অঙ্গাদিপুরমে ফিরে আসেন। অতঃপর এই স্থান ত্যাগ করে পুনরায় তিনি উত্তর আর্কট জেলার কালাহস্তি সহ অন্যান্য অঞ্চলে যাত্রা করেছিলেন। এই সময় তিনি সন্ন্যাসী হবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন শাখার স্বামী আত্মানন্দ ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনারকে জানিয়েছিলেন যে, স্বামী চিদানন্দ পালঘাটের স্কুলে বছর চারেক ধরে লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, চিদানন্দ যে-রকম বিলাসবহুল জীবনযাপন করে থাকেন তার জন্য মিশন আর তাঁকে স্বীকার করে না এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁকে (অর্থাৎ চিদানন্দকে) এই সংগঠনের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হবে কি না সে-বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করছেন।

তিনি মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯০৪ সালের জুন মাসে তিনি পুনায় শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরই উদ্যোগে সেখানে অবস্থানের সময় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বিবরণী: বয়স প্রায় ৩০ বছর, উচ্চতা—৫ফুট ৭ইঞ্চি, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো, পরিধানে মস্তক আবরণী এবং লাল রঙের কোট। ইংরেজি, হিন্দি এবং মালয়ালি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। তিনি বলেছিলেন যে, কাথিয়াবাড়ের লিমড়িতে নাকি তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র রয়েছে।

১৭। **স্বামী কৃষ্ণানন্দ** : এঁর পূর্বাশ্রম-নাম সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী। ইনি ১৮৮৭ সাল নাগাদ স্বামী বিবেকানন্দর শিষ্য হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। শোনা যায় যে, ইনি নাকি কাশ্মির থেকে এসেছিলেন। কিন্তু কাশ্মির স্টেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন যে, এঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারা যায়নি। তাঁর পরিবার রাজপুতানায় বসবাস করতেন বলে বলা হয়েছে এবং তাঁর ভাই অক্ষয়কুমার নাকি লাহোরে ব্যারিস্টার হিসাবে প্র্যাকটিস করতেন। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে, লাহোরে ওই নামে কোনো ব্যারিস্টার বা উকিল নেই এবং রাজপুতানাতেও তাঁর পরিবারের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের তারকেশ্বরে তাঁর উপস্থিতির কথা সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী জানা গিয়েছিল। সেই সময় তিনি বেলুড় মঠে ফিরে যাচ্ছিলেন।

১৮। **স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ** : ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে এই স্বামীজিটিকে মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব অর্পণ করে পাঠানো হয়েছিল। এঁর পরিচালনায় এটিই সংগঠনের সব থেকে প্রগতিশীল কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে ইনি রেঙ্গুন পরিদর্শনে

যান এবং সেখানে ২০ তারিখে সেবক-সমিতির উদ্যোগে তাঁকে স্বাগত সংবর্ধনাও জানানো হয়েছিল। ওই মাসেরই ২৫ তারিখে তিনি আবার রেঙ্গুন ত্যাগ করে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

১৯। নিরঞ্জনানন্দ : ১৮৯৭ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ সমভিব্যাহারে তিনি সিংহল থেকে মাদুরার পম্বনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছিলেন না সরাসরি সিংহল থেকেই এসেছিলেন সে-খবর জানা যায়নি। তাঁর সম্পর্কে তদবধি আর কোনো সংবাদ জানা যায়নি।

২০। পণ্ডিত রামতীর্থ ওরফে **স্বামীরাম** ওরফে **গোস্বামী রামতীর্থ** : এঁর প্রকৃত নাম তীর্থরাম। ইনি ছিলেন পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার সদর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত মুরলিওয়ালা গ্রামের অধিবাসী হীরানন্দ নামে জনৈক সারস্বত ব্রাহ্মণের পুত্র। তীর্থরাম বিবাহিত ছিলেন এবং গুজরানওয়ালা মিশন স্কুলে পাঠরত মদনলাল নামে তাঁর একটি পুত্রসন্তানও আছে। এম.এ. পাশ করার পর লাহোরের ফর্মান ক্রিশ্চান কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে তীর্থরাম নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যও পড়াশুনা করেছিলেন এবং মাঝে মধ্যে সংস্কৃত দর্শনে ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। তিনি লাহোরের থিওসফিকাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন এবং *রিসালা আলিফ* নামে একটি স্থানীয় ভাষার পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯০০ সালের মাঝামাঝি তিনি সুপরিচিত ধর্মানুরাগী স্বামী সুহাগন চাঁদের সংস্পর্শে এসে তাঁর মতবাদে এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, সেই সময় তিনি সংসারত্যাগী হতেও মনস্থ করেছিলেন। এমত অভিপ্রায়ে তিনি মিশন কলেজের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সস্ত্রীক গঙ্গা (হরিদ্বার?) অভিমুখে যাত্রা করেন এবং কিছুকাল সেখানে সন্ন্যাস জীবনও যাপন করেছিলেন। অতঃপর স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি একজন সংস্কারক এবং হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত-দর্শনের প্রচারক হিসাবে ভ্রমণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। চার বছর আগে তিনি ভারত ত্যাগ করে জাপানের ধর্ম-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আবার সেখান থেকে আমেরিকার পথে যাত্রা করে ক্যালিফোর্নিয়াতে এসে বসবাস করেছিলেন এবং বেদান্ত-দর্শন প্রচারের কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানিয়েছিলেন যে, এই স্বামীজি (তীর্থরাম) প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমেরিকা বাসের সময় তাঁর সঙ্গে স্বামী ত্রিগুণাতীত (নিবাস ৪০ স্টাইনার স্ট্রিট, সানফ্রান্সিসকো) এবং স্বামী অভেদানন্দর (নিবাস ৬২ ওয়েস্ট, ৭১তম স্ট্রিট, নিউইয়র্ক) মতবিরোধ হওয়ায় তিনি মিশন ত্যাগ করে একক উদ্যমে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালের শরৎকালে স্বামী (তীর্থরাম) আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ৮ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেন। এর কিছুদিন বাদে তিনি স্বামী সুহাগন চাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁরই সঙ্গী হয়ে মথুরা যাত্রা করেছিলেন। সেখান থেকে ১৯০৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তিনি আবার আজমীর এবং পুষ্করে চলে যান এবং সেখানে মাদ্রাজ প্রত্যাগত জনৈক স্বামী নারায়ণের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে এই দু-জন স্বামীজি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। রামতীর্থ যান দেরাদুনের পথে এবং স্বামী নারায়ণ শুকুরে চলে আসেন। রামতীর্থ সম্পর্কে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে জানা যায় যে, তখন তিনি সংযুক্ত প্রদেশে

ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এইসব স্থানে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণের উপযোগিতা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকর্ম শেখানোর উদ্দেশ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বিবরণী : বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫ বছর, মধ্যম ধরনের উচ্চতা, রোগাটে গড়ন, ফরসা রং, গাল ও মাথা কামানো, চশমাধারী।

২১। স্বামী সারদানন্দ : এঁর প্রকৃত নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি কলকাতার ঔষধ-প্রস্তুতকারক গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র। ইনি বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। ১৮৮৬ সাল নাগাদ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনিও ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে আমেরিকা ভ্রমণের জন্য যাত্রা করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন। ইনি এখন কলকাতায় মিশনের বৃহত্তম শাখাটির আচার্য হিসাবে যুক্ত রয়েছেন।

২২। স্বামী স্বরূপানন্দ : ১৯০১ সালের আগস্ট মাসের *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকায় এঁকে সম্পাদক বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই বাঙালি ভদ্রলোক রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন।

২৩। স্বামী সত্যচরণ মিত্র : ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে এঁকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সদস্য হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। ইনি বগুড়ার টাউন হলে হিন্দুধর্ম বিষয়ে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

২৪। স্বামী শিবানন্দ : এঁকে স্বামী বিবেকানন্দর একজন সহকর্মী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। সিংহলবাসী তামিলদের আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের জন্য ইনি ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে কলম্বোয় গিয়েছিলেন। কিন্তু আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখেই তিনি ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বীপভূমি ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আর কোনো বিশদ খবর জানা যায়নি।

২৫। স্বামী সুরেশানন্দ : ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ত্রাণে ইনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে সাহায্য করেছিলেন বলে জানানো হয়েছে (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় উল্লিখিত প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে ইনি একলা অখণ্ডানন্দর উপর এই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মহলা ত্যাগ করে কলকাতার আলমবাজার মঠের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর সম্পর্কে আর কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২৬। স্বামী তুরীয়ানন্দ : এঁর পূর্বাশ্রম-নাম হরিভূষণ চ্যাটার্জী। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হওয়ার সুবাদে, স্বামী বিবেকানন্দ এঁর গুরুভ্রাতা ছিলেন। লখনউতে ১৮৯৯ সালের ৪ জুলাইতে প্রকাশিত *অ্যাডভোকেট* পত্রিকার মন্তব্য অনুযায়ী 'ইনি বেদান্ত-দর্শনে বিশেষ পারদর্শী এবং অসামান্য পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী, সুবক্তা ও সুলেখক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁর অভিজ্ঞতাও বিশাল। ইনি প্রায় গোটা উত্তর ভারত পরিক্রমা করেছিলেন।'

এঁর অতীতজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। ১৮৯৬ সালে তিনি কয়েক মাস লখনউতে অতিবাহিত করেন। সে-সময় যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের সকলকেই তিনি

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি ১৮৯৯ সালের ২০ জুন তারিখে স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে ইংল্যান্ড অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে অল্প কয়েকদিন বসবাসের পর তাঁরই সঙ্গে আবার আমেরিকার পথে রওনা হয়ে যান। কলকাতার *বেঙ্গলী* পত্রিকায় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় লেখা হয় যে, তিনি আমেরিকায় 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি গ্রীষ্মকালীন স্কুল খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই স্কুলে বেদান্ত পড়ানো ছাড়াও যে-সব আমেরিকান বৈদান্তিকেরা পবিত্র ধ্যান অভ্যাসের মধ্যে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁদের নিভৃত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্পর্কে আর কোনো খবরের রেকর্ড নেই।

২৭। স্বামী কামেগাসুন্দর (কামাখ্যাসুন্দর ?) : ডব্লু. কলভিন ওরফে ইউ. ধম্মলোক নামে জনৈক ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ বলেছিলেন যে, ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে সিঙ্গাপুরে একজন ভারতীয় যোগীকে দেখা গিয়েছিল। তাঁর নাম তিনি এখন আর ঠিক মনে করতে পারছেন না। এই যোগীটি জানিয়েছিলেন যে তিনি আমেরিকাতে ছিলেন এবং একটু গন্ধক মেশানো দুধ ছাড়া অন্য আর কিছুই আহার করেন না (He used to take sulphur with milk and no other food)। স্ট্রেটস-সেটেলমেন্টের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ পুলিশ এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে যে-সব খবর সংগ্রহ করেছেন তার থেকে তাঁর প্রকৃত নাম জানা না গেলেও বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসেরই একজন শিষ্য। ইনি এখন পেনাং, সম্মিলিত মালয় রাজ্য এবং স্ট্রেটস-সেটেলমেন্ট এলাকায় বেদান্ত-দর্শন শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

তাঁর আপন বক্তব্য অনুযায়ী তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত চিদাম্বরমের বাসিন্দা। মাদ্রাজে লেখাপড়া শিখে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, তিনি নাকি স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন, পুলিশের ইন্সপেক্টরও হয়েছিলেন এবং পরে বার্মার কমিসারিয়েটেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কয়েকদিনের জন্য সিঙ্গাপুরের ব্রাশ বাশা রোডের হিন্দুমন্দিরে উঠেছিলেন এবং কিছুকাল ট্যাঙ্ক রোডের চেট্টি মন্দিরেও আশ্রয় নিয়েছিলেন। বৈদিক সূক্তগুলি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য তিনি প্রায়শই পেনাং এবং সম্মিলিত মালয় রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সম্মিলিত মালয় রাজ্যগুলির গণ্যমান্য হিন্দুদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তিনি আমেরিকায় গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শিকাগো প্রদর্শনীতেও উপস্থিত হয়েছিলেন।

বিবরণী : বয়ঃক্রম আনুমানিক ৩০/৩৫ বছর, উচ্চতা—প্রায় ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি, গায়ের রঙ মাঝারি কালো, কিছুটা শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘ বাহু, খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারেন।

২৮। স্বামী নির্ভবানন্দ : এই স্বামীজিটি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায়নি। তবে ইনি আলমোড়ার নিকটবর্তী মায়াবতীর রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সদস্য ছিলেন। ইনি বর্তমানে কাংড়া উপত্যকা অঞ্চলে রয়েছেন। এখানে ১৯০৫ সালের ৪ এপ্রিলের ভূমিকম্প-পীড়িত মানুষগুলির মধ্যে খাদ্য এবং বস্ত্র বিতরণে নিযুক্ত রয়েছেন।

[G. C. Press, Simla – No.C. 20D., C.I.D., – 21.11.05, – 200 – R.S.W.]

পূর্বেকার পৃষ্ঠাগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্টের মূল আখ্যানভাগের (Original text) যে মোটামুটি অথবা প্রায় মূলানুগ অনুবাদ পেশ করা হয়েছে সেই বিষয়ে একটি প্রয়োজনীয় কথা বলে নেওয়া দরকার। আগেই বলা হয়েছে যে, গোয়েন্দা বিভাগের যে গোপন (Confidential) ফাইল থেকে এটি উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে এই বিষয়ে মোট দুইটি মুদ্রিত (printed) এবং একটি টাইপে লেখা (typescript) প্রতিবেদন ও বিভাগীয় অফিসারদের হাতে লেখা কিছু টিপ্পনি ও পার্শ্ব-মন্তব্য (marginal comments and check marks) রয়েছে। এগুলি কিছুটা অগোছালোভাবে লেখা এবং আলোচ্য বিষয়ের বিন্যাসের অভাব ও পৌনঃপুনিকতা লেখার পাঠযোগ্যতা (readability) নিঃসন্দেহে অনেকটাই খর্ব করেছে। এই রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনের এক একটি দিক নিয়ে সংক্ষেপে এবং পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মঠ, মিশন, মিশনের স্বদেশ ও বিদেশে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আশ্রম, ধর্মালোচনা কেন্দ্র, সেবাশ্রম এবং সেগুলি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইত্যাদি নানা কথা এইসব রিপোর্টের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মিশন ও মঠের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অনেক দেশি ও বিদেশি অনুরাগীদের কথাও লেখা হয়েছে। এইসব অনুরাগীদের মধ্যে যেমন অনেক সংসার-আশ্রিত গৃহস্থ ছিলেন তেমন অনেকেই আবার বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে আশ্রমবাসী হয়েছিলেন। মিশনের প্রথম আমলের বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসীদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া বিবেকানন্দর চিন্তাধারা কীভাবে ধর্মালোচনার প্রসঙ্গের ঊর্ধ্বে, পরাধীন মানুষকে রাজনীতি তথা স্বাধীনতা-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বিবেকানন্দর একান্ত অনুগত শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকেই বা কেন পরোক্ষে রাজনীতি-প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সেই সব বিষয়েও এই রিপোর্টে ইতস্তত মন্তব্য করা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, এই রিপোর্টে মিশন-সংক্রান্ত তথ্যগুলি আজকের যুগের পাঠকের কাছে আদৌ অভিনব বলে মনে না হতেও পারে, কেননা এইগুলি রামকৃষ্ণ মিশন বিষয়ক নানা গ্রন্থে ইতিমধ্যেই বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে যখন মিশনের পরিচিতি এত ব্যাপক ছিল না, সেই সময়েও পুলিশ-কর্তারা নিজেদের গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে যে-রকম অনুপুঙ্খ পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন তা যথার্থই বিস্ময়কর। নানা রকম বিচিত্র ধরনের তথ্য সমাবেশের ফলে রিপোর্টটিতে হয়তো অনিবার্যভাবেই অনেক ক্ষেত্রে পুনরুক্তি (overlapping) দেখা দিয়েছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন যে তার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই প্রশাসন তথা পুলিশের চোখে রাজদ্রোহের প্রেরণা-সৃষ্টিকারী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিলে সে-কথা এই রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। নানা রকম ত্রুটি সত্ত্বেও আলোচ্য রিপোর্টের এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

কালানুক্রমের বিচারে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের এই প্রথম রিপোর্টটি মনে হয় ফাইলে সন্নিবেশিত বাকি অন্য দুটি রিপোর্ট থেকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ যদিও রিপোর্টটি পেশ করার বা প্রস্তুত করার সঠিক কোনো তারিখ এতে দেওয়া নেই তবুও আগেই যেমন বলা হয়েছে এর মুদ্রাকরের বিবরণী থেকে অনুমান হয় যে, ১৯০৫ সালের শেষদিকে (সম্ভবত

ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা স্টিভেন্সন-মুর দ্বারা) এটি রচিত হয়েছিল। সেই হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে এটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তৈরি করা সব থেকে প্রাচীন তথা প্রথম রিপোর্ট। রিপোর্টটি প্রস্তুত করার সময় সরকার যে তাঁদের উপর এমন সতর্ক প্রহরা রক্ষা করে চলেছেন সে-কথা কিন্তু মিশনের সন্ন্যাসীরা মোটেও আন্দাজ করতে পারেননি। বস্তুত এই নিশ্চিন্ত অনবধানতাই হয়তো সরকারের গোয়েন্দাগিরির কাজ অনেকটা সহজ করে তুলেছিল।[৩] প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ থাকে যে, পুলিশের এই প্রথম রিপোর্টটির এতটাই গুরুত্ব ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীকালে মূলত এটির উপরেই ভিত্তি করে আরো অনেক রিপোর্ট তৈরি করিয়েছিলেন। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ টেগার্ট ১৯১৪ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে মিশন সম্পর্কে 'রেড বুক' নামে পরিচিত যে গোপন রিপোর্টটি রচনা করেছিলেন সেখানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই পুলিশি প্রতিবেদনটির কথা বারে বারেই উল্লেখ করা হয়েছিল।

তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রেও আলোচ্য প্রতিবেদনটির মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি, সংশয় এবং ত্রুটি চোখে লাগে। উদাহরণস্বরূপ মেমোরেন্ডাম বা স্মারকপত্রটির প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষদিকে লেখা হয়েছে যে, রামকৃষ্ণদেব কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার পরে গুরুর দেওয়া 'বিবেকানন্দ' নামে নরেন্দ্রনাথ অতঃপর সর্বসাধারণের পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। 'He came under the influence of Ramkrishna Paramhansa who initiated him as a *Sanyasi* and gave him the name of Swami Vivekananda by which he was henceforth known.' কিন্তু লোকশ্রুতি এই যে, বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হওয়ার আগে অর্থাৎ সম্ভবত জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে নরেন্দ্রনাথের নাম হয়েছিল 'বিবিদিশানন্দ'। পরের দিকে নরেন্দ্রনাথ নিজেই এই নাম পরিবর্তন করে 'সচ্চিদানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। আরো পরে এবং এই সময় শেষবারের মতো তিনি নিজেই তাঁর নতুন নামকরণ করেন 'বিবেকানন্দ'।[৪]

মেমোরেন্ডামের তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে, ১৮৯৭ সালে কলকাতায় ফিরে আসার পর এবং থিওসফিস্ট কুমারী ম্যুলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অব্যবহিত পরে স্বামীজি এই শহরে যে-কয়টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি কলকাতার নাগরিকদের মনে নাকি একেবারেই কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি বরং তার ফলে কলকাতার থিওসফিস্ট এবং ব্রাহ্মসমাজ যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল—'A little later, his lectures in Calcutta were said to have given offence to the Theosophists and the Brahmo community.' এতদ্ভিন্ন এই রিপোর্টে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, বাংলা দেশের (Bengal) অনেকেই বিবেকানন্দকে শূদ্র বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন এবং আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি নিষিদ্ধ ভক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন বলে রটনা হওয়াতে তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দুরাও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন—'The Brahmins, moreover, were said to look down on him as a *Sudra* and denied his claim to the title of *Swami*. This may have been because he (had no) prejudices as to food after his visit to Europe and America.'[৫]

স্মারক প্রতিবেদনটিতে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এইসব মন্তব্যের গুরুত্ব ও সত্যাসত্য বিচার করে দেখার জন্য কিছু ভূমিকা ও প্রাক্‌কথনের প্রয়োজন।

এ-কথা সাধারণভাবে সকলেরই জানা আছে যে, ব্রাহ্মসমাজ ও থিওসফিস্ট সোসাইটি রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং রামকৃষ্ণ আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ রকম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপ মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ সকলেই ছিলেন রামকৃষ্ণর ভক্ত ও অনুরাগী। রামকৃষ্ণর সংস্পর্শে আসার আগে প্রথম জীবনে বিবেকানন্দ নিজেও অনেকটা ব্রাহ্মভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। আর নরেন্দ্রনাথ যখন নিতান্তই কিশোর সেই তখন থেকেই ওলকট প্রমুখ থিওসফিস্টগণ ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা ও দর্শনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। ইংল্যান্ডের থিওসফিকাল সোসাইটির প্রভাবশালী সদস্য কুমারী হেনরিয়েটা ম্যুলার ১৮৯৭ সালেই বিবেকানন্দর সঙ্গে যুক্ত হবার পর কিছুদিন বাদেই *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকাটি প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দর আমেরিকা গমনেও থিওসফিস্টরা অনেকভাবে সাহায্য করেছিলেন। শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে স্বামীজির বক্তৃতা যাঁদের সব থেকে বেশি মুগ্ধ করেছিল তাঁদের মধ্যে থিওসফিস্ট নেত্রী অ্যানি বেসান্তই বোধহয় সর্বাগ্রগণ্যা ছিলেন। এই ধর্মসভায় স্বামীজি প্রদত্ত ভাষণ যে অপরাপর সকলের বক্তৃতাকে ছাপিয়ে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল, সে-কথা উল্লেখ করে বেসান্ত পরবর্তীকালে লিখেছিলেন:

> ...all was subdued to the exquisite beauty of the spiritual message which he had brought to the sublimity of that matchless evangel of the East which is the heart, the life of India the wondrous teaching of the Self

অর্থাৎ ভারত-আত্মা ও ভারতীয় জীবনের মহান শিক্ষা, প্রাচ্যের যে অনুপম উদার চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছিল সেই অধ্যাত্মবাণীর অতুলনীয় বিভায়—যা তিনি (বিবেকানন্দ) বহন করে এনেছিলেন, সকলে বিমোহিত বোধ করেছিল।

তবুও এ-সব তথ্য মনে রেখেও এ-কথা বলতেই হয় যে, ধর্মসম্মেলনের বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করার আগে অবধি বিবেকানন্দকে প্রায় সকলেই কিছুটা করুণামিশ্রিত সহানুভূতির চোখেই দেখেছিলেন। এই করুণার বশেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাইটের (Dr. John Henry Wright) আগ্রহাতিশয্যে সম্মেলনের আয়োজকেরা তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে এই জগৎসভায় বক্তৃতা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তবে তাঁরা মনে মনে নিশ্চয় ভেবেছিলেন যে, পরাধীন দেশের একজন পৌত্তলিক কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভ, শ্বেতাঙ্গদের স্বভূমে এসে তাঁদের এবং তাঁদের ধর্মীয় প্রতিনিধিগণের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। অথচ সেই অসম্ভব ব্যাপারটাই যখন বাস্তবে ঘটে গেল তখন ঈর্ষা ও মাৎসর্যের স্বাভাবিক রিপু তাড়নায় তাঁরা কম-বেশি সকলেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। জাতি ও ধর্মের কল্পিত গৌরবে উদ্ধত খ্রিস্টান ইভানজেলিক পাদ্রিরা হয়তো সব থেকে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু অপরাপর ধর্মাবলম্বী মায় সনাতনপন্থী হিন্দুরাও যে রীতিমতো আহত বোধ করেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তাই এই অজ্ঞাতকুলশীল হিন্দু সন্ন্যাসীর জয়গৌরবে পুলকিত তাঁর অধিকাংশ দেশবাসীই যখন বিবেকানন্দকে বীরোচিত সংবর্ধনা দানের আয়োজন-উৎসবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের উচ্ছ্বাসকে যেন স্তিমিত করে দেওয়ার জন্যই মাদ্রাজে শিকাগো

সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা রেভারেন্ড বারোজকেও একটি প্রতিস্পর্ধী সংবর্ধনা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান, ইউরোপীয় ও ভারতীয়রাই (অর্থাৎ যাঁরা বিবেকানন্দের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন) এই বিকল্প সভার আয়োজনে লিপ্ত হয়েছিলেন। মাদ্রাজের *দি হিন্দু* নামক দৈনিকের ৩ মার্চ ১৮৯৭ তারিখে এই বিষয়ে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি উল্লেখযোগ্য:

THE VISIT OF DR. J. H. BURROWS D.D.

> A committee of Hindus, Parsi, Mahomadan, Brahmo and Protestant Christan gentlemen, Europeans and Natives was formed to welcome Dr. Burrows to Madras and arrange for his course of six lectures on the Haskell Foundation as a deserved recognition of the obligation under which he had placed all alike by his courtesy and broad-minded eclecticism at the Chicago Parliament of Religions in 1893.[৭]

কিন্তু বারোজকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের ঘটনাকে একটা নিছক সাধারণ বা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। মনে রাখা দরকার যে, সেই আমলে কোনো কোনো মহলে জনশ্রুতি ছিল এই যে, বারোজ স্বামীজির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া তো দূরের কথা বরং মনের গভীরে তাঁর প্রতি খুবই ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। বারোজের অনুরাগী জনৈক বাঙালি ভদ্রলোক বিবেকানন্দর সমালোচনা করে এই সময় *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় যে-চিঠিখানি লিখেছিলেন, সেটি পড়ে জানা যায় যে, শিকাগোতে বিবেকানন্দর অভূতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে বারোজ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কুরুচিকর ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য করে বলেছিলেন যে, নতুন কিছু বলে চমক সৃষ্টির প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বিবেকানন্দর বক্তৃতা একমাত্র আমেরিকার খবরের কাগজগুলিরই কাটতি বাড়ানোর কাজে লেগেছিল। পত্রলেখকের ভাষায় :

> Now Dr Burrows of Chicago, who has never yet been accused of lying and slandering his own opponents, says very plainly that so far from being a phenomenal success Swami Vivekananda was never anything better than good copy for the American press ever hungering for novelty sensation.[৮]

অপিচ শুধু বারোজই নয়, যে থিওসফিকাল সোসাইটি ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তার বিশেষ অনুরাগী বলে সাধারণ ভারতীয়দের কাছে পরিচিত ছিল সেই সোসাইটির সভাপতি কর্নেল ওলকটের কাছেও বিবেকানন্দর সাফল্য মোটেও অভিপ্রেত ছিল না। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র পূর্বোক্ত পত্রলেখকের ওই একই চিঠি থেকে জানা যায় যে, বিবেকানন্দ নিজেও জানতেন, এই আপাত ভারতপ্রেমী ওলকটই তাঁর কোনো নিকট বন্ধুকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে নিজের মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করে জানিয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দর পক্ষে শিকাগোতে বিশেষ কিছু করে ওঠা হয়ত সম্ভব হবে না, কেননা শীতকালে সেখানকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় 'তাঁর মতো আপদের মৃত্যু অবধারিত।'

> It is now rather more than a year ago since Swami Vivekananda, at a press meeting in Madras, accused Colonel Olcott of writing in a letter to some one in America : 'I hope the winter's cold will soon kill that Devil.' (Swami Vivekananda)[৯]

ওলকট অবশ্য এই চিঠির সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে বিবেকানন্দর কাছে পত্র দিয়েছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দও নাকি তাঁর অভিযোগের অভ্রান্ততা প্রমাণ করার জন্য বন্ধুকে লেখা ওলকটের সেই ব্যক্তিগত চিঠিখানি সর্বসমক্ষে পেশ করতে পারেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন। এই অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ করার প্রয়োজন আজ হয়তো ফুরিয়েছে। কিন্তু এ-কথা বললে নিশ্চয় অত্যুক্তি হবে না যে, শিকাগো-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ও তাঁর পার্ষদগণের সঙ্গে থিওসফিস্টদের অনেকেরই সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে এই বিতর্কিত বিষয়ে যতটুকু তথ্য আহরণ করা সম্ভব তা থেকে মনে হয় যে, হয়তো বেসান্ত নিজেও এই আবিলতা থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি।

> If Mrs. Besant treated the *Swami* with indifference and was hostile, it must have because he was known to have unfriendly feelings towards the Society and to have spoken disparagingly and sarcastically about the Masters whom the majority of the Theosophists and Mrs. Besant to an especial degree hold in reverence for what they have taught them.[১০]

কিন্তু কেবল খ্রিস্টান মিশনারি ও থিওসফিস্টরাই নয়, স্বামীজির বিরুদ্ধে সম্ভবত তাঁর স্বদেশবাসী কলকাতার কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরাই সব থেকে বেশি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা ব্রাহ্মণেতর সকলকেই শূদ্র জ্ঞান করতেন। সুতরাং এঁদের বিচারে সম্ভবত দত্ত কুলোদ্ভব নরেন্দ্রনাথও শূদ্র। আর এহেন শূদ্র, ব্রাহ্মণদের মতো সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'স্বামী' অভিধা স্বীকার করার স্পর্ধা প্রকাশ করবে এমনটি তাঁরা আদৌ বরদাস্ত করতে পারেননি। তা ছাড়া শোনা গিয়েছিল যে, নরেন্দ্রনাথ নাকি বিলাত ও আমেরিকায় গিয়ে নিষিদ্ধ মাংসও আহার করেছিলেন। আর বিদেশের বিভিন্ন বক্তৃতা-সভাতেও তিনি বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করে প্রকারান্তরে সনাতন ধর্মকেই (তাঁদের বিচার অনুযায়ী) অবমূল্যায়িত করেছিলেন। অতএব এইরকম একজন কালাপাহাড়ের তথাকথিত সাফল্যে কলকাতাবাসী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। *হিন্দু* পত্রিকার ৫ মার্চ ১৮৯৭ সংখ্যায় কলকাতার নাগরিকদের এই মনোভাব ব্যক্ত করে নিম্নলিখিত রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল।

SWAMI VIVEKANANDA IN CALCUTTA

(From our own correspondent)

> The opening event of the past week in Calcutta was the arrival and reception of SWAMY VIVEKANANDA. The Reception Committee no doubt made the necessary arrangements for welcoming him to the city of his birth and the disciples of the late Paramhansa Ramkrishna had helped them materially in

organising a grand ovation in honour of their friend and brother and the general public also were attracted in very large numbers together at the Sealdah station and along the roadside, by which Vivekananada was expected to pass, but truth to tell, despite all these, Hindu Calcutta did not seem to have joined the movement as heartily and enthusiastically as Hindu Madras seemed to have done Perhaps it is only another proof of the old adage.

A PROPHET IS NOT HONOURED IN HIS OWN COUNTRY

Perhaps it is due to the bold attack made by Vivekananda upon the sanctified superstitions of his people, but whatever may be the cause of it, the fact is there that Hindu Calcutta has practically shown the cold shoulder to the Swamy. Indeed ever before he gave any cause of offence the *Bangabasi*, the most widely circulated and influential organ of Hindu Revival in these parts had distinctly said that Bengali Hindus were thankful to the Swamy for all that he had said and done in England and America and they would be very glad to welcome him back to his home with all affection and love, but cannot and will not accept or recognise him as a Sannyasi or a Swamy.

Sriman Narendranath Dutt would be received with open arms, but they would not recognise or receive him as Swamy Vivekananda. The *Bangabasi* is the spokesman of the new fangled orthodoxy in Bengal and as such its protest against the assumption of

THE ROLE AND TITLE OF SUNYASIN

by a kayastha, was thoroughly consistent. In Bengal, there is hardly that distinction between Kayastha and a Sudra that we find in upper India. In the North-West and Behar even the Kayasthas are not put in the same as Kshatriyas. But whether originally the Kayasthas were Kshatriyas or not, there is no doubt of it that they are nowhere recognised as such now.

...And their claims to the rights of the twice-born classes being sometimes totally denied and always strongly disputed, the Sannyasa in the case of Swamy Vivekananda, is looked upon by orthodox Bengal as self-imposed and unauthorised. This had already estranged the sympathy of many people from him even before he opened his lips at Madras.

উদ্ধৃতি হয়তো একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু আমেরিকাতে বিবেকানন্দর চমকপ্রদ সাফল্য ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মানুষদের একাংশকে যে কতদূর ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল তার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে

বিবেকানন্দর বক্তৃতা যে কলকাতাবাসী নাগরিকদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং তাঁর ভাষণগুলি যে ব্রাহ্ম ও থিওসফিস্ট নেতাদের মনোবেদনার কারণ হয়েছিল, গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষে এমন মন্তব্য করা বোধহয় খুব অস্বাভাবিক ছিল না।

(৩)

স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের দ্বিতীয় প্রতিবেদন

পূর্বে উল্লিখিত বাংলা সরকারের স্পেশাল ব্রাঞ্চের 8/9/1909 (I. B. Serial no. 14/1909) ফাইলে মিশন সম্পর্কে যে আরো একটি মুদ্রিত দলিল আছে সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই দ্বিতীয় দলিল বা নথিটি রচনা করেছিলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সি. জে. স্টিভেন্সন-মুর। এটি সিমলা থেকে ১৯০৯ সালের ২২ জুন তারিখে প্রকাশ করা হয়েছিল। আগেরটির মতো এটিও একটি গোপনীয় সরকারি প্রতিবেদন। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং রাজপুরুষদের অবগতির জন্যই অল্প কিছু সংখ্যায় এটি ছাপা হয়েছিল। এটির শিরোনাম এইভাবে লেখা হয়েছিল— MEMORANDUM ON THE RAMKRISHNA MISSION. দুটি রিপোর্টের বিষয়বস্তু এক হলেও সংবাদ পরিবেশনের দিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় যে, প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির সুস্পষ্ট রকমের প্রভেদ ছিল এবং দুটির তথ্যভাণ্ডারও ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। বস্তুত রিপোর্ট দুটি ছিল একে অন্যের পরিপূরক। প্রতিবেদনটির যথোপযুক্ত অনুবাদ এখানে পেশ করা হল।

গোপনীয়

রামকৃষ্ণ মিশন বিষয়ে স্মারকপত্র

উপরোক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে ১৯০৫ সালের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যে স্মারক-প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল তার সংযোজনী হিসাবে এখনকার এই নোটটি দাখিল করা হচ্ছে। দু-একটি ছোটোখাটো বিষয়ে এখন আরো যে-সব অতিরিক্ত খবর পাওয়া গিয়েছে সেগুলি বিচার করে আগেকার রিপোর্টটিকে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এখনকার এই রিপোর্টে প্রথমেই আমেরিকায় অবস্থিত বেদান্ত-সোসাইটির সংগঠন সম্পর্কে একটি বিবরণী দেওয়া হবে। তারপরে আলমোড়ার কাছে মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ মিশনের যে-শাখাকেন্দ্রটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বেদান্ত-ধর্ম প্রচারের কাজে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে তার কথা বলা হবে। সব শেষে দেশে ও বিদেশে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে এই সোসাইটির যোগাযোগের কথাও বলা হবে।

নিউ ইয়র্ক : ১৮৯৫ সালে এবং তার আগেকার বছরে স্বামী বিবেকানন্দর বক্তৃতাদানের ফলে এই শহরে ১৮৯৫ সালেই বেদান্ত-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দ আমেরিকা ছেড়ে যাওয়ার পর স্বামী সারদানন্দকে এই কাজ চালানোর জন্য কলকাতা থেকে

নিয়ে আসা হয়েছিল। ইনি (অর্থাৎ সারদানন্দ) আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে না পারায় ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে লন্ডনে যিনি তখন বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিলেন সেই স্বামী অভেদানন্দকে নিউইয়র্কের বেদান্ত-সোসাইটির তরফে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তিনিও ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভেদানন্দ নিউইয়র্ক সহ আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের সর্বত্রই বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং বেদান্ত-সোসাইটিকে সংগঠিত করে গড়ে তোলেন। নিউইয়র্ক রাজ্যের আইন অনুযায়ী ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে এই সোসাইটিকে সমিতিবদ্ধ (incorporated) করা হয়েছিল। এক বছর পরে সোসাইটির অফিস ও লাইব্রেরির জন্য কয়েকটি ছোটো ছোটো কর্মকেন্দ্রও খোলা হয়েছিল। ১৯০২ সালের বসন্ত কালে এইগুলি সব ১০২ নং ইস্ট, ফিফটি-এইটথ স্ট্রিটের সুপরিসর বাড়িতে সরিয়ে আনা হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক বছরে স্বামী অভেদানন্দর বক্তৃতারাজি উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছিল। ১৯০৪ সালের মে মাসে সেন্ট লুই-এর বিশ্বমেলায় অন্যান্য সকল ধর্মের সঙ্গে যখন এই বেদান্ত-সোসাইটিও প্রতিনিধিত্ব করে তখন থেকে স্বামী অভেদানন্দর শিক্ষার বাণী আরো বেশি করে আমেরিকার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। মোটামুটি এই সময়েই বেদান্ত সোসাইটিকে আরো একটি বড়ো বাড়িতে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং তখন তাই এটি ৬২ নং ওয়েস্ট, সেভেন্টি-ফার্স্ট স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল। এই স্থানে প্রতি রবিবারে আলোচনাসভা হত এবং একজন স্বামীজিকে এখানকার সর্বক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল।

১৯০৫ সালে এই সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় ব্রুকলিনে একটি যোগ-কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং গোটা বছর ধরে সোসাইটিতে নিয়ম করে সাপ্তাহিক সভারও আয়োজন করা হত। ওই একই বছরে ওয়াশিংটনেও সোসাইটির একটি শাখাকেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯০৬ সালের মে মাসে স্বামী বোধানন্দকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে স্বামী অভেদানন্দ ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেন এবং ওই বছরেই ডিসেম্বর মাসে তাঁর কাজে সহায়তা করবার জন্য স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে আবারও নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে অভেদানন্দ পিটসবার্গে বেদান্ত-সোসাইটির একটি নতুন শাখার উদ্বোধন করেন। স্বামী বোধানন্দকে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পিটসবার্গ থেকে নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর অভেদানন্দ প্রতি রবিবারের বিকেলবেলায় কার্নেগি লাইসিয়ামের একটি বিশেষ পাঠক্রমে (course) ভাষণ দিতেন। সেই সময় পরমানন্দও বেদান্ত হাউসের প্রাতঃকালীন শিক্ষাসূচিটি পরিচালনা করতেন। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে বেদান্ত সোসাইটি ১৩৫ নং ওয়েস্ট, এইট্টিয়েথ স্ট্রিটের বাড়িটি কিনে নেয় এবং তদবধি এটি সেখানেই রয়ে গিয়েছে। এই বাড়িটি শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত এবং এখানে বক্তৃতা করা, ক্লাস নেওয়া, লাইব্রেরি করা এবং পুস্তক প্রকাশনা প্রভৃতির জন্য অনেকগুলি ঘর পাওয়া গিয়েছিল। তা ছাড়া এখানে কর্মাধ্যক্ষ স্বামীজিদের বসবাসের জন্যও একটি আবাস ছিল।

১৯০৮ সালে অভেদানন্দ আবারও লন্ডনে উপস্থিত হয়ে সেখানে ছয় মাস ধরে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন। এই সময় লন্ডনেও বেদান্ত-সোসাইটির একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। অভেদানন্দ প্যারিসেও বক্তৃতা দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

নিউইয়র্কে বেদান্ত-সোসাইটি তার প্রকাশনা বিভাগটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছিল। প্রায় চল্লিশটি বই, স্বামীজিদের বক্তৃতাসম্ভার এবং বেদ ও অপরাপর প্রাচ্য-বিষয়ক পুস্তকাদির অনুবাদ এখান থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এই বইগুলি বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রটি কয়েকটি এজেন্সি শাখাও খুলেছিল। এই কেন্দ্র থেকে বেদান্ত-বিষয়ক দুইটি বিখ্যাত পত্রিকা—*ব্রহ্মবাদিন্* এবং *অ্যায়েকেন্ড ইন্ডিয়া* (Awakened India) বিতরণ করা হত।

নিউইয়র্ক, ব্রুকলিন এবং ওয়াশিংটন প্রভৃতি যে-কেন্দ্রগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও ১৯০৬ সালে এই সোসাইটি সানফ্রান্সিস্কো, লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া এবং ভ্যাঙ্কুভারে কয়েকটি শাখা খুলেছিল। সানফ্রান্সিস্কোর কেন্দ্রটি স্বামী ত্রিগুণাতীত-এর পরিচালনাধীন ছিল। এই শাখাটির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ৪০ নং স্টাইনার স্ট্রিটে এবং এই রাস্তার উপরেই সোসাইটি এক টুকরো জমি কিনে একটি মন্দির তৈরি করেছিল। ভূমিকম্পের সময় এই মন্দিরটি আশ্চর্যজনকভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল।

১৯০৭ সালের ১০ই এপ্রিল অপরাহ্নে বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক থিয়েটারে ত্রিগুণাতীত এবং তাঁর সঙ্গে ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে যে-স্বামীজি ভারতবর্ষ থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন, সেই প্রকাশানন্দকে যুগ্মভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। এই সভায় প্রায় ছয় হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন বলে জানানো হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি অধ্যাপক হুইলার এই দুই স্বামীজিকে স্বদেশবাসীর নেতা ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বস্তুত আমেরিকার কোনো কোনো মহলে এই স্বামীজিদের কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তা এই অভিভাষণবাণীর মধ্যেই আভাসিত হয়েছিল।

১৯০৬ সালে এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি তপোনিবাস (Home for Meditation) খোলা হয়েছিল। এটি একটি নয়নাভিরাম উপত্যকার ঠিক মধ্যস্থলে সোসাইটিকে দান করা একটি বিশাল জমির উপর অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত হেলবম (Mr. Helbom) এই তপোনিবাসের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নিজের নাম বলতেন—গুরুদাস ব্রহ্মচারী। বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে এখানে ছাত্র ও স্বামীজিরা উপস্থিত হয়ে ধ্যান করতেন। ১৯০৮ সালে মায়াবতীতে একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে বাস করতে দেখা গিয়েছিল এবং তখন জানা যায় যে, এঁর নাম শ্রীযুক্ত হেবলম (Mr. Heyblom)। মনে হয় এই ভদ্রলোক এবং ওই 'শান্তি আশ্রম' নামক তপোনিবাসটির কর্মাধ্যক্ষ উভয়েই অভিন্ন ব্যক্তি।

ক্যালিফোর্নিয়ার 'শান্তি আশ্রম'-এর জমিটি একজন মহিলা দান করেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দর যে বিপুলসংখ্যক অত্যুৎসাহী মহিলা ভক্তবৃন্দ ছিলেন ইনি তাঁদেরই অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দর আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জীবনচর্যার কথা মনে রেখেও এ-কথা হয়তো নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেদান্ত-ধর্মের কয়েকজন ভণ্ড প্রবক্তা এবং এমনকী নির্ভেজাল স্বামীজি হিসাবে (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) স্বীকৃত অনেকেই পাশ্চাত্যের মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পাওয়া যাবে জেনেই ইউরোপ এবং আমেরিকায় তাঁদের (বেদান্ত-ধর্ম প্রচারের) কাজ শুরু করেছিলেন। এই ধর্ম-আন্দোলনের প্রবক্তা (স্বামীজি) সম্পর্কে উল্লেখ করে *ইন্ডিয়ান*

মিরর পত্রিকায় ১৮৯৬ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখে লেখা হয়— 'আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের একটি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এঁরা সোৎসাহে এবং নিষ্ঠা সহকারে হিন্দু দর্শন এবং যোগ বিষয়ে তাঁর ক্লাসগুলিতেও উপস্থিত থাকেন বলে জানা গিয়েছে। লন্ডনের জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির মতে, "এটি সত্যই এক অভাবনীয় দৃশ্য যে ভারতীয় চেলারা যেমন ভক্তিভরে গুরুর কথা শুনে থাকেন ঠিক তেমনিভাবে লন্ডনের সব থেকে কেতাদুরস্ত মহিলারাও এখানে চেয়ারের অভাবে মাটির উপরেই পদ্মাসন ভঙ্গিতে উপবেশন করে থাকেন।" এই দৃশ্য দেখলে স্বামী বিবেকানন্দ যে আমেরিকাতে তাঁর প্রথম জনসভায় 'আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেটি হঠাৎ-করা একটি সম্ভাষণ বলে সন্দেহ করা চলে না। (It was not merely an accident that the first words spoken in public by Swami Vivekananda in America were, '*Sisters and brothers of America.*')।'

মায়াবতী : ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংল্যান্ড ভ্রমণ করছিলেন সেই সময় ক্যাপ্টেন জে.এইচ. সেভিয়ার (J.H. Sevier) নামে একদা ভারতবর্ষে কর্মরত যে-ভদ্রলোক তখন হ্যাম্পস্টেডে বসবাস করছিলেন তিনি বিবেকানন্দর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দর ভারত প্রত্যাবর্তনের সময় এই ভদ্রলোক সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর চার-পাঁচজন বাঙালি শিষ্য সহ আলমোড়াতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁরা তখন সেখানে একটি সুযোগ্য বাসস্থানের সন্ধান করছিলেন। অতঃপর আলমোড়ার টমসন হাউসে প্রায় নয় মাস অতিবাহিত করার পর, তাঁরা জনৈক জেনারেল ম্যাকগ্রেগারের (Macgregar) কাছ থেকে সাত হাজার টাকায় 'মায়াবতী' আবাসটি কিনে নেন এবং ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেখানেই বসবাস শুরু করেন।

আলমোড়াতে এঁরা যখন অবস্থান করছিলেন, সেই সময় মাদ্রাজের মাসিক বেদান্ত পত্রিকা *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর সম্পাদকের দেহান্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তখন ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকেই পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে রাজি করান। তদবধি মায়াবতী থেকেই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হত। তা ছাড়া বেদান্ত-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থও এখান থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই সময় এখানকার কর্মচারীদের মধ্যেও কিছু রদবদলও করা হয়েছিল। ১৯০২ সালে সেভিয়ারের মৃত্যু হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পাদককে সহায়তা করার জন্য আরো যে তিনজন স্বামীজিকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও ১৯০৪ সাল নাগাদ স্বরূপানন্দ এবং ১৯০৭ অথবা ১৯০৮-এ বিমলানন্দ গতাসু হন। অতঃপর শেষোক্ত বছরে (অর্থাৎ ১৯০৮-এ) এখানকার সাবেক কর্মীদের মধ্যে রইলেন কেবল শ্রীমতী সেভিয়ার, বিরজানন্দ এবং মাখনলাল সাহা নামে জনৈক প্রেস কম্পোজিটর। শ্রীমতী সেভিয়ারের উদ্যোগে বেলুড় মঠ থেকে আনীত স্বামী পরমানন্দ এবং তেজনারায়ণ ও ইতিপূর্বে অন্যত্র উল্লিখিত শ্রীযুক্ত হেবলম নামক আমেরিকান ভদ্রলোক প্রমুখের সাহায্যে এইসব শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ করা হয়েছিল।

১৯০৮ সালে শ্রীমতী সেভিয়ারের তদারকিতে তিনজন বাঙালি স্বামীজির সহায়তায় সংবাদপত্র বিভাগটির কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। বিরজানন্দ সম্পাদকের কাজ করতেন।

পরমানন্দ জেনারেল ম্যানেজার ছাড়াও এস্টেটের দেখাশোনা করতেন আর তেজনারায়ণ ছিলেন পত্রিকার ম্যানেজার। তা ছাড়া তিনি মায়াবতী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিতেও ডাক্তার হিসাবে কাজ করতেন। শ্রীযুক্ত হেবলম বই বাঁধাই এবং প্যাকেজিং বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর জন্য প্রবন্ধাদিও লিখতেন।

আশ্রমটি সম্পর্কে ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি স্থানীয় রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, 'শ্রীমতী সেভিয়ার সমেত এখানকার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সকলের মধ্যেই পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় ছিল। তাঁরা সবাই একই বাড়িতে একত্র আহার ও বসবাস করতেন (অবশ্য শ্রীমতী সেভিয়ার শেষের তিন-চার মাস মায়াবতী পরিদর্শনের জন্য আগত শ্রীমতী ক্রিশ্চিয়ানা নাম্নী কলকাতার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আলাদা একটি বাড়িতে থাকতেন)। আশ্রম সদস্যদের সাধারণ কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টা দুয়েক ধ্যান করতে হত। তারপর তারা সকলে মিলে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য ভ্রমণে বের হতেন। সকাল দশটা নাগাদ আবার একত্রে প্রাতঃভোজনে (morning meal) বসতেন। এরপর পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিকেল চারটে অবধি তাঁরা যে-যাঁর আপন কাজে লিপ্ত হতেন। অতঃপর তাঁরা দুই ঘণ্টা যাবৎ ক্রকেট (Crocket) খেলার শেষে আবারও প্রায় দু-ঘণ্টার মতো ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। রাত ন-টা নাগাদ সান্ধ্য আহার শেষে সোজা বিছানায় আশ্রয় নিতেন।

এই সময় আশ্রমের উপর এবং পত্রিকাটিরও নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে শ্রীমতী সেভিয়ারের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় ছিল। সম্ভবত এই কারণেই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনে আশ্রম ও পত্রিকাটিকে ব্যবহার করা হত বলে সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি। বস্তুত রাজনীতি ছিল এঁদের কর্মসূচি-বহির্ভূত বিষয়। তাই মায়াবতীর কোনো সদস্যের পক্ষে রাজনীতি-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে মুখ খোলারই নিয়ম ছিল না। পত্রিকার ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই নিয়মের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করাও হয়েছিল। তবে এ-সব সত্ত্বেও মায়াবতীর এক সময়কার বাসিন্দা তিনজন বাঙালি, কোন অবস্থায় কলকাতার সন্ত্রাসবাসী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন সে-কথা পরে জানানো হচ্ছে।

রাজনীতি এবং বেদান্ত-সোসাইটি : বিবেকানন্দর বক্তৃতার মধ্যে সরাসরি রাজনীতির বিষয় যে খুব বেশি পরিমাণে থাকত এ-কথা কোনোমতেই বলা যাবে না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দুধর্মকে তিনি স্বয়ং যেভাবে বুঝেছিলেন সেইভাবে তার সম্যক প্রকাশ ঘটতে পারে যদি বিশ্বের সব কয়টি ধর্মকেই তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুতরাং এটা স্বভাবতই মনে করা যেতে পারে যে, তাঁর পক্ষে হিন্দুদের উপর খ্রিস্টানদের আধিপত্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মগ্রহণ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'সে ছিল এক সুযোগ্য সময়। তাঁর মতো একজন মানুষের জন্ম নেওয়ার তখন বড়ো প্রয়োজন ছিল। আর তাই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই ঘটনার সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর দিক ছিল এই যে, তাঁর জীবনের সমুদয় কর্মকাণ্ড এমনই একটি শহরের (কলকাতা) নিকটে ঘটেছিল, যা পশ্চিমের ভাবধারায় নিমজ্জিত ছিল এবং পাশ্চাত্যের আদর্শকে উন্মাদের মতো অনুসরণ করেছিল এবং যে-শহরে ভারতবর্ষের যে-কোনো নগরীর চেয়ে অধিক মাত্রায়

ইউরোপীয়করণ ঘটেছিল।' পশ্চিম থেকে প্রথমবার ভারতবর্ষে ফিরে এসে কলকাতা নিবাসী হিন্দুদের কাছে একবার বক্তৃতা করার অবকাশে বিবেকানন্দ আবারও বলেছিলেন, 'দেওয়া আর নেওয়া — এই হল জীবনের গূঢ় সত্য। কিন্তু আমরা কি সবসময় নিয়েই যাব— ইউরোপবাসীদের পদতলে সমাসীন হয়ে সব কিছুই শিখব, এমনকী ধর্মও? আমরা তাদের কাছে যন্ত্রের কথা শিখতে পারি এবং হয়তো বা আরো অনেক কিছুই। কিন্তু আমাদেরও তো তাদের কিছু শেখাতে হবে এবং (এই শেখাবার বিষয়টা হল) আমাদের ধর্ম এবং অধ্যাত্মচিন্তা। পৃথিবী একটা সর্বাঙ্গীন সভ্যতার অপেক্ষায় রয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যে-সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে পৃথিবী তারই অপেক্ষায় রয়েছে, অপেক্ষায় রয়েছে বিগত বহু প্রজন্মের অধঃপতন ও দুর্গতি সত্ত্বেও গোটা ভারতীয় জাতি অদ্যাবধি যা বুকের মধ্যে আঁকড়ে রয়েছে সেই অনুপম, জাতীয় (Race) আধ্যাত্মিক-উত্তরাধিকার লাভ করবার আশায়।' ওই একই বক্তৃতার অন্য এক জায়গায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'তুমি যদি ইংরাজ অথবা আমেরিকানদের সমকক্ষ হতে চাও তা হলে তোমাকে শিখতে হবে এবং শেখাতেও হবে এবং (তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে) আগামী বহু শতাব্দী ধরে শেখানোর মতো অনেক সঞ্চয় (তোমারও ভাণ্ডারে) জমা আছে।'

কিন্তু কলকাতায় প্রদত্ত অপর একটি ভাষণেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কে স্বামীজি সম্ভবত সব থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং স্পষ্টভাষায় তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এই ভাষণ থেকে একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

> প্রতিটি জাতিরই (nation) একটি নিজস্ব কর্মপদ্ধতি থাকে। কোনো একটি জাতি রাজনীতির মাধ্যমে কাজ করে, কেউ বা সমাজসংস্কার অথবা অন্য কোনো পথে এই কাজ করে চলে। আমাদের পক্ষে ধর্মই হল একমাত্র ভূমি যার উপর দাঁড়িয়ে আমরা এগোতে পারি। রাজনীতির মাধ্যমে ইংরাজ, ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারে। সমাজসংস্কারের পথে ধর্মকে অনুধাবন করা হয়তো একজন আমেরিকানের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একজন হিন্দুর পক্ষে একমাত্র ধর্মের মধ্য দিয়েই কেবল রাজনীতি অনুধাবন করা সম্ভব। তার কাছে ধর্মের মাধ্যমেই সমাজবিদ্যা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় প্রকট হয়ে ওঠে। সে জানে, ধর্মই হল মূল বিষয় এবং বাদবাকি সব কিছুর মধ্যে কেবল জাতির জীবন-সঙ্গীতের সুর অনুরণিত হয়।

সোসাইটির বাংলা পত্রিকা *উদ্বোধন* প্রধানত ধর্মসংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা সেখানে নিয়মানুযায়ী নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের সংখ্যাটির দুটি অনুচ্ছেদ রীতিমতো ব্যতিক্রমী এবং সম্পূর্ণরূপে আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়েছিল। সরকারের বাংলা অনুবাদক-কৃত এই দুইটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

> তোমরা সকলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছ। শাসকগোষ্ঠী তোমাদের বলে, 'তোমরা নীচ, পরাধীন, শক্তিহীন' এবং আবহমান কাল ধরে তোমরাও ভেবে এসেছ তোমরা নীচ, অপদার্থ ও পরাজিত মানুষেরই দল এবং এই প্রকার ভাবনায় ক্রমাগত পরিতাপ করার ফলে তোমরা স্ব-কল্পিত ধারণার ধাঁচে যথাবিধ তৈরি হয়ে উঠেছ। দেখ,

> আমার এই দেহ তোমাদেরই এই দেশের মাটি দিয়ে নির্মিত হয়েছে। অথচ আমি তো তোমাদের মত করে নিজেকে ভাবতে শিখিনি। তাই যে-সকল মানুষ আমাদের অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজ তারাই আমাকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। তাই তোমরা যদি এমনটি ভাবতে পার যে, তোমরাও অনন্ত শক্তি, জ্ঞান এবং অমিত বীর্যের অধিকারী এবং আত্মশক্তিকে তোমরা যদি যথার্থই জাগ্রত করতে পার তাহলে আজ আমি যা হতে পেরেছি তোমরাও অচিরাৎ তা-ই হয়ে উঠবে।
>
> কেবল তারস্বরে চিৎকার করে মানুষের মুক্তিলাভ ঘটে না। এখন শাণিত কৃপাণ এবং মরণপণ সংগ্রামের প্রয়োজন। তাই এখন মাতৃস্বরূপিনী কালী, মহাবলী (হনুমান বা হনু দেবতা) এবং ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকেই পূজা করা কর্তব্য। মাতৃ-আরাধনার জন্য চাই রক্ত, নরবলি।

যদিও স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তব রাজনীতির মধ্যে বিশেষ জড়িত ছিলেন না, তথাপি তাঁর অনেক অনুগামীই বাংলাদেশের রাজদ্রোহমূলক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই সম্পৃক্ত ছিলেন। কলকাতার 'অনুশীলন সমিতি' তো বেলুড় মঠের সঙ্গে ভালোভাবেই যুক্ত ছিল। কুলচন্দ্র সিংহরায় নামে জনৈক ছাত্রের এক্সারসাইজ বুকের ১ মাঘ ১৩১৪ (১৯০৭) তারিখের পৃষ্ঠার লেখা থেকে জানা যায় যে, ন্যাশনাল কলেজের প্রায় ৩০/৩৫ জন ছাত্র অনুশীলন সমিতির সদস্যগণের সঙ্গে একযোগে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিলেন। তা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং ডাকসাইটে *যুগান্তর* পত্রিকার প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই পত্রিকার কর্মীদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হন এবং এক বছর কারাবাসের পর ১৯০৮ সালের জুন মাসে মুক্তিলাভ করে আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠেই কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মানিকতলার পারিবারিক বাগানবাড়ির বোমা মামলার রহস্যটি উদঘাটিত হয়। এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিবৃতি দেওয়ার সময় অরবিন্দ বলেছিলেন :

> এক সময় আমি বেদান্ত দর্শন ভিত্তিক এমন এক ধর্ম আন্দোলনের কথা ভেবেছিলাম যা ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা অবধি ছড়িয়ে পড়বে। আমি সত্যই বিশ্বাস করেছিলাম এবং এখনও করি যে বৈদান্তিকতার মধ্যেই পৃথিবী তার ভবিষ্যৎ ধর্ম খুঁজে পাবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমি কয়েকটা মাস কঠোর পরিশ্রম করি এবং এ-ব্যাপারে আমি কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত মহলের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।

এই বিবৃতিটি অনুধাবন করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এখানে তিনি (অরবিন্দ) তাঁর বরোদায় বসবাসের সময়টিই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় উগ্রপন্থী দলের কাজে নিজের লেখনী ও মস্তিস্ক ব্যবহার করার প্রয়োজনে তিনি চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

অবশ্য মানিকতলার বোমা-ষড়যন্ত্রে যাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবল একা অরবিন্দই বিবেকানন্দর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এমন নয়। আলমোড়ার নিকটবর্তী

'মায়াবতী' আশ্রমটির আতিথ্য, সত্যসন্ধ মানুষদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। প্রধানত বাংলাদেশ থেকে আগত সন্ন্যাসী ও পরিদর্শকগণ এই সুযোগ গ্রহণ করতেন। স্বামী স্বরূপানন্দ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন অবধি সমুদয় বেদান্ত-শিক্ষার্থীদের তিনিই পড়াতেন। তাঁর এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। এঁরা দুজনেই মানিকতলা মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ নং ধারা মোতাবেক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মায়াবতীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে এসে তিনি ১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালে *গীতা* অধ্যয়ন করেছিলেন। এই জায়গায় থাকার সময় তিনি কলকাতায় ডাফ কলেজের তাঁর সহপাঠী বন্ধু হৃষীকেশকে ডেকে নিয়ে আসেন। তাঁদের দু-জনকেই সন্ন্যাসী হিসাবে দীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর অবেক্ষাধীন সময় পার হওয়ার ঢের আগেই তাঁরা ওই স্থান ত্যাগ করে চলে যান। এইভাবেই বোম্বাই নিবাসী রামচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল। বাংলাদেশ থেকে যে-সব সন্ত্রাসবাদী বোম্বাইতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেককেই এই রামচন্দ্র আশ্রয় দিয়েছিলেন।

ইন্দ্রনাথ নন্দী নামে সন্ত্রাসবাদী দলের অপর এক সদস্য ১৯০৪ সালে মায়াবতী পরিদর্শনে এসেছিলেন। ইনিও ওই একই মামলায় (অর্থাৎ মানিকতলা বোমা মামলায়) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু মায়াবতীতে তিনি দুইমাস সময় কাটানোর আগেই তাঁর বাবা তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। মায়াবতীতে যাঁরা অধ্যয়ন করতেন তাঁরা যে শেষপর্যন্ত তাঁদের লব্ধ শিক্ষার অযোগ্য হয়ে পরেন (অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করেও যে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির কর্মে লিপ্ত হতে পারেন) তা লক্ষ করে শ্রীমতী সেভিয়ারও বিরক্ত বোধ করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাওয়ার আগে শ্রীমতী সেভিয়ারও স্বয়ং পুনায় গিয়ে তিলকের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাই মনে হয় যে, উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদের পক্ষে তাঁর নিজেরও একটা আকর্ষণ ছিল। (কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্তত) তাঁর আমলে মায়াবতীতে রাজদ্রোহীদের সমর্থন যোগানো হত না। বস্তুত পক্ষে কলকাতার সন্নিকটবর্তী হওয়ার ফলে একমাত্র বেলুড় মঠই বড়যন্ত্রকারীদের আড্ডাস্থল (rendezvous) হিসাবে পরিণত হয়েছিল। বিপজ্জনক মতাবলম্বী অনেক ব্যক্তিই নানা সময়ে এই মঠ পরিদর্শন করতে আসতেন। রাজনৈতিক সন্ন্যাসীরাও এই স্থান থেকেই উপদেশ ও প্রশিক্ষণ লাভ করতেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি বেলুড় মঠের কয়েকটি শাখা পুরী এবং বাঙ্গালোরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বাইরে রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠনগুলিকে উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রয়োজনে কতদূর ব্যবহার করা হচ্ছে সে-বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট রকম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এমনটি মনে করা যেতেই পারে যে, বেদান্ত-ধর্মে আগ্রহী আমেরিকাবাসীগণ এখন এই দেশ এবং এখানকার মানুষদের সম্পর্কেও কৌতূহলী হয়ে উঠছেন। বস্তুত যে-দেশে তাঁদের বিশেষ আস্থার স্থল বেদান্ত-ধর্মের উন্মেষ ঘটেছিল সেখানকার অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও রাজনৈতিক অভিমত সম্পর্কেও তাঁরা নির্বিচারে আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। আমেরিকায় বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন এমন একজন ভারতীয় বলেছিলেন যে 'ইন্ডো-আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন' এবং বার্কলে ও ক্যালিফোর্নিয়ার রাজদ্রোহমূলক সংগঠনগুলিতে এমন অনেক আমেরিকান

সদস্য রয়েছেন যাঁরা স্বামী রামকৃষ্ণর অনুগামী হওয়ায় নিজেদের হিন্দু বলেই মনে করতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত জি. ডাবলিউ. গালওয়ানি (G. W. Galwani) ছিলেন পোর্টল্যান্ডের অ্যাটর্নি। তবে নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দ অন্তত প্রকাশ্যভাবে কোনো ভারতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয় না। তথাপি তিনিও কিন্তু মাইরন ফেল্প্‌স (Myron Phelps)-এর 'সোসাইটি ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইন্ডিয়া'-র সদস্য হয়েছিলেন। 'ইন্ডিয়া হাউস' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই সোসাইটিরই কয়েকজন সদস্য 'বেদান্ত-সোসাইটি'র বাড়িতেই একত্র মিলিত হতেন। মনে হয়, হাল আমলের 'ইন্দো-আমেরিকান' ক্লাবটিও 'বেদান্ত-সোসাইটি'র সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই যুক্ত আছে।

যামিনী মজুমদার নামে জনৈক বাঙালি, কলকাতায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সুবাদে গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিবৃতি দিয়ে কবুল করেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিরা ভারতবর্ষে আসার সময় আমেরিকা থেকে অস্ত্র আমদানি করতেন। কিন্তু এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করে দেখা হয়নি। মনে হয় স্বামীজিদের, যাঁরা কোনোমতেই বুদ্ধিতে খাটো ছিলেন না, তাঁদের যে ভাবেই হোক অপদস্থ করাই ছিল এ-ধরনের সংবাদের (অর্থাৎ প্রচারের) প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সিমলা, ২২ জুন, ১৯০৯

সি. জে. স্টিভেন্সন-মুর
অফিশিয়েটিং ডিরেক্টর, ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স

[G.M. Press, Simla.–No.12Cr. – 5-8-09. – 50. – H.A.W.]

বাংলা সরকারের স্পেশাল ব্রাঞ্চের পূর্বালোচিত গোপন ফাইলটিতে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে আরো দুটি ছোট আকারের গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে। তবে আগেকার দুটি মেমোরেন্ডামে আলোচনার পরিসর ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রথমটিতে মিশন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস সহ স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা ও মিশনের প্রথম আমলের গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাসীদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি বর্ণনা করা হয়েছিল। এই আলোচনার অবকাশে বিবেকানন্দর আমেরিকা ও লন্ডনস্থ বিদেশি ভক্ত ও অনুরাগী, যাঁরা ভারতবর্ষে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বাইরেও মিশনের নানা রকম সাংগঠনিক, প্রচার ও সেবাকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রথমটির পরিপূরক (supplement) হিসাবে রচনা করা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমটির তথ্য সংকলনে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে গিয়েছিল, এখানে আলোচনায় সেই বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্টে প্রধানত আমেরিকার নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ব্রুকলিন, বার্কলে এবং ভারতবর্ষের আলমোড়া তথা মায়াবতীর বেদান্ত-সোসাইটিগুলির কথা বলা হয়েছিল। তবে রিপোর্টের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি একেবারে শেষদিকে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এই অংশে বিবেকানন্দর বেদান্ত-ধর্ম এবং তাঁর মতাদর্শ কীভাবে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের (Bengal) স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল এবং কীভাবে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সন্ত্রাসবাদী সদস্যরা রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন সে-কথা সংক্ষেপে

বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় রিপোর্টের 'রাজনীতি এবং বেদান্ত-সোসাইটি' (*The Vedanta-Society and Politics*) অংশটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিচারে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল যে, এটির মূল আখ্যানভাগে (original text) বহু জায়গাতেই পাশে পেন্সিল দিয়ে জরুরি মার্কা (marginal bold mark) করে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ এইসব তথ্য সংগ্রহে যে অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিল তা যথার্থই বিস্ময়কর। সংকলিত তথ্যের মধ্যে যে ত্রুটি ও ভ্রান্তি ছিল না তা একেবারেই নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাল তারিখের বর্ণনায় কিছু বিভ্রম ঘটেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকজন মঠাধীশ ও সেবাব্রতী সন্ন্যাসীকে হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করারও চেষ্টা করা হয়েছে।[১১] কিন্তু এই সব বিভ্রান্তি-সৃষ্টিকারী সংবাদগুলি পুলিশের অধঃস্তন দেশীয় সংবাদদাতারা যোগান দিয়েছিলেন (তাঁরা অনেক সময়েই উপরওয়ালা সাহেব অফিসারদের খুশি করবার জন্য সংবাদের বিকৃতি ঘটাতেন) না তথ্য সংকলনের দায়িত্বে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীগণ রচনা করেছিলেন সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মোটের উপর সবদিক বিবেচনা করে এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, পূর্বে আলোচিত দুটি রিপোর্ট বা মেমোরেন্ডাম ছিল যথোচিত বস্তুনিষ্ঠ (objective)। এই গুণের জন্যই মিশন সম্পর্কে পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক অন্য যে-সব ছোটো-বড়ো রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল সেগুলিতে কম-বেশি এখান থেকেই তথ্য আহরণ করা হয়েছিল। টেগার্টের প্রতিবেদনেও নানা স্থানে এই রিপোর্ট থেকে বিপুল পরিমাণে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। এমনকী এক যুগ পরে ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির (রাউলাট কমিশন) রিপোর্টেও যে এগুলির প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। আলোচিত মেমোরেন্ডাম দুটিতে বারে বারেই বলা হয়েছিল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব সর্বদা পরিহার করা সত্ত্বেও তাঁদের মতাদর্শ স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের সব সময় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সিডিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট বিচারপতি রাউলাট (S.A.T. Rowlatt) এই কথাটি অন্যভাবে উল্লেখ করে লিখেছিলেন : 'From much evidence before us it is apparent that this influence (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর মতাদর্শের প্রভাব) was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects.' সার কথা এই যে, রাউলাটের মতে, অরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্রই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর ভাবনা ও মতাদর্শকে বিকৃত করে নিজেদের পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করার উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিলেন।

টেগার্ট তাঁর রিপোর্টে এই বলে অভিযোগ করেছিলেন যে, বেলুড়ের বাইরে বৃহৎ পূর্ববঙ্গের জেলা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে মিশনের যে একাধিক শাখাকেন্দ্র ও গ্রাম আশ্রমগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের অনেকগুলিই ক্রমশ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আনাগোনার কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই সকল কেন্দ্র ও অঞ্চলে যে বিরাট লোকসমাগম হত সেখানে ভক্ত স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করার অছিলায় এই সকল বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করতেন। কিন্তু পূর্বে আলোচিত মেমোরেন্ডাম দুটিতে এই বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা দেখতে

পাওয়া যায় না। তাই আলোচ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের তৃতীয় বা সর্বশেষ প্রতিবেদনটিতে যে-দুটি সংক্ষিপ্ত টাইপ করা রিপোর্ট রয়েছে তার প্রথমটিতে এই বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সমুদয় তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল। সাড়ে চারটি ফুলস্ক্যাপ পৃষ্ঠায় টাইপ করা প্রায় চোদ্দো-শত শব্দের এই রিপোর্টটি ১৯১২ সালের ৯ আগস্ট তারিখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়া হয়। নথিটির শেষে এটি যিনি প্রস্তুত করেছিলেন সেই অফিসারের নামের আদ্যাক্ষর থেকে (initial) তাঁকে সঠিক সনাক্ত করার উপায় নেই। তবে মনে হয় যে এটিও স্টিভেন্সন-মুর সকাশেই জমা করা হয়েছিল। রিপোর্টটির মোটামুটি বাংলা তর্জমা এখন পেশ করা হচ্ছে।

(৪)

স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের তৃতীয় প্রতিবেদন

পূর্বভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী ব্রহ্মানন্দ অদ্যাবধি হাওড়ার বেলুড় মঠে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্রের সভাপতি রয়েছেন। রেল স্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরের এই বেলুড় মঠটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এখানে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ি রয়েছে। এই বাড়িতেই স্বামীজিরা, তাঁদের শিষ্যবর্গ এবং বেলুড় মঠে যাঁরা পরিদর্শন করতে আসেন তাঁরা সকলেই একত্র বাস করেন।

কলকাতা এবং আশপাশের গ্রাম থেকে আগত বহুসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে বেলুড় মঠে প্রতি রবিবারেই সভা করা হয়। মঠের সংলগ্ন মাঠটি সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হয়। গরিব মানুষের দল এই সুযোগে এখানে এসে মঠের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় প্রসাদ গ্রহণ করে। ২৯ জানুয়ারি ১৯১১ তারিখে মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দর ৪৯তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রায় ছয় শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মঠে সমবেত হয়েছিলেন। সমাগত মানুষের মধ্যে প্রায় ২০ জন মারাঠি এবং মাদ্রাজি যুবক ছাড়াও কয়েকজন আমেরিকানকেও দেখা গিয়েছিল। শ্রীযুক্ত আলেকজান্ডার নামক জনৈক আমেরিকান এবং আরো কয়েকজন স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রশস্তিমূলক ভাষণও প্রদান করেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আরো অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনুশীলন দলের পুলিনবিহারী মুখার্জী এবং যোগেন ঠাকুরও হাজির ছিলেন।

রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষেও ১৯১১ সালের ৫ মার্চ বেলুড় মঠে আবার একবার অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়েছিল। এই সময় লক্ষ করা গিয়েছিল যে, বেশির ভাগ পূর্ববঙ্গের লোকেরাই এতদুপলক্ষে গঙ্গার ঘাট এবং অন্যত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিলেন। এই জয়ন্তী উৎসবটিকে প্রধানত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলা হলেও 'সারদা' নামে জনৈক সন্দেহজনক ব্যক্তি যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই মর্মে খবর পাওয়া গিয়েছিল। এই সারদাই ছিলেন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা এবং আদাবাড়ি অস্ত্র মামলার পলাতক আসামি সারদাচরণ চক্রবর্তী। এই সময়কার আরো একটি খবরে জানা যায় যে, আলিপুর বোমা মামলায় অব্যাহতি-প্রাপ্ত

দুই অভিযুক্ত—শচীন্দ্রনাথ সেন এবং কুঞ্জলাল সাহা ও দেবব্রত বসু এবং তারাপদ বসু নামে অপর দুই ব্যক্তি যাঁরা নাংলা ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকারী অফিসারদের মধ্যে একজনকে হত্যা করার সঙ্কল্প করেছিলেন তাঁরা সকলে মিলে বেলুড় মঠে বসবাস করছিলেন। পরে ওই বছরের জুন মাস নাগাদ মঠে বসবাসকারী সন্দেহজনক ব্যক্তিদের খোঁজ করবার অছিলায় মঠের ভিতর পুলিশ যে-ভাবে তল্লাসি শুরু করেছিল তাতে মঠের আবাসিকবৃন্দ তীব্রভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তাঁরা নিজেরাই এইসব সন্দেহজনক মানুষের গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশকে অবহিত করার জন্য সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

তারপর থেকে ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মোৎসবের সময় পর্যন্ত বেলুড় মঠ সংক্রান্ত আর কোনো সংবাদ কর্ণগোচর হয়নি। এই বছরের উৎসবে প্রায় ৪০০ লোকের জমায়েত হয়েছিল। পুলিনবিহারী মুখার্জীর পরিচালনায় অধুনালুপ্ত অনুশীলন সমিতির সদস্যগণ এই উৎসবের সময়েও দরিদ্রভোজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক সন্দেহভাজন ব্যক্তিও এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। পুলিশের জনৈক ইনফর্মার জানিয়েছিলেন যে, এই সুযোগে অনুষ্ঠানের ধর্মীয় কৃত্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করবার জন্য এখানে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল।[১২] সভায় সকলে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং রাজধানী (কলকাতা থেকে দিল্লিতে) স্থানান্তরিত করে সরকার বাঙালিকে তার আপন রাজ্যে অবরুদ্ধ রেখে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। পুলিনবিহারী মুখার্জী ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার আপিলের রায় প্রকাশ হওয়া অবধি অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁরা আরো সুযোগ্য মানুষের সন্ধান করে তাঁদের সহায়তা নিয়ে নতুন করে এবং আরো জোরদারভাবে আন্দোলন শুরু করতে চান। অবশ্য এই সংবাদটি এখনো অবধি যাচাই করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত সংবাদটির মধ্যে কিছু সত্য রয়েছে বলেই ধারণা হয়। অন্তত এটিকে কোনোমতেই অগ্রাহ্য করা চলে না।

১৯১২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণর জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে আবার একটি বড়ো জনসমাবেশ হয়েছিল। এই সভাতে পুলিনবিহারী মুখার্জী আবারও উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সতীশ বসু এবং লিয়াকৎ হোসেনও উপস্থিত ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁর দলবল নিয়ে সভায় যে-গানটি গেয়েছিলেন তার বক্তব্য ছিল এই যে, জনগণকে এখন দেশসেবার জন্য এবং (প্রয়োজন হলে) জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

অবিভক্ত বাংলাদেশের (Bengal) কলকাতা, বরিশাল এবং ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের অনেকগুলি শাখা ছিল। এ-ছাড়া মুর্শিদাবাদের মহুলাতেও মিশনের একটি অনাথ আশ্রম ছিল। মহুলার অনাথ আশ্রমটি স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক ১৮৯৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এটি অদ্যাবধি তাঁরই পরিচালনাধীন রয়েছে এবং এটি যথানিয়মেই চলছে। এখানে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোকেদের আশ্রয় দেওয়া হত বলে তেমন কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারে কোথাও সে-রকম কিছু জানা যায়নি।

মিশনের কলকাতা শাখাটি বাগবাজারের ১২ এবং ১৩ নং গোপাল নিয়োগী লেনে অবস্থিত ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের পত্নীও এই শাখা নিবাসেই বাস করতেন। মিশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য *উদ্বোধন* নামে যে ধর্ম-বিষয়ক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করা হত তার অফিসও এই বাড়িতেই অবস্থিত ছিল। স্বামী সারদানন্দ এই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। দেবব্রত বসু তথা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এঁর অন্যতম সহকারী ছিলেন। ইনি আলিপুরে বোমা মামলায় অব্যাহতি-প্রাপ্ত অভিযুক্তদের মধ্যেও অন্যতম ছিলেন।

কলকাতা শাখাকেই কেন্দ্র করে ১৯০৪ সালে বাগবাজারের ১৭ নং বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতা এবং ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা কর্তৃক একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার গত বছর দেহান্ত ঘটে। খুব বৃহদায়তন না হলেও এই বিদ্যালয়টি কিন্তু এখনো টিকে আছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে মনে করতে ভালো লাগে যে, ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিতে এই বছর থেকে একটি মেডেল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০ বছরের নীচে যুবকদের দিয়ে গঠিত ফুটবল খেলার দলকেই এই মেডেল দেওয়া হবে।

১৯০৪ সালে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশন শাখাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগে এই শাখাটি বেলুড় মঠের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল — অসাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের (Unsectarian religion) প্রসার, দুর্গত ও অভাবী মানুষকে সাহায্যদান এবং জাগতিক প্রয়োজন মেটানোর মতো কিছু বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ। কিন্তু কয়েকটি বই বিক্রয় করা ভিন্ন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-চেতনা বিস্তার করার জন্য প্রায় কিছুই করা সম্ভব হয়নি। আসলে এই কেন্দ্রের সকল সদস্যই ছিলেন হিন্দু এবং তাই প্রতি রবিবার যখন তাঁরা মিলিত হতেন তখন কেবল নিজেদের ধর্ম বিষয়েই তাঁরা আলোচনা করতেন। অবশ্য দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের জন্য কেন্দ্রটি যথার্থই কিছু ভালো কাজ করেছিল এবং সেই অবসরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের উপরেই গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ হয়েছিল। তবে জানা গিয়েছে যে, মিশনের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও আপন ধর্মের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে মুসলমানদের পক্ষে মিশনে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। ১৯১০ সালে (এই শাখার চিকিৎসাকেন্দ্রে) ১৬৬ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছিল। ১৯১১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬৮ এবং বর্তমান বছরে জুন মাসের শেষ অবধি এখানে ১০৩ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়ে গিয়েছে। মিশনের বাড়ির ছাতটি ছিল টিন দিয়ে তৈরি। এটি মিশনের সেক্রেটারি পরমানন্দ দাশগুপ্তের দান করা জমির উপর নির্মিত হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করা চালের বিক্রয়লব্ধ টাকা, ব্যক্তিগত চাঁদা এবং এককালীন অর্থসাহায্য ও বরিশালে যাতায়াতকারী স্টিমারের যাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ ইত্যাদি নানা উপায়ে মিশনের অর্থভাণ্ডারটি গড়ে তোলা হয়েছিল। জানা গিয়েছে যে, ১৯১১ সালে মিশনের মোট আয় হয়েছিল ৭৫৭ টাকা ১১ আনা ১ পাই, যেখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৭৫ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই। কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হয়েছিল তার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। আয়-ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্য মিশন কর্তৃক প্রচারিত প্রায় প্রতিটি আবেদনপত্রের মুদ্রিত বাণীর সঙ্গে বড়োই বেমানান ছিল। এইসব প্রচারপত্রে লেখা থাকত —'ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ আর্ত

মানুষের শুকনো গলা চিরে এখন কেবলই খাদ্যের দাবিই উচ্চারিত হচ্ছে।' বরিশাল কেন্দ্রের বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন সরকারি চাকুরে। কিন্তু মিশনের স্থায়ী সদস্য না হলেও বেশ কিছু অবাঞ্ছিত লোকও এখানে যাতায়াত করতেন। বেলুড় মঠের প্রতিনিধিগণও মাঝে মাঝে এই কেন্দ্র পরিদর্শন করতে আসতেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের ঢাকা কেন্দ্রটি ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র (১৮৯৮) স্থাপিত হয়েছিল। দলবাজারের পরলোকগত বাবু মোহিনীমোহন দাঁশের বাড়িতে বেলুড় মঠের স্বামী প্রকাশানন্দ এবং বিরজানন্দ এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে বিশেষ কারো কোনো আগ্রহ না থাকায় এটি ১৯০৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৫ পৌষ (১৯০৭) জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক বাবু শশীমোহন বসাকের তদারকিতে এবং সরকারি সচিবালয়ে নিযুক্ত কয়েকজন কর্মচারীর উদ্যোগে এই মিশন কেন্দ্রটি আবারও খোলা হয়েছিল। পুনরুজ্জীবনের অল্প কিছুদিন পরেই এই শাখা কেন্দ্রটির সঙ্গে একটি সেবাশ্রমও যুক্ত হয়েছিল। এখানে প্রতি শনি ও রবিবারে অপরাহ্নকালীন সভা করা হত। সেবাশ্রমের পঙ্গু ও দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করার জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্যেই কিছু কিছু করে টাকা সংগ্রহ করতেন। তা ছাড়া খবর পাওয়া মাত্রই দুর্গত ও অসহায় মানুষদের সেবা করবার জন্য তাঁরা উদ্যোগী হতেন।

ধীরেন্দ্রনাথ সোম নামে বেলুড় মঠের জনৈক শিষ্য ১৯১২ সালের মার্চ মাসে ঢাকার নারায়ণগঞ্জেও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র খুলেছিলেন বলে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ যে, এই কেন্দ্রটি যাতে বেলুড় মঠের স্বীকৃতি লাভ করে সেই জন্য লিখিতভাবে একটি আবেদনও জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দুষ্কর্মে জড়িত রজনীকান্ত রায় নামক জনৈক বহু পরিচিত ব্যক্তি এই শাখা কেন্দ্রের সভাগুলিতে উপস্থিত থাকতেন।[১৩]

স্বা: অস্পষ্ট

তাং : ৯.৮.১৯১২

পূর্বোক্ত ক্ষুদ্রায়তন রিপোর্টটি পাঠ করার পর যে-কেউ এর অসামান্য গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। বস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে-সব অভিযোগ বা সন্দেহের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, সে-সব বিচার করে বড়োজোর এইটুকু ধারণা করা যায় যে, বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ এবং তাঁদের অনুবর্তী সন্ন্যাসীসমাজের মতাদর্শ, সেই আমলের রাজনৈতিক নেতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের কম-বেশি অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীদের অজ্ঞাতসারে এইসব রাজনৈতিক কর্মীরা কীভাবে মিশনের চত্বরে পরস্পর মাঝে মাঝেই মিলিত হতেন এবং মিশনের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত ভক্ত জনতার মধ্যে নিজেদের গোপন রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রচার করতেন সেই বিষয়ে এই রিপোর্টেই প্রথম তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বেলুড় এবং কলকাতার বাইরে বৃহৎ বঙ্গের দূরবর্তী মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলে, মিশনের অনুমোদন নিয়ে অথবা বহু ক্ষেত্রে বিনা অনুমোদনেই রামকৃষ্ণ

মিশনের অনেক শাখাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং এই শাখাকেন্দ্রগুলিতে বেলুড়ের কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে অনেক সময়েই রাজনৈতিক কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত বা রাজনীতির সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা ঘন ঘন যাতায়াত করতেন। আসলে ১৯০৮-০৯ সালে ঢাকার অনুশীলন সমিতি সহ আরো অনেক রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর এইসব সংগঠনের কর্মীরা গোপনে এবং নানা রকম ছদ্মনামের প্রতিষ্ঠান মারফত তাঁদের কর্মসূচি সচল রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এইসব ছত্রভঙ্গ রাজনৈতিক কর্মীদের একাংশ গ্রামাঞ্চলে মিশন-কেন্দ্রগুলির নিরাপদ আশ্রয়ে সমবেত হতেন। কোথাও কোথাও তাঁরা নিজেদের আখড়াগুলির সঙ্গে রামকৃষ্ণর নাম যুক্ত করে স্থানীয় লোকজনের কাছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতেন। ঢাকার কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশনে পাসোরা রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিল মিশনের সঙ্গে সংস্রবহীন অথচ রামকৃষ্ণর নামাঙ্কিত এই রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী একটি সমিতি। এটি এই অঞ্চলে, সাধুহাটির প্রমথনাথ মুখার্জী কর্তৃক স্বদেশি-প্রচার এবং লাঠিখেলা অনুশীলনের জন্য স্থাপিত হয়েছিল।[১৪]

পুলিশের স্পেশাল ডিউটি সুপারিনটেনডেন্ট আর্মস্ট্রং (J.E. Armstrong)-এর ২৪ এপ্রিল ১৯১৭-এর একটি রিপোর্টে অনুশীলন সমিতির 'তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন' (third quarterly report) থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে দেখানো হয়েছিল যে, এই বিপ্লবী সমিতিগুলি ধর্মীয় আদর্শের কথা আউড়িয়ে তাদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করত ('religion being exploited by the *Samiti* to further its own nefarious ends'.) এবং এই কাজে রামকৃষ্ণ মিশনকে কীভাবে ব্যবহার করা হত টেগার্টের রিপোর্ট থেকে তার একটি উদাহরণ সঙ্কলন করে তিনি নিজের রিপোর্টে (*An account of the revolutionary organization in Eastern Bengal with special reference to the Dacca Anushilan Samiti*, Parts I and II, Volume 1.) সংযোজন করেছিলেন।[১৫] বিপ্লবী মানসিকতায় জারিত গোটা পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে মিশনের অনুমোদিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অননুমোদিত গ্রাম আশ্রমগুলি কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, টেগার্ট ও আর্মস্ট্রং-এর দুটি রিপোর্টেই সে-কথা সবিস্তারে জানানো হয়েছে। টেগার্ট জানতেন যে, মফস্বলের দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে, কোন সংগঠন মিশনের বিনা অনুমোদনে মিশনের নাম ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লিপ্ত রয়েছে সে-সংবাদ মিশন কর্তৃপক্ষের রাখা সম্ভব ছিল না এবং তাঁরা এ-বিষয়ে যথার্থই কোনো খোঁজখবরও রাখতেন না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ সন্দেহ করত যে, মিশন তথা ধর্মের আশ্রয়ে রাজনীতির এই ব্যাপক প্রসার রোধ করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের তরফে হয়তো আন্তরিক প্রচেষ্টারই অভাব ছিল।

কিন্তু সরকার যাই সন্দেহ করুক না কেন এবং বিপ্লবীদের সম্পর্কে সন্ন্যাসীদের যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন, মিশন অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে (officially) তার সংগঠনকে রাজনীতির স্পর্শমুক্ত করে রাখতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ খবরের কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ভাঁড়িয়ে যারা রাজনীতি করে, সেইসব বিপজ্জনক ব্যক্তিদের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। 'জনসাধারণের প্রতি চেতাবনি' বা *A warning to the public* শীর্ষক এই লেখাটি ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা দেশের (Bengal) নাম করা সব দৈনিক পত্রিকাতেই প্রকাশিত

হয়েছিল। তা ছাড়া মিশনে যোগদানেচ্ছু কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যে রাজনীতির সম্পর্ক নেই এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্রেও তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার একটা নিয়ম এই সময় থেকে চালু করা হয়েছিল। এই অঙ্গীকারপত্রে লেখা হত — 'I do hereby solemnly declare that I am in no way connected with any society or body of men–individual or individuals, whom I know to cherish any unlawful political purpose or act in any unlawful way against the Government established by law in this country, nor do I cherish such a purpose or act in such a manner myself.'

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এইভাবেই মিশনকে রাজনীতির স্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

উত্তরভাগ

আলোচ্য ফাইলের (S.B.Bengal 8/9/1909) দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ ফাইলে গ্রন্থিত আর একটি মাত্র অবশিষ্ট রিপোর্টের বাংলা তর্জমা এইবারে পেশ করা হবে। এটির বিষয় দক্ষিণ ভারতের রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি শাখাকেন্দ্র। এইটি পাপারাও নাইডু নামে বাঙ্গালোর পুলিশের জনৈক ডেপুটি সুপার ১৯০৯ সালের ২৪ নভেম্বর রিপোর্টটি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছিলেন। প্রায় দেড় হাজার শব্দ সম্বলিত টাইপ করা এই রিপোর্টে অবশ্য কিছু মামুলি তথ্য ভিন্ন অন্য কোনো রকম অতিরিক্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয়নি। তবে রিপোর্টটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা পুলিশকে যেভাবে শাখাকেন্দ্র দুটির চারদিকে গোপন প্রহরা রাখতে হয়েছিল, তা লক্ষ করলে মিশন ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের প্রকৃত মনোভাবটি বোঝা যায়। রিপোর্ট প্রদানকারী ডেপুটি সুপার এই মনোভাবের কথা অকপটে ব্যক্ত করে লিখেছিলেন—'I have reason to suspect that these *maths*, some of them, may turn into political rendezvous, though at present they all appear to be innocent religious *Ashrams*'. প্রতিবেদনটির আখ্যানভাগ ছিল এই রকম :

'সবিনয় নিবেদন এই, যে বাঙ্গালোরে বাঙালি-পরিচালিত রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমানে দুটি মঠ রয়েছে। বাসাবান্নাগুড়ি শহর এলাকার মধ্যে অবস্থিত মঠটির পরিচালক ছিলেন নির্মলানন্দ এবং আলসুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মঠটি ছিল যোগীশ্বরানন্দর অধীন। আমি এই মঠ দুটি সম্বন্ধে বাইরে থেকে এবং ভক্তের ছদ্ম-পরিচয়ে এদের ভিতরে উপস্থিত হয়ে অনেক তথ্য অনুসন্ধান করে জানতে সফল হয়েছি।

'বাসাবান্নাগুড়ির নিকটবর্তী মিশনের সুন্দর পাকা বাড়িটির মূল্য প্রায় ছয় হাজার টাকা। বাঙ্গালোর শহর এবং মহীশূরের সাধারণ মানুষের দান সংগ্রহ করে এটি নির্মিত হয়েছিল। চাঁদা প্রদানকারীদের মধ্যে প্রাক্তন দেওয়ান শ্রীযুক্ত ডি.পি. মাধবরাও ছিলেন অন্যতম। মহীশূরের যুবরাজের প্রাক্তন গৃহশিক্ষক এবং বাঙ্গালোর সিটির অন্যতম ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত নরসিংহ আয়েঙ্গার মহাশয়ও এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই বাড়িটিতে একটি প্রশস্ত চত্বর ছিল এবং এটির নির্মাণকার্যে শ্রীযুক্ত কার্ভে নামক জনৈক মারাঠি ব্রাহ্মণ ও অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বিশেষভাবে তদারকি করেছিলেন। বাড়িটির কেন্দ্রীয় হলঘরে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দর দুটি ব্রোমাইড করা এনলার্জ ছবি ছিল। সাধারণ হিন্দু ভক্তদের মনে সম্ভ্রম সৃষ্টি করবার জন্য দুটি ছবিই যোগী সন্ন্যাসীদের মতো করে তোলা হয়েছিল।

'বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করার পর বিশুদ্ধানন্দ নামে আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী জনৈক সুদর্শন বাঙালি যুবার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। ইনি বেশ গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলতে পারতেন। নারায়ণ রাও নামে অন্য এক ব্যক্তি, যাঁকে আমি পুডুকোটা স্টেটে চাকরি নেওয়ার আগে একজন দক্ষ ক্রিকেটার হিসাবে চিনতাম, তাঁরই সম্পর্কে তখন বিশুদ্ধানন্দর কাছে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। ঠিক এই সময়েই নির্মলানন্দ নামে এক ব্যক্তি তখন সেই ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। এঁর বয়স আনুমানিক ৪০ বছর, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো এবং ঘাড়ের কাছে ছিল ঝুলে পড়া চুলের বোঝা। বিশুদ্ধানন্দ আমাকে নারায়ণ রাও-এর বন্ধু হিসাবেই নির্মলানন্দর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হলের ঠিক মধ্যস্থলে বিস্তৃত একটি ব্যাঘ্রচর্মের উপর উপবিষ্ট ভঙ্গিতে নির্মলানন্দ তখন আমাকে বলেছিলেন যে, নারায়ণ রাও মাত্র দুই বছর আগে বাঙ্গালোরের মিশনে এসে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি (অর্থাৎ নারায়ণ রাও) প্রায় সারাক্ষণই ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং সাধনমার্গে রীতিমতো এগিয়েও ছিলেন। তিনি মাথায় ও গালে লম্বা চুল ও দাড়ি রাখতেন। তিনভেলি ও অন্যান্য অঞ্চলে নির্মলানন্দর অনুপস্থিতির সময় এই নারায়ণ রাও-ই মিশনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। প্রায় এক সপ্তাহ আগে মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দর সঙ্গে দেখা করবার জন্য নারায়ণ রাও বেলুড়ের প্রধান কর্মকেন্দ্র অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। (শোনা যাচ্ছে যে) হয়তো খুব শীঘ্রই তাঁকে মঠের কোনো একটি শাখা কেন্দ্রেরও দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। মিশনের প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মানন্দ এখন পুরীতে রয়েছেন। কলকাতায় যাওয়ার পথে নারায়ণ রাও হয়তো তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে পারেন। নির্মলানন্দ আমাকে বলেছিলেন যে, আমেরিকাতে সব কয়টি মঠের দায়িত্ব অভেদানন্দর উপর ন্যস্ত থাকলেও বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দকে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে মনোনীত করায় তিনিই এখন পৃথিবীব্যাপী মিশনের তাবৎ কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।

'নির্মলানন্দ প্রতি শুক্র এবং রবিবারে মঠে সভার আয়োজন করে থাকেন। মিশন বাড়ির বাইরেকার নোটিশ-বোর্ড পড়ে জানা যায় যে, তিনি (অর্থাৎ নির্মলানন্দ) শুক্রবারের সভায় 'রাজযোগ' এবং রবিবারের সভায় 'ভগবদ্গীতা' বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। রাজ্যের কয়েকজন উচ্চ-পদাধিকারী অফিসার সমেত প্রায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশজন সদস্য এই সান্ধ্য সভাগুলিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। নির্মলানন্দ এবং বিশুদ্ধানন্দ নামে এই দু-জন ছাড়া এই বাড়ি বা এর চত্বরে আর কোনো বাঙালিকে আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু মঠের ভিতরে আমার স্বল্পকালীন অবস্থানের মধ্যেই আমি শ্রীযুক্ত কার্ভের ২৩ বৎসর বয়স্ক যুবা পুত্রকে তারই সমবয়স্ক দু-জন মারাঠি ব্রাহ্মণের সঙ্গে মঠে উপস্থিত হয়ে নির্মলানন্দকে নমস্কার জানাতে দেখেছিলাম। কিন্তু আমাকে নির্মলানন্দর সঙ্গে ব্যস্ত থাকতে দেখে তাঁরা সেখানে বেশিক্ষণ রইল না। মোট কথা নির্মলানন্দকে এখানকার সব মানুষই বিশেষ শ্রদ্ধা করে থাকে এবং খবর যা পাওয়া গিয়েছে তদনুযায়ী তিনি সরাসরি রাজনীতি বিষয়ে কখনো বাক্যালাপই করতেন না। নির্মলানন্দ আমাকে জানিয়েছেন যে, জেলাগুলি থেকে মানুষের ডাক পেলেই তিনি তাঁদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করে আবার এখানেই ফিরে আসতেন।

'আলসুর-এর মঠ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে নির্মলানন্দ জানান যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বর্তমানে এটির কোনো সম্পর্ক নেই। যোগীশ্বরানন্দ নামে মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী যিনি এক

সময়ে এই মঠেই অধিষ্ঠিত ছিলেন, এখন মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই এখানে আলাদা একটি মঠ খুলেছেন। কিন্তু তিনিও এটিকে রামকৃষ্ণ মঠ নামেই অভিহিত করে থাকেন। আমি তাই আলসুর-এর মঠটিও পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। এই মঠের বাড়িটিও আকারে খুবই সুদৃশ্য এবং এর নির্মাণকার্য তখন প্রায় শেষ হওয়ার মুখে ছিল। এটির সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড হলঘর ছিল এবং এর উপরতলাতেও একটি ঘর ছিল। জনসাধারণের কাছ থেকে প্রায় ৩০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত মারাপ্পা নামে কোলার স্বর্ণখনির জনৈক ঠিকাদার এটির নির্মাণকাজে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বাড়িটি এখনো বাসযোগ্য না হওয়াতে নিকটবর্তী একটি ভাড়া বাড়িতেই এখন মঠটির কার্যালয়। আমি যোগীশ্বরানন্দর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। এঁর বয়স প্রায় ৪০ বছর, মাথায় টাক এবং মুখমণ্ডল নিখুঁতভাবে কামানো। কিন্তু নির্মলানন্দ অপেক্ষা ইনি অনেক বেশি শক্তিশালী পুরুষ। ইনি আমাকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি বিবেকানন্দর সঙ্গে রামকৃষ্ণ আশ্রমে একত্র ছিলেন এবং আনুমানিক ১৯০৪ সাল অবধি নির্মলানন্দর সঙ্গেও অপরাপর মঠে একসঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন তবুও স্বামীজিদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গে তাঁর মতৈক্য হয়নি এবং সেই কারণে তিনি তাঁদের সাহচর্য ত্যাগ করে আলসুর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার লোকেদের সাহায্য নিয়ে এই স্থানেই একটি নতুন মঠ খুলেছেন। এখানে অবশ্য তাঁকে স্বহস্তে নিজের আহার্য প্রস্তুত করতে হয় না। মুদালিয়র নামে এক ব্যক্তিই আপাতত তাঁর আহার্যের জোগান দিয়ে থাকেন। যোগীশ্বরানন্দর প্রায় ৩০/৪০ জন শিষ্য তাঁকে মাসিক চার আনা থেকে দু-টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিয়ে নিয়মিত সাহায্য করে থাকেন। তিনি নারায়ণস্বামী মুদালিয়রের স্কুলে সপ্তাহে দু-বার করে সভার আয়োজন করেন এবং ডোডান্না সভাঘরে এখন নিয়মিতভাবে রামায়ণ পড়িয়ে থাকেন। যোগীশ্বরানন্দ আরো জানিয়েছেন যে, মঠের জন্য সংগৃহীত অর্থ কয়েকজন দায়িত্বশীল লোকের কাছে গচ্ছিত রাখা হয় এবং তাঁরাই মঠের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। খাওয়ার খরচ ছাড়া তাঁর নিজের জন্য কোনো টাকার প্রয়োজন হয় না। বস্তুত তিনি বিনা পারিশ্রমিকের একজন সন্ন্যাসী হিসাবেই কাজ করতে আগ্রহী। তিনি বলেছিলেন যে, সেকেন্দ্রাবাদ এবং মাদ্রাজে তাঁর কয়েকজন অনুরাগী বাস করেন এবং সে-কারণে তাঁকে প্রায়ই সেকেন্দ্রাবাদ যেতে হয়। গত বছর তাঁকে মাদ্রাজের পাচাপ্পা স্কুলে একটি বক্তৃতা দিতে যেতে হয়েছিল। কিন্তু মাইলাপুর কেন্দ্রে তাঁর কখনো যাওয়া হয়নি। বাঙ্গালোর শহরের লোকজন এবং এইসব মঠগুলির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে যে, আলসুরের এই দ্বিতীয় মঠটি প্রথমটির (অর্থাৎ বাঙ্গালোর মঠের) প্রতিযোগী এবং সাধারণ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী এই মঠের কাজে যোগীশ্বরানন্দ, নির্মলানন্দ অপেক্ষা ঢের বেশি উৎসাহী এবং উদ্যোগী। প্রথম মঠটির সঙ্গে যুক্ত জনৈক ভোলানন্দ বা বোধানন্দ বক্তৃতা করার জন্য সম্প্রতি বৌরঙ্গিপেট অভিমুখে যাত্রা করেছেন। ডা. হালুক (Dr. Hallook) এই দুটি মঠের কোনোটির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না।

'মায়াবতী থেকে প্রকাশিত অক্টোবর মাসের *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকার ১৯৪ পৃষ্ঠায় আমি বোম্বাইয়ের ক্রাউন ইলেকট্রিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডি.পি. মুখার্জী কর্তৃক লিখিত *দি লাইট অফ স্বদেশিজিম* (*The Light of Swadeshism*) নামে একখানি বই বিক্রির

বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। আমার সন্দেহ যে, বোম্বাই থেকে উধাও হয়ে যাওয়া যে-ব্যক্তির এখন আমরা খোঁজ করছি, ইনিই সেই লেখক—দেবীপ্রসাদ মুখার্জী। আমি এই বইটির একটি কপি আজ চেয়ে পাঠিয়েছি। এই পত্রিকার উক্ত সংখ্যার একই পৃষ্ঠায় অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতাবলী এবং আরো কতগুলি রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থের বিপণনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।

'এই বিজ্ঞাপনগুলি এবং তথাকথিত 'আনন্দ' নামধারী ব্যক্তিদের প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের প্রকাশিত কিছু কিছু অংশ অনুধাবন করার পর আমার এমন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে, আপাত-নিরীহ ধর্মীয় আশ্রম বলে মনে হলেও এই মঠগুলি অচিরেই রাজনীতি করার ডেরা হিসাবে পরিণত হতে পারে। আমি মাঝে মাঝেই বাঙ্গালোর ও মাইলাপুরের মঠগুলি পরিদর্শন করতে যাব এবং তখন এইগুলি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত রকমের রিপোর্ট পেশ করব।'

পাপারাও নাইডু-র নাতিদীর্ঘ রিপোর্টের এইখানেই সমাপ্তি। এটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, রিপোর্টটি কিছুটা অপটু হাতের রচনা। এখানে নির্মলানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, যোগীশ্বরানন্দ, নারায়ণ রাও প্রমুখ কয়েকজন সন্ন্যাসীর আশ্রমিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অনেক রকম তথ্য পরিবেশন করা হলেও বর্ণনার পদ্ধতি খুবই অসংলগ্ন এবং সংক্ষিপ্ত ধরনেরও বটে। এই রিপোর্টে মঠ ও রাজনীতির যোগাযোগ সম্পর্কে কেবলই সন্দেহের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সন্দেহের কথা প্রমাণ করার জন্য নিরেট কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়নি। ফলে এই রিপোর্টে, মিশন সম্পর্কে পুলিশের একাংশের নিছক সন্দেহবাতিকের মনোভাবটিই উদ্ঘাটিত হয়েছে। টেগার্টের রিপোর্টে যেমন মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল এমন অনেক রাজনৈতিক কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, সে-রকম কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা এখানে চোখে পড়ে না। তবে স্পেশাল ব্রাঞ্চের যে-ফাইলে এই রিপোর্টটি গ্রন্থিত ছিল সেখানে 'মন্তব্য ও নির্দেশ' (*Notes and Orders*) অংশের পৃষ্ঠাগুলির হস্তলিখিত অংশে এই রকম অনেক নাম এবং তাঁদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া রয়েছে। এ-ছাড়া প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী কর্মী এবং রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের যে বিপুল তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি খুঁটিয়ে পড়লেও এঁদের মধ্যে কাদের সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ ছিল, সেই বিষয়ে কিছু খবর জানা যেতে পারে।[১৬] কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যে রচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপিকা রত্নলেখা রায়-এর গবেষণাপত্রেও এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।[১৭]

সূত্র নির্দেশ

১) 'With the growth of national awakening and the formation of the Indian National Congress in 1885, the need for '*utilising in British India the services of the police forces and in native state the means at the disposal of the political officers, for the collection of intelligence on political, social and religious movements*', was felt more. Consequently Lord Dufferin, the then Viceroy of India, after a hurried consultation with the Provincial Governors, wrote to the Secretary of State for India... informing him of the setting up of the Central and Provincial Special Branches for the purpose noted above,... The Central Special Branch accordingly came into existence at SImla in January 1888, and simultaneously the provincial Special Branches at the provincial headquarters'.

দেখুন Samanta K. Amiya, *Terrorism in Bengal*, Vol.I., Calcutta, 1995, pp. xi, xii. (অতঃপর *T.I.B.* লেখা হবে)।

২) মুলার সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে উত্তরকালে তাঁর নানা বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছিল এবং সেই কারণে তিনি খ্রিস্টধর্মে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দ্রষ্টব্য Beckerlegge G., *The Ramakrishna Mission*, Oxford (New Delhi), 2000, pp. 180-201.

৩) স্বামী গম্ভীরানন্দ মিশনের দ্বিতীয় সাধারণ রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে মন্তব্য করেছেন যে, পুলিশের চর বেলুড় মঠের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উপর নজর রাখলেও ইংরাজ সরকার কিন্তু মিশনের সততা এবং আন্তরিকতা ('integrity and ...sincerity') সম্পর্কে খুবই নিশ্চিন্ত ছিল। সরকারের এই রকম ইতিবাচক মনোভাবের জন্য মিশন অন্তত ১৯০৮ সাল অবধি অনেকটাই নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে পেরেছিল। দ্রষ্টব্য : Swami Gambhirananda, *History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission*, Calcutta, 1983, p. 168 (অতঃপর এই বইয়ের নাম সংক্ষেপে *H.R.M.* লেখা হবে)। কিন্তু মিশন কর্তৃপক্ষ টের পাননি যে, পুলিশ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই মঠ ও মিশনের উপর তীক্ষ্ণ নজর (শ্রী অমিয় সামন্তর ভাষায় 'micro-level inquiry') রাখার ব্যবস্থা করেছিল। Bengal Police Intellignece Abstract – নোটস ও বিবরণীগুলিতে এই মতের সমর্থন মেলে।

৪) Swami Gambhirananda, *H.R.M.*, pp. 52-3.

৫) ইতিহাসের সত্য হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশে (Bengal) করণ-কায়স্থ ও অম্বষ্ঠ-বৈদ্য সহ ব্রাহ্মণেতর অপরাপর ছত্রিশ জাতিকেই শূদ্র হিসাবে গণ্য করা হত। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলকাতা, দে'জ সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ২৪৫-৭)।

৬) Swami Gambhirananda, *H.R.M.*, p. 69.

৭) Basu Sankari Prasad (ed.), *Swami Vivekananda in Contemporary Indian News*, 1893-1902, Vol.I., Calcutta, 1997, pp. 158-9.

৮) Basu Sankari Prasad and Ghosh Sunil Behari (ed.), *Vivekananda in Indian Newspapers*, 1893-1902, Calcutta, 1969, pp. 318-9.

৯) ঐ

১০) Basu Sankari Prasad (ed.), *Swami Vivekananda in Comtemporary Indian News*, pp. 158-9. বিবেকানন্দ, থিওসফিস্ট সম্প্রদায় ও অ্যানি বেসান্তকে কেন্দ্র করে যে

বাদ-প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মাধব দাস নামে জনৈক বেসান্ত-অনুরাগী ওলকটের *Old Diary Leaves*, Sixth Series, Appendix 13 থেকে 128-36 পৃষ্ঠার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে *দি হিন্দু* পত্রিকায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। 'Mr. Swamiji's Attitude Towards Theosophy' শীর্ষক এই চিঠিতে মাধব দাস বিবেকানন্দকে বক্র কটাক্ষ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: Basu Sankari Prasad (ed.), *Swami Vivekananda in Contemporary News*, pp. 136-8.

১১) যেমন মুর্শিদাবাদের সরগাছি আশ্রমের স্বামী অখণ্ডানন্দকে ভ্রষ্ট চরিত্রের মানুষ (man of loose morals) বলা হয়েছিল। নিবেদিতা সম্পর্কেও অরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছিল। আর স্বামী অভেদানন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তিনি আরাম করে জীবন কাটাবেন বলেই সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করেছিলেন।

১২) অবশ্য উর্ধ্বতন যে পুলিশ অফিসারের অবগতির জন্য এই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল তিনি কিন্তু পুলিশ ইনফর্মারের এই সংবাদটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেননি। রিপোর্টের বাম পাশে মার্জিনে তিনি এই বিষয়ে নিজের সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছিলেন : '*...in the math? highly improbable.*' অর্থাৎ মঠের অভ্যন্তরে এই রকম একটি রাজনৈতিক সভা হওয়া তাঁর মতে একেবারে অসম্ভবই ছিল।

১৩) ভারত সরকারের অফিস অফ দি ডিরেক্টর অফ ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স কর্তৃক ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত *Who's Who of Politico-Criminals in India, 1914*, শীর্ষক তালিকায় পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলার পরলোকগত হরি দাসের পুত্র জনৈক রজনী রায়-এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর এম.এম. ঘোষের হত্যা পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : *T.I.B., Vol. V.*, p. 979.

১৪) Samitis in Eastern Bengal and Assam, entry no. 13. *T.I.B.*, Vol. II, p. 886.

১৫) *ibid*, pp. 366-7.

১৬) (a) List of Political suspects in Bengal - Corrected upto the end of 1912, (b) Conviction Register upto the end of 1920, (c) The Politico-Criminal 'Who's Who' of the Bengal Presidency, Revised upto the 1st July 1930, (d) Who's Who of Politico-Criminals in India, 1914. দ্রষ্টব্য *T.I.B., Vol.V.*, pp. 459-1017.

১৭) Ray Ratnalekha, Ramakrishna Mission and the Indian National Movement : A Supplementary study, *Journal of History, V*, Jadavpur University, year of publication not given in the off-print.

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ফাইল ও রামকৃষ্ণ মিশন

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, গোয়েন্দা বিভাগে প্রাপ্ত হাওড়া জেলার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সম্বলিত আরো একটি গোপন ফাইল। এটি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ১৫ নং সংগ্রহ। ফাইলটির শীর্ষনাম Government of Bengal (I. B. Serial no. 38/1908) O. B. VIII/9/1909, Sub : Ram Krishna Mission, Belur, Howrah, Miscellaneous Information. এই ফাইলে মোটামুটি চার রকমের নথি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। নথিগুলি বিষয়ানুক্রমিকভাবে যথাক্রমে :

ক) গোয়েন্দা বিভাগের মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী বা Printed Intelligence Branch Abstract.

খ) পুলিশের সংবাদদাতা তথা ইনফরমার এবং ইন্সপেক্টরদের স্বহস্ত-লিখিত ও স্বাক্ষরিত গোপন রিপোর্ট।

গ) মিশন ও মিশনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের কর্তিত অংশ বা ক্লিপিংস। এইগুলির মধ্যে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট এবং বেঙ্গল ইন্টেলিজেন্স কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ সমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঘ) গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের পরস্পরের মধ্যে লিখিত 'মন্তব্য ও নথিলিখন' ('Notes and Correspondence')। এইসব নোটস-এর অনেকগুলিই কিন্তু স্বাক্ষরবিহীন অবস্থায় ছিল।

উপরোক্ত চার রকমের নথির মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের মুদ্রিত বিবরণী বা I.B. Abstract গুলিকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। এইগুলি প্রধানত মিশন ও মঠ বা তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব (Religious characters) এবং সাধারণ গৃহস্থ নাগরিকদের পিছু-নেওয়া পুলিশের বিক্ষিপ্ত রিপোর্টের সার-সঙ্কলন (Abstract)। রিপোর্টগুলি মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে, মিশনের সন্ন্যাসীদের উপর পুলিশের গোপন প্রহরা কেবলমাত্র বাংলা দেশে (Bengal) বা বেলুড়ের মিশন হেড-কোয়ার্টার্সেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই নজরদারির জাল গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। রিপোর্টগুলির মধ্যে প্রথমটি মাদ্রাজ সিটি থেকে ১৯০৬ সালের ২৩ আগস্ট প্রকাশিত (Accession no. 1041) হয়েছিল। আর সবচেয়ে সাম্প্রতিক বা শেষের রিপোর্টটি বেঙ্গল স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট থেকে ১৯১১ সালের ১৭ জুন তারিখে (Accession no. 2741) প্রকাশ করা হয়েছিল। ফাইলে মোট ২৪টি অ্যাবস্ট্রাক্ট দেওয়া আছে, এগুলির মধ্যে নিতান্ত পুনরুক্তিমূলক কয়েকটি বাদ দিয়ে অন্যান্য সব কয়টির যথাসম্ভব বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হল।

১৪০১. মাদ্রাজ সিটি, ২৩-৮-০৬ : এই মাসের ২২ তারিখের প্রত্যুষে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজে এসে পৌঁছিয়েছেন এবং অতঃপর এখান থেকে ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের মেল ট্রেন ধরে ওই সকালবেলাতেই পুরীর পথে যাত্রা করেছেন।

বাংলাদেশের (Bengal) স্পেশাল ব্রাঞ্চ মারফত জানা গিয়েছে যে, পুরীর পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে স্বামীজির এই যাত্রার কথা জানানো হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়ে অতিরিক্ত রিপোর্টের প্রত্যাশায় এখন অপেক্ষা করা হচ্ছে।[১]

১০৪৮. বেঙ্গল স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ১৫-৯-০৬, দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ নং ১০৪১ : রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অভেদানন্দ এই মাসের ৯ তারিখে হাওড়া রেল স্টেশনে এসে উপস্থিত হওয়ার পর কলকাতা পুলিশের থেকে নিম্নলিখিত রিপোর্টটি পাওয়া গিয়েছিল :

স্থানীয় নাগরিকদের মালিকানাধীন সংবাদপত্র এবং বহুল সংখ্যায় বিতরিত অন্যান্য প্রচারপত্রে স্বামী অভেদানন্দর কলকাতায় আগমনের সংবাদ ঘোষণা করা হলেও হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ৫০০ থেকে ৮০০-র বেশি অভ্যর্থনাকারীর সমাবেশ ঘটেনি। এঁদের মধ্যে যে-সব বিশিষ্ট নাগরিক তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন, তাঁরা হলেন *ইন্ডিয়ান মিরর* পত্রিকার বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন; টাকি, ২৪ পরগণার বাবু যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী; *বসুমতী* পত্রিকার বাবু জলধর সেন; ইন্ডিয়ান ট্রেজারিজ-এর ডেপুটি কন্ট্রোলার বাবু জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র।

স্বামীজিকে স্বাগত জানানোর জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়েছিল তার সদস্যদের মধ্যে একটি বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দর অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সরকারি কর্মচারী। এ-ছাড়া এমন কিছু লোকও ছিলেন যাঁরা কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সদস্য আবার কলকাতায় তাঁর (অভেদানন্দর) উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন (অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বামী অভেদানন্দর নীরব-সম্মতি ছিল বলেই পুলিশ বিশ্বাস করত)। মনে হয় কমিটির অরাজনৈতিক সদস্যদের ব্যাপারটা মনঃপূত না হওয়ার জন্যই সম্ভবত হাওড়া স্টেশনের সমাবেশে উপস্থিতির সংখ্যা কম হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির অগ্রগণ্য সদস্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত মিত্র নিজেও অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 'বন্দে মাতরম' সমিতির সদস্যরা সকলেই সদলবলে হাজির ছিলেন। *স্টেটসম্যান* পত্রিকার তরফে মি. রবার্টস সেদিনকার সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ট্রেনটি স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চকণ্ঠের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ট্রেন থেকে অবতরণ করা মাত্রই বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, স্বামী (অভেদানন্দ)কে মাল্যভূষিত করে গাড়ির দিকে নিয়ে যান। তাঁকে বিচারপতি শ্রীযুক্ত মিত্রের বাড়িতে নিয়ে তোলা হয় এবং এখানে ৯ তারিখের পুরো দিনটা কাটানোর পর তাঁকে ১০ তারিখে বাবু পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে আনা হয়। ১২ তারিখে তাঁকে টাউন হলে জন-সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছিল।

স্বামী অভেদানন্দর প্রকৃত নাম কালীচরণ চন্দ্র। এঁর ভাই বি.এল.চন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। তিনি স্থানীয় একটি খ্রিস্টান পরিবারের সদস্য হয়েও প্রায় ১৩ বছর আগে 'বেদান্ত-সোসাইটি'-তে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে বক্তৃতাও করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন একটি আধা রাজনৈতিক (quasi-political) সংগঠন। হাওড়ার বেলুড়ে এর প্রধান কর্মকেন্দ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন স্বামীজিদের দ্বারা পরিচালিত এর যে-সব

শাখা সংগঠন রয়েছে সেগুলি হল : ১) ক্যালিফোর্নিয়ার স্বামী রাম বা রাম তীর্থ; ২) স্বামী ত্রিগুণাতীত, ৪০ স্টেইনার স্ট্রিট, সানফ্রান্সিসকো; ৩) নির্মলানন্দ, ৬২ ওয়েস্ট সেভেন্টি-ফার্স্ট স্ট্রিট, নিউইয়র্ক; ৪) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ক্যাসল কের্নাম, ট্রিপ্লিকেন, মাদ্রাজ; ৫) স্বামী আত্মানন্দ ভুরেস্বামী, মুদালিয়র স্ট্রিট, ফোর্ট বাঙ্গালোর; ৬) স্বামী তুরীয়ানন্দ, বংশীবট, সংযুক্ত প্রদেশ; ৭) স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, কনখল, সাহারানপুর, আপার প্রভিন্সেস; ৮) স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব, এলাহাবাদ এবং ৯) স্বামী স্বরূপানন্দ, মায়াবতী, শাহগড়, আলমোড়া।

স্বামী অভেদানন্দ ভারত ভ্রমণে আসার পর তাঁর জায়গায় আমেরিকাতে স্বামী প্রকাশানন্দকে ১৯০৬ সালের ১৩ জুন তারিখে পাঠানো হয়েছিল। বেদান্ত-দর্শনের প্রচার এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে ভারতবর্ষের দাবি বা চাহিদা সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই বেদান্ত-সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কলকাতার ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনের কার্যালয় থেকে বেদান্ত সোসাইটির *উদ্বোধন* নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই পত্রিকায় সাধারণত রাজনৈতিক প্রসঙ্গই আলোচিত হত।

আমেরিকায় সুলভ এই বেদান্ত সোসাইটির দুটি জনপ্রিয় পত্রিকার নাম *দি গেলিক আমেরিকান* (দ্র. পরবর্তী অনুচ্ছেদ নং ১০৫৫) এবং *দি লস-এঞ্জেলেস*। সম্প্রতি এই দুটি কাগজেই ভারত-বিষয়ক কিছু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১০৮০. পুরী ১১-৯-০৬, দ্র. অনুচ্ছেদ নং ১০৪৮ : আমেরিকাস্থ বেদান্ত-সোসাইটির স্বামী অভেদানন্দকে স্বাগত-সংবর্ধনা জানানোর জন্য এই মাসের ৭ তারিখে সন্ধ্যা ৭টার সময় পুরী-র জিলা স্কুলের হলঘরে স্থানীয় উকিল এবং শহরের অন্যান্য অধিবাসীরা একটি সভায় মিলিত হয়েছিলেন। এই সভায় স্বামী অভেদানন্দ 'হিন্দু যোগী এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত-সোসাইটি' বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বাংলা দেশের (Bengal) স্থানীয় অধিবাসী এই স্বামীজিটি এখন ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষদের মধ্যে বেদান্ত-ধর্ম প্রচারের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। পুরীতে অবস্থানকালে ইনি কটকের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি উকিল, রায় হরিবল্লভ বোস বাহাদুরের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন।

১০৮১. বেঙ্গল স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ২২-৯-০৬ : এই মাসের ১২ তারিখে কলকাতার টাউন হলে স্বামী অভেদানন্দকে স্বাগত জানিয়ে যে গণ-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল সে-বিষয়ে নীচে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হল :

এই সমাবেশে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় প্রায় ১৫০০ জন লোক উপস্থিত হয়েছিলেন—এঁরা প্রায় সকলেই বাঙালি, যদিও অল্প কিছু সংখ্যক মাদ্রাজি এবং মাড়োয়ারিও সভায় হাজির ছিলেন। সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলি নিঃসন্দেহে অরাজনৈতিকই ছিল। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় স্বামী অভেদানন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, কলকাতা শহরে তাঁর উপস্থিতি এবং তাঁর উচ্চারিত উপদেশাবলী বর্তমান যুগের বিক্ষোভ ও বেদনাদায়ক মতবিরোধ সমূহ, যা হিন্দু সমাজে আত্মঘাতী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে এবং যার ফলে উদ্ভূত যে-বর্ণবিদ্বেষ (racial bitterness) ভারতবাসীর উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তা বহুলাংশে দূরীভূত হবে বলে তিনি আশা রাখেন।

স্বামী অভেদানন্দর মূলত অধ্যাত্মবিষয়ক বক্তৃতায় রাজনীতির প্রসঙ্গ একেবারেই উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতাই এটা একেবারে পছন্দ করেননি। ফলে তাঁরা অনেকেই আশাহত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত শ্রী মদনজিতও উপস্থিত ছিলেন। এই মদনজিৎ ছিলেন কাথিয়াবাড়ের জুনাগড়ের বাসিন্দা। তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় গোষ্ঠীর নেতা শ্রীযুক্ত গান্ধিই সেই স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জনৈক ভক্ত শিষ্য বাঙ্গালোরের কাছে তাঁকে কয়েক একর জমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বক্তৃতায় একবার উল্লেখ করেন। এই জমির উপরেই তাঁরা মিশনের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন বলে মনস্থ করেছেন। আমেরিকাবাসী কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করার এই কাজে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

অভেদানন্দর বক্তৃতাবলীর গোটা অংশই ১৩ তারিখের *বেঙ্গলী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ এখন বাবু পশুপতিনাথ বসুর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন।

২০১৮. পুরী, ২৫-১০-০৬ : পুরী টাউন পুলিশ থানার জনৈক সাব-ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন যে, একজন অজ্ঞাতপরিচয় আমেরিকান ভদ্রলোক পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বাবু অটলবিহারী মৈত্রের বাড়িতে কয়েকদিন যাবৎ বসবাস করছেন।

এই ভদ্রলোক নাকি হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়ে এবং গুরুদাস নাম গ্রহণ করে এখন সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করছেন। ইনি স্বামী অভেদানন্দর শিকাগো শিষ্যবর্গের অন্যতম। ইনি সম্প্রতি জগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরীতে এসেছেন, তবে এখনও অবধি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। পুরীর টাউন ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন যে, তিনিও নাকি জনৈক সন্ন্যাসী সমভিব্যাহারে এই গুরুদাসকে নগ্ন পদে পুরী শহরের অভ্যন্তরে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখেছিলেন। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন যে, এই ব্যক্তিটি এবং তাঁর অপরাপর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় যাবতীয় খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন এবং এই বিষয়ে কিছু জানা গেলেই তিনি যথাবিধ রিপোর্ট করবেন।

১১৫৯. আগ্রা পুলিশ রিপোর্ট নং ৪২, তাং ২০-১০-১৯০৬ : আগ্রার হিন্দু অধিবাসীরা জনৈক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ অভেদানন্দকে) যে-অভিনন্দন পত্র প্রদান করেছিলেন এবং যাঁর আসন্ন বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জনসাধারণের মধ্যে যে-প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল, সেগুলির কয়েকটি কপি দাখিল করা হল। এই ব্যক্তির বক্তৃতা শুনতে সভায় প্রায় ৩০০ মানুষের জমায়েত হয়েছিল। বক্তা ভাষণ দেওয়ার অবকাশে মন্তব্য করেন যে, হিন্দু মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই স্থানে (অর্থাৎ আগ্রাতে) একটি স্কুল খোলা খুবই দরকার এবং এর জন্য এখন থেকেই টাকা জোগাড় করাও প্রয়োজন। এই রকম আবেদনের ফলে ঘটনাস্থলে প্রায় তদ্দণ্ডেই ১০০০/১২০০ মতো টাকা সংগ্রহ করা গিয়েছিল।

সংযুক্ত প্রদেশের (U.P.) গোয়েন্দা বিভাগ একটি সংক্ষিপ্ত নোটে জানিয়েছে যে, উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিটি আমেরিকাতে [illegible]গারো বছর কাটিয়ে সম্প্রতি গত জুলাই মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কলকাতা ও মাদ্রাজে তাঁকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলির পূর্ণ বিবরণী *অ্যাডভোকেট* এবং *দি ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ*

পত্রিকায় ইতিমধ্যেই ছেপে বেরিয়েছে। ইনি এখন ধর্ম এবং হিন্দুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কাজে গোটা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে ব্যস্ত রয়েছেন। ইনি খুবই প্রভাবশালী লোক। এঁকে খুব সাবধানে চোখে চোখে রেখে এঁর সমুদয় কাজের গোপন রিপোর্ট পাঠানো দরকার।

৩০৭. পাটনা, ১৫-২-০৮ : পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনের স্মরণোৎসব পালন করার জন্য নেয়াতলার অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুলে ২৫ জানুয়ারি তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জজ কোর্টের উকিল, বাবু কেদারনাথ এই সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। বাবু মথুরানাথ সিংহ এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এই সভায় বক্তৃতা করেন।

১৮৮৭. হাওড়া, ১০-৯-০৮, দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ নং ১৬৩৬ : উলুবেড়িয়া পুলিশ থানার অন্তর্গত ফুলেশ্বরের মৃত বাবু প্যালারাম ঘোষ ওরফে পিয়ারীমোহন ঘোষের পুত্র বাবু তিনকড়ি ঘোষ একজন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং উলুবেড়িয়া সিভিল কোর্টের সব থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবীগণের অন্যতম। ইনি তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করার জন্য সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। ইনি উলুবেড়িয়ার আর্য ধর্মসভা, ডিবেটিং ক্লাব এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখাকেন্দ্র ইত্যাদির সদস্য ছিলেন। ফুলেশ্বরের আর্য অনুশীলন সমিতিতে ইনি নিয়মিত দান ও চাঁদা পাঠাতেন। উলুবেড়িয়ার লোন অফিস এবং স্বদেশি বিক্রয়কেন্দ্রেও এঁর বেশ কিছু শেয়ার রয়েছে। ইনি বেশ বিত্তশালী এবং সম্পন্ন জমিদার ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অনুগামী।

স্বামী অভেদানন্দর পূর্বাশ্রমের নাম কালীচরণ চন্দ্র। কলকাতার গরানহাটা অঞ্চলের ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষক পরলোকগত বাবু রসিকলাল চন্দ্রের এই পুত্রটি ১৮৬৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অভেদানন্দ ওই সেমিনারিতেই শিক্ষা লাভ করে প্রবেশিকা শ্রেণী (entrance class) অবধি পড়াশোনা করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে যাতায়াত করতেন এবং অচিরেই তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি বেদান্ত-দর্শন পাঠ করে ক্রমশ একজন ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। অতঃপর তিনি আমেরিকায় গিয়ে বেশ কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানও পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং এইভাবে দশ বছর কাটানোর পর অবশেষে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তারপর ভারতে প্রায় চারমাস অবস্থান করার শেষে আনুমানিক দুই বছর আগে আবার আমেরিকাতে ফিরে যান। তিনি বেদান্ত-দর্শন প্রচার করে বেড়াতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দর পরলোকগমনের পর স্বয়ং নিউইয়র্কে বেদান্ত-সোসাইটির কর্মাধ্যক্ষ হন। বর্তমানে তাঁর বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি অকৃতদার এবং তাঁর ভ্রাতাদের সংখ্যা সম্ভবত তিন বা চার। এঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ এবং কলকাতার একজন নেটিভ খ্রিস্টান বাবু বিহারীলাল চন্দ্র কলকাতার রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। তাঁর আর এক ভাইয়ের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র। কিন্তু অপরাপর ভাইদের নাম নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে তাঁরা সকলেই এখনো জীবিত আছেন।

৩৫৭. বেঙ্গল স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ২০-২-০৯ : সম্প্রতি নিশ্চিতরূপে জানা গিয়েছে যে, বাখরগঞ্জের কাউখালি পুলিশ থানার অন্তর্গত আমড়াজেরির সতীশ ওরফে গঙ্গানন্দ নামে জনৈক আঠারো বছর বয়সী যুবক ১৯০৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ নাগাদ পুরীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইনি পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজি মহারাজের আশ্রমে দশ দিন কাটানোর পর এখন জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি উকিলের 'শশী নিকেতন' নামক বাড়িতে উঠে এসেছেন। সতীশ রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সদস্য এবং তিনি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তিনি ইংরেজি জানেন। বিগত ১০ জানুয়ারি তারিখে তিনি পুরী ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী হলেন পুরীর উকিল হরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর ভাই। জানা গিয়েছে যে, তিনি স্থানীয় ভিক্টোরিয়া ক্লাবের একজন সদস্য এবং ওই ক্লাবের ম্যানেজার বাখরগঞ্জ জেলার বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরা দু-জনে যখনই ক্লাবে মিলিত হতেন তখনই 'স্বদেশি', 'বয়কট' ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয়েই আলোচনা করতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটি কুকুর আছে, তার নাম কার্জন। বিগত জানুয়ারি মাসের শেষদিকে একদিন যখন তিনি জনৈক সতীশচন্দ্র দাস ও তাঁর ভিক্টোরিয়া ক্লাবের ম্যানেজার বন্ধুটির সঙ্গে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় পুলিশের শাদা পোশাকের একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁর কার্জন নামের কুকুরটিকে নিয়ে ওই সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। আরো জানা গিয়েছে যে, আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিজয় ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রর একজন বন্ধু এবং তিনি জ্ঞানেন্দ্রকে বোমা বানানো শিখিয়েছিলেন। বিজয়, জ্ঞানেন্দ্রকে বোমা তৈরির কিছু উপকরণেরও সন্ধান দেন। জেলে রাজসাক্ষী হত্যার ঠিক আগের দিন জ্ঞানেন্দ্র আলিপুরে গিয়ে বিজয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পরেই তিনি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যান। জ্ঞানেন্দ্র সম্প্রতি ম্যালেরিয়াতে ভুগছেন এবং সেই কারণে চিকিৎসার্থে কলকাতায় এসেছেন। কলকাতায় তাঁর ঠিকানার সন্ধান করা হচ্ছে।

জ্ঞানেন্দ্র সম্পর্কে বিশদ বিবরণীতে (Descriptive Roll) লেখা আছে—বয়স ২৫ বছর, লম্বা, মাঝারি গড়ন ও গায়ের রঙ কালো। অল্প একটু গোঁফ আছে, কিন্তু দাড়ি নেই। স্পষ্ট এবং দীর্ঘ নাসা, বিচ্ছিন্ন ভ্রূ-যুগল, নীচের ঠোঁট বেশ মোটা, চোয়ালের কোণ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ চিবুক, আয়ত চক্ষু এবং লম্বা ধরনের কানের লতি।

পুলিশ-রিপোর্ট মোতাবেক পুরীর তিন নম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তি হলেন মাদ্রাজ-নিবাসী বিজয়গোপাল রাজ। তিনি একজন হাতুড়ে চিকিৎসক এবং নিজেকে উপদংশ রোগের বিশেষজ্ঞ বলে জাহির করতেন। ইনি কালিকাদেবী শাহী এলাকায় বাস করেন। পুলিশের রিপোর্টে এঁকে একজন পাঁড় মাতাল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এঁর কালো লম্বা চুলের গোছা ঘাড় বেয়ে পিছনের দিকে নীচে নেমে গিয়েছে, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, দাড়ি-গোঁফ আছে, গায়ের রঙ শ্যামলা, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং বেশ শক্তপোক্ত গঠন। বাতের অসুখের জন্য এঁর বাঁ পা-টি একটু ফোলা। সাধারণত একটা হলুদ রঙের র‍্যাপার পরে থাকেন।

৮২. বেঙ্গল স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ৯-১-০৯ : রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা পুরীতে গেলে সাধারণত ভদ্রকের জমিদার রামকৃষ্ণ বোসের বাড়িতে গিয়েই ওঠেন এবং মাঝে মাঝে পুরীর সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্রর বাড়িতেও অবস্থান করেন। এইসব সন্ন্যাসীরা পাতিকুড়

স্টেটের কেন্দ্রে, কৃষ্ণ প্রসাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কর্মে কয়েক মাস নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা গাঞ্জামের রঙাতেও মাস কয়েক কাটিয়ে এসেছিলেন। এইখানে সম্ভবত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু অটলবিহারী মৈত্রর উদ্যোগে তাঁরা দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজে সরকারের সঙ্গেও সহযোগিতা করেছিলেন।

এই সন্ন্যাসীরা 'স্বরাজ' প্রচারের কাজেও যুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ হয়। কলকাতার বাগবাজারের জনৈক রাখালচন্দ্র ঘোষ ওরফে মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী এই সকল সন্ন্যাসীদের নেতা। এঁকে সাধারণত 'মহারাজ' বলেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে। ইনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য এখন মাদ্রাজে গিয়েছেন। তবে সেখান থেকে তিনি আবার পুরীতেই ফিরে আসবেন বলে কথা আছে। তাঁর অন্যতম অনুগামী বরিশাল-নিবাসী গঙ্গারাম এখনো পুরীতেই অবস্থান করছেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত কয়েকজন স্বামীজিও প্রায়শই পুরীতে যাতায়াত করেন:

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী, গঙ্গারাম স্বামী এবং সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ভারতী স্বামী।

কটকেও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র আছে। বাবু গোপাল প্রহরাজ, বি.এ., বি.এল., এই কেন্দ্রের সেক্রেটারি। বাঙালি ও উড়িষ্যাবাসী মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন এই কেন্দ্রের সদস্য। গরিব ছেলেদের শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহের জন্য এই কেন্দ্রের সদস্য-ছাত্রগণ ভিক্ষা করে অর্থসংগ্রহ করে থাকে। এই ছাত্ররা আবার তাদের আখড়ায় একত্র জিমন্যাস্টিকেরও চর্চা করে।

কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত নামে ফার্স্ট এনট্রান্সে অকৃতকার্য হওয়া জনৈক ছাত্র বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েক মাস কাটানোর পর তিনি এখন আবার কটকে ফিরে এসেছেন। অর্থসংগ্রহের জন্য কটকের এই কেন্দ্রটি ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ একটি অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নামে পোস্টাফিসের জনৈক কেরানিবাবুর বাড়িতে ১৯০৯ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে, এই কেন্দ্রের সদস্যগণ দরিদ্রভোজনের আয়োজন করেছিলেন। অদ্যাবধি এই কেন্দ্রের দশজন সদস্যর নাম জানা গিয়েছে। এঁরা হলেন — কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বৈরাগী মিত্র, কৈলাশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বৃন্দাবন সেনগুপ্ত, হরিকৃষ্ণ রায়, হরিবল্লভ ঘোষ, সত্যকুমার রায়, হরিপদ ব্যানার্জী (উকিল) এবং গোপাল প্রহরাজ।

৬৩৬. হুগলি, ২৬-২-১০ (হুগলি) : ট্রেনিং-একাডেমির প্রধান শিক্ষক এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তৌজি কেরানি 'অনাথ ভাণ্ডার'-এ (the Poor Fund) অর্থসংগ্রহের জন্য ছেলেদের কাজে লাগানো উচিত হবে কিনা সেই বিষয়ে পুলিশ সুপারের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। পাটনা কলেজের অধ্যাপক আশুতোষ চ্যাটার্জী, *বার্তাবহ* পত্রিকার সম্পাদক দীননাথ মুখার্জী, উকিল সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং ভূমি-রাজস্ব বিভাগের তৌজি কেরানি প্রভাসচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রমুখ অন্যান্য সকলে ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে এই 'অনাথ ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গরীবদের সাহায্য দান করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ট্রেনিং-একাডেমির প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ গাঙ্গুলী এই প্রতিষ্ঠানের কাজে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। জনসাধারণ ও ছেলেদের মাধ্যমে এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থ ও চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। এইভাবে গড়ে প্রতি মাসে ৫ থেকে ৭

টাকা এবং ৫/৬ মন চাল সংগ্রহ করা হত। নিম্নলিখিত বালকেরা এই কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিল — খেকশিয়ালির এম.এ. পাঠরত ছাত্র লক্ষ্মীনারায়ণ চ্যাটার্জী; প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র ধীরেন্দ্রনাথ নিয়োগী; শ্যামবাবু ঘাটের বাসিন্দা, দশম শ্রেণীর ছাত্র পরেশনাথ ধর; হুগলি কলেজের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র ও খেকশিয়ালির বাসিন্দা যজ্ঞেশ্বর চ্যাটার্জী; ট্রেনিং-একাডেমির সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্র ও খিড়কিগলির বাসিন্দা শঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য; হুগলি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র, চৌমাথার রাধারমণ দত্ত এবং ফ্রি চার্চ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র, চৌমাথা এলাকারই বাসিন্দা প্রভাসচন্দ্র সাধু।

পুলিশ সুপার এদের সকলেরই নাম স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে জেলাশাসকের নিকট থেকেই এই বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ ও আদেশ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২৪. বেঙ্গল স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট, ১৪-১-১১ : নিম্নে সংযুক্ত প্রদেশের গোপন বিবরণী, (United Provinces Secret Abstract) নং ১, তাং ৭ জানুয়ারির একটি অনুচ্ছেদের অগ্রিম কপি পেশ করা হল। এটি বেনারস, নং ৫২, তাং ৩১-১২-১০ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে:

> হাওড়ার বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দর শিষ্য তেজনারায়ণ ব্রহ্মচারী, বেলুড় মঠে ব্রহ্মানন্দর অপর এক শিষ্য সিয়ারাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে এখানে এসে উঠেছেন। নদীয়া শান্তিপুরের অধিবাসী তেজনারায়ণের প্রকৃত নাম বামিন্দ্রনাথ মুখার্জী। সিয়ারাম জানিয়েছেন যে, তিনি তাঞ্জোরের কামানগঞ্জ পুলিশ থানার অন্তর্গত কামানগঞ্জের সুন্দররাম নামক জনৈক মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের সন্তান। তেজনারায়ণ এবং সিয়ারাম উভয়েই এখন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বাস করছেন।
>
> *বিশদ বিবরণ* : তেজনারায়ণ — ২৫ বছর বয়স, লম্বা, রোগাটে ফরসা এবং লম্বা মুখ। সিয়ারাম —২৬ বছর বয়স, বেঁটে, রোগাটে, শ্যামবর্ণ এবং লম্বাটে মুখ।

৫০৮. বেঙ্গল অ্যাবস্ট্রাক্ট, ৬-২-১১ : কলকাতা পুলিশের জনৈক অফিসার ১৯১১ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দর ৪৯-তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত রিপোর্টটি পেশ করেছিলেন। রিপোর্টটি যেদিন জমা পড়ে সেই দিনই ওই অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল। বেলা ১২.৩০ থেকে বিকেল ৪.৩০ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি চলেছিল। রিপোর্টটি হল :

কলকাতা শহরের প্রায় ৬০০ জন সম্ভ্রান্ত নাগরিক এবং প্রায় সমসংখ্যক ভিক্ষুক ও নিম্ন শ্রেণীর লোক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। এ-ছাড়া প্রায় ২০ জন মারাঠি এবং মাদ্রাজি যুবকও অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দর অনুগামী কয়েকজন আমেরিকান মহিলা এবং ফ্রান্সিস জন আলেকজান্ডার নামক জনৈক ভদ্র যুবাকেও এই সময় বেলুড় মঠের স্বামীজির দলে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। অভ্যাগতদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরও দেখা গিয়েছিল:

১) যোগেন ঠাকুর (দ্রষ্টব্য ১৯১০ সালের বেঙ্গল অ্যাবস্ট্রাক্টের ১৫৩১ নং অনুচ্ছেদ) — প্রায় ৩০ জন যুবক ও বালকের একটি দলকে নিয়ে ইনি রান্না ও পরিবেশনের দায়িত্বে নিযুক্ত

ছিলেন। এইসব বালক ও যুবক সমভিব্যাহারে তিনি গতবারের গঙ্গাসাগর মেলাতেও যোগ দিয়েছিলেন।[২]

২) উৎসব উপলক্ষে যে-ঘরে বিবেকানন্দর ছবির প্রদর্শনী হচ্ছিল সেখানেও কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটির বেশ কয়েকজন যুবা সদস্যর জমায়েত দেখা গিয়েছিল।

৩) অনুশীলন সমিতির অমৃতলাল গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র কর, পান্নালাল বসাক, কামাখ্যানাথ গুপ্ত এবং পুলিনবিহারী মুখার্জী প্রমুখ সকলেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তবে অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে এঁরা সেই সময় মেলামেশা করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই নাম জানা যায়নি। এ-ছাড়া আর যে-সব সন্দেহজনক ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন:

ক) কানাইলাল ঘোষাল : ইনি কাঁধে কম্বল চড়িয়ে সাধুর মতো পোশাক পরে সর্বদাই যুবকদলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেন।

খ) নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী : ইনি 'যুবক মণ্ডলী' নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গরীবদের মধ্যে অন্ন বিতরণের কাজে এঁকে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল।[৩]

গ) কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ : লক্ষ্মী প্রেসের সঙ্গে যুক্ত এই লোকটিকে সর্বদা সব জায়গাতেই দেখা যেত।[৪]

ঘ) তারাপদ বোস : খুলনা থেকে আগত এই স্বেচ্ছাসেবক ভদ্রলোকটি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে থাকতেন। শোনা যায় যে, ইনি নাকি স্বামী বিবেকানন্দর অনুগামী হয়েছিলেন। এঁর সম্পর্কে বেঙ্গল অ্যাবস্ট্রাক্টের ৪৯১ নং অনুচ্ছেদে আরো অনেক সংবাদ দেওয়া হয়েছে।[৫]

ঙ) শচীন সেন ও দেবব্রত বসু : এঁরা দু-জনেই বেলুড় মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের সম্পর্কে ১৯১০ সালের বেঙ্গল অ্যাবস্ট্রাক্টের যথাক্রমে অনুচ্ছেদ নং ৪৩০৩ এবং ৪০৭০-এ আরো অনেক রকম সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।[৬]

পূর্বে উল্লিখিত আমেরিকান ভদ্রলোক আলেকজান্ডারকে, দেবব্রত বসু শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি (অর্থাৎ আলেকজান্ডার), পশ্চিমের জনসাধারণ কর্তৃক বিবেকানন্দ কি বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন সেই বিষয়ে উপস্থিত প্রায় ৩০০ জন শ্রোতার কাছে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দর বিদ্যাবত্তা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী সম্পর্কে অতীব মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে ভাষণ দেওয়ার সময় এ-কথাও বলেন যে, বিবেকানন্দ একটি ব্যাপারে পাশ্চাত্যবাসী জনগণের মহা উপকার সাধন করেছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীর কাছে এ-যাবৎ যাঁরা কিছু লেখা বা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই অজ্ঞতাবশত অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এই দেশ সম্পর্কে অসত্য এবং বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ বিষয়ে পশ্চিমের মানুষদের মনে লালিত সেই সব ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছিলেন। আলেকজান্ডার বেদান্ত-দর্শন সম্পর্কেও উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমের মানুষ এবং বিশেষ করে আমেরিকাবাসীরা বেদান্তের মর্মকথা এখন এত গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, তাঁর মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রতিটি শহরেই বেদান্তের আদর্শ প্রচারিত হবে। আলেকজান্ডারের ভাষণ বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অভিনন্দিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সম্প্রতি জানা গিয়েছে, তেজনারায়ণ ব্রহ্মচারী নামে আনুমানিক ত্রিশ বছর বয়সী জনৈক ব্যক্তি, স্বামী

বিবেকানন্দর আদর্শ ও ধর্মের প্রচার করার উদ্দেশ্যে খুব শীঘ্রই আমেরিকা যাত্রা করবেন বলে স্থির হয়ে আছে। তেজনারায়ণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। তিনি বেলুড় মঠের একজন আবাসিকও বটে।

৫৯৫. মাদ্রাজ অ্যাবস্ট্রাক্ট, তাং ১১-২-১১, অনুচ্ছেদ নং ১৬১, সি.আই.ডি., ৩১-১-১১: মাইলাপুরের রামকৃষ্ণ হলে গতকাল স্বামী বিবেকানন্দর ৪৯-তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল। এতদুপলক্ষে প্রথা অনুযায়ী সকালের দিকে দরিদ্রভোজন এবং অপরাহ্নে ভজন গানের আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে আমেরিকা-নিবাসী মাইরন ফেল্পস-এর সভাপতিত্বে যে জনসভার আয়োজন করা হয় সেখানে বিপুল লোকসমাগম হয়েছিল। এই সভায় শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরঙ্গা রাও-এর ভাষণ দেওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তিনি উপস্থিত থাকতে না পারায় সভাপতি (অর্থাৎ মাইরন ফেল্পস) স্বামী বিবেকানন্দর জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিভাষণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন।

ভারতবর্ষে নবজাগরণের জন্য যে-সব কাজ শুরু করা উচিত সেই বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, সন্ন্যাসীসমাজের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উন্মেষ ঘটানোর জন্য স্বামীজি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা এবং তাদের দারিদ্র্য সম্পর্কে তিনি সব সময়েই গভীরভাবে চিন্তা করতেন। এই কারণেই স্বামীজির কর্মসূচিতে সন্ন্যাসীদের কেবল নীতিশাস্ত্র নয়, পক্ষান্তরে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিষয় সমূহেও প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ন্যাসীগণ দিবাভাগে মাঠের মধ্যে উপস্থিত হয়ে এবং সন্ধ্যার সময়ে লোকের বাড়ি বাড়ি হাজিরা দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করবেন বলে ভাবা হয়েছিল। এমন একটি সহজ ও বাস্তবানুগ আদর্শ যদি যথার্থই কাজে রূপায়িত করা যেত তা হলে একটি সত্যিকারের বড়ো পরিকল্পনা নির্মিত হতে পারত। বক্তা আরো বলেন যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত ঐক্য কেবল ধর্মীয় ভিত্তির উপরেই গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু ধর্মীয় আচার ও আচরণের ক্ষেত্রে এখন যে সর্বতোমুখী অবক্ষয়ের লক্ষ্মণ প্রকাশ পাচ্ছে তা যথার্থই বেদনাদায়ক। হিন্দুধর্মের মূল আদর্শগুলি সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ-সবের একমাত্র কারণ। ভারতবর্ষের ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃতর চর্চায় অবহেলার কারণেই এমনটি ঘটে চলেছে। বক্তা সখেদে বলেন যে, প্রায় ১৬০০ জন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৫২ জন সংস্কৃতর ছাত্র। এমতাবস্থায় এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণশক্তিই বিনষ্ট হতে বসেছে। সুতরাং ছাত্রসমাজকে এখন থেকেই সংস্কৃত শিক্ষায় অনুরাগী করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। লর্ড কার্জন যেভাবে ভারতরাসীর নিজস্ব শিক্ষাধারার প্রসারে সযত্ন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তার জন্য ভারতবাসী মাত্রই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। আসলে ভারতবর্ষে জনস্বার্থে কাজ করার মতো মানসিকতা বিশেষ গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন সেইসব মানুষদেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যাঁরা সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। এই একটিমাত্র এষণার শক্তিতেই আজ আমেরিকা এত বড়ো হতে পেরেছে। ভারতবর্ষর এখন উপলব্ধি করা দরকার যে, আপন ধর্ম সম্পর্কে যথোচিত চর্চা বা অনুশীলন ব্যতিরেকে এই ধরনের হিতৈষণার বোধ কিছুতেই সঞ্চারিত হতে পারে না। এই হিতৈষণাই ভারতবর্ষের ধর্মের মূল বাণী এবং

তার সেবাধর্মেরও গোড়ার কথা। বক্তা আক্ষেপ করে বলেন যে, স্বামীজি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পরিকল্পনার রূপায়ণ দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু ভারতবাসীর এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, স্বামীজির জন্যই প্রধানত এ-দেশের এই নবজাগরণ সম্ভব হতে পেরেছে। তাই তিনি যে-কাজের সূচনা করে গিয়েছেন তার ঐতিহ্য ও ধারাকে বাঁচিয়ে রাখাই হবে ভারতবাসীর একমাত্র পবিত্র কর্তব্য। আগামীদিনে তাদের আরো কী করণীয় রয়েছে, সে-কথাও ভারতবাসীর জানা দরকার। আসলে শ-য়ে শ-য়ে এবং হাজারে হাজারে ভারতবাসী এই আন্দোলনে সামিল হতে পারলে তবেই এ-দেশের পুনরভ্যুদয় সম্ভব হতে পারে। আপন বিশ্বাসের প্রতি অবিচল আস্থা এবং দৃঢ় সঙ্কল্প একদিন পথের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করবেই। জীবসেবা এবং দারিদ্র্যব্রতই হল ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন আদর্শ এবং এই দ্বিবিধ পন্থাই হল মানব কল্যাণের পরম নির্ভরস্থল। বক্তা এই বলে শেষ করেন যে, তিনি নিশ্চিত জানেন, এই দুটি মহান আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ভারতবর্ষ পুনরায় তার শ্রেষ্ঠত্ব নতুন করে ফিরে পাবে।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর শ্রীযুক্ত এস.এস. সেটলার স্বামীজির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে তাঁর অসামান্য শক্তির কথাও বর্ণনা করেছিলেন।

১৩২. মুর্শিদাবাদ, ৩-১১-১১ : বহরমপুর কলেজের ছাত্র লালা রাধাগোবিন্দ আরো দুই-তিন জন ছাত্র সমভিব্যাহারে সম্প্রতি স্বামী অখণ্ডানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গিয়েছেন। (এই অখণ্ডানন্দ স্বামী সম্পর্কেই পুলিশ প্রায় বছর দুই আগে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল)। কিন্তু এইসব ছাত্ররা সঠিক কী কারণে অখণ্ডানন্দর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিল তা এখনো জানা যায়নি।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : পুলিশ সুপার কি অখণ্ডানন্দ এবং তাঁর আশ্রম-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান করে সত্বর একটি রিপোর্ট পাঠাতে পারেন? এঁর সম্পর্কে ১৯০৮ সালের পুলিশ অ্যাবস্ট্রাক্টের ২০৫১ নং অনুচ্ছেদে এবং বর্তমান অ্যাবস্ট্রাক্টের ৬ নং অনুচ্ছেদে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য জানানো হয়েছে।

১৫৬৮. বেঙ্গল অ্যাবস্ট্রাক্ট, ১৫-৪-১১ : স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের জনৈক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন যে, আলিপুর বোমা মামলার খালাস পাওয়া আসামি কুঞ্জলাল সাহাকে তিনি বেলুড় মঠ পরিদর্শনকালে সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন।[৭] কুঞ্জলাল ওই অফিসারকে বলেছিলেন যে, তিনি এক সময় কনখলের সেবাশ্রমে বাস করতেন। (এই কনখলেই রামকৃষ্ণ মিশন একটি হাসপাতাল তৈরি করেছিল)। কনখল হরিদ্বারের কাছেই অবস্থিত। এখান থেকে কুঞ্জলাল কোনো এক সময়ে হিমালয়ের উচ্চে অবস্থিত পবিত্র হৃষীকেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। হৃষীকেশ থেকে এক সপ্তাহ বাদে আবার তিনি বেনারসে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ১৯১১ সালের ২৯ মার্চ তারিখে বেলুড় মঠেই প্রত্যাবর্তন করেন। বেলুড় মঠের নানা ধরনের গৃহস্থালি কাজে তিনি সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। লোকে বলে যে, এখন নাকি তাঁর জীবনে এবং আচার-আচরণে বেশ বড়ো রকমের পরিবর্তন এসেছে। তিনি এখন ব্রহ্মচারী হয়েছেন। অধুনা তাঁর বিনীত ব্যবহার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো।

আলিপুর বোমা মামলার আর একজন খালাস পাওয়া আসামি শচীন্দ্রকুমার সেনও (দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ নং ৭৩৬) এখন বেলুড় মঠে বাস করছেন।

৫০৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দেবব্রত বসু ১৯১১ সালের ৩১ মার্চ তারিখে কলকাতার পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন।

২৭৪১. বেঙ্গল স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট, ১৭-৬-১১ : স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের জনৈক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন যে, বিগত ৯ তারিখে তিনি বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়ে অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে, কলকাতার চোরবাগানের জনৈক নলিনীকান্ত দে (সরকার) ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গী হয়ে এখন পুরীতে অবস্থান করছেন। ওই অফিসার আরো জানাচ্ছেন যে, দেবব্রত বসু এবং শচীন্দ্রকুমার সেনও (দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ নং ২২৪৮) বেলুড় মঠে বসবাস করছেন। এ-কথাও জানা গিয়েছে যে, বাঙ্গালোর (মাদ্রাজ) থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তুলসী মহারাজ অর্থাৎ নির্মলানন্দ স্বামী এখন *উদ্বোধন* কার্যালয়ে এসে বাস করছেন। নির্মলানন্দ, শশী মহারাজ অর্থাৎ রামকৃষ্ণানন্দকেও সঙ্গী করে নিয়ে এসেছেন। শশী মহারাজ এখন ডায়াবেটিস ও যক্ষা রোগে ভুগছেন। নলিনীকান্ত দে নাকি ননীগোপাল সেনগুপ্তর দলের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন।[৮]

এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ফাইল থেকে যে-ষোলোটি আই.বি. অ্যাবস্ট্রাক্টের বিবরণী আগেকার কয়েকটি পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও আরো আটটি অ্যাবস্ট্রাক্ট এই ফাইলে দেখতে পাওয়া যায়।[৯] এ-ছাড়াও এই ফাইলে আরো যে তিন রকমের নথির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্তত দুটির কথা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। এইসব নথির মধ্যে পুলিশের ইনফরমার এবং ইন্সপেক্টরদের স্বহস্ত-লিখিত এবং স্বাক্ষরিত গোপন রিপোর্ট ও গোয়েন্দা অফিসারদের নিজেদের মধ্যে লিখিত গোপন নোট ও চিঠিপত্রগুলিই (correspondence) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যার বিচারে এগুলি নেহাত কম ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশন ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত সন্ন্যাসী মায় সাধারণ গৃহস্থদের বিরুদ্ধেও পুলিশের গোপন অনুসন্ধান যে কত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছিল এই নথিগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। এগুলির মধ্যে মাত্রই কয়েকটি নমুনা হিসাবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পূর্বে উদ্ধৃত বেঙ্গল স্পেশাল ব্রাঞ্চের ১৯০৯ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ৮২ নং অনুচ্ছেদে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসীদের পুরীতে আগমনের বার্তা পাঠানোর কথা লেখা হয়েছিল। এই অনুচ্ছেদের সংবাদ পাঠ করে বোঝা গিয়েছিল যে, বেলুড় মঠ ছেড়ে বাংলা প্রদেশের বাইরে তীর্থভ্রমণে গিয়েও সন্ন্যাসীরা নাছোড়বান্দা পুলিশের হাত থেকে অব্যাহতি পাননি। পুরীর পুলিশ সুপার, এল.এইচ.বার্টন, ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের জি.সি. ডেনহ্যামকে পুরী থেকে একটি গোপন চিঠি-মারফত এইসব সন্ন্যাসীদের পুরীতে উপস্থিতির সংবাদ জানিয়ে দেন। ১৯০৯ সালের ৩ এপ্রিলে লেখা এই চিঠিতে বার্টন বলেছিলেন যে, বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী, রাখাল মহারাজ এবং শিব সিং প্রসাদ নামে অপর এক ব্যক্তি সমভিব্যাহারে গতকাল অর্থাৎ ২ এপ্রিল তারিখে পুরীতে এসে হরিবল্লভ বসুর সমুদ্রতীরবর্তী বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করেছেন। বার্টন আরো জানান যে, পুলিশ এঁদের

পিছু নিয়ে এবং এঁদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে জানতে পেরেছে যে, গেরুয়াধারী এইসব শিক্ষিত যুবকের দল রাজনীতি এবং আলিপুর বোমা মামলার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। ('All four wear the *gerua* cloth and appear to be very well-educated. They were heard to discuss on politics etc., and seem quite enthusiastic about the bomb case.') বার্টন বলেন যে, যে-হেতু এঁদের সকলকেই তাঁর রীতিমতো বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে মনে হয়েছে সেই কারণে এঁদের আরো সতর্কভাবে অনুসরণ ও নজরদারির জন্য কলকাতার স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের ডি.আই.জি., এফ.সি.ড্যালিকে অনুরোধ করে যেন কোনো একজন ঝানু গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে অবিলম্বে পুরীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ('From all accounts they are very dangerous youths and are being closely watched. I would be very grateful if you could get Daly to spare me one of his men to ascertain full particulars about them, as I doubt very much if the local police will be able to do so, especially as they appear to be very cautious.')। এই চিঠিখানির ঠিক দু-দিন পরে অর্থাৎ ৫ এপ্রিল ১৯০৯ তারিখে বার্টন এবারে সরাসরি ড্যালিকেই একটি চিঠি লিখে জানান যে, আসন্ন রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে পুরীতে সম্প্রতি অনেক বহিরাগত বাঙালির আনাগোনা শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উগ্রপন্থী-রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ করা হলেও স্থানীয় পুলিশ কোনোভাবেই এদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। বীরভূমের হেতমপুর কলেজের সতীশচন্দ্র গুপ্ত নামে জনৈক অধ্যাপক এইসব উগ্রপন্থী যুবকদের বুদ্ধিদাতা। এই রকম অবাঞ্ছিত লোকদের সম্পর্কে গোপনে বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য এই কাজে বিশেষ রকম অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর প্রমোদ মুখার্জীকে যাতে অবিলম্বে পুরীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেজন্য বার্টন বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

অতঃপর বার্টনের অনুরোধ মতো প্রমোদ মুখার্জী পুরীতে এসে অধ্যাপক সত্যেন্দ্র গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার নামে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করা বর্তমানে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের পিছু নিয়েও শেষপর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কোনো খবরই যোগাড় করতে পারেননি। অবশ্য অধ্যাপক গুপ্ত যে 'যুগান্তর' দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেইটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছিল। কিন্তু ইন্সপেক্টর মুখার্জী এ-কথাও নিঃসন্দেহে স্বীকার করেন যে, এই দুই ব্যক্তির সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রামকৃষ্ণ মিশন অথবা বেলুড় মঠের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে প্রমোদ মুখার্জীর রিপোর্টে (মে, ১৯০৯) মিশনের সন্ন্যাসীদের সন্দেহের আওতা থেকে একেবারে বাদও দেওয়া হয়নি। মুখার্জী জানান যে, এইসব সন্ন্যাসীরা পূর্বোক্ত হরিবল্লভ বসুর বাড়িতেই অবস্থান করছেন এবং এঁদের প্রশ্রয়দাতা ছিলেন স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্র। এই ব্যক্তিটি সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশি-তৎপরতা শুরু হলেই সে-খবর আগেভাগেই সন্ন্যাসীদের জানিয়ে দিতেন এবং তাঁরাও তখন সেই মতো সাবধানে চলাফেরা করতেন। এইভাবে আগাম খবর পেয়ে যাওয়ার কারণে পুলিশ তাঁদের পিছু নিয়েও স্থানীয় লোকজনেদের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশা বা শলাপরামর্শ করতে দেখেননি। ('I suspected that they have somehow or other got a scent of the police activity from before and so are carefully avoiding themselves from the society of

young men. The saviour Deputy Magistrate might have warned them.') মোট কথা রাজনীতির সঙ্গে পুরীতে আগত এইসব সন্ন্যাসীদের যোগাযোগ সম্পর্কে কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ এ-যাত্রায় এখনো পাওয়া না গেলেও গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর এঁদের বিরুদ্ধে পুলিশি-প্রহরা শিথিল না করবারই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর মুখার্জীর অভিমতে বার্টনও সায় দিয়ে লিখেছিলেন যে, তাঁদেরও দৃঢ় বিশ্বাস, সন্ন্যাসীরা দিনের বেলায় ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও গভীর রাতে নিজেদের বাড়িতে তাঁদের প্রতিবেশী অনুগামীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। বার্টন এই কারণে সন্ন্যাসীদের বাড়িতে প্রহরা মোতায়েন করারও ব্যবস্থা করেছিলেন— 'I have no doubt they meet their friends there in the night sometime. I am having the place closely watched.'

বার্টনের উপরোক্ত মন্তব্যটি প্রমোদ মুখার্জীর রিপোর্টের সঙ্গে ১৯০৯ সালের ৫ মে তারিখে পাওয়া গিয়েছিল। এর ঠিক দু-মাস আগে ৪ মার্চ তারিখে মাদ্রাজের ক্রাইম অ্যান্ড রেলওয়েজ বিভাগের ডি.আই.জি., সি.জি. ডাব্লু. ক্লগস্টনের কাছে ড্যালি কলকাতায় তাঁর ৪১ নং পার্ক স্ট্রিটের অফিস থেকে এক গোপন চিঠি (নং ১৪৪৫ এস.বি.) মারফত জানান যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এখন মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন আশ্রমে আছেন। এখানে তিনি কোন কর্মে লিপ্ত রয়েছেন, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করে তাঁকে যেন একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়। ড্যালি লেখেন যে, রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে যে বিপ্লবী দলগুলির যোগাযোগ রয়েছে সে-বিষয়ে কলকাতা পুলিশের কোনো সন্দেহ নেই—'The association of the Belur Math with the Revolutionary party in Calcutta is certain.' অধিকন্তু সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি খবরে জানা গিয়েছে যে, ব্রহ্মানন্দ স্বামী নাকি বিপ্লবীদের প্রচারপত্র 'যুগান্তর' বিলি করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে বিষদ সংবাদ সংগ্রহ করাটা খুবই জরুরি এবং সেই কারণেই তিনি এই চিঠি লিখছেন। কিন্তু বাংলা পুলিশের দুর্ভাগ্য, ক্লগস্টন দু-সপ্তাহ ধরে ব্যাপক অনুসন্ধান করেও ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে 'যুগান্তর' প্রচারপত্রের কোনো সংস্রব খুঁজে পাননি। বস্তুত তিনি রামকৃষ্ণ মিশন বা মঠের সঙ্গে উগ্রপন্থী রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই বলে শেষপর্যন্ত ড্যালিকে ১৭ মার্চ ১৯০৯ তারিখে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সন্দেহ করার মতো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও ড্যালির সন্দিগ্ধ মনোভাব দূর হয়নি। আর তাই এই ঘটনার দু-বছর পরেও তিনি বাংলাদেশের (Bengal) বিপ্লব আন্দোলনের বিস্তার প্রসঙ্গে যে-নোট তৈরি করেছিলেন সেখানে লিখেছিলেন, 'The Ramkrishna Mission, with its headquarters at Belur Math, in the Hooghly district, has been a favourite gathering place for the young missionaries of the revolutionary movement.' অবশ্য এই নোটে ড্যালি এ-কথাও লিখেছিলেন যে, একটা সময় অবধি রামকৃষ্ণ মিশন যথার্থই বিপ্লবীদের মিলনস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হলেও মিশন কর্তৃপক্ষ এখন আর তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির কাজে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না এবং পুলিশের সন্দেহ-তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবেই যাতে মিশনের সঙ্গে জড়িত হতে না পারে সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।[১০] প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ১৯১৭ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারিও মিশনের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে অভিযোগ করে লিখেছিলেন—'It is not for a moment suggested that these men are revolutionaries because of

their connection with the Ramkrishna Mission, but I think there is reason to suppose that in many cases they belonged to the Mission because they were revolutionaries.' ১১ অর্থাৎ মিশনকে বাহ্যত অব্যাহতি দিয়েও ব্রিটিশ সরকার তাকে রাজনীতির দায়ে অভিযুক্ত করতে কসুর করেনি।

১৯০৯ সালের উল্লিখিত ফাইলে (Government of Bengal, O.B./VIII/9/1909) গ্রন্থিত আর যে-সব কাগজ বা নথি রয়েছে সেগুলি থেকে রামকৃষ্ণ মিশন ও রাজনীতি বিষয়ে অন্য কোনোরকম জরুরি তথ্য, বিশেষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ঠিক এর পরের বছরকার অন্য আর একটি ফাইল— Government of Bengal, Intelligence Branch 1078/1910, Serial No. 41/1910-এ আলোচ্য বিষয়ে অন্য কয়েকটি সাধারণ অর্থাৎ মামুলি নথির সন্ধান মেলে। এইগুলি মিশন কর্তৃক প্রকাশিত মিশনের বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত প্রচারপত্র (leaflet), পুস্তিকা (booklet), সাংগঠনিক স্মারকপত্র (Memorandum of Association), সদস্যপদ গ্রহণের আবেদনপত্র (form), বার্ষিক কার্য-বিবরণী (Annual Report), এবং নিয়মাবলীপত্র বা Prospectus। ভারত সরকারের Act XXI, 1860, অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশন নিবন্ধীকৃত (Registered) হওয়ার পর এই পুস্তিকা এবং কাগজগুলি নিয়মানুযায়ী সরকারি অফিসে জমা পড়ে এবং সেখান থেকে কালক্রমে সেগুলি মহাফেজখানায় এসে সংরক্ষিত হয়েছিল। বর্তমান প্রসঙ্গে এইগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

এই ফাইলে সংরক্ষিত অন্যান্য নানাবিধ কাগজের মধ্যে রাজনীতির প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে উত্থাপিত হয়েছে। এইগুলির মধ্যে সব থেকে কৌতূহল জাগানোর মতো একটি নথি এখানে নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি ললিতমোহন সেন নামে জনৈক ইনফর্মারের ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখে লিখিত একটি গোপন প্রতিবেদন (Confidential Report)। এই রিপোর্টে ললিতমোহন লিখেছিলেন যে, তিনি অরবিন্দ ঘোষের ঘনিষ্ঠ জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে জেনেছেন যে, গোটা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ১৯১৩ সাল নাগাদ সন্ত্রাসবাদীদের প্রায় চোদ্দোটি দল বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় অবস্থায় ছিল। কিন্তু এই দলগুলির কর্মসূচির প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি বা আগ্রহ সম্প্রতি হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য সন্ত্রাসবাদীগণের মধ্যে যে-সব ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি রয়েছেন তাঁরা এখনো দলের ভেতরে ও বাইরে বহুসংখ্যক মানুষের শ্রদ্ধা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এইসব দেখে বিপ্লবীদের ধারণা হয়েছে যে, একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজনীতির জগতে টেনে আনা সম্ভব। বিপ্লবী দলগুলির নেতৃবৃন্দ এই কারণেই তাঁদের যুবক কর্মীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা দানের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অ্যানার্কিস্ট দলের অনেকেই ইতিমধ্যে সরাসরি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে বিবেকানন্দর আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতেও শুরু করে দিয়েছেন। অরবিন্দ ঘোষ, দেবব্রত বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি ব্যানার্জী, যোগেন ঠাকুর এবং মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী প্রমুখ অনেকেই এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। দেবব্রত বসু তো এখন মিশনেই যোগ দিয়েছেন এবং তাঁর দেখাদেখি আরো অনেক অ্যানার্কিস্ট প্রায়শই মিশনে উপস্থিত হয়ে সেখানকার ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। মোট কথা বিপ্লববাদীরা মনে করেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের এখন যে বিপুল খ্যাতি ও পরিচিতি

তাতে এই সংগঠনটির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে গোটা মিশনকেই বিপ্লবীদের অনুকূলে নিয়ে আসা একান্ত আবশ্যক।[১২]

অর্থাৎ সত্য বা অতিরঞ্জিত যা-ই হোক না কেন, ললিতমোহন সেনের উপরোক্ত বিবৃতি অনুযায়ী ১৯১৩ সালের প্রথম দিকেও মিশনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির যোগাযোগ ছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই কারমাইকেলের দরবার-বক্তৃতায় (১১ ডিসেম্বর ১৯১৬) মিশনের বিরুদ্ধে তির্যকভাবে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। নথিটির মূল ইংরেজি লেখাটি (text) ছিল এইরকম :

Religious Characters

1041. Madras City, 23-8-06. Swami Abhedananda, accompanied by Swami Ramkrishnananda, arrived in Madras from Bangalore on the morning of the 22nd instant and proceeded to Puri by the East Coast Railway Mail train the same morning.

Note by Bengal I.B. : A report from the Superintendent of Police, Puri, who has been apprised of the visit of the Swami is awaited.

২। যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। ১৯১২ সালে এঁর বয়স ছিল ২৮ বছর। গায়ের রং মাঝারি ধরনের, দীর্ঘাকৃতি, পেশিবহুল এবং মজবুত ধরনের গড়ন। বাসস্থানের ঠিকানা, ২০১ আপার চিৎপুর রোড এবং ৩ নং রানি রোড, পাইকপাড়া, কলকাতা। 'যুগান্তর' এবং 'সারথি যুবকমণ্ডলী'-র উৎসাহী সদস্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। Political Suspects upto August, 1912, entry no. 179 (Calcutta), & Who's Who of Politico-Criminals in India, 1914, *T.I.B.*, Vol. V., p 532, 1009.

৩। নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী : এঁর পিতার নাম প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী। ১৯১২ সালে এঁর বয়স ছিল ২৪ বছর, বাসস্থান — ২ নং রাজাবাগান জংশন রোড, কলকাতা। যোগেন ঠাকুরের মতো ইনিও 'সারথি যুবকমণ্ডলী'-র একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইনি 'চেরি ক্লাব'-এর সেক্রেটারিও ছিলেন। এঁকে মোক্ষদা সামাধ্যায়ী এবং জ্ঞান বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দেখা যেত। Political Suspects upto August, 1912, entry no. 159 (Burdwan), *T.I.B.*, Vol. V., p.528.

৪। কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ : এঁর বাসস্থানের ঠিকানা, ৬৪/১ সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা। অরবিন্দ ঘোষের একান্ত ঘনিষ্ঠ এই ভদ্রলোক বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুরেশ মজুমদার এবং নরেন্দ্র চ্যাটার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নিয়মিত এঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ইনি লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত entry no. 100 (Burdwan), *T.I.B.*, Vol. V., p.517.

৫। তারাপদ বোস : খুলনা জেলার (অলকা) অধিবাসী প্রিয়নাথ বসুর এই পুত্রের বয়স মাত্র ১৮ বছর (১৯১৩ সালে)। ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই কিশোরের গায়ের রঙ মোটামুটি ফরসা, এবং গড়নও মধ্যম আকৃতির। কিন্তু এই বয়সেই এর মাথার সব চুলই ছিল শাদা। নাংলা ডাকাতি ষড়যন্ত্র মামলায় নিযুক্ত গোয়েন্দাদের হত্যা করবার জন্য এই ডাকসাইটে বেপরোয়া কিশোরটি কলকাতায় এসে উঠেছিল। Who's Who of Politico-Criminals in India, 1914, *T.I.B.*, Vol. V., p.843.

৬। শচীন সেন : পূর্ববঙ্গের ঢাকা, টাঙ্গিবাড়ি, সোনারঙের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ সেনের ২২ বৎসর বয়স্ক এই পুত্রটিকে পুলিশের খাতায় রীতিমতো বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। কলকাতায় ৫৩ নং গ্রে স্ট্রিটে এর নিজের আস্তানা থাকলেও অধিকাংশ দিনই সে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠে বাস করত। মানিকতলা বাগানবাড়ির বোমা মামলায় এঁকে চালান করা হলেও প্রমাণাভাবে এঁকে বিচারের সময় খালাস দেওয়া হয়। এঁকে চট্টগ্রামেও মাঝে মাঝেই আপাত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। Political Suspects upto August, 1912, entry no. 171 (Burdwan) & Who's Who of Politico-Criminals in India 1914, *T.I.B.*, Vol. V., *pp.531. 995.*

দেবব্রত বসু : আশুতোষ বসুর এই পুত্রটির বয়স ছিল ৩৪ বছর (১৯১৩ সালে) এবং কলকাতায় ইনি ৫৫/৩ গ্রে স্ট্রিটের বাসাতে থাকতেন। ইনিও আলিপুর বোমা মামলায় ধৃত হয়ে পরে প্রমাণাভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন। কলকাতার আবাসিক হওয়া সত্ত্বেও ইনি প্রধানত বেলুড় মঠেই বাস করতেন। Who's Who of Politicao-Criminals in India, *T.I.B.*, Vol. V., p. 840.

৭। কুঞ্জলাল সাহা : নদিয়া জেলার মোজামপুর, কুষ্ঠিয়ার রামলাল সাহার এই ২৯ বৎসর বয়স্ক পুত্রটি এক সময় পাবনার বাঁশেরহান্দায় আস্তানা গেড়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বেলুড় মঠেই প্রধানত বাস করছেন। ইনিও আলিপুর বোমা মামলায় প্রথমে অভিযুক্ত হয়ে পরে প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়েছিলেন।

বোমা মামলায় জড়িত এন. রায় ও বি. বি সরকার প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে এঁকে প্রায়ই দেখা যেত। দ্রষ্টব্য : Who's Who of Politico-Criminals in India, 1914, *T.I.B.*, Vol. V., pp. 999. 605, 639.

৮। হাওড়া শিবপুরের চৌধুরীপাড়ার বৈদ্যবংশীয় ক্ষেত্র গুপ্তের ৩২ বৎসর বয়স্ক এই পুত্রটি যে একটি গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন সে-কথা ললিত চক্রবর্তী নামক জনৈক রাজসাক্ষীর জবানবন্দী থেকে প্রথম জানা গিয়েছিল। ইনি ১০ নং জাঠ বাহিনীর মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং হাওড়া ডাকাতি মামলাতেও জড়িত ছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। *T.I.B.*, Vol. V., p. 997.

৯। এই আটটি অ্যাবস্ট্রাক্টই (দ্র: Government of Bengal, O.B. VIII/9/1909) ১৯১১ সালের এপ্রিল, মে এবং নভেম্বর মাসের। এইগুলির আলোচ্য বিষয় ও প্যারাগ্রাফ নম্বর এই রকম :

i) Bengal, Special Department, No.2741 dated 17-6-1911. Sub : Belur Math.
ii) Calcutta Police Detective Deptt., No. 2410 dated 23-5-1911. Sub : Varmanand and Tirianand. (*sic*)
iii) Calcutta Police Detective Deptt., No.2248 dated 20-5-1911. Sub : Belur Math News – Debabrata Bose and Kunja Lal Saha.
iv) Bengal, Special Deptt., No. 2384 dated 27-5-1911. Sub : Tulsi Maharaj.
v) Calcutta Police Detective Deptt., No.2129 dated 10-5-1911. Sub : Nirmalanand Swami.
vi) Eastern Bengal & Assam Abstract, No. 1501 dated 1-4-1911. Sub : Ramkrishna Mission of Barisal.
vii) United Provinces Abstract, No.1455 dated 8-4-1911. Sub : Sobhananand at Belur Math.

viii) United Provinces Abstract, No. 1454 dated 8-4-1911. Sub : Gokulanand & Brahmanand at Benares.

১০। Daly F.C., Strictly Confidential Note on the Growth of the Revolutionary Movement in Bengal, 1911. দ্রষ্টব্য Ghose Sankar, *First Rebels*, Calcutta, 1981, p.21.

১১। রায়চৌধুরী লাডলীমোহন, পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১২৯।

১২। *Confidential Report*

'... The anarchists who could take the leadership and who esteem the respects of the parties have taken spiritual views and are leading their lives in that direction. The ideas of those persons are that unless the tendencies of the members of these gangs flow in one channel the final fight for a common object can never be attained. The only thing that can unite these men and make them fight for a common object is Religion. To set examples to the youths of these gangs the leaders of them teach them spiritualism and they are to some extent following them. Some of the anarchists have already joined the Ramkrishna Mission and are following the doctrines of Bibekananda. The ideas of Arabinda Ghosh, Debabrata Bose, Sham Sundar Chakrabarty, Punch Couri Banerjee, Jogen Thakur, Mokhada Samadhya and others are also this. Debabrata has already joined the Mission and is living there and the others very often go there and discuss about religion. Arabinda is living at the charity of some of the friends at Pondichery and is leading a spiritual life. His followers are waiting for him to return and teach the doctrine. At Pondichery Arabinda does not speak to any one and very seldom goes out. *The sole intention of the anarchists is to improve the Ramkrishna Mission which is the only one now standing and requires to be looked after. Now, at present the anarchists do not get wholehearted sympathy from the public but once they can declare that they are doing this only for their country.*'

Lalit Mohon Sen. 19-2-1913.

দ্রষ্টব্য : Government of Bengal, Intelligence Branch, 1078 / 1910 (Serial No. 41 / 1910) উপরোক্ত প্রতিবেদনটির ভাষা হয়তো কিছুটা অপরিণত। কিন্তু এ-জন্য বোঝার কিছু অসুবিধা হয় না। লেখার কিছু অংশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বাঁকা হরফে মুদ্রিত হয়েছে।

টেগার্টের 'রেড বুক' ও রামকৃষ্ণ মিশন

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন বিষয়ে গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে সব থেকে সুবিন্যস্ত ও তথ্যনিষ্ঠ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিলেন চার্লস অগস্টাস টেগার্ট। ইনি ১৯০১ সালে ভারতীয় পুলিশ বিভাগে (Indian Police Service) প্রবেশ করেছিলেন এবং প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে পরবর্তী ত্রিশ বছর যাবৎ বাংলা দেশের (Bengal) পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারত সচিব কর্তৃক ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন এবং কর্মজীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার কর্তৃক নাইটহুড খেতাবও লাভ করেছিলেন। চাকরি-জীবনের শেষ আট বছর তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

ডাকসাইটে এবং বেপরোয়া এই পুলিশ অফিসারটি তাঁর গোটা কর্মজীবনে বাংলা দেশের (Bengal) বিপ্লববাদী আন্দোলনের উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বিপ্লবীদের অভিযান দমন করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁদের বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বিপ্লবীরা বেশ কয়েকবার তাঁকে প্রাণে মারবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের উগ্রপন্থী আন্দোলনকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগে তিনি এই আন্দোলনের সূচনা, বিকাশ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে রয়্যাল এম্পায়ার সোসাইটি আয়োজিত একটি সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা করেছিলেন।[১]

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে টেগার্ট এই রিপোর্টটি যখন তৈরি করেছিলেন সেই সময় তিনি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই মুদ্রিত রিপোর্টটি লাল রঙের শক্ত মলাটে বাঁধাই করে এবং ২২ এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে 'গোপনীয়' (Confidential) মার্কা করে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। মলাটের রং লাল হওয়ার দরুণ এটি 'রেড বুক' হিসাবেই সরকারি মহলে সমধিক পরিচিত হয়েছিল।

Terrorism in Bengal (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থের লেখক, টেগার্টের এই রিপোর্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রধানত ধর্মীয় চরিত্রের সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ পুলিশ বা ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট রামকৃষ্ণ মিশনকেও রাজনৈতিক কারণে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি ('The predominant religious character of the organization did not spare it from the scrutiny of the Intelligence Branch.')। আসলে বাংলা দেশের (Bengal) 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর' প্রভৃতি নানা রকমের বিপ্লবী সংগঠনের কাজের ধারা সম্পর্কে খোঁজখবর করতে গিয়ে পুলিশ টের পেয়েছিল যে, এই সকল গুপ্ত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মিশনেরও প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশের সন্দেহের তালিকায়

এমনকী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমও বাদ পড়েনি।[২] টেগার্ট জানতেন যে, স্বামী বিবেকানন্দর বক্তৃতারাজি ভারতীয় যুব-মানসে জাতীয়তার বোধ উসকে দিয়েছে এবং তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাও এই জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অতএব রামকৃষ্ণ মিশনকে স্বভাবতই ব্রিটিশ পুলিশের সন্দেহ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়নি। কিন্তু নিছক সন্দেহই নয়, টেগার্টের রিপোর্টে সংকলিত যাবতীয় তথ্যের অভ্রান্ততাও ছিল দেখার মতো।

তবে টেগার্টের আলোচ্য রিপোর্টটির অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও এ-কথা বলা দরকার যে, এই বিষয়ে স্টিভেন্সন-মুরই ছিলেন পথিকৃৎ এবং টেগার্ট মূলত তাঁর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই নিজের প্রতিবেদনটি রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত এ-কথাও বলা দরকার যে, ১৯১৪ সালের এই রিপোর্টে টেগার্ট বাংলা দেশের (Bengal) বিপ্লববাদী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রামকৃষ্ণ মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেও ১৯৩২ সালে রয়াল এম্পায়ার সোসাইটির ভাষণে তিনি একবারের জন্যও সে-সব কথার পুনরাবৃত্তি করেননি। মনে হয় মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দর ১৯১৪ সালে লিখিত 'A Warning to the public' শীর্ষক প্রবন্ধটির পরিপ্রেক্ষিতেই টেগার্ট এই বিষয়ে পুনরায় কিছু বলা সঙ্গত মনে করেননি।

পরিশিষ্ট সমেত টেগার্টের মূল প্রতিবেদনটির যথাযোগ্য বঙ্গানুবাদ এখন পেশ করা হল।

হিন্দু সন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী, তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার ফলে এগুলি সম্প্রতি ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবিকাশ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত যে বিপ্লবী দলটি বাংলা দেশের (Bengal) যুব সম্প্রদায়কে আলোড়িত করেছে এবং যার বিষময় প্রভাব পাঞ্জাব এবং ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলিতেও বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলির সঙ্গে মিশন ও তার অনুগামীদের যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি ও প্রসার এবং উপরে যেমন বলা হয়েছে, বিশেষ করে এর রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছে।

১

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলে নেওয়া দরকার।

প্রথম জীবনে গঙ্গাধর (আসলে গদাধর। টেগার্টের এই রকম অনেক মারাত্মক ভুল পরেও লক্ষ করা যাবে) চ্যাটার্জী নামে অভিহিত, রামকৃষ্ণ ১৮৩৩ সালের কোনো এক সময়ে হুগলি

জেলার কামারপুকুর গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিকগণের মতে, একদা গয়াতে তীর্থযাত্রা করার পথে তাঁর বাবার কাছে স্বয়ং বিষ্ণু স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে অচিরেই তাঁর ঘরে জন্ম নেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এই জন্যই বিষ্ণুর আর এক নাম গঙ্গাধর (গদাধর) হিসাবে তাঁকে প্রথম জীবনে ডাকা হত।

শোনা যায় যে, বাল্যকাল থেকে রামকৃষ্ণ ধর্ম বিষয়েই সব থেকে বেশি আকর্ষণ বোধ করতেন। গাঁয়ের স্কুলে পাঠ নেওয়া ছাড়া বেশি লেখাপড়া তিনি শেখেননি। কিন্তু তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। পুরী যাওয়ার পথে তাঁর বসত গ্রামের উপর দিয়ে যে-সব সন্ন্যাসী এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যাতায়াত করতেন তাঁদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৭/১৮ বছর বয়সের রামকৃষ্ণ তাঁর বড়ো ভাই রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন।

১৮৫৫ সালে রানি রাসমণি নামে একজন ধনী বাঙালি মহিলা কলকাতা থেকে চার মাইল দূরে গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণের বড়ো ভাই এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত হন এবং অল্প কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণও এখানে সহকারী পুরোহিতের কাজ পেয়ে যান।

এই সময় তাঁর ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস দেখে অনেকেই রামকৃষ্ণের প্রকৃতিস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। শোনা যায় যে, নিয়মিত পূজার্চনার পর তিনি প্রায়ই কালীমূর্তির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তবগান করে চলতেন এবং বাহ্যজ্ঞান রহিত না হওয়া পর্যন্ত বালকের মতো একটানা প্রার্থনা করে যেতেন। কোনো কোনো দিন মা-কে যেমন পূর্ণরূপে চাইতেন, তেমনভাবে দেখতে না পেলে তিনি একনাগাড়ে কয়েক ঘন্টা শুধু কেঁদেই চলতেন। তাঁর আত্মীয়েরা ভাবলেন যে, বিয়ে হলে এবং পরিবারের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলে তাঁর কল্পনা-প্রবণতা আপনা থেকেই সংযত হয়ে আসবে। তাই দেশের গ্রামে ফিরিয়ে এনে তাঁকে ২৪-পরগনার জয়রামপুরে রামকমল মুখার্জীর মেয়ে সারদামণির সঙ্গে ১৮৫৯ সালে বিয়ে দেওয়া হল।

সারদামণি এখনো জীবিত আছেন। বিয়ের সময় তাঁর নিজের বয়স ছিল মাত্র ছয় এবং তাঁর স্বামীর বয়স ছাব্বিশ।* বিয়ের পর রামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে ফিরে আসেন এবং শোনা যায় যে, সেই সময় থেকে তিনি ধর্মকর্ম ও ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাস অনুযায়ী এই সময় তাঁর ধর্মোচ্ছ্বাস না কমে বরং হাজারগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ধর্মের ব্যাপারে এই রকম মানসিক অবস্থায় তাঁকে দিয়ে আর মন্দিরের কাজ চালানো যাবে না, এই ভেবে মন্দির কর্তৃপক্ষ এই সময় তাঁর জায়গায় আর একজন পুরোহিত নিয়োগ করেছিলেন।

কর্মজীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে রামকৃষ্ণের একজন অনুগামী এই সময় মন্তব্য করেন — 'বিয়েটা শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে। এতদিন তিনি শুধু মা, মা করে দিবারাত্র ডেকে গিয়েছেন। আর এখন তিনি স্রেফ কাষ্ঠপুত্তলি বা প্রস্তরবৎ স্থাণু। এখন থেকে কখনো তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ-চিত্ত মানুষ আবার কখনো বা বালকের মতো আচরণ করতে দেখা যেত। বিষয়ী লোকের নজরের আড়ালে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। ভগবানের প্রতি যাদের ভালবাসা নেই তাদের তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না, এমনকী ভগবৎ-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য

কোনো কথা তিনি শুনতেই চাইতেন না। "মা! আমার জগজ্জননী মা!" — এই ছিল তাঁর সে-সময়কার, একটিমাত্র বিরামহীন জপের মন্ত্র।'

ভক্ত হিসাবে রামকৃষ্ণের খ্যাতি এই সময় বাংলা দেশের (Bengal) সর্বত্র দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক পণ্ডিত ও তাঁদের শিষ্যরা রামকৃষ্ণকে দেখতে আসতেন এবং তাঁরা অনেকেই তাঁকে নদিয়ার সিদ্ধপুরুষ চৈতন্যের অবতার বলে বিশ্বাস করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স-পার্ষদ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং ফিরতি সাক্ষাতে রামকৃষ্ণও বহুবার কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, এইসব সাক্ষাৎকার-সভায় রামকৃষ্ণ বহুক্ষণ ধরে ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর মুখনিঃসৃত সেইসব জ্ঞানের বাণী গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনত।

জীবনের শেষভাগে রামকৃষ্ণ যেন নিজেকেই ভগবানের অবতার রূপে অনুভব করতেন এবং তাঁর শিষ্যরা এখনো তাঁকে সেইভাবেই পূজা করে। শেষদিকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ আরো প্রসারিত হয়েছিল এবং তাঁর সমাধি বা বাহ্যজ্ঞান-রহিত অবস্থা আরো দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকল। তাঁর শিষ্যরাও নাকি অনেকবার তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এই রকম বাহ্যজ্ঞান-লুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হতেন। এই রকম স্পষ্টত সম্মোহনী শক্তির ফলে রামকৃষ্ণ অচিরেই ঐশী শক্তির অধিকারী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

লোকে বলে যে, যে-কোনো ব্যক্তির শরীরকে স্পর্শ করেই তার চিন্তাভাবনা পালটে দেওয়ার মতো অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। স্পর্শলাভ করা মাত্রই কারো কারো সমাধি হত আর সেই অবস্থায় তাঁরা বাহ্য পৃথিবীর সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে দেব-দেবীর দর্শন লাভ করতেন।

দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি যোগ বা দৈহিক সংযম অভ্যাস করতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর ফলে মানুষ তাঁকেই পেতে পারে যাঁকে সহজে লাভ করা যায় না এবং যাঁকে পাওয়া হলে মানুষ আর কখনো তার ব্যক্তি-চৈতন্যের জগতে ফিরে আসতে ইচ্ছুক হবে না। এই রকম সাধনার ফলে তিনি মাঝে মাঝে অন্তত ছয় মাস ধরে ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে যেতেন। এইভাবে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছিল। ১৮৮৬ সালে, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে রামকৃষ্ণের শেষবারের মতো চৈতন্যলুপ্তি বা সমাধি হয় এবং সে-যাত্রা আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। নিকটস্থ শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই জায়গার ঠিক বিপরীত দিকে নদীর অপর পারে বর্তমানের বেলুড় মঠ। জীবনের শেষ কয়টি বছরে তাঁর স্ত্রী সারদামণি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সর্বদা তাঁর পাশে থেকে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সেবা করে গিয়েছেন।

কেশবচন্দ্র সেন এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ তাঁর দুই সমকালীন খ্যাতনামা ব্যক্তি, আলাদা সম্প্রদায় ও ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ এঁদের মতো কোনো নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেননি। তিনি কেবল ভারতের সনাতন বেদাশ্রয়ী ধর্মের প্রচার করেছিলেন। তবে রামকৃষ্ণ একাই যে কেবল ধর্মপ্রচার বা সন্ন্যাসের জীবন গ্রহণ করেছিলেন, সে-কথা কোনোভাবেই বলা চলে না।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'রামকৃষ্ণকে কোনো অর্থেই একজন মৌলিক চিন্তানায়ক, একটি নতুন মতবাদের আবিষ্কর্তা বা জাগতিক সংঘটনের এক নতুন ব্যাখ্যাকার হিসাবে গণ্য করা চলে না। কিন্তু তিনি এমন অনেক কিছু উপলব্ধি করেছিলেন যা

অন্য কেউ পারেনি। যেখানে ঈশ্বরের সাড়া কোনোভাবেই মেলার নয় সেখানেও তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি কবি, উচ্ছ্বাসময়, বা চাই কি তাঁকে স্বপ্নচারী মানুষও বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্নগুলি বাঁচিয়ে রাখার মতো এবং সেগুলি সহজেই আমাদের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ কোনো দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করেননি। তিনি কেবল সংক্ষিপ্ত কিছু বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন — হয়তো বক্তা তখন স্বপ্ন বা সমাধি দশায় থাকতেন কিংবা হয়তো সে-সময় তাঁর হুঁশও থাকত না, তবু লোকে সেইসব বাণী শুনতে আসত। আমরা যেটুকু জানতে পারি, তা থেকে এটা স্পষ্টত পরিষ্কার যে, শ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রবল ক্ষমতা ও দীর্ঘকালব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনার অভ্যাস প্রভৃতির ফলে তিনি স্নায়বিক উত্তেজনার এমন চরমে উঠে যেতে পারতেন যে, সে-সময় যে-কোনো মুহূর্তে তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারতেন বা তথাকথিত সমাধি বা অচৈতন্য দশাও প্রাপ্ত হতেন। এক এক সময় রামকৃষ্ণকে এক গভীর ঘুমে এত দীর্ঘসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখা যেত যে, তাঁর বন্ধুরা সভয়ে চিন্তা করতেন যে তিনি বুঝি আর কোনোদিন জেগে উঠবেন না। তাঁর মৃত্যুর সময় ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। হঠাৎ তাঁর সংজ্ঞালোপ হল এবং আর তাঁর জ্ঞান ফিরল না। কিন্তু মৃত্যুর শাসন শুধু তাঁর শ্বাসবায়ু এবং দেহের উপরেই স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর সত্তা, যা আর তাঁর নিজস্ব ছিল না, তা অচিরেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ ফিরে পেল। প্রপঞ্চময় জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আকারময় দেহের অস্তিত্ব ও আমিত্বের কুহেলি ভেদ করে, তিনি সেই শাশ্বত, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বা অনন্ত আত্মার সঙ্গে লীন হয়ে গেলেন।'

ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছে সেই রকম উপরোক্ত লেখকও স্বীকার করেন যে, রামকৃষ্ণ খুবই সাধারণ স্তরের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত অথবা ইংরেজি বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকলেও তিনি কিন্তু দর্শন বা জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে প্রভেদটা খুব সহজেই বুঝতে পারতেন এবং জ্ঞানী অপেক্ষা বেশি করে ভক্ত ও দেবীর উপাসক হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

২

বেলুড় মঠ এবং মঠের প্রতিষ্ঠাতা

এইরকম একজন মানুষের জীবনী ও বাণী তাঁর একান্ত অনুরক্ত এবং প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ অচিরেই ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমের পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী তাঁর শিষ্যবৃন্দ বর্তমানে একটি ক্রমবর্ধমান সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পারিবারিক নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্ভবত ১৮৮১ সাল নাগাদ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাটর্নির পেশায় নিযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ দত্ত নামক পরলোকগত জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮৬৩ সালে কলকাতা শহরে নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার স্কটল্যান্ড মিশন চার্চের স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং কালক্রমে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন।

তাঁর দু-জন ভাই ছিল। প্রথম জন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন কুখ্যাত *যুগান্তর* কাগজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই কাগজটিই বাংলার যুবমানসে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অঙ্কুর বপন করে। অবশ্য সরকার ১৯০৮ সালের মধ্যেই এগুলি দমন করেন। রাজদ্রোহের দায়ে ভূপেন্দ্রনাথই

সর্বপ্রথম অভিযুক্ত হন এবং এই জন্য ১৯০৭ সালে তিনি এক বছরের মেয়াদে কারাদণ্ড লাভ করেন। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি মুক্তি লাভ করার পর কিছুকাল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠে আত্মগোপন করে থাকেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ওই বছরের আগস্ট মাসে নিউইয়র্কে এসে উপস্থিত হন। তিনি নিউইয়র্কের 'ভারত ভবন'-এ এসে ওঠেন এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান সমালোচক মাইরন ফেলপস (Myron Phelps)[৪] এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত এবং বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত জনৈক ভারতীয়, গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসারের কাছে কবুল করেন যে, তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসার পথে প্যারিসে কৃষ্ণ বর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিনি জেনেছিলেন যে, কৃষ্ণ বর্মার বিশেষ আস্থাভাজন ভূপেন্দ্রনাথ বর্তমানে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ রকম আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। এ-সব কথা বাদ দিলেও রিপোর্টে আছে যে, এই ব্যক্তিটিই সম্ভবত বাংলার বিপ্লবী দলের সব চেয়ে বিপজ্জনক নেতৃবৃন্দের অন্যতম এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা থাকায় তিনি বিপ্লবী দলের গোঁড়া সদস্যদের কাছ থেকে এক ধরনের ধর্মীয় সম্মান লাভ করেছিলেন।

বিবেকানন্দের অন্য ভাই মহেন্দ্র বর্তমানে কলকাতায় বাস করছেন। নিজস্ব আয়-বিশিষ্ট এই ভদ্রলোক ইউরোপ, মিশর এবং পারস্য অঞ্চল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। কলকাতায় তাঁর বাড়িতে মিশনের একটি কেন্দ্র হয়েছে। ১৯০৯ সালে অপরাধ বিভাগের (Criminal Intelligence) অধিকর্তা (Director) রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে যে-প্রতিবেদনটি রচনা করেছিলেন সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করার পর, ১৮৯২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে-সময় তিনি কাথিয়াবাড় এলাকার বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করছিলেন এবং সেখানকার স্থানীয় রাজারা তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর ধর্মীয় বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মনে বড়ো একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, কিন্তু এটা লক্ষ করা গেছে যে, তিনি রাজনীতির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের গোড়ার দিকে মাদ্রাজ যান। সেই সময় শিকাগোতে ধর্মসভা আয়োজন করার প্রস্তাব চলছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া জাগায় এবং এই কারণে শিকাগোর ওই ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য মাদ্রাজ-নিবাসী হিন্দুরা তাঁকেই মনোনীত করেন। তাঁর ব্যয়-নির্বাহের জন্য হিন্দু সম্প্রদায় অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হন। মহীশূর এবং রামনাদের মহারাজগণ এই উদ্দেশ্যে চাঁদা দিয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালের মে মাসে শিকাগোতে পৌঁছে স্বামীজি শুনতে পেলেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই ধর্ম-মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে না। এই অন্তর্বর্তী সময়ে বন্ধুরা এগিয়ে এসে বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৩-র সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে তিনি বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করেন এবং এখন থেকে তিনি আমেরিকাতে বেদান্ত-ধর্মের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃত হলেন। ১৮৯৪-৯৫ এর মধ্যে তাঁকে সে-দেশ ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করতে দেখা যায় এবং এই সময় তিনি প্রভূতভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতেও সক্ষম হন। নিউইয়র্কে তিনি কয়েক মাস ধরে রোজই

অবৈতনিক ক্লাস নিতেন। মোট কথা তাঁর বিদেশযাত্রা অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। ১৮৯৫ সালে এবং তার আগের বছরে বিবেকানন্দ যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার জের হিসেবে ওই বছর সেই শহরে বেদান্ত-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দ ফিরে যাওয়ার পর, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ তথা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে এই সোসাইটির কাজ চালানোর জন্য ১৮৯৬ সালে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়। ইনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না, কেননা তিনি ১৮৯৮ সালেই ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে লন্ডনে বক্তৃতারত কালীচরণ চন্দ্র তথা স্বামী অভেদানন্দকে বেদান্ত-সোসাইটির তরফে নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। তিনি নিউইয়র্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বত্র বক্তৃতা দান করেন। তিনি ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বেদান্ত-সোসাইটিকে সমিতি আকারে সংগঠিত করেন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা জানান যে, পরবর্তী বছরগুলিতে অভেদানন্দের বক্তৃতা সভায় বিপুলসংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ হত। ১৯০৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সেন্ট লুই-এর জগৎ মেলায় ('World's Fair') অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে বেদান্ত-সোসাইটিকে তাঁরই উদ্যোগে সেখানে উপস্থাপিত করা হলে, আমেরিকায় অভেদানন্দের উপদেশাবলী সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ সালে ব্রুকলিন-এ একটি যোগকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং গোটা মরশুম ধরেই নিয়ম করে নানা স্থানে সাপ্তাহিক সভার আয়োজন করা হত। ওই বছর ওয়াশিংটন-এও একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করা হয়।

হুগলি জেলা-নিবাসী হরিপদ চ্যাটার্জী তথা স্বামী বোধানন্দের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে স্বামী অভেদানন্দ, ১৯০৬ সালের মে মাসে ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দেন। ওই বছরের মে মাসে স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দকে তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্ক-এ উপস্থিত হন।

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সোসাইটি, ১৩৫ নং ওয়েস্ট এইট্টিয়েথ স্ট্রিটের বাড়িটি কিনে সেখানে উঠে আসে এবং তদবধি এই প্রতিষ্ঠান সেখানেই রয়ে গিয়েছে। শহরের কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত এই বাড়িতে বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস নেওয়া, লাইব্রেরি করা বা ছাপাখানার কাজ চালানোর মতো অনেকগুলি ঘর ছিল। এ-ছাড়া এখানে ভারপ্রাপ্ত স্বামীজিদের থাকার মতো যথোপযুক্ত আবাসগৃহও ছিল।

১৯০৮ সালে অভেদানন্দ পুনর্বার লন্ডনে এসে সেখানে ছয়মাস ধরে বক্তৃতা দান করেন। এখানে তিনি বেদান্ত-সোসাইটির আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি প্যারিস-এও বক্তৃতা দেন এবং অল্পবিস্তর সাফল্যও অর্জন করেন।

অপরাধ বিভাগের অধিকর্তার মতে নিউইয়র্কের বেদান্ত-সোসাইটি, তার প্রকাশনা-বিভাগের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। প্রকাশনা-বিভাগ থেকে প্রায় চল্লিশখানি বই প্রকাশিত হয়। বেদ ও প্রাচ্য দেশের অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও, এই সংস্থা স্বামীজিদের বিভিন্ন বক্তৃতাগুলি সংকলন করে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহরগুলিতে *ব্রহ্মবাদিন্* ও *অ্যাওয়েকেন্ড ইন্ডিয়া* (Awakened India) নামক দুটি শীর্ষস্থানীয় বেদান্ত-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলি বিক্রয় ও প্রচারের জন্য সোসাইটি একাধিক কেন্দ্রও স্থাপন করেছিল।

উপরে উল্লিখিত নিউইয়র্ক, ব্রুকলিন এবং ওয়াশিংটন কেন্দ্রগুলি ছাড়াও, ১৯০৬ সালে সোসাইটি, ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো ও লস এঞ্জেলেস এবং ভ্যানকুভার-এও কয়েকটি নতুন শাখাকেন্দ্র উদ্বোধন করে। কলকাতার নন্দনবাগান অঞ্চলের অধিবাসী সারদাকুমার মিত্র তথা স্বামী ত্রিগুণাতীর্থ সানফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করতেন।[৫] তিনি অদ্যাবধি ওই কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন। ১৯০৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতেও একটি যোগকেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং গুরুদাস ব্রহ্মচারী নামে যিনি আত্মপরিচয় দিতেন সেই মি. হেলবম (Mr. Helbom) এটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে বহু ছাত্র এবং স্বামীজিরা বছরের এক সময়ে যোগাভ্যাস করবার জন্যই এই কেন্দ্রে এসে সমবেত হন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা মনে করেন যে, ১৯০৮ সালে মি. হেডলম (Mr. Heydlom) নামে পরিচিত যে আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে মায়াবতীতে বসবাস করতে দেখা গিয়েছিল, তিনিই ছিলেন এই যোগকেন্দ্রের পরিচালক। স্বামী অভেদানন্দর অসংখ্য উৎসাহী মহিলা অনুরাগীদের একজন ক্যালিফোর্নিয়ার এই শান্তি আশ্রমটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং উপদেশগুলির সমুদয় আধ্যাত্মিক-মাহাত্ম্য সত্ত্বেও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেদান্ত-ধর্মের কতিপয় ভণ্ড প্রচারক এবং এমনকী যাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তাঁরাও পশ্চিমের মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পাওয়া যাবে জেনেই, ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই সব কাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন।'

আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪-৯৫ সালে ডেট্রয়েট, বোস্টন, হার্ভার্ড এবং শিকাগো পরিভ্রমণ করেন।

আমেরিকায় তাঁর দু-জন শিষ্যকে মিশনের স্বামী হিসাবে বিধিমতো দীক্ষা দেওয়া হয়। এঁরা হলেন —

১) মারি লুইজি (Marie Lousie) তথা স্বামী অভয়ানন্দা নামক জনৈক ফরাসি ভদ্রমহিলা।

২) লিও স্যান্ডসবারি (Leon Sandsbury) তথা স্বামী কৃপানন্দ নামক একজন রাশিয়ান ইহুদি।

১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ত্যাগ করে ইংল্যান্ডের পথে যাত্রা করেন এবং ইংল্যান্ডের থিয়োসফিকাল সোসাইটির সদস্য মি. স্টার্ডির (Mr. Sterdy) সঙ্গে একত্র বসবাস করেন। এই স্থানেও তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজ বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করে। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller)-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

নীতি সম্মেলনে (Ethical Conference) যোগ দেওয়ার জন্য অতঃপর স্বামীজি ইংল্যান্ড থেকে জুরিখ-এ এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনি জার্মান বৈদান্তিক, অধ্যাপক ড্যাসন (Deussen)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কিয়েল-এ আসেন। লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সময় ড্যাসন তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর অগণিত অনুরাগীবৃন্দ তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য পিকাডেলির জলরং শিল্পীদের ভবনে (Institute of Painters in Water Colours) আয়োজিত একটি বিদ্বৎসভায় তাঁর উদ্দেশ্যে একটি মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ, শ্রী ও শ্রীমতী সেভিয়ার (Sevier) নামে দু-জন আমেরিকান এবং গডউইন (Godwin) নামে অপর একজন ইংরাজ ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এঁরা সকলেই তাঁর শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে তাঁকে কলম্বোতে স্বাগত-সম্ভাষণ জানানো হয় এবং ওই মাসের ২৬ তারিখে তিনি রামনাদের রাজা কর্তৃক পম্বনে মহা সমারোহে অভ্যর্থিত হন। ১৮৯৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং অন্যান্যরা তাঁকে মাদ্রাজ শহরেও সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানান। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং মি. হ্যারিসন (Harrison) নামে সম্ভবত জনৈক বৌদ্ধ, কলম্বোর সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে মনে হয়।

১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় পৌঁছোলে তাঁকে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-এর সভাপতিত্বে আহূত একটি বিশাল জনসভায় তাঁর উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ পাঠ করা হয়। লক্ষ করা যেতে পারে যে, তিনি ফিরে আসার পর তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য যে-সব আয়োজন করা হয়েছিল তাতে জাতীয় কংগ্রেসের অনেকেই যোগদান করেন। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজির একটি বক্তৃতা-সভায় কংগ্রেসের নিম্নলিখিত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন —শ্রী পি. আনন্দ চার্লু, শ্রী এ.এম. বসু, শ্রী গুরুপ্রসাদ সেন, শ্রী জে. ঘোষাল, শ্রী এন. ঘোষ এবং *ইন্ডিয়ান মিরর* (কলকাতা) পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন।

১৮৯৭ সালের মে মাসে, মঠের অপরাপর পাঁচজন সন্ন্যাসী সহ স্বামী বিবেকানন্দ, উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি লখনউ, আলমোড়া, দেরাদুন, নৈনিতাল, বেরিলি, শিয়ালকোট, লাহোর, অমৃতসর এবং অন্যান্য জায়গাগুলি পরিভ্রমণ করেন।

ফিরে আসার পর (১৮৯৮ সালে) স্বামী বিবেকানন্দ, হাওড়া জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী বেলুড়ে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং বেদান্ত-ধর্মের বাস্তব দিকটি প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে এইবারে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। একটি দোতলা বাড়ি বানিয়ে শিষ্যদের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হল এবং এখানেই তাঁরা বেদান্ত-দর্শনের পাঠ গ্রহণ করতেন। পূর্বে উল্লিখিত স্বামী অভেদানন্দ তথা কালীচরণ চন্দ্রের পিতা বাবু রসিকলাল চন্দ্র, একদা এই বাড়ি ও তার সংলগ্ন জমি সমূহের মালিক ছিলেন।

১৮৯৮ সালে চারজন বাঙালি শিষ্য ও চারজন ইংরেজ ও আমেরিকান মহিলা সহ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বারের জন্য উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। শেষোক্ত দলে ছিলেন মি. পিচার (Mr. Pitcher) এবং কুমারী নোবল (Miss Noble), যিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। এঁর বিস্তৃত জীবন-ইতিহাস পরে বর্ণিত হয়েছে। এঁরা সকলে নৈনিতাল, কাশ্মির এবং আলমোড়া পরিদর্শন করে ওই বছরের অক্টোবর মাসেই আবার কলকাতায় ফিরে আসেন।

এই সময় বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি বিশ্রামের জন্য দেওঘরে এসে উপস্থিত হন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টায় তিনি অল্প কিছুদিন পরেই লন্ডনের দিকে যাত্রা করেন। এ-সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন কুমারী নোবল এবং কলকাতার বোসপাড়ার বাসিন্দা হরিপদ চ্যাটার্জী তথা স্বামী তুরীয়ানন্দ।

জানা গিয়েছে যে, ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অল্প কিছুদিন ইংল্যান্ডে বাস করার পর স্বামীজি আবার আমেরিকায় চলে আসেন। নিউইয়র্ক শহরে তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান। এই স্থানে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যাত্রা করেন। ক্যালিফোর্নিয়াবাসী অগণিত বন্ধুদের একজন, মিশনের সাহায্যার্থে এই সময় তাঁকে ১৬০ একর জমি দান করেন।

ধর্মীয়-মহাসম্মেলনের তরফে প্যারিস প্রদর্শনীতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, আমন্ত্রণ পাওয়ার পর তিনি ফ্রান্সের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন।

১৯০০ সালের শেষাশেষি বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য আবারও ভাঙতে শুরু করে এবং তিনি সব রকম শ্রমসাধ্য কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯০১ সালের শেষাশেষি বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য আবারও ভাঙতে শুরু করে এবং তিনি সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯০১ সালের মার্চ মাসে তিনি ঢাকা যান এবং সেখান থেকে পরের মাসে শিলং-এ এসে পৌঁছোলে সেখানকার চিফ কমিশনার স্যার হেনরি কটন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি বেলুড়ে নিরিবিলিতে বাস করছিলেন। এখানেই ১৯০২ সালের ৪ জুলাই, ৩৯ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি ভারতীয় যুব দলের সদস্যদের প্রতি বছরেই কিছু কিছু সংখ্যায় জাপানে পাঠানোর প্রয়োজন উল্লেখ করে, তাদের বিচ্ছিন্নতা এবং জাত বাঁচানোর আগ্রহ, যা তাদের সমুদ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে, সেই সব গোঁড়ামির নিন্দা করেন।

মঠের আবাসিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শুনবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা, উন্মুক্ত বেলুড় মঠের প্রশান্ত প্রাঙ্গণে প্রতিদিন সমবেত হতেন। প্রাঙ্গণের যে-অংশে ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শেষকৃত্য নিষ্পন্ন হয়েছিল, সেইখানে একটি মন্দির নির্মিত হয়। এরই ঠিক বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরে বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-ক্ষেত্র। মঠের দুটি ঘরে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পোশাক, বিছানা, রন্ধনসামগ্রী এবং তাঁদের মূল রচনাবলীর কিয়দংশ, প্রভৃতি ব্যক্তিগত সামগ্রী সংরক্ষিত আছে। মঠের নিজস্ব উপাসনাগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বস্ত শিষ্যরা নিত্য তাঁর আরাধনা করে থাকেন।

৩

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষের অস্থিরতা

ভারতবর্ষের বিপ্লব-আন্দোলন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা মন্তব্য করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল না যেগুলি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর তাবৎ ধর্মগুলির পরিপূরক হিসেবে হিন্দুধর্মকে স্বকীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত

করতে চেয়েছিলেন। এইজন্য হিন্দুদের উপর খ্রিস্টানদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাকে তিনি নিজের ধর্ম-চেতনার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না।

এই প্রশ্নটি আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, পূর্বে উল্লিখিত, ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারণে স্বামী বিবেকানন্দের পরিবার, রাজদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। দুই ভাইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক-একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা যা অচিরেই বিদেশির অধীনতা থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হবে। আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে ভূপেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আদর্শ এবং বেদান্ত-দর্শনের শিক্ষা অনুযায়ী বিবেকানন্দ শুধু দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। বেদান্ত-দর্শনে আছে মানুষে মানুষে সাম্যের শিক্ষা এবং এর কোথাও নেই জাতি-বৈষম্যের বিধান, যা পরবর্তীকালে প্রাচীরের মতো ভারতবাসীকে এমনভাবে ঐক্যহীন ও দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছিল এবং যার ফলে ঐক্যবদ্ধ মুষ্টিমেয় ইংরেজ, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বামীজির উপদেশাবলীর এই বিশেষ তাৎপর্যটুকু তাঁর কিছু কিছু বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এখানে সেগুলি উল্লেখ করলে সুবিধা হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে, একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের উজ্জীবিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, 'ওঠ! জাগো! লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত গতি রুদ্ধ কর না। কলকাতাবাসী যুবগণ, তোমরা ওঠ, জাগ্রত হও, সুযোগ্য প্রহর সমাগত, আমাদের সম্মুখে সব কিছু ইতিমধ্যেই উন্মুক্ত; ভয় পেলে চলবে না, সাহস অবলম্বন কর ... ওঠ, জাগো! তোমার দেশের জন্যই এই দুর্জয় আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। যুবকদের দ্বারাই একাজ সম্ভব। যারা তরুণ, উদ্যমী, বলবান, সুদেহী এবং বুদ্ধিমান — এ কাজ কেবল তাদেরই জন্য এবং কলকাতায় এই রকম শত সহস্র তরুণ রয়েছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের বৃহত্তর অঞ্চলে গত বছর বহুল প্রচারিত বিপ্লবী প্রচারপুস্তিকা 'লিবার্টি' বিবেকানন্দের মন্ত্রবাণী দিয়েই শুরু হত — 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'

ওই একই বক্তৃতায় স্বামীজি এও বলেন যে, ভারতবর্ষের পতন ও দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে, সে নিজেকে সংকুচিত করে খোলার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং আমাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে। দেওয়া আর নেওয়া হল জীবনের ধর্ম। কিন্তু আমরা কি সব সময় পশ্চিমীদের পায়ের তলায় বসে সব কিছু মায় ধর্ম পর্যন্ত, খালি শিখতেই থাকব?

মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন সারস্বত সমাজে (Triplicane Literary Society) প্রদত্ত 'আমাদের কর্তব্য' (The work before us) শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজি আবারও বলেন যে, যে কারণগুলির জন্য ভারতবর্ষ অধঃপাতে যেতে বসেছে তাদের মধ্যে একটি হল এই যে — 'আমরা আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছি, আমাদের কর্মের পরিধিকে সঙ্কুচিত করে চলেছি। যে জাতি এক গ্লাস জল ডান না বাঁ হাত দিয়ে পান করতে হবে, এমনি সব গূঢ় সমস্যা নিয়ে অগুন্তি বছর ধরে আলোচনায় নিবিষ্ট, তার কাছ থেকে আপনারা আর কী-ই বা আশা করতে পারেন? একটা জাতির সর্বোচ্চ মনীষা, কয়েক-শো বছর ধরে শুধু রান্না ঘরের প্রসঙ্গ কিংবা নিছক

আমার তোমাকে ছোঁয়া উচিত, না তোমার আমাকে ছোঁয়া উচিত, আর সে-ধরনের ছোঁয়াছুঁয়ির প্রায়শ্চিত্তই বা কি, এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এসেছে — এর থেকে চরম অধঃপতনের আর কি থাকতে পারে? বেদান্তের মনীষা এবং ঈশ্বরের মহামহিমময় ও ভূমা স্বরূপ প্রকৃতি সম্পর্কে, পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় বেদান্তের উপদেশগুলি অর্ধলুপ্ত অবস্থায় মাত্র কতিপয় সন্ন্যাসী অরণ্য অঞ্চলেই টিকিয়ে রেখেছেন। আর জাতির বাকি অংশ পারম্পরিক ছুঁৎমার্গ, পোশাক এবং খাদ্যাদি-বিষয়ক গভীর সমস্যা নিয়ে মগ্ন রইল। তারপর ভালোই হোক আর মন্দই হোক, ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। আধিপত্য অবশ্য সব সময়েই খারাপ কেন না আধিপত্য হল (এক ধরনের) পাপ। বিদেশি শাসন যে অমঙ্গলময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অমঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেমন কখনো কখনো মঙ্গল সূচিত হয় তেমনি ভারতবর্ষে ইংরাজ আধিপত্যেরও একটা মঙ্গলময় দিক রয়েছে। ইংল্যান্ড তথা গোটা ইউরোপ তার সভ্যতার জন্য গ্রিসকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। ইউরোপের সব কিছুতেই গ্রিসের প্রভাব লক্ষণীয়। সেখানকার প্রতিটি বাড়ি, এমনকী প্রতিটি আসবাবের উপরেও গ্রিসের প্রভাব প্রকটিত। ইউরোপের শিল্প ও বিজ্ঞান গ্রিসিয় রীতির। আর আজ ভারতবর্ষের মাটিতে (ইংরেজ আধিপত্যের সুবাদে) প্রাচীন গ্রিকেরা এসে প্রাচীন হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটি ধীরে ও নীরবে ঘটেই চলেছে। আমাদের চারদিকে পুনরভ্যুত্থানের এই ব্যাপক এবং সঞ্জীবনী জোয়ার, এইসব নানা পরিস্থিতির একত্র সন্নিবেশের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমাদেরও সেই এক আদর্শ, ভারতবর্ষ আজ সমগ্রকে জয় করার প্রত্যাশী এবং আমাদের তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের প্রতিটি স্নায়ুকে সক্রিয় রেখে তৈরি হতে হবে — যাতে পুরোমাত্রায় অভীষ্টলাভ ঘটে। বিদেশিরা সৈন্য সমভিব্যাহারে এ-দেশ ছেয়ে ফেলুক, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। হে ভারত, তুমি তোমার আধ্যাত্মিকতার শক্তি নিয়ে দুনিয়া জয় করার জন্য জাগ্রত হও। এই দেশের মাটিতেই একদিন ঘোষিত হয়েছিল যে, হিংসা কখনো আপনাকে জয় করতে পারে না, ভালোবাসা দিয়েই হিংসাকে জয় করতে হয়। ঐহিকতার সাহায্যে ঐহিকের দুঃখভোগ জয় করা সম্ভব নয়। সৈন্য দিয়ে সৈন্যবিজয়ের প্রচেষ্টা শুধু সৈন্য সংখ্যাই বাড়িয়ে চলে আর তার ফলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে পশ্চিমকে জয় করতেই হবে। ক্রমে ক্রমে তারা নিজেরাও বুঝছে যে জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের দরকার অধ্যাত্মচেতনা এবং তার জন্যেই তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

ওই একই সিরিজে 'ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক স্বামীজি প্রদত্ত অপর একটি বক্তৃতাও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

এই অনুষ্ঠানে নানাবিধ মন্তব্য করার ফাঁকে বক্তা তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'ভারত সন্তান' নামে সম্ভাষণ করেন। তিনি বলেন যে, অতীতকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ এবং এই কারণেই তিনি তাঁদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান।

'আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে মহান ছিলেন সে-কথা আমাদের প্রথমেই স্মরণে আনা কর্তব্য। আমাদের অস্তিত্বের উপাদান অর্থাৎ আমাদের ধমনীতে কোন ধরনের রক্ত বয়ে চলেছে তা জানা দরকার। সেই রক্তের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রাখতে হবে, তার অতীতকে জানতে হবে। সেই শ্রদ্ধা এবং অতীত গৌরব সম্পর্কে সেই সচেতনতার বোধকে ভিত্তি করেই আমরা প্রাচীন

ভারতবর্ষ থেকেও মহিমময় আর এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলব। অবশ্য অতীতেও অধঃপতন ও অবক্ষয়ের যুগ ছিল। কিন্তু সে-সব যুগের প্রয়োজনও ছিল — আমি তাই সেগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না।' স্বামীজি বলেন, 'সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমরা সেই ঐতিহ্যের শিলাগাত্রে প্রথম সোপানটি রচনা করতে চাই এবং সেই বনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভারতকে গড়ে তুলতে হবে। আমরা সকল হিন্দু অর্থাৎ দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অথবা অদ্বৈতবাদী এবং শৈব, বৈষ্ণব ও পাশুপত প্রভৃতি যে-সম্প্রদায়েরই লোক হই না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা সাধারণ ভাবগত ঐক্য রয়েছে এবং এখন আমাদের নিজেদের স্বার্থেই, আমাদের স্বজাতির মঙ্গলের জন্যই এই সব তুচ্ছ কলহ ও মতবিরোধের ঊর্ধ্বে ওঠার সময় এসেছে। জেনো, এই সব কলহ একেবারেই নিরর্থক। আমাদের শাস্ত্রে এ-সবের নিন্দা করা হয়েছে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ-সব নিষেধ করে গিয়েছেন এবং যাঁদের রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত, এবং যে-সব মহান পুরুষদের উত্তরাধিকার আমরা দাবি করে থাকি তাঁরাও তাঁদের সন্তানদের এই সব তুচ্ছ বিরোধ নিয়ে দ্বন্দ্বে নিমগ্ন হতে দেখে ঘৃণা বোধ করেন।'

বক্তা এরপর দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতি যে উত্তর ভারতের আর্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সেই আলোচনায় প্রবিষ্ট হয়ে উল্লিখিত প্রচলিত মতবাদটি খণ্ডন করতে অগ্রসর হন। 'একটি মাত্র ব্যাখ্যা', তিনি বলেন, 'যা মহাভারতে পাওয়া যায়, তা হল এই যে, সত্য যুগের প্রারম্ভে একটিই মাত্র জাতি ছিল এবং তারা হল ব্রাহ্মণ, কিন্তু কালক্রমে বৃত্তির বিভিন্নতা অনুযায়ী তারা নিজেদের বিভক্ত রেখেছিল। প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে এই কথাই বলা হয়েছিল যে, অন্য সব জাতিগুলিকে পুনরায় সেই এক সাম্যদশায় ফিরে যেতে হবে। অতএব ভারতবর্ষের জাতিভেদ সমস্যাকে এমনভাবে সমাধান করতে হবে যাতে উচ্চ জাতিকে নীচে না নামতে হয় বা ব্রাহ্মণদের অবলুপ্তি ঘটে। উঁচুকে টেনে নামানোটা কোনো সমাধান নয়, বরং নীচুকে উপরে তোলার প্রয়োজন।'

অতঃপর স্বামীজি কি করে তুলনামূলকভাবে স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর মতে এটি সম্ভব হয়েছিল কেন না ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেকে একে অপরের চেয়ে ভিন্ন ইচ্ছার বশীভূত ছিল, আর ইংরেজরা সেই জায়গায় প্রতি জনের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংহত করতে সক্ষম হয়েছিল। 'এই সংহতির অর্থ অপরিসীম শক্তি। গোটা পৃথিবীতে এইভাবেই সব কিছু হয়ে এসেছে। আপনারা লক্ষ করে থাকবেন যে, ক্ষুদ্র অথচ সংহত জাতিগুলি এইভাবেই সর্বত্র বেঢপ আকৃতির জাতিগুলির উপর তাদের শাসন এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এসেছে। ... (সুতরাং) এই সব বিভেদকে আমাদের থামাতেই হবে।'

তিনি বলেন যে, ঠিক যে-ভাবে এতদিন ধর্মপ্রচার করে আসা হয়েছে সেই ভাবেই এখন থেকে প্রতিটি গৃহে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রচার করা উচিত। 'এই কাজটি সহজেই সিদ্ধ করা যেতে পারে। অতঃপর এইসব শিক্ষক এবং প্রচারকগণের সহায়তায় এই কর্মসূচিকে আরো ব্যাপক আকারে প্রসারিত করা যেতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে এই রকম নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হব। এই কাজের জন্য আমার

দরকার যুবশক্তি। বেদ বলেছেন, শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন যুবদলই কেবল মাত্র ঈশ্বর লাভে সক্ষম। আপনাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার উপযুক্ত সময় এখন সমাগত। আপনারা কি ক্লান্ত এবং অবসন্ন দেহে যৌবনের শক্তি শুধুই সঞ্চয় করে রাখবেন? সময় সংক্ষেপ, আপনারা জাগ্রত হোন। তুচ্ছ বিরোধে লিপ্ত থাকা বা আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখার চেয়ে জীবনে আরো অনেক বড়ো কাজ করবার আছে। নিজ জাতির উন্নতকল্পে আত্মোৎসর্গ করাটাই হল সব চাইতে বড়ো কাজ। জীবন বড়ো স্বল্পস্থায়ী এবং মৃত্যু সুনিশ্চিত হলেও আত্মা শাশ্বত এবং অবিনাশী। অতএব আসুন, আমরা একটা মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি এবং সেই আদর্শের জন্য আমরা জীবন সমর্পণে প্রস্তুত হই।'

মানিকতলা বোমা মামলার অনুসন্ধান চলা কালে জানা যায় যে, গোটা ভারত জুড়ে প্রচারক প্রেরণ করার জন্য স্বামীজি একসময় যে-প্রস্তাব করেছিলেন তা পরবর্তীকালে বারীন ঘোষ এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা (সম্পূর্ণরূপে) পালিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য স্বামীজির এই সময়কার আদেশ, পূর্ব বাংলার বিপ্লবীরা কীভাবে পালন করেছিলেন সে-কথাও এই রিপোর্টের পরবর্তী কোনো অংশে উল্লেখ করা হবে।

উপরে বর্ণিত স্বামীজির এই শিক্ষা ও মতাদর্শ তাঁর 'বর্তমান ভারত' নামক অন্য এক কৌতূহলোদ্দীপক বক্তৃতাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। এই বক্তৃতায় স্বামীজি শুধু ধর্ম বিষয়েই নিজের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি, পক্ষান্তরে স্বদেশে ভারতবাসীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তিনি নিতান্ত তীব্র ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলেন। তিনি প্রথমেই বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে ভারতবর্ষের পুরোহিত সমাজের ক্ষমতা কীভাবে ক্ষয় পেয়েছিল সেই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এ-দেশের পুরোহিতসমাজ ও রাজন্যবর্গ আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় অবিরত বিরোধে লিপ্ত ছিল এবং যুগান্তরের মধ্য দিয়ে এই বিরোধ শেষপর্যন্ত জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের পর চিরদিনের মতো প্রশমিত হয়েছে।

স্বামীজি বলেন, 'কিন্তু এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।[৬]

'এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম-কর্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই দুর্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি! আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।

'অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশির অধিকারস্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে। বারংবার ভারতবাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে। তবে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার-রূপ বিজয়-ব্যাপারকে এত অভিনব বলি কেন?

'... কিন্তু যে বৈশ্যকুল — রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত — মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার-অনুরোধে[৭] নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান রাজাগণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশিয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও

বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ও যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্বিত লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, "পামর, রাজসামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিস" — অচিরকাল মধ্যে ওই দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীরা যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-নামক বণিক্‌সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়া মানবজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, (ইহা) ভারতবাসী কখনো দেখে নাই!! ...

'এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের "যেন তেন প্রকারেণ" সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে।...

'কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক-স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

'তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।' [৮]

স্বদেশবাসীর বর্তমান অবস্থায় স্বামীজি যে, কি তীব্র মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর ওই একই বক্তৃতা থেকে গৃহীত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

'প্রজোৎপাদন ও "যেন তেন প্রকারেণ" উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের — ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

'ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন-প্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে।... এই সকল ভাবের মধ্যে (অর্থাৎ ইংরেজরা যেগুলি এদেশে প্রবর্তন করে) কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর — এ-দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।'

'... *ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাহার দীর্ঘ সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতেছে।*' [৯]

অতঃপর স্বামীজি আরো বলেন :

'সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনো প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নেই। সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও

বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহু কল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। ...ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা "নেটিভ" অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।... কিন্তু ইংরেজ-সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব "যেন তেন প্রকারেণ" ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির "গৌরব" সদা জাগরূক রাখা। এই হাস্যকর এবং নিতান্ত করুণ মনোভাব কি ভাবে ইংরাজের চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং এই মানসিকতাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাহারা কিরূপ তৎপরতার সহিত ব্যাপক কর্মপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছে তাহা দেখিলে যুগপৎ হাস্য ও চক্ষুবারি উদয় হয়। ...

'যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!

'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা — এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?'

বক্তা তারপর এই বলে শেষ করেন, '... হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামীজির বক্তৃতা এবং রচনাবলী থেকে এইরকম একই সুরের বহু অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু স্বামীজির শিক্ষার মূল নীতিগুলি বর্তমানকালের বিপ্লবী দলগুলিকে কী পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল এবং ভারতবর্ষের যুব মানসে বিপ্লব এবং নৈরাজ্যের বীজ বপন করার প্রয়াসে স্বামীজির বাণী ও রচনা সমূহ কীভাবে এইসব সমিতিগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, সে-সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বলা হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে এ-ও দেখানো হবে যে, মানিকতলা ষড়যন্ত্রের নেতা অরবিন্দ ঘোষের শিক্ষাদর্শও আসলে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুসরণেই রচিত হয়েছিল। বস্তুত তিনিও বাহুবল অথবা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আবেদন জানান এবং ভারতবর্ষের নব জাগরণের জন্য এর প্রয়োজনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

৪
ভগিনী নিবেদিতা

কুমারী নোবল তথা ভগিনী নিবেদিতা, যাঁর সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দের সেই অন্যতম প্রধানা শিষ্যা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে সুবিধামতো আলোচনা করা যেতে পারে।

ভগিনী নিবেদিতা নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই স্বামীজির কর্মকাণ্ডের রাজনৈতিক দিকগুলি, তাঁর প্রিয়পাত্রী শিষ্যাদের অন্যতমা এই মহিলার সংস্পর্শ-হেতু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

এই মহিলা ১৮৬৭ সালের অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এঁর বাবা ও মা উভয়েই ছিলেন আইরিশ। এঁর বাবা রেভারেন্ড এস.আর. নোবল (S.R. Noble) ছিলেন ধর্মসভার পুরোহিত (Congregational minister)। সম্ভবত ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কুমারী নোবল প্রথম স্বামীজির সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং পরের বছর তিনি ইংল্যান্ডে এলে আবারও তাঁর দেখা পান। এই সময়েই তিনি স্বামীজির কাজে সাহায্য করবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন এবং শেষপর্যন্ত ১৮৯৮-এর গোড়ার দিকে স্বামীজির সঙ্গেই তিনি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করেন। এই বছরে স্বামীজির সঙ্গে তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং এইভাবে আলমোড়ায় এসে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার সত্য স্বরূপ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এর পর তিনি রামকৃষ্ণ-সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষালাভ করেন, তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা মানে 'সমর্পিতা'। তাঁর একজন ভারতবাসী গুণগ্রাহী বলেন, ভারতের সেবায় তিনি যথার্থই নিবেদিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে একাকী অবস্থান করতেন। এইস্থানেই তিনি কিন্ডারগার্ডেনের আদলে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতীয় রীতি অনুযায়ী সাজসজ্জা করতেন এবং খালি মাথায় ও পাদুকা ছাড়াই চলাফেরা করতেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, তাঁর চরিত্র বড়ো ভালো ছিল না, একদল বাঙালি যুবকের সঙ্গে তিনি এক বাড়িতে থাকতেন এবং এই সব কারণে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ভারতীয় নাগরিকেরাও তাঁকে বিশেষ ভাল চোখে দেখতেন না। বাহ্যত তাঁর খরচ-খরচা রামকৃষ্ণ মিশনই জোগাতেন।

তার প্রথম সাহিত্যকীর্তি, *Kali the Mother,* ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালেও তিনি *Web of Indian Life* নামে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। *Pioneer* পত্রিকার ১২ মে ১৯০৫ সংখ্যায় এই বইয়ের একটি পর্যালোচনায় মন্তব্য করা হয় যে, এই বইটি প্রচ্ছন্ন ভাবে অল্পবিস্তর একটি রাজনৈতিক পুস্তিকা ধরনের এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রচার করা যে, ভারতবর্ষ কোনোক্রমেই একটি বহুধা-বিভক্ত জাতি বা ধর্মের এলোমেলো সংগঠন নয়, ভারতবর্ষ মানে একটি জাতি এবং এই বইতে সেই জাতীয় সত্তার প্রতি আবেদন জানানো হয়েছিল যাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তার ভবিষ্যতকে সার্থক করে তুলতে পারে। পুস্তক পর্যালোচক সব শেষে মন্তব্য করেন, 'ধূর্ততা, বইটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং এর বিষয়বস্তু আগাগোড়া দুরভিসন্ধিমূলক।' লক্ষ করা যেতে পারে যে, এই বইটিতে যে-সব আদর্শের কথা ভগিনী নিবেদিতা প্রচার করেছিলেন, সেগুলি তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব-উল্লিখিত শিক্ষাদর্শগুলিরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

স্বামীজির জীবদ্দশাতেই তাঁদের মধ্যে বাহ্যত কিছু মতবিরোধ দেখা দেয়। নিবেদিতা রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিলেন বলে স্বামীজি কয়েকবার তাঁকে ভর্ৎসনাও করেন। নিবেদিতা ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের উগ্র সমর্থক এবং 'বন্দেমাতরম'কে তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের (Bengal) বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন।

বন্দেমাতরম নামে যে রীতিমতো রাজদ্রোহাত্মক পত্রিকাটি পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়, সেখানে ১৯০৭ সালের একটি সংবাদে প্রকাশ পায় যে, *যুগান্তর* পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জন্য যে ক-জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জামিন দাঁড়িয়েছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ওই একই বছরে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপে যান এবং সংবাদে প্রকাশ যে, পরের বছর গোড়ার দিকে তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী গিরীন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে লন্ডনে একত্র বাস করেছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে বোসপাড়া লেনেই বসবাস করেন। এই সময়েই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁরা বলেন যে, যে-হেতু তাঁরা নিবেদিতার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় আপত্তি করেছিলেন, সেই জন্য নিবেদিতাই কিছুদিন আগে তাঁদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

১৯১১ সালে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়ে এবং তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর বিশেষ কিছু লাভ হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত ওই বছরের অক্টোবর মাসে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পরের বছর গোড়ার দিকে কলকাতার টাউন হলে তাঁর উদ্দেশ্যে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বিপিনচন্দ্র পাল, প্রভাসচন্দ্র দে এবং বিপ্লবী দলের অন্যান্য সুপরিচিত সদস্যরাও যোগদান করেন।

জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার যোগদান প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে একজন গুণমুগ্ধ ভারতীয় এই রকম মন্তব্য করেন :

'ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের (Bengal) জাতীয় আন্দোলনে তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব। সর্বশ্রী ব্লেয়ার (Blair) এবং র‍্যাটক্লিফ (S.K. Ratcliffe)-এর মতো দু-জন অভিজ্ঞ বিচারক এই অভিমত পোষণ করেন যে, অন্য যে-কোনো লোকের চেয়ে বাংলা দেশে (Bengal) তিনিই জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম হয়েছিলেন। মিঃ ব্লেয়ারের মতে অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি সম্ভবত পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদ-পত্রগুলির চাইতেও বেশি পরিমাণে কাজ করেছিলেন।'

শ্রীর‍্যাটক্লিফ (নিবেদিতার সঙ্গে) তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উল্লেখ করে পরবর্তীকালে *Daily News* পত্রিকায় লেখেন — 'তাঁর উচ্চারিত ও লিখিত বাণীগুলির মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদের ভাবধারা এত মনোগ্রাহী ও জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল।'

ভগিনী নিবেদিতা এবং (রামকৃষ্ণ) মঠের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে মঠের বর্তমান সেক্রেটারি সারদানন্দ সম্প্রতি মন্তব্য করেন :

'ভগিনী নিবেদিতা মিশনকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণেই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেন এবং কিছুদিন ধরে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে মিশন থেকে আলাদা হয়ে ভগিনী নিবেদিতা স্বাধীনভাবেই কাজ করেছিলেন।'

আগেই বলা হয়েছে যে, ভগিনী নিবেদিতা যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সর্বসাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যেই সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিবেদিতা যে সত্যিই সেই সময় মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তখনো কিছু সন্দেহ ছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা এবং ভগিনী ক্রিস্টিনা (Christina)-র বিভিন্ন কাজের উল্লেখ করে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সম্প্রতি, 'মিশনে মহিলাদের কাজ' (*Women's Work in the Mission*) শীর্ষক প্রকাশনাটিতেও এই সন্দেহের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়, কেননা এই পুস্তিকাতে ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সকল কাজের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তা ছাড়া পরলোকগত ভগিনী নিবেদিতার উজ্জ্বল স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের তরফেই 'ভগিনী নিবেদিতা স্মারক সমিতি' অর্থ সংগ্রহ করেছিল। উপরন্তু নিবেদিতার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরে *Bengalee* পত্রিকায় যে শীর্ষস্থানীয় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেও লেখক নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

'ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তিনি আগে থেকেই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি অধিকাংশ জননেতাকেই চিনতেন এবং পরিচিত লোকেদের শ্রদ্ধাও তিনি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে, যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের তিনি সব থেকে কর্মঠ সদস্য ছিলেন, সেটি স্পষ্টতই দুর্বল হয়ে পড়ল।

কুমারী গ্রিনস্টাইডেল (টেগার্ট লিখেছেন Greenstile) তথা ভগিনী ক্রিস্টিনা নামক যে আমেরিকান মহিলার কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে তিনি আজো বোসপাড়া লেনের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পর্দানশিন মহিলাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার (আরব্ধ) কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

৫

রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকা সমূহ

জীবৎকালেই স্বামীজি হিন্দুধর্মের শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত *উদ্বোধন* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। অদ্যাবধি চালু রামকৃষ্ণ মিশনের এই মুখপত্রটি প্রধানতঃ ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী এতে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় না। পত্রিকাটি রাজনীতি ব্যাপারে উদাসীন এবং এটি এই মত পোষণ করে যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে বরং জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তের শিক্ষা প্রচার করেই ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ সম্ভব করে তোলা যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিক্রম ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে লক্ষ করা যায়। এগুলির অনুবাদ নিম্নরূপ :

> তোমরা সকলে মোহাবিষ্ট হয়ে আছ। তোমাদের শাসককুল তোমাদের বলে, তোমরা নীচ, পরাধীন, শক্তিহীন এবং হাজার বছর ধরে তোমরাও ভেবে এসেছ, তোমরা নীচ, অপদার্থ এবং পরাভূত মানুষের দল। আর এইসব নিয়ে নিরন্তর আত্মবিলাপের ফলেই তোমরা নিজেদের যা ভাবো, তা-ই হয়ে পড়েছ। তোমাদেরই দেশের মাটি দিয়ে আমারও এই দেহ তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো নিজেকে ভাবতে শিখিনি। তাই সেই একই মানুষ, যারা আমাদের সবাইকে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তারাই আজ আমাকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করছে। তোমরা যদি এমন চিন্তা করতে পারো যে, তোমাদের মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি, জ্ঞান এবং অমিত বীর্য এবং তোমরা যদি তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারো, তা হলে আমি যা হয়েছি তোমরাও তাই হতে পারবে।
>
> কেবল উচ্চস্বরে চিৎকার করে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে না। এখন প্রয়োজন শাণিত কৃপাণ আর মরণপণ সংগ্রামের। এখন মাতৃস্বরূপা কালী, মহাবীর (অর্থাৎ হনুমান বা হনু দেবতা) এবং ধনুর্ধারী রামকে পূজা করা প্রয়োজন। মায়ের পূজার জন্য চাই রক্ত-নরবলি।

মায়াবতী এবং মাদ্রাজ শাখা মিশন থেকে যথাক্রমে *প্রবুদ্ধ ভারত* এবং *ব্রহ্মবাদিন্* নামে দু-খানি ইংরেজি মাসিকপত্রও প্রকাশ করা হয়। এগুলি ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর মিশনের পরিচালন-ভার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর অর্পিত হয়, তিনি এর প্রেসিডেন্ট হন এবং এখনো সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। এঁর প্রকৃত নাম রাখালদাস ঘোষ, নিবাস, ২৪-পরগনার বসিরহাট। ১৮৮০ সাল থেকেই তিনি মিশনের সভ্য।

পূর্বে উল্লিখিত স্বামী সারদানন্দ মিশনের সেক্রেটারি হয়েছিলেন এবং অদ্যাবধি সেই পদে বহাল আছেন।

কালক্রমে বেলুড়ের কেন্দ্রীয় মিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও অনুমোদিত বিভিন্ন শাখা-আশ্রমগুলি (নিম্নলিখিত) স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —

১। মাটিগঞ্জ, এলাহাবাদ : এই কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত শিব আশ্রম, দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎসাব্যবস্থা চালু করেছিল।

উপরোক্ত ধরনের অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও (নিম্নলিখিত) স্থানে খোলা হয়েছিল—

১। বেনারস সিটির অন্তর্গত লঙ্কর।
২। বংশীবট, বৃন্দাবন, মথুরা।
৩। শাহারাণপুরের অন্তর্গত কনখল।
৪। বরিশাল (রামকৃষ্ণ মিশন)।
৫। মুর্শিদাবাদের সরগাছি (মিশন অনাথ আশ্রম)।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে আবার মঠ কর্তৃক স্বীকৃত শাখাকেন্দ্রও খোলা হয়েছিল, যথা —

১। রামকৃষ্ণ হোম, মাইলাপুর, মাদ্রাজ।
২। রামকৃষ্ণ আশ্রম, গোল টেম্পল রোড, বাঙ্গালোর সিটি।
৩। অদ্বৈত আশ্রম, বেনারস।
৪। আলমোড়ার অদ্বৈত আশ্রম এবং মায়াবতী।
৫। কলকাতার ১২ ও ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে শ্রী (সারদা) মায়ের কলকাতাস্থ বাসভবন এবং *উদ্বোধন*।

শ্রীশ্রীমা অর্থাৎ সারদামণি দেবী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপত্নী। এঁর জীবনবৃত্তান্ত ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি এখনো রয়েছে এবং বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এইগুলি সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এগুলি ছাড়াও গোটা বাংলা দেশ (Bengal) জুড়ে অসংখ্য রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন লাভের জন্য আবেদনও করেছে, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এখনো (এদের মধ্যে কাউকেই) অনুমোদন দেওয়া হয়নি। ব্যাপারটি নিয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৭

বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ

১৯০৬ সালে যখন পূর্বে উল্লিখিত অভেদানন্দ স্বামী আমেরিকা থেকে হাওড়ায় এসে উপস্থিত হন, সেই সময়েই মিশন সম্পর্কে সর্বপ্রথম (সকলের) দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চরমপন্থী দলের অনেক সদস্য ওই দিন হাওড়া রেল স্টেশনে এসে অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি সহযোগে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এই মানুষটি আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাসমূহ *ভারত ও তার অধিবাসী* এই শীর্ষনামে ওই একই বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বইটি বহুলাংশে আপত্তিজনক এবং কয়েক স্থানে স্পষ্টত রাজদ্বেষে পূর্ণ। বোম্বাই সরকার, প্রেস-অ্যাক্টের বলে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, স্বামী প্রেমানন্দকে তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য সঙ্গে নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ ওই বছরেই নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। অভেদানন্দ এখনো আমেরিকাতেই রয়েছেন এবং জানা গিয়েছে যে, নিউইয়র্কের নিকটবর্তী একটি কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে এবং সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারও এ-বিষয়ে তদন্ত করে দেখেছেন।

মানিকতলা বোমা মামলায়, অনুসন্ধানকালে মিশন আবার পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষড়যন্ত্রকারীদের হোতা অরবিন্দ ঘোষ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন :

> একসময় আমি বেদান্তদর্শনভিত্তিক এমন এক ধর্ম আন্দোলনের কথা ভেবেছিলাম যা ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা অবধি ছড়িয়ে পড়বে। আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম এবং এখনো করি যে, বৈদান্তিকতার মধ্যেই পৃথিবী তার ভবিষ্যৎ ধর্ম খুঁজে পাবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আমি কয়েকটা মাস কঠোর পরিশ্রম করি এবং এই ব্যাপারে আমি আমার কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত মহলের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।

এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য অরবিন্দ, বরোদায় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভবানী মন্দির' নামে একটি প্রচারপুস্তক প্রকাশ করেন। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় এই বইটি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এই বইয়ে, পাহাড়ের উপর মা ভবানীর নামে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। 'এই পবিত্র কাজে সাহায্য করবার জন্য মায়ের সকল সন্তানের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছিল।' পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের

ফলে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, রেওয়ার কাছে অমরকন্টকেই অরবিন্দ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। লেখকের (অরবিন্দের) সংজ্ঞা অনুযায়ী ভবানী হলেন অনন্ত শক্তিস্বরূপা, তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, রাধা, দয়িতা, লক্ষ্মী, তিনি মা এবং নিখিল প্রাণীজগতের স্রষ্টা। ভবানীই শক্তি।

তিনি বলেন, শক্তির অভাবেই আমরা ভারতবর্ষে সব কিছুতেই হার স্বীকার করে চলেছি। শক্তির অভাবে আমাদের উদ্যমও আজ মৃতপ্রায়। শক্তি বিনা আমাদের ভক্তিও আর প্রাণে সাড়া জাগায় না।

এইভাবে তাঁর প্রতিটি বক্তব্য সবিস্তার আলোচনা করার পর লেখক (অরবিন্দ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষকে এখন কেবলই শক্তিসঞ্চয় করতে হবে—

> আমরা যতই গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করি ততই আরো বেশি করে বুঝতে পারি যে, এখন শুধু একটি জিনিসেরই অভাব, এবং সেটি আমাদের সর্বাগ্রে অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে — শক্তি। দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি তো বটেই, কিন্তু সর্বোপরি চাই আত্মিক শক্তি যা অন্যান্য প্রতিটি শক্তির অনন্ত এবং অবিনাশী উৎসস্বরূপ। শক্তির অভাবে আমরা এমন এক স্বপ্নাবিষ্ট মানুষে পরিণত হয়েছি যে, হাত থাকা সত্ত্বেও সেই হাত দিয়ে আমরা আঘাত হানতে পারি না কিংবা পা থাকা সত্ত্বেও আমরা পদ-সঞ্চালনে অক্ষম। স্থবির ইচ্ছাশক্তি এবং বার্ধক্যের ভারে আনত ভারতবর্ষকে আমাদের জাগিয়ে তুলতেই হবে।

লেখক আরো দেখিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষকে যথার্থই জাগিয়ে তোলা সম্ভব। ভারতবর্ষ ক্ষয়িষ্ণু, রক্তশূন্য, নির্জীব এবং এতই দুর্বল যে ধ্বংসই তার অনিবার্য নিয়তি — এগুলি অলস এবং নির্বোধ ধারণামাত্র। লেখক বলেন :

> জাতি কি? জনগণের শক্তি!

জাতি কাকে বলে? আমাদের দেশমাতৃকা বলতেই বা কী বোঝায়?

দেশ মানে এক টুকরো মাটি বা নিছক কথার কথা অথবা স্রেফ মনের একটা কল্পনামাত্র নয়। এ হল এক অপরিসীম শক্তি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে যে একটা জাতি গঠিত হয়, এ হল তাদেরই সম্মিলিত শক্তি, এ যেন সেই ভবানী মহিষমর্দিনী যাঁর আধারে স্ফুরিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ দেবতার মিলিত তেজোপুঞ্জ। যে-শক্তিকে আমরা ভারতবর্ষ বলি, তিনি হলেন ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মূর্তিমান ঐক্যের শক্তি — ভবানী ভারতী। তিনি আজ স্থাণুবৎ, তাঁর সন্তানদের অজ্ঞতা এবং স্বেচ্ছারোপিত স্থবিরতা ও তমসার মায়াগণ্ডির অভ্যন্তরে তিনি আজ বন্দি। এই তমসা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের অন্তঃস্থিত ব্রহ্মকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

> আমাদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে আমরা নিজেদের জাতি হিসেবে গড়ে তুলব না নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

হাজার হাজার পবিত্র মানুষ, সাধু এবং সন্ন্যাসী, তাঁদের জীবনব্যাপী, একান্ত নীরবে আমাদের কী শিখিয়ে গেলেন? ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন-সাধনা কোন মহান বাণী প্রচার করে গেল? সিংহ-হৃদয় বিবেকানন্দের বাগ্মিতার মধ্যে কী এমন জিনিস ছিল যা দুনিয়া কাঁপিয়ে

দিয়েছিল? এ-হল সেই জীবন্ত ঈশ্বর যিনি এই ত্রিশ কোটি মানুষের প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজমান। যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাট থেকে আরম্ভ করে তাঁর আজ্ঞার দাস, শ্রমিক অথবা ত্রি-সন্ধ্যাচারী ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সকলের কাছে তাড়া খাওয়া পথের কুকুর পর্যন্ত, সকল প্রাণীর অন্তরে অধিষ্ঠান করেন। আমরা সকলেই (একাধারে) ঈশ্বর এবং স্রষ্টা, কেননা আমাদের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের তেজ এবং আমাদের সমগ্র জীবন ব্যেপে রয়েছে সৃষ্টির প্রকাশ — সৃষ্টি মানে শুধু নতুন একটি আকৃতির জন্ম নয়, সৃষ্টি মানে স্থিতি, সংহারও বটে। আমরা, কী সৃষ্টি করব, তা শুধু আমাদেরই উপর নির্ভর করছে, কেননা আমরা যদি নিজেরাই তাই চাই তো আলাদা কথা, তা না হলে আমরা কেউ-ই নিয়তি বা মায়া নিয়ন্ত্রিত ক্রীড়নক নই, আমরা সেই অনন্তবীর্য শক্তিরই অংশ এবং বহিঃপ্রকাশ।

ভারতবর্ষকে নতুন করে জানতেই হবে কেননা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বার্থেই তার নবজন্মের প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ মরতে পারে না, আমাদের জাতি কখনো ক্ষয় পেতে পারে না। কেননা সকল শ্রেণীর মনুষ্যকুলের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেরই উপরে অর্পিত রয়েছে মানুষের ভবিষ্যৎকে সার্থক করে তুলবার বিধি-নির্দিষ্ট চমকপ্রদ এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার। ভারত আত্মার অন্তর থেকেই জন্ম নেবে গোটা পৃথিবীর আগামী দিনের ধর্ম — সেই প্রাচ্যের ধর্ম যা সমস্ত বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মমতের সমন্বয় ঘটিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে রাখবে। নীতি-জগতেও একইভাবে ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বকে ম্লেচ্ছত্ব বা বর্বরতা থেকে মুক্ত করে সমগ্র পৃথিবীতে আর্য-সভ্যতার উন্মেষ ঘটাবে। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই পুনরায় আর্য-সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

মানবজাতির উপর অর্পিত সর্বকালের মহত্তম এবং আশ্চর্যজনক দায়িত্বস্বরূপ এই মহান কাজটি আরম্ভ করে দেওয়ার জন্যই ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল এবং বিবেকানন্দও সেই জন্যই ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এইভাবে যে-সম্ভাবনা নিয়ে কাজটি শুরু হয়েছিল তা যদি আর না এগোয় তা হলে তোমরাই, তার জন্য দায়ী — তোমরা যারা ভীরুতা, সন্দেহ-সংশয় আর অলসতার তিমির তমসায় পুনরায় নিজেদের সমাচ্ছন্ন করে রেখেছ। আমরা (অর্থাৎ) আমাদের মধ্যে অনেকেই এই দু-জনের একজনের কাছ থেকে লাভ করেছি ভক্তি, অন্যজন জুগিয়েছেন জ্ঞান — কিন্তু শক্তির অভাবে, কর্মের অভাবে, আমরা আমাদের ভক্তিকে জীবন্ত করে তুলতে পারিনি। আমরা যেন এখনো স্মরণে রাখি যে, যিনি কালী, তিনিই ভবানী, শক্তিদায়িনী মা, যাঁকে রামকৃষ্ণ পূজা করতেন এবং যাঁর মধ্যে তিনি লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতের ভাগ্য মাত্র কয়েকজন লোকের ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য থমকে যাবে না। মানুষ জেগে উঠে তাঁর পূজা শুরু করুক এবং দিগ্বিদিকে তা ছড়িয়ে দিক — এটাই হল জগদম্বার ইচ্ছা। শক্তি লাভ করতে হলে শক্তিস্বরূপা জগদম্বাকে পূজা করার প্রয়োজন। শক্তি! আমাদের জাতির চাই শক্তি। শক্তি এবং অধিকতর শক্তি।

অতঃপর বিবেকানন্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অরবিন্দও জাপানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, আধুনিক কালে জাপানে যে-রকম অভূতপূর্বভাবে শক্তির উন্মেষ ঘটেছে সে-রকম চমকপ্রদ আর একটিও উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অর্জুন যেমন অনায়াসে ও অপ্রতিহতভাবে তাঁর গাণ্ডীব ধারণ করেছিলেন, সেই রকম ভাবে বর্তমানের দ্বীপময় সাম্রাজ্য জাপানও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অমোঘ অস্ত্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে চলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে জাপানের ওয়েমাই-এর বেদান্তের শিক্ষা এবং শিন্টো-ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে। এ-সবের জন্যই মিকাডো-র পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা জাতীয় শক্তির আরাধনা পুনরায় প্রচলিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বৃহত্তর প্রয়োজন আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের ...

জাপানের চাইতে ভারতবর্ষকে অনেক বেশি পরিমাণে ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করতে হবে। কারণ যে-শক্তি তার ইতিপূর্বেই ছিল তাকেই সঞ্জীবিত এবং সম্পূর্ণ করা ছিল জাপানের (একমাত্র) প্রয়োজন। সেই শক্তি আমাদের ইতিপূর্বে ছিল না, কিন্তু তাকেই আমাদের সৃষ্টি করতে হবে, আমাদের (সমগ্র) প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন করতে হবে, (যাতে) আমরা নতুন হৃদয়ের নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি, আমাদের পুনর্জন্ম ঘটে।

লেখক মন্তব্য করেন যে, ভারতবর্ষের প্রতিটি নবজাগরণ এবং তার ইতিহাসের প্রতিটি গৌরবময় এবং মহামহিমময় অধ্যায়ে সে কোনো-না-কোনো যুগান্তকারী ধর্ম আন্দোলনের স্রোতোধারাতেই পুষ্টি সঞ্চয় করে এসেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন ভারতবর্ষের এখন তিনটি জিনিসের প্রয়োজন এবং এগুলি তিনটি প্রধান অনুশাসনের পরিপূরক :

১. ভক্তি তথা মাতৃমন্দির

শক্তিস্বরূপা মা-এর আরাধনা বিনা আমরা কিছুতেই শক্তিসঞ্চয় করতে পারব না। শ্বেত ভবানী তথা শক্তিস্বরূপিনী ভারতজননীর জন্য আমাদের তাই একটি মন্দির গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক শহরগুলির মলিন পরিবেশ থেকে বহুদূরে এমন একটি স্থানে আমরা এই মন্দির গড়ে তুলব যেখানে এখনো বহুল পরিমাণে মানুষের চলাচল শুরু হয়নি, যেখানে শুধুই খোলা বাতাস, প্রাণের উৎসাহ আর শান্তির একাধিপত্য। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই মায়ের পূজা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং চতুর্দিকের এই পাহাড়ের মাঝখানে পূজা লাভে তুষ্টা জননী অচিরাৎ তাঁর পূজারিদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের ভিতর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বেন। জগদম্বার নিজেরও সেই রকম ইচ্ছা।

২. কর্ম তথা একটি নতুন ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়

কিন্তু পূজার্চনাও নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে যদি না তাকে কর্মের মধ্যে রূপান্তরিত করা হয়।

মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠে আমাদের তাই নতুন একটি কর্মযোগী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে—সেখানকার প্রতিটি মানুষ মায়ের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে একত্রিত হবে। আশ্রমের কেউ কেউ ইচ্ছা করলে পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশই থাকবেন ব্রহ্মচারী হয়ে এবং আরব্ধ কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁরা গার্হস্থ্য-আশ্রমে ফিরে আসতে পারবেন। তবে সকলকেই সংসার ত্যাগ করতে হবে। কেন? প্রধানত দুটি কারণে :

১) কেননা ঠিক যে পরিমাণে আমরা বস্তুজগতের আলস্য, আকাঙ্ক্ষা, লালসা এবং রতি-সম্ভোগ অথবা দেহজ কামনা এবং সুখানুসন্ধান থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারব ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা আমাদের অন্তঃস্থিত অধ্যাত্মশক্তির মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হতে পারব।

২) কেননা, শক্তির উন্মেষের জন্য চাই পূর্ণ একাগ্রতা — বর্শাকে যেমন লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, মনকেও সেই রকম লক্ষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নিবিষ্ট রাখা দরকার। নানারকম চিন্তা এবং বাসনা এসে যদি মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে, তা হলে বল্লমটি তার সরল গতিপথ থেকে চ্যুত হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আমরা চাই এমন মনুষ্যসত্তা যার মধ্যে শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে, যে-সত্তার প্রতিটি অণু, শক্তির প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে পৃথিবীকে উর্বর করে তুলবে। হৃদয় এবং মস্তিষ্কে ভবানীর তেজোরাশি সংগ্রহ করে এই সব মানুষগুলি গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেই তেজোপুঞ্জ ছড়িয়ে দেবে।

৩. জ্ঞান, তথা পরম বাণী

জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠলে ভক্তি এবং কর্ম কখনই পূর্ণ হয় না, সার্থক হয়ে ওঠে না।

ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে তাই এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা জ্ঞানরূপ শিলাখণ্ডের উপর ভিত্তি করে তাদের সকল কর্মসাধনাকে গড়ে তুলতে পারে, যাতে তাদের নিজেদের আত্মাও জ্ঞানার্জনের দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কী হবে সে-জ্ঞানের ভিত্তি? কেন, সেই সোহহম মন্ত্র? বেদান্তের সেই শক্তি-মন্ত্র, সেই শাশ্বত উপদেশ যাকে জাতির হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ এখনো সমাপ্ত হয়নি, সেই জ্ঞান যা কর্ম এবং ভক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত হলে তবেই মানুষ সর্বপ্রকার ভীরুতা এবং দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

'ভবানী মন্দির' নামে এই প্রচার পুস্তিকাটি থেকে কিছু সবিস্তার উল্লেখ করা হল, কেননা ভারতবর্ষের বর্তমান বিপ্লব আন্দোলনের যিনি হোতা এবং যাঁকে এই আন্দোলনের প্রবক্তা বলা যেতে পারে সেই অরবিন্দ ঘোষ কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শগুলি গ্রহণ করে যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্করণ সহ সেগুলিই আবার বিপ্লবের মন্ত্র হিসেবে তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, তার নমুনা এই বইয়ের ভাষায় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। অরবিন্দের মতে, শক্তি তথা বীর্য এবং কর্ম তথা সাধনার অভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কাজগুলি ঠিক যে-ভাবে শুরু হয়েছিল সেই মতো আর এগোতে পারছে না। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষের পুনর্জন্ম এবং জাগরণের পর তার ত্রিশ কোটি অধিবাসীর মিলিত উদ্যমকে কর্মে রূপান্তরিত করে তার মুক্তি সম্ভব করে তুলতে হবে। প্রসঙ্গত একটি সঠিক উদাহরণ দেওয়ার জন্য অরবিন্দ জাপানের বিস্ময়কর (অগ্রগতির) কাহিনী উল্লেখ করেছিলেন। স্বামীজি নিজেও ইতিপূর্বে তাঁর বক্তাদের কাছে জাপানের উদাহরণ উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু oyomei-এর বেদান্তের শিক্ষা, শিন্টো-ধর্মের পুনরভ্যুদয়, মিকাডোর বিগ্রহ ও ব্যক্তিসত্তাকে অবলম্বন করে জাপানে জাতীয় শক্তি আরাধনার বিকাশ (ইত্যাদি)

গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে কীরকম তুলনারহিতভাবে, সে দেশে সহসা 'শক্তির পুনর্জাগরণ' ঘটিয়েছিল, সে-দিকে অরবিন্দই প্রথম (সকলের) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মানিকতলা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেবলমাত্র অরবিন্দই যে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, এমন কথা বলা চলে না। আলমোড়ার মায়াবতী আশ্রমটির দ্বার সমুদয় সত্যসন্ধীদের জন্য পরলোকগত স্বামী স্বরূপানন্দ কর্তৃক পরম আতিথেয়তা সহকারে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখা হত। যে-সব শিষ্যেরা তাঁর আতিথেয়তার সুযোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মানিকতলা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, যাঁকে ওই একই মামলায় দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এঁরা দুজনেই আলমোড়ার আশ্রমের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগের কথা স্বীকার করে জানান যে, এখানে তাঁরা দু-জনেই সন্ন্যাসীজীবনে দীক্ষা লাভ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু শিক্ষানবিশি শেষ হওয়ার আগেই ওই স্থান ত্যাগ করেন। বাংলা দেশের (Bengal) কয়েকজন বিপ্লবী বোম্বাইতে এসে উপস্থিত হলে সে-সময় তাঁদের যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই বোম্বাই-নিবাসী রামচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে এই আশ্রমেই তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওই একই মামলায় (মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র) হাইকোর্টের কাছে আবেদনক্রমে যিনি শেষপর্যন্ত নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছিলেন, বিপ্লবী দলের সেই অন্যতম সদস্য ইন্দ্রনাথ নন্দীও নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এই আশ্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আশ্রমটি সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের দু-জন আমেরিকার শিষ্য ক্যাপ্টেন এবং শ্রীমতী সেভিয়ার (টেগার্ট লিখেছেন Siever) এর দ্বারা পরিচালিত হত। শ্রীসেভিয়ার ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান, কিন্তু শ্রীমতী সেভিয়ার অদ্যাবধি সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন। ফৌজদারি গোয়েন্দা দপ্তরের অধিকর্তার (Director, Criminal Intellignece) মতে, শোনা যায় যে, মায়াবতী আশ্রমে শিক্ষালাভ করেও যারা নিজেদের সেই শিক্ষার অযোগ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিল সেই রকম কিছু লোকের অস্তিত্ব টের পেয়ে এই মহিলা যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বাহ্যত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে এই মহিলা পুণায় উপস্থিত হয়ে তিলকের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তবে তাঁর আমলে মায়াবতী আশ্রমে রাজদ্রোহ লক্ষিত হয়নি।

মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অপর যে তিনজন সম্পূর্ণরূপে ছাড়া পেয়েছিলেন, যথা কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বসু এবং শচীন্দ্রকুমার সেনও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শেষোক্ত দু-জন এখন পুরোপুরিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। প্রথমজন প্রজ্ঞানানন্দ এবং শেষোক্তজন শচীন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। শোনা যায় যে, তাঁরা পুরোনো মতাদর্শ এবং সহকর্মীদের সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে পুরোপুরি ভাবে ধর্মজীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাদ্রাজের মাইলাপুর শাখা আশ্রমটির সঙ্গে কুঞ্জলাল সাহা যুক্ত ছিলেন।

মানিকতলা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ভবভূষণ মিত্র নামক অপর এক ব্যক্তি বেলুড় মঠে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এই মামলার বিচার চলাকালীন অন্য আর একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের কাছে একটি বিবৃতিতে ভবভূষণের সঙ্গে বেলুড় মঠের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন।

মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধানে, যে-ক-টি খানাতল্লাসি চালানো হয়েছিল, তার ফলে বেলুড় মঠের শিক্ষা, তৎকালীন বিপ্লবী যুব-সম্প্রদায়ের মনে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-বিষয়ে কিছু নতুন আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। এই তল্লাসির ফলে জানা গিয়েছে যে, ১৯১০ সালে বাংলা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ কলকাতা অনুশীলন সমিতি নামক বিপ্লবী সংস্থাটির সঙ্গেও বেলুড় মঠের যোগাযোগ ছিল।

১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলার সুবাদে জাতীয় ছাত্রাবাস নামে পরিচিত ১১৭ নং আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে তল্লাসি চালানো হয়েছিল। এই ছাত্রাবাস থেকে যে-সমস্ত সাক্ষ্য-বস্তুগুলি (exhibits) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা থেকে প্রমাণ হয় যে, ছাত্রাবাসের কয়েকজন আবাসিক অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং এটাও বোঝা গিয়েছিল যে, ছাত্রাবাসটি বিপ্লবী এবং ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান আস্তানা ছিল। (অনুসন্ধানে) প্রাপ্ত কুলচাঁদ সিংহ রায় নামক জনৈক ছাত্রের ১৯০৭ সালের এক দিনের তারিখ অঙ্কিত একটি এক্সারসাইজ খাতায় অনুশীলন সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ-ও জানা যায় যে, ন্যাশনাল কলেজের প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে (বেলুড়) মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিলেন। খাতার অন্য এক জায়গায় আগের কোনো এক সময়কার মঠ পরিদর্শনের কথাও উল্লিখিত হয়েছিল এবং এটিকে বিপ্লবী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল এই রকম ইঙ্গিতও দেওয়া হয়। বর্তমানে বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত (একদা) বোসপাড়া লেন নিবাসী তুলসীচরণ দত্ত তথা স্বামী নির্মলানন্দের কয়েকটি মন্তব্য এই খাতায় টুকে রাখা হয়।

এই অনুষ্ঠানে (স্বামীজির জন্মজয়ন্তী) নির্মলানন্দ শারীরিক ব্যায়াম এবং উচ্চতর গণিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শ্রোতাদের বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং (প্রয়োজন হলে) সেখানকার দুরূহ অংশগুলি ব্যাখ্যা করে দেওয়ার জন্য ছাত্রদের তাঁর কাছে আসতে বলেন। এরপর তিনি আরো বলেন, 'আমরা চাই ছেলেদের দল। দুর্বল সাবালক বা বুড়িয়ে যাওয়া এবং ঝিমিয়ে পড়া বালক নয়, উদ্যমী ছেলের দল। কাজের প্রয়োজনে এই সব বালকদের সংগ্রহ করো। এই মঠ তো তোমরাই ব্যবহার করবে। ছার দেশের মুক্তি, তোমরা ইচ্ছে করলে গোটা দুনিয়াকেই মুক্ত করতে পারো।'

এইসব বক্তব্য থেকে অনুশীলন সমিতির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে দুটি বিষয় অবগত হওয়া যায় — একটি হল, অনুশীলন (দলের) পাঠ্যপুস্তক, বিবেকানন্দ-পাঠ এবং অপরটি হল বিশ্বাসী যুবক এবং তরুণদের দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে, যে-সূত্রে নির্মলানন্দের শিক্ষাচিন্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, সে-সম্পর্কে মঠের বর্তমান সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামী এবং মঠের আরো একজন স্বামীজির কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ-ই এ-কথা ব্যাখ্যা করতে পারেননি যে, কেমন করে স্বামীর (নির্মলানন্দের) শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে কুলচাঁদ ওই রকম একটা ধারণা করে নিয়েছিল। তাঁদের দুজনেরই বিশ্বাস যে, উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর (নির্মলানন্দের) আলোচনা সম্পর্কে ছাত্রদের ভুল ধারণা জন্মেছিল।

উপরোক্ত তল্লাসির ফলে যে-সব কাগজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯০৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করার জন্য একদল ছাত্র নৌকা করে বেলুড় গিয়েছিল। খাতাটিতে লেখা আছে যে, এই উপলক্ষে নদীবক্ষে যাওয়ার সময় হরেন্দ্রচন্দ্র পাল নামে একজন সহযাত্রী এই রকম মন্তব্য করেন — 'আজ আমরা ছোটো এই গঙ্গা নদী পার হয়ে অন্য তীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। যখন এই দাস-জীবনের অপর পারে পৌঁছে আমরা বিজয়তূর্য এবং 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি-সহযোগে চারিদিক উচ্চকিত করে স্বাধীনতার পতাকা ওড়াতে পারব, তখন না জানি আমরা আরো কত সুখী হব। এমন চিন্তা কল্পনা করেও মন উৎসাহ আর আনন্দে ভরে ওঠে।'

কলকাতা অনুশীলন সমিতির আর একজন বিশিষ্ট সভ্য, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা যোগেন ঠাকুরও এই সময় বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইনি 'যুগান্তর' এবং 'সারথি যুবকমণ্ডলী' প্রমুখ সংগঠনগুলিরও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।

সঠিক কোন পদ্ধতিতে বিপ্লবী দলগুলি বিবেকানন্দের শিক্ষানীতিগুলি গ্রহণ করে সেগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন, তার একটি নিদর্শন সম্প্রতি চোখে পড়েছে। বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে এবং ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে বক্তৃতা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্বে উল্লিখিত ইন্দ্রনাথ নন্দীও মানিকতলা দলের তরফে বাংলা দেশে (Bengal) ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং সেই অবসরে তিনিও স্বামীজির নির্দেশমতো তাঁর শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ম্যাজিক-লণ্ঠন ব্যবহার করেছিলেন। এই রকমের আরো কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

৮

১৮৬০ সালের ২১ নং বিধি অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের সমিতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ

১৮৬০ সালের ২১ নং বিধি অনুযায়ী ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামকৃষ্ণ মিশন যথাবিধি 'রামকৃষ্ণ মিশন' নাম নিয়ে সমিতিবদ্ধ হয়। সংগঠনের স্মারকপত্রে অপরাপর বিষয় ছাড়াও, সমিতির যে-সব উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেগুলি হল —

১) বিভিন্ন শাখা ও বিভাগ সমেত তুলনামূলক ধর্ম এবং বেদান্তের শিক্ষার সম্যক প্রচার ও সম্প্রসারণ, ঠিক যেমনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়েই বাস্তবানুগভাবে বেদান্তের অনুশাসনগুলি সম্পর্কে লোককে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

২) কলা, বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা প্রচার ও প্রসারণ।

৩) জ্ঞানের উপরোক্ত বিবিধ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান এবং সেই মতো জনগণের দ্বারে তাঁরা যাতে উপস্থিত হতে পারেন তদনুরূপ চেষ্টা করা।

৪) জনগণের মধ্যে শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখা।

৫) স্কুল, কলেজ, অনাথ আশ্রম, কারখানা, গবেষণাগার, হাসপাতাল, দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ এবং অন্যান্য শিক্ষা-সংক্রান্ত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন, পোষণ, পরিচালনা এবং সেগুলিতে সহায়তা দান।

৬) সমিতির উদ্দেশ্যসমূহ প্রচার করবার জন্য সমিতির ইচ্ছানুযায়ী সব রকম পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ এবং প্রচারপুস্তিকা ছাপানো এবং প্রকাশ করা ও সেগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করা।

৯

গ্রাম-আশ্রমগুলির বিকাশ

বাংলা দেশ (Bengal) এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের যে-সব স্থানে তাঁদের শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে (জনসাধারণের) দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিল সেইসব জায়গা মিশনের স্বামীজিরা প্রায়শই ভ্রমণ করে আসতেন।

এ-কথা সত্যি যে, পূর্ব-উল্লিখিত কয়েকটি আশ্রম ভিন্ন, অন্য সব শাখা-আশ্রমগুলির পরিচালনা ইত্যাদির দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশন কখনই স্বীকার করেনি। কিন্তু তবুও স্বামীজিরা যখন সদর দপ্তর থেকে পরিদর্শনমূলক ভ্রমণে (Inspection-tour) বের হতেন তখন বাংলা দেশ (Bengal) তথা পূর্ববঙ্গ এবং আসামে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের কয়েকটি আশ্রমও তাঁরা দেখে যেতেন।

বেলুড় মঠের স্বামী বিরজানন্দ যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন সেই সময় তিনিও কলকাতার বউবাজারের ন্যাড়াগির্জা অঞ্চলের অধিবাসী এবং বর্তমানে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো (San Francisco) কেন্দ্রে বসবাসকারী সুশীলকুমার চক্রবর্তী তথা স্বামী প্রকাশানন্দ (যুগ্মভাবে) বিগত ১৮৯৮ সাল নাগাদ ঢাকায় একটি শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আগ্রহের অভাব হেতু ১৯০৫ সালে এই শাখা আশ্রমটি উঠে গেলেও পূর্ববঙ্গ এবং আসামের মহাকরণের কেরানিকুলের প্রচেষ্টায় এটি ১৯০৭ সালে পুনর্গঠিত হয়। এই সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন জনৈক সুরেন্দ্র বসু যাঁকে একদা রাজনৈতিক কারণে নজরে রাখা হয়েছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতি কর্তৃক আয়োজিত জন্মাষ্টমী দিনের অনুষ্ঠানে যে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে, সেই ব্যাপারেও এঁকে সন্দেহ করা হয়েছিল।

ঢাকা জেলার সবজি মহল, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং বজ্রযোগিনী অঞ্চলেও স্থানীয় লোকেরা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা (কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদের যে অনাথ আশ্রমটির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সেটি ১৯০০ সাল নাগাদ সরগাছি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি এখনও এটি পরিচালনা করছেন। ব্যানার্জী তথা গাঙ্গুলি তথা অখণ্ডানন্দ নামক এই ব্যক্তিটি ১৮৬৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই এঁর ছোটোভাই কলকাতা পৌরসভার অফিসে ওভারসিয়ার হিসেবে চাকুরিরত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায়, অখণ্ডানন্দ ১৮৯৭ সাল থেকেই কাজ করে আসছিলেন এবং সেখানকার অর্ধশিক্ষিত গ্রামবাসীরা তাঁর ধর্মীয় বক্তৃতাগুলি শুনে প্রথম প্রথম রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। বস্তুতপক্ষে এমনও শোনা যায় যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই একসময় তাঁকে স্বয়ং ভগবানের মতো পূজাও করেছিল। তিনি মহুলা গ্রামেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে শেষপর্যন্ত সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং তাদের দ্বারা তিনি

বিতাড়িত হন। এরপর তিনি পার্শ্ববর্তী সরগাছি গ্রামে আস্তানা করেন এবং এখানে তিনি বর্তমান অনাথ আশ্রমটি গড়ে তোলেন। এইখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে ১২টি বালক বাস করছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ব্যভিচারী এবং এই কারণে আশ্রমের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক তাঁর আশ্রমে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

হুগলির কোন্নগর এবং গোবরহাটাতেও দুটি আশ্রম খোলা হয়েছে।

নদিয়ার জানিপুর গ্রামেও একটি শাখা খোলা হয়েছে।

১৯১১ সালে বাঁকুড়া শহরে শ্রী ডি.কে. সেন নামে জনৈক ব্যবহারজীবী কর্তৃক একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী এই ভদ্রলোক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে বয়কট এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে ১৯০৭-০৮ সালের মধ্যেই বিশেষ জন-পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

১৯১২ সালে ফরিদপুরেও একটি সেবাশ্রম খোলা হয়। এই আশ্রমের দুজন বিশিষ্ট সদস্য রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বাংলা দেশ (Bengal) থেকে আগত উদ্বাস্তুগণের সুপরিচিত আশ্রয়স্থল, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতেও এই বছরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। অনুমান করা যায় যে, পার্বত্য ত্রিপুরায় বিপ্লবীদলের সদস্যদের দ্বারাই এই শাখা-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গত জানুয়ারিতে ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষের হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রিয়নাথ ব্যানার্জী এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের সেই সক্রিয় সংগঠক নিশিকান্ত ঘোষ প্রমুখ বেশ কয়েকজন সুপরিচিত সন্দেহভাজন (রাজনৈতিক) ব্যক্তি এই কেন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

মিশনের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় এমন কতকগুলি ঘটনা এই সময় কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে অবশ্য মিশনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু তা হলেও এই ঘটনাগুলি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পূর্বে উল্লিখিত ভারত-ভ্রমণরত আমেরিকা-নিবাসী ব্যবহারজীবী মাইরন ফেলপস, ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজের মাইলাপুর রামকৃষ্ণ হলে শিক্ষার পুনর্বিকাশ এবং ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বিপ্লবী দলের কলকাতা-শাখার সঙ্গে জড়িত বলে যিনি নিজেই নিজেকে সনাক্ত করেন, রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন সেই নলিনী দে-কে এই বছরেই পুরীর মঠের সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করতে এবং তাঁর সঙ্গেই মিশনের সদর দপ্তর বেলুড়ে একত্র ফিরে আসতে দেখা গিয়েছে। নলিনী নামে এই ব্যক্তিটি এখন মিশনেই যোগ দিয়েছেন এবং ব্রহ্মচারী হিসেবে তিনি এখন মঠে শিক্ষানবিশ রয়েছেন।

১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রামকৃষ্ণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠে আয়োজিত একটি বিশাল জনসভায় বিপ্লবী দলের বেতনভুক বক্তা (paid orator) লিয়াকৎ হুসেনকে আনা হয়েছিল। শোনা যায় যে, তিনি (এই সভায়) চরম রাজদ্বেষে পূর্ণ একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন এবং (সেই সঙ্গে) শ্রোতাদের, দেশসেবা ও দেশের কারণে আত্মবলিদান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই রকম এবং এই ধরনের অন্য সব সভাতেও বিপ্লবীদলের অনেকেই বেলুড়ে সমবেত হতেন বলে শোনা গিয়েছে। মঠের কর্তৃপক্ষ অবশ্য সঙ্গতভাবেই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, (মঠ সংলগ্ন) প্রাঙ্গণগুলি জনসাধারণের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে এবং এইসব অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোকসমাবেশ হয়, (তাই এদের মধ্যে) কিছু সংখ্যক অবাঞ্ছিত লোকের উপস্থিতি কোনোক্রমেই এড়ানো যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, এইসব ব্যক্তিরা জনসমাগমের সুযোগ নিয়ে যাতে সমবেত জনতার মধ্যে রাজদ্বেষ ছড়াতে না পারে কিংবা এইসব অনুষ্ঠানে মঠকর্মীদের কাজে সাহায্য করে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মনে এই ধারণা সৃষ্টি না করতে পারে যে, তারা মঠের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত কিংবা মঠকর্মীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, সে-ব্যাপারে মঠেরও যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে তা কর্তৃপক্ষ এত সহজেই অস্বীকার করতে পারেন না।

এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হবে।

১০

গ্রাম-আশ্রম এবং বিপ্লবী আন্দোলন

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যেতে পারে যে, রামকৃষ্ণ মিশন যেমন ক্রমশ বিস্তারলাভ করছিল, তেমন রাজনীতি এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও এটি যে সম্পূর্ণভাবে সংস্রবমুক্ত ছিল না, সে-কথা (মোটামুটি) সকলেই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান শুরু না হওয়া পর্যন্ত এটা পরিষ্কার জানা যায়নি যে, এইসব অননুমোদিত বা ভুয়ো গ্রাম-আশ্রমগুলি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কী পরিমাণে গজিয়ে উঠেছিল। পূর্ববাংলার বিপ্লবী-দলের ৩৬ জন সদস্যকে শেষপর্যন্ত এই মামলায় বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা সকলেই দ্বীপান্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই মানুষগুলির অধিকাংশই ছিলেন ঢাকার নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সদস্য। এঁরা পরস্পর একত্রিত হয়ে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দল ভারী করে চলেছিলেন এবং (সেই সঙ্গে) ঢাকা সমিতির ডাকসাইটে সর্বাধিনায়ক, পুলিন দাস নির্দেশিত-পন্থায় ডাকাতি এবং নরহত্যা সমেত সুপরিকল্পিত অপরাধের জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

এই মামলার অনুসন্ধানের প্রাথমিক স্তরে দলের নেতারা কোন পদ্ধতিতে (দলে) নবীনদের আকর্ষণ করতেন সে-ব্যাপারে (সকলের) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শিকার হিসাবে যাদের বাছা হত, বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করার মতো (মানসিকভাবে) উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে সমিতির বিপ্লবী কর্মসূচির কথা গোপন করে বলা হত যে, তাদের বর্তমান সংগঠনটি রামকৃষ্ণ মিশন এবং এটি একটি (পুরোপুরি) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তা ছাড়া পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের অবাঞ্ছিত নজর এড়িয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে বিভিন্ন স্থানে মিলিত হতে পারে সেইজন্য তারা গ্রামে ভুয়ো রামকৃষ্ণ আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিপ্লবী দলের সদস্যগণকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে 'জেলা সংগঠন পরিকল্পনা' রচনা করা হয়েছিল সেখানেও উপরোক্ত পদ্ধতির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এই দলের জনৈক নেতা, রমেশচন্দ্র আচার্যের নিকট থেকে এই পরিকল্পনা-পত্রটি পাওয়া গিয়েছিল। এই (নির্দেশনামার) একটি নিয়ম ছিল নিম্নরূপ :

> কাজের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য যদি কোনো সাধারণ জায়গায় সদস্যগণ সচরাচর মিলিত হতে না পারেন তাহলে তাঁরা হরির লুঠ বা ওই রকমের কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করে সেই অবকাশে পরস্পর জড়ো হতে পারেন।

অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে, এই উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার সর্বত্র বিভিন্ন গ্রামে এই ধরনের রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় রাজসাক্ষী রজনী দাস কবুল করেন যে, (দলের) সদস্যগণের মধ্যে চিঠি চালাচালির সময় সেগুলি যাতে ভুল জায়গায় গিয়ে সব কিছু ফাঁস না হয়ে যায় সেই ভয়ে বিপ্লবী সমিতিগুলিকে রামকৃষ্ণ মিশন বলে উল্লেখ করা হত। কোর্টে জেরার সময় রজনী বলেছিলেন, 'সমিতিতে আমাকে যোগদান করার জন্য যখন আহ্বান করা হয়, সেই সময়েই প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ব্যবহৃত হতে শুনি।' তিনি আরো বলেন, 'এইভাবেই লোকেদের প্রতারিত করা হত।' তিনি এ-কথাও বলেন, 'যদি এমন আশঙ্কা দেখা দিত যে, যাকে দলে ভর্তি করতে যাচ্ছি তাকে স্বদেশি সমিতির কথা বললে সে আমার কোনো কথাই শুনবে না, তখন তার কাছে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কথাই বলতাম। ...সমিতি প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে যখন প্রথম কথা বলা হয়, তখন আমিও ভেবেছিলাম যে, এঁরা যেন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার জন্যই আমাকে অনুরোধ করছেন।' বরিশাল মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ওই দলের যতীন্দ্রনাথ রায় ওরফে ফেণ্ডর কাছে লেখা রজনীর একটি চিঠি থেকে নেওয়া নিম্নোক্ত অংশটুকুর মধ্যেও উপরোক্ত রাজসাক্ষীর জবানবন্দীর আশ্চর্যজনক সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। 'এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পটুয়াখালি চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে যে করেই হোক, যে-কোনো একজনকে রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে আসা যায় কিনা সেদিকে খেয়াল রাখবে। তুমি বিশেষভাবে চেষ্টা কোরো।'

ঢাকা থেকে সমিতির সদস্যগণের কাছে লেখা আর একটি চিঠিতে ফেণ্ড রায় বলেছিলেন যে, ঢাকা থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠানো হচ্ছে এবং তাঁরা অর্থাৎ (বিপ্লবী দলের) সদস্যরা তাঁর হাতে বিবেকানন্দের লেখা এক গাদা বই দেখেই তাঁকে চিনে নিতে পারবেন। এই ব্যক্তিটি সংকেত স্বরূপ 'ওঁ নমঃ ভগবতে রামকৃষ্ণ মিশন' লেখা এক টুকরো কাগজও দেখাবেন। এই চিঠির বিষয়বস্তু থেকে জানা গিয়েছে যে, উক্ত দূতকে ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত) বরিশাল শাখাটির দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

রজনীকে সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যিনি দায়ী ছিলেন ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার) এই রকম একজন সদস্য জানিয়েছিলেন যে, বাখরগঞ্জ জেলার অভয়নীল গ্রামেও একটি সন্দেহজনক রামকৃষ্ণ মিশন খোলা হয়েছে। একদা এই সংবাদদাতাকে ফেণ্ড রায়-ই বলেছিলেন যে, এইসব মিশনের আড়ালে বিপ্লবীদলের সদস্যরা নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে পরস্পর মিলিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ খুঁজে পাবেন।

ঢাকায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সূত্র থেকে এই ব্যাপারে আরো সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। বসন্ত ভট্টাচার্য নামে ষড়যন্ত্র দলের একজন পুরোনো সদস্য, দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে এই সময়

পুলিশকে কিছু সংবাদ জানিয়েছিলেন। গত বছর ঢাকায় বিপ্লবী দলের হাতে এই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর, এঁর দেওয়া সংবাদগুলি যে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বোঝা গিয়েছিল। এই ব্যক্তিটি বলেছিলেন যে, তিনি যতদূর জানেন তদনুযায়ী সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং সেই জায়গায় হিন্দু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইনি আরো বলেন, 'প্রতিটি সদস্যের এটা দেখা কর্তব্য যে অন্য আরো অনেকে যেন বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করে এই সমিতির দলভুক্ত হন।' বাংলা দেশের (Bengal) বাইরে যে-সব জায়গায় সদস্য পাঠানো হয়েছিল তাদের কথা উল্লেখ করে বসন্ত আরো জানান, 'মাদ্রাজের সদর কার্যালয়ে বিবেকানন্দের অনুগামী এই ছদ্ম-পরিচয়ে এমন অনেকেই বাস করতেন যাঁরা সকলেই এই গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।...

'ফরাসগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন নামে ঢাকার ফরাসগঞ্জেও একটি রামকৃষ্ণ মিশন রয়েছে। জ্ঞানরঞ্জন (জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জী) নামে সমিতির একজন সদস্য প্রায় তিন মাস আগে আমাকে সেখানে যেতে বলেছিলেন। আমি সেখানে এক সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে দেখি যে, সেখানে তখন একটি উৎসব চলছিল।

'নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি, মদন ভৌমিক প্রমুখ আরো অনেকেই সেই স্থান ছিলেন। জ্ঞানও সেখানে ছিলেন। আমরা কিছু জলযোগ করার পর সকলেই (স্থানত্যাগ করে) চলে গিয়েছিল। জ্ঞান প্রায় প্রতি শনিবারেই এই মিশনে আসতেন।'

রিপোর্টে উল্লিখিত নরেন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর এই দু-জন অনুগামীই হলেন বাংলা দেশের (Bengal) বর্তমান সন্ত্রাসবাদী-আন্দোলনের সব চাইতে বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া তিন কর্মী।

নিহত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ১৯১৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি রিপোর্টে বসন্ত জানিয়েছিলেন যে, ঢাকার ফরাসগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনটিতে জ্ঞানরঞ্জন নিয়মিতভাবে হাজিরা দিতেন। রামকৃষ্ণ কথামৃত এবং বিবেকানন্দের কর্মযোগ থেকে পাঠ করে শুনিয়ে কীভাবে কর্মী সংগ্রহ করা হত সে-সব ব্যাপারেও তিনি আলোচনা করেন।

ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার) অন্যতম নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর বরিশালের বাড়িতে একটি বিবেকানন্দ পাঠাগার ছিল। এখানে ছিল এক সেট বিবেকানন্দের রচনাবলী, পাঠাগারের নিয়মাবলীর একটি অনুলিপি এবং ওইসব বইয়ের একটি তালিকা। এইসব বইয়ের মধ্যে ছিল পূর্বে উল্লিখিত 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' এবং এটি স্পষ্টতই বরিশাল দলের সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হত।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ অতি সম্প্রতি, যে-জেলে তিনি বর্তমানে মেয়াদ ভোগ করছেন সেখানে বসেই একটি বিবৃতিতে কেমন করে তিনি এই গুপ্ত সমিতিতে এসে ভিড়লেন সেই প্রশ্নটির জবাব দেন। তিনি বলেন, যতীন রায় ও রমেশ আচার্য নামে এই সমিতির দু-জন নেতা তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দূষিত, পূর্ব বাংলার জেলাগুলির সর্বত্র কীভাবে রামকৃষ্ণ

মিশনের এই গ্রাম-আশ্রমগুলি বিস্তারলাভ করেছিল, সে-ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানের ফলে সব কথা পরিষ্কার ভাবে জানা গিয়েছে।

দলের এক সময়কার সক্রিয় সংগঠক, পূর্ব বাংলার বিপ্লবী দলের জনৈক বিশিষ্ট সদস্য বর্তমানে কর্তৃপক্ষকে কিছু সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন। এগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন এবং পূর্ব বঙ্গস্থিত তার বিভিন্ন শাখা-কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে ইনি বলেন, 'আমি যতদূর জানি বেলুড়ের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে এই বিপ্লব আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু পূর্ব বাংলার সর্বত্র অসংখ্য ছোটো ছোটো রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলি ভালো মনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিন্তু অচিরেই বিপ্লবী দলের সদস্যরা এগুলিতে এসে যোগ দেন এবং এই আশ্রমগুলি এখন সেই "ভাবাদর্শ" ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যতদূর জানি, পূর্ব বাংলার প্রায় সব বিপ্লবীরাই নিজেদের রামকৃষ্ণের অনুগামী বলে অভিহিত করেন এবং সুযোগ পেলে তাঁরা বেলুড় মঠও দর্শন করে আসেন। পূর্ব বাংলার গ্রাম-আশ্রমগুলিতে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা মাখন সেনই করেছিলেন।' এই সংবাদ সূত্রে উল্লিখিত মাখন সেন পূর্বে কথিত পুলিন দাসের বহিষ্কারের পর, পূর্ব বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রবল বারিপাত-জনিত বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বর্ধমান, হুগলি এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে কাজ করার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যে-সব ত্রাণ-সংগঠন তৈরি করেছিলেন তাদের সুবাদে ১৯১৩ সালের শেষাশেষি মিশনের প্রতি আবারও পুলিশের নজর যায়। সে-সময়কার অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে, ত্রাণের অছিলায় পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক না করে পরস্পর মিলিত হওয়ার যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায় বিপ্লবী দলগুলি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা দলে দলে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় এবং এই সুযোগে নিজেদের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সমূহ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠিক করে নিত। একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল যে, এই রকম ত্রাণ দলের জনৈক নেতা অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এবং তাঁর দলের লোকেরা যে-সব এলাকায় কাজ করছেন সেইসব জায়গায় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-আশ্রম স্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী নামক এই ব্যক্তিটি পুলিশের কাছে খুবই পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে সম্প্রতি যে-সব খবর পাওয়া গিয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, তিনি বর্তমানে একজন অত্যন্ত সক্রিয় এবং বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকারী কর্মী।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে এই ব্যক্তিটির যোগাযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামী বন্যাত্রাণে অমরেন্দ্রনাথের কাজের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বন্যাত্রাণের কাজে অমরেন্দ্রনাথ যে মিশনের কাছ থেকে ২০০ টাকার মতো অর্থসাহায্য লাভ করেছিলেন সে-কথা তিনি স্বীকার করেন। অমরেন্দ্রনাথ যে বেলুড় কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা পরিচিত ছিলেন সেটা আরো প্রত্যক্ষভাবে জানা গেল যখন তাঁকে বেলুড়ের উৎসবগুলিতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গ পরে উল্লেখ করা হবে। ব্রহ্মচারী জ্ঞানানন্দ তথা বরিশালের জ্ঞানানন্দ দাশগুপ্তের পরিচালনায় বন্যার্ত এলাকায় রামকৃষ্ণ মিশন নিজেই একটি দল গড়েছিল। এই দলের সভ্যদের নামগুলি

সারদানন্দ জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি এদের মধ্যে মাত্র চারজনের নাম করতে সক্ষম হন। এদের মধ্যে জনৈক প্রিয়নাথের নাম ছিল, কিন্তু সারদানন্দ এর সম্পর্কে পূর্ণ বৃত্তান্ত দিতে সক্ষম হননি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গত নভেম্বর মাসে ২৯৬/১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়িটি তল্লাসি করার সময় অমৃত হাজরার যে গোপন নোটবইটি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে এক টুকরো কাগজে 'প্রিয়নাথ দাস, রামকৃষ্ণ মিশন, মূল ত্রাণকেন্দ্র, চাঁদপুর, ইছাপুর পুলিশ থানা, মেদিনীপুর' কথা কয়টি লিপিবদ্ধ ছিল দেখা যায়। এই অমৃত হাজরাকে আবার রাজাবাজার বোমা মামলার অপর তিন জন বিচারাধীন ব্যক্তি সহ বোমা সমেত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মনে হয় এই প্রিয়নাথ সেই একই ব্যক্তি, দলের সদস্য হিসেবে যার কথা সারদানন্দ উল্লেখ করেছিলেন। সারদানন্দ জানিয়েছেন যে, এই প্রিয়নাথ এখন *উদ্বোধন* অফিসে শিক্ষানবিশ রয়েছেন এবং সেই হিসেবে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। (এই প্রতিবেদনের 'সংযোজন' দ্রষ্টব্য)।

রাজাবাজার মামলার অনুসন্ধান চলা-কালে যে-কয়েকটি চিঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মায়াবতী থেকে প্রেরিত 'অতুল' এই স্বাক্ষরযুক্ত একটি সন্দেহজনক পোস্টকার্ড পুনরায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। চিঠিখানিতে যা লেখা ছিল তা এইরকম :

প্রবুদ্ধ ভারত কার্যালয়
মায়াবতী, লোহাঘাট পো. অ.
জিলা আলমোড়া, যু. প্র.
তাং ৩রা মার্চ ১৯১৪

ভাই বিনোদ,

অনেক দিন যাবৎ তোমার কোন খবর পাইনি। আশা করি এই চিঠির উত্তরে সকল সংবাদ জানিয়ে আমাকে সুখী করতে ভুল হবে না।

মেদিনীপুরের বন্যাত্রাণ কাজ ফেলে আমি হঠাৎ হিমালয়ে এসে পৌঁছেছি। মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণের কাজ ভালই চলছে। তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে? শরীরের দিকে নজর রাখবে। দৈনিক কিছুটা ব্যায়াম করলে ভাল হয়। এ জায়গার বর্ণনা কি দেব? জায়গাটি ভারি মনোরম এবং সাধুদের পক্ষে উপযুক্ত। জায়গাটি বাস্তবিক পূজার্চনার পক্ষেই উপযুক্ত, যেন সমস্ত মন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে চায়। এখান থেকে বরাকরের সারি সারি পাহাড় দেখতে কী ভাল লাগে। জায়গাটার দূরত্ব এখান থেকে হাঁটাপথে প্রায় ১৫/২০ দিনের মত।

আমি ভালই আছি। তোমার কুশল সংবাদ জানিয়ে সুখী কোর। এই চিঠির বিষয়ে আমার গ্রামের কাউকে কিছু জানিও না।

ইতি
তোমার
অতুল (ব্রহ্মচারী ভরত)

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী
আশাকুটির, রাজশাহী সমীপেষু

উপরোক্ত চিঠির লেখক 'অতুল' হলেন ঢাকা-নিবাসী অতুলচন্দ্র গুহ যিনি ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমে রয়েছেন এবং এখানে ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

ইতিপূর্বে রাজাবাজার মামলা প্রসঙ্গে যে অমৃত হাজরার কথা হয়েছে তার বাড়িতে সংকেত-লিপিতে রচিত যে-সব তালিকা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে উপরোক্ত চিঠির প্রাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নামও খুঁজে পাওয়া যায়। (প্রফুল্ল নামক) ঢাকার এই বালকটি সম্ভবত উত্তর বাংলায় বিপ্লবের প্রচারকাজ চালানোর জন্যই রাজশাহীতে গিয়েছিল এবং অমৃতের অনুগামীরা এই পরিকল্পনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করেছিল।

দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধানকালে রামকৃষ্ণ মিশন এবং তার উত্তর ভারতীয় শাখাকেন্দ্রগুলি পুনরায় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মনে হয় বিশেষত কনখল শাখাটিই ষড়যন্ত্রকারীদের যোগাযোগের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলার সুবাদে (পুলিশ) যাঁকে খুব খোঁজাখুঁজি করছিল সেই ফেরার রাসবিহারী বসুও কনখল হরিদ্বার শাখার সদস্য ছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনের কাজে ইনি পাঞ্জাব এবং বাংলার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। গত মার্চ মাসে পুলিশ এঁর চন্দননগরের বাড়িতে তল্লাসি চালানোর সময় মিশনের বহু সদস্যের আলোকচিত্র এবং মিশন-সংক্রান্ত (বিভিন্ন) পুস্তিকাদিও খুঁজে পায়।

দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সম্প্রতি বিচারাধীন (আসামী) রঘুবীর শর্মার বাড়িতেও কয়েকজনের নাম সম্বলিত একটি তালিকা পাওয়া যায়। এঁদের কাছে বিতরণের জন্য, কিছু রাজদ্রোহমূলক প্রচারপত্র পাঠানোর কথা ছিল। এই তালিকায় যাঁদের নাম ছিল তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী। এঁদের মধ্যে জনা পাঁচেক ছিলেন কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বাঙালি বাসিন্দা এবং এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এঁদের মধ্যে চারজন, সম্ভবত মোট পাঁচজনই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন, কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্র, অবনীন্দ্র ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন। গত দুর্গাপূজার সময় ইনি বেনারসের রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলেন এবং সেখান থেকে কনখল আশ্রমে যান এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে সেখানে এখনো বাস করছেন।

হাওড়ার নীতিচন্দ্র রায় নামে আরো এক ব্যক্তি বেলুড় মঠে নিত্যই যাতায়াত করতেন এবং বেলুড় ও কনখলের রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থানও করেছিলেন।

(উপরোক্ত) তালিকার তৃতীয় ব্যক্তি, কলকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং প্রাক্তন বিচারপতি সারদা মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুশীলকুমার মিত্রও প্রায়শ বেলুড় মঠ পরিদর্শনে যেতেন।

অন্য যে ব্যক্তির ঠিকানায় যোগাযোগ করা হয়েছিল সেই অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীও পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পঞ্চম ব্যক্তি হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো যোগাযোগের কথা জানা না গেলেও, এই সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, এঁর মধ্যে ধার্মিক ভাব রয়েছে এবং ইনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন ও দেরাদুনেও গিয়েছিলেন। অতএব এটা খুবই সম্ভব যে, ইনিও রামকৃষ্ণ মিশনের উত্তর ভারতীয় শাখাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছিলেন।

পুলিশ বেশ কিছুদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছিল রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন এমন দু-জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে, যাদের শেষপর্যন্ত ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে রামকৃষ্ণ আশ্রমেই খুঁজে

পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একজন, বলদেও রায়কে পাওয়া গিয়েছিল বেনারস আশ্রমে। ইনি সেখান থেকে কনখল গিয়েছিলেন এবং সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানকার স্থানীয় আশ্রমেই তিনি বাস করছেন। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নামক অপর একজন পরিব্রাজক, যিনি পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকেও বেনারসের সেবাশ্রমে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানকার মিশন চিকিৎসালয়ে ইনি বর্তমানে কম্পাউন্ডারের কাজ করছেন।

যে-সব সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, বেলুড় এবং তার অনুমোদিত শাখা কেন্দ্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবাদির সময় বহু রকমের আপত্তিকর অনুষ্ঠান পালন করা হত। উদাহরণস্বরূপ গত মার্চ মাসে বেলুড়ে রামকৃষ্ণের ৭৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যায়। সংবাদে প্রকাশ যে, (এতদুপলক্ষে) উপস্থিত বিশাল জনসমাবেশে পূর্ব-উল্লিখিত অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, মাখন সেন, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও বিপ্লবী দলের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং অভ্যাগত দেখাশোনার কাজে মঠ-কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এই উপলক্ষে একদল স্বেচ্ছাসেবী সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এবং মঠ-কর্তৃপক্ষের তরফে অগণিত অতিথিদের তত্ত্বাবধান করে সকলের বিলক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলা দেশে (Bengal) রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য শাখাগুলিতেও ওই রকম অনুষ্ঠান হত।

ঢাকাতে যে-উৎসব হয়েছিল সেখানে সংকীর্তন দল (সংগীত-সহযোগে নাচের দল) আনা হয়েছিল এবং দলটি গান গেয়ে শহরের পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রাটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রায় ৫০০ জন ছাত্র ও যুবক এতে অংশ নিয়েছিল বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। (সংকীর্তনের সময়) যাঁরা নেচে নেচে গাইছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আত্মসংযম হারিয়ে গায়ের উত্তরীয় খুলে ফেলেন এবং আরো অনেকে মূর্ছা যান। সংকীর্তনের পরে যে যাত্রাভিনয় হয়েছিল সেখানে উৎসাহী শ্রোতাদের সম্মুখে 'আমার দেশ' এবং 'আমার জন্মভূমি' প্রমুখ প্ররোচনামূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১১

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান কর্মীবৃন্দ

এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট অংশে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনে নিযুক্ত স্বামীজি এবং ব্রহ্মচারীদের পূর্ণ তালিকা পেশ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীজি এবং ব্রহ্মচারীদের পূর্বাশ্রমের নাম ও ঠিকানা বর্তমানে যতটা জানা গিয়েছে তাও লিখে রাখা হয়েছে। এই রিপোর্টে এঁদের মধ্যে অনেকেরই নাম ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। স্বামীজিদের তালিকায় উল্লিখিত ২৫ নং ব্যক্তি হলেন সারদানন্দ তথা মঠের বর্তমান সেক্রেটারি সারদা চক্রবর্তী।[১০] তাঁর ভাই নরেশ চক্রবর্তী সম্পর্কে আমরা সম্প্রতি যে-সংবাদ পেয়েছি তাতে জানা যায় যে, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত রয়েছেন।

আমেরিকাতে দীর্ঘদিন বসবাস করার পর এই ভদ্রলোক সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। শোনা যায় যে, আমেরিকাতে অবস্থানকালে নিতান্ত উৎকট ধরনের চরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল।

মনে হয়, নরেশ এবং সুরেন্দ্র উভয়েই আমেরিকার 'হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধি হিসেবে নিকট প্রাচ্য, আমেরিকা এবং ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁরা প্যারিসের সুপরিচিত ভারতীয় বিপ্লবী (firebrands) মাদাম কামা (Madame Cama) এবং কৃষ্ণ বর্মার সংস্পর্শেও এসেছিলেন। ইউরোপে অবস্থানের সময় নরেশ নাকি স্বীকার করেছিলেন যে. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন'-এর শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচিগুলি আসলে নিতান্তই ছুতো, ভারতবর্ষে বিপ্লবসাধনই ছিল এটির মূল উদ্দেশ্য।

নরেশ এবং সুরেন্দ্র বসু কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাঁদের তল্পিতল্পা তল্লাসি করা হয় এবং শেষোক্ত জনের বাক্সের মধ্যে কিছু কিছু আধা-প্ররোচনামূলক পুস্তিকাও খুঁজে পাওয়া যায়।

সারমর্ম

আগেকার আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অতীতে ধর্ম এবং সেবামূলক কাজের আড়ালে রামকৃষ্ণ মিশনকে যে বিপ্লবে ইন্ধন জোগানোর কাজে ব্যবহার করা হত, সে-সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ রয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অবশ্য সব থেকে বড়ো বিপদ দেখা দিচ্ছে অননুমোদিত আশ্রমগুলি থেকে, যেগুলি বেলুড়ে মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই তাঁদের অগোচরে পূর্ব বাংলার দুর্গত এলাকাসমূহে ব্যাঙের ছাতার মতো দ্রুত গজিয়ে উঠছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি দিগ্বিদিকে প্রচার করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর সেই আদেশ বাংলার বিপ্লবীরা এমন চমৎকারভাবে কাজে লাগাচ্ছেন যে, এখন মিশন কর্তৃপক্ষের হাজার সদিচ্ছা সত্ত্বেও সেগুলিকে আর সংযত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামীর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎকারের সময় ইতিপূর্বে কথিত এইসব ঘটনা সংক্ষেপাকারে জানানোও হয়েছিল। তিনি এ-কথা স্পষ্ট স্বীকারও করেন যে, বিবেকানন্দের শিক্ষানীতির কিছু কিছু অংশ বিপ্লব আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু এই রকম সম্ভাবনার কথা স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং চিন্তা করেছিলেন বা তিনি নিজেই এটা চেয়েছিলেন, এ-রকম কিছু সারদানন্দ স্বীকার করেননি।

পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে এইসব রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাহায্যে কি পরিমাণে বিপ্লবের প্রচার চালানো হয়েছিল সে-বিষয়ে অবশ্য তিনি আগে থেকে কিছু জানতে পারেননি। তবে মঠের শিক্ষাদর্শসমূহের এরূপ বিপজ্জনক বিকৃতিসাধন যদি বন্ধ না করা যায়, তা হলে মঠের অস্তিত্বই যে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে সে-বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ খেয়াল রয়েছে। তাঁকে বোঝানো হয় যে, (এমতাবস্থায়) তাঁর উচিত, জনসমক্ষে এবং বেলুড় ও অন্যান্য অনুমোদিত শাখা-কেন্দ্রগুলি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জনসমাবেশ ও সংবাদপত্রে এ-কথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা যে, এইসব ভুয়ো আশ্রমগুলির সঙ্গে মিশনের কোনো সম্পর্কই নেই। এই রকম অনুরোধের ফলে এপ্রিলের গোড়ার দিকে বাংলা দেশের সব কটি প্রধান পত্রিকায় সারদানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত সাবধানবাণীটি প্রচারিত হয়েছিল।[১১]

রামকৃষ্ণ মিশন

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবার্তা

পূর্ব বাংলার কয়েকটি সাম্প্রতিক মামলার সুবাদে যে সব তথ্য জানা গিয়েছে তা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালক মণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কয়েকটি সংগঠন, দলের সদস্যবৃদ্ধি এবং নিজেদের দুরভিসন্ধিমূলক মতবাদ, এমন কি কখনও অপরাধমূলক প্রচার কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে মিশন এবং বেলুড় মঠের সুনামকে কাজে লাগাচ্ছেন। পরিচালক মণ্ডলী তাই মনে করেন যে জনসাধারণ এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের (Bengal) সরল যুব সম্প্রদায়কে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ যাঁদের মূল কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠে এবং যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের মহান নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সর্বৈব একটি ধর্মীয় সংস্থারই অন্তর্ভুক্ত এবং কোন ধরনের রাজনীতি বা বেআইনী সংগঠন সমূহের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। জীব ব্রহ্মৈব না পরা — অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দেবতার প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবচন মেনে নিয়ে এই সম্প্রদায় জন্মমুহূর্ত থেকেই সাধ্যমত শিব জ্ঞানে জীব সেবা এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয় কৃষ্টির প্রচার ও বেদান্তের শাশ্বত দর্শন উপলব্ধি করার ব্রতে নিযুক্ত রয়েছে। এই সেবা ধর্ম পালনের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই ভাবে মানুষের কল্যাণ ও হিতৈষা সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করা হয়। অতএব এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, কোন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন রকম সম্পর্ক থাকতেই পারে না। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় লালিত, মিশন বিশ্বাস করে যে, ধর্ম এবং ব্রহ্মোপলব্ধির ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই একমাত্র, বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্ভব হতে পারে, রাজনীতির পথে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ভারত আত্মার পুনর্বিকাশই প্রতিটি ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত এবং এই বিশ্বাসেই মিশন জাতীয় কংগ্রেস, উগ্রপন্থী দল এবং অন্যান্য নিয়মিত বা অনিয়মিত রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির কর্মসূচী থেকে নিজেদের দূরত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। রাজনীতি নয়, ভারতের অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যেই ভারতবাসীর প্রাচীন ঐতিহ্য নিহিত রয়েছে। রামকৃষ্ণ এবং তদীয় শিষ্য বিবেকানন্দ, প্রেম, মৈত্রী এবং শান্তির মাধ্যমেই সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার শিক্ষা দিয়ে যান এবং তদবধি মিশন সেই আদর্শ অনুযায়ীই পরিচালিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ ও বেলুড় মঠের নামে ভবিষ্যতে কেউ যদি কোন যুবকের কাছে কোন রকম রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত হন তাহলে তিনি স্বচ্ছন্দেই তাদের ভেকধারী প্রতারক বলে ধরে নিতে পারেন। এই সব লোকেরা নিজ নিজ গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই মিশনের সুনামকে অপব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছে। এই সকল যুবকেরা যদি সত্যিই মিশনের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে চান তাহলে তাঁরা সহজেই মিশনের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু মিশনের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁরা যেন কখনও এই সব সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মারফৎ কোন তথ্য সংগ্রহ না করেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই সকল যুবকের কাছে যাঁরা উপস্থিত হবেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু শুনবার আগেই যুবকেরা মিশনের সেক্রেটারী অথবা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পত্রালাপ করে এঁরা যথার্থই মিশনের সঙ্গে যুক্ত ধর্মপ্রচারক কিনা, সে

বিষয়ে সব কিছু জেনে নিতে পারেন। মিশন জনকল্যাণমূলক কাজের প্রয়োজনে যাঁদের অর্থ সংগ্রহে পাঠায় তাঁদের সকলের কাছেই মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্রের বিশেষ শিলমোহর করা পরিচয়পত্রও দেওয়া হয় এবং চাঁদা দেওয়ার আগে জনসাধারণ যেন অবশ্যই এগুলি যাচাই করে দেখে নেন।

দ্বিতীয় আর একটি বিষয়ে আমরা জনসাধারণকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতে চাই যে, তাঁরা যেন রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত যে কোন সংগঠন বা সেবাশ্রমকে নির্বিচারে বেলুড় মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-আশ্রম বলে মনে না করেন। সেবাব্রতের যে মহান আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন তার ফলে স্বদেশ ও বিদেশের সর্বত্র তাঁরা সমাদর লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের দুজনের নাম নিয়ে দেশের চারিদিকে বহু সংখ্যক সংগঠন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কারখানা, দোকান, ঔষধ বিপণী, ট্রেড মার্ক ইত্যাদি নানা রকমের ভাল ও মন্দ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ভাল লোকেরা সেবাব্রতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁদের নাম ব্যবহার করে আর মন্দ লোকেরা তাঁদের নামের সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের আস্থা লাভ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেয়। অতএব জনসাধারণের এ কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে রামকৃষ্ণ মিশন শুধু সেই সকল সংগঠন, আশ্রম বা সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেই তার শাখা-সংগঠন হিসাবে গণ্য করে যেগুলির নামের সঙ্গে 'রামকৃষ্ণ মিশন' কথা কয়টি যুক্ত আছে। এই নামটি ব্যবহারের সুযোগ নিতে হলে ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিশনের মূল কেন্দ্রের কাছে আবেদন করে অনুমতি নিতে হয় এবং এই প্রসঙ্গে এখানে জানিয়ে রাখা যায় যে, রামকৃষ্ণ মিশনের বরিশাল শাখাটিকে বাদ দিলে, গোটা বাংলা দেশে আমাদের অন্য কোন অনুমোদিত শাখা-কেন্দ্র নেই। অবশ্য বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকটি সংগঠন এবং আশ্রম, অনুমোদন লাভ করবার জন্য আমাদের কাছে আবেদন জানাবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। জনসাধারণের এই সমস্ত কথা খেয়াল রেখে সেই মত ইতিকর্তব্য স্থির করা উচিত। পরিশেষে আমাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা যে, জনসাধারণ নিজেদের এবং সেই সঙ্গে মঠ ও মিশনের স্বার্থ ও নিরাপত্তার খাতিরে যেন উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বন করেন।

আপনাদের ... ইত্যাদি
সারদানন্দ
সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

শুরুতে যেমন বলা হয়েছিল, এই প্রতিবেদনে মূলত মিশনের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং মিশনের বিরুদ্ধে বক্তব্যগুলিও ক্রমানুসারে উপস্থিত করা হয়েছে। এর ফলে হয়তো অসাবধানতাবশত এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যে, মিশনের কর্মপ্রণালীর উজ্জ্বল দিক বলতে কিছুই নেই। এই রকমের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা যেতে পারে যে, রামকৃষ্ণ মিশন যা হতে চেয়েছিল তা না

হয়ে, সে যে অন্য কিছু হয়েছে এমন কথা কখনো বলা হয়নি। (প্রকৃতপক্ষে) এটি এমন একটি ধর্মীয় সংস্থা যা সীমিতভাবে, নিঃসন্দেহে সংকটের সময় ত্রাণ-বিতরণে প্রভূত পরিমাণে কাজ করে এসেছে এবং পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন সেবাশ্রমের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে সকল সময়েই বিনা ব্যয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে এসেছে।

সম্ভবত দু-একজন ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে স্বামীজিরা কেউ-ই নিজেদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেননি। রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মিশন থেকে অপসারিত করার জন্য তাঁরা সকলে উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করেছেন এবং সম্প্রতি, সম্ভবত পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কিংবা মঠের আড়ালে থেকে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করার জন্য মিশনে যোগদানেচ্ছু বিপ্লবীদলের তিনজন সদস্যকে মঠে প্রবেশাধিকার না দিয়ে তাঁরা এ-বিষয়ে তাঁদের সদিচ্ছারও প্রমাণ দিয়েছেন। মিশনে যোগদানে ইচ্ছুক সদস্যদের কাছ থেকে, ১৯১১ সালে যে-ঘোষণাপত্র আদায় করা হত তার থেকেও প্রমাণ হয় যে, মঠের কর্তৃপক্ষ বিপ্লবীদের সম্পর্কে কি পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। 'আমি ঘোষণা করছি যে আমার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বা কোনো গুপ্ত দলের কোনোরকমের সম্পর্ক নেই।' এই মর্মে উক্ত ঘোষণাপত্রে আবেদনকারী (ইচ্ছুক সদস্যকে) স্বাক্ষর দিতে হত।

অপরপক্ষে এটাও দেখানো হয়েছে যে, মঠের সাধারণ কর্মীবৃন্দ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত ছিলেন না। এই প্রতিবেদনটি রচনা করার মুহূর্তে রীতিমতো অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করা হয়েছিল যে, সারদানন্দের ভাই নিজেও একজন সক্রিয় এবং বিপজ্জনক বিপ্লবী। আরো দেখানো হয়েছে যে, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষানীতির বেশ কিছু অংশ রাজদ্বেষে পূর্ণ এবং সেগুলির অনিষ্ট-সাধনের ক্ষমতা সম্পর্কে বিপ্লবীদল পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিল এবং তারা সে-সবের সুযোগও নিয়েছিল। তা ছাড়া রাজনৈতিক কারণে পলাতক ব্যক্তিরাও বিভিন্ন অনুমোদিত মঠে এসে আশ্রয় গ্রহণ করত। পূর্ব বাংলার সর্বত্র আশঙ্কাজনকভাবে দ্রুতগতিতে ভুয়ো আশ্রমগুলি গজিয়ে ওঠে এবং সেগুলি সবই ছিল বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের কেন্দ্রস্থল।

মনে হয় বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এখন আগামীদিনের বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হয়েছেন এবং তাঁদের শিক্ষানীতিগুলির বিকৃতিসাধন যথাসম্ভব রোধ করার জন্য তাঁরা আগ্রহীও হয়েছেন। এটি তাঁরা কীভাবে সমাধা করবেন সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারদানন্দ একদা এই মন্তব্য করেন যে, সরকার এক বিশাল শক্তি ও সংগঠনের অধিকারী হয়েও যখন নিজেই এইসব বিপ্লববাদী-ক্রিয়াকর্ম দমনে অপারগ তখন মিশনের গুটিকয় সন্ন্যাসীই বা সেই বিপুল জোয়ার কীভাবে ঠেকিয়ে রাখবেন? যা হোক অনুসন্ধানের ফলে এটা কিন্তু জানা গিয়েছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ব্যবহার করেই বিপ্লবী দলে অতীতে সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এই সদস্যগণের অনেকের মধ্যেই প্রথম প্রথম এই ধারণা ছিল যে, তারা রামকৃষ্ণ মিশনেই যোগ দিতে চলেছে। এইভাবে সকলের অলক্ষে বিষ সংক্রমিত করা হয়েছে এবং দলের যথার্থ স্বরূপ যখন শেষপর্যন্ত তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তখন তারা সকলেই দলের উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর এবং সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এটা সহজেই বন্ধ করতে পারেন যদি তাঁরা সকল প্রকারের রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কশূন্যতার

কথা মাঝে মধ্যেই জনসমক্ষে ঘোষণা করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারায় কলুষিত যে-সব ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদেরও বহিষ্কার করেন।

সি. এ. টেগার্ট
স্পেশাল সুপারিনটেনডেনট অফ পুলিশ,
ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ

কলকাতা
২২ শে এপ্রিল ১৯১৪

সংযোজন

এই প্রতিবেদন যখন প্রেসে পাঠানো হয়, সেই সময় আরো অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, পূর্বে উল্লিখিত প্রিয়নাথ দাস ওরফে সুরেন্দ্র ওরফে বীরেন্দ্র এবং ফরিদপুরের কামারপুর-নিবাসী প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাস যে-সময় সাজা পান তার অনেক আগেই এই প্রিয়নাথ, পুলিন দাস ও অমৃত হাজরার দলে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রিয়নাথের বসন্ত নামে যে-ভাইটি এখন কলকাতায় রয়েছেন, তিনিও 'যুগান্তর' দলের একজন সদস্য। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বারীন ঘোষের সাজা হওয়ার পর তাঁর অনুগামীরা এই 'যুগান্তর' দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পরিশিষ্ট
রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান কর্মীবৃন্দ

স্বামীজিগণ

নিম্নে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত বর্তমান স্বামীজি এবং ব্রহ্মচারীগণের একটি পূর্ণ তালিকা সন্নিবেশিত হল। এগুলি মঠের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে।

১। অভেদানন্দ : কালীচরণ চন্দ্র, কলকাতার আহিরিটোলা-নিবাসী বি.এল. চন্দ্র (ক্রীশ্চান) -এর ভাই। ১৮৮৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে নিউইয়র্কের নিকট একটি কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন।

২। অচলানন্দ : কেদার ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জানা যায়নি। বেনারসের অধিবাসী ১৯০১ অথবা ১৯০২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন।

৩। অদ্ভুতানন্দ : লাটু মহারাজ, ছাপরার একটি গ্রামের অধিবাসী। ১৮৮৪ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেনারসে একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করছেন।

৪। অখণ্ডানন্দ : গঙ্গাধর ব্যানার্জী, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটের বাসিন্দা, কলকাতা পুরসভার আলোক (বিভাগের) পরিদর্শক হরিদাস ব্যানার্জীর ভাই। ১৮৮৩ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার সরগাছি অনাথ আশ্রমের দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন।

৫। অম্বিকানন্দ : নীরদবিহারী ঘোষ, হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরবাসী গোপাল ঘোষের পুত্র। সম্ভবত ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠেই আছেন।

৬। আত্মীয়ানন্দ : মালদা জেলার সুকুল ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জানা যায়নি। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন, এখন বেনারস মঠে রয়েছেন।

৭। বিরজানন্দ : বেলেঘাটার নারকেলডাঙা অঞ্চলের কালীকৃষ্ণ বসু। ডা. কৈলাশ বসুর পুত্র। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

৮। বিশুদ্ধানন্দ : জীতেন্দ্রনাথ, ২৪ পরগণা অথবা হুগলি (জেলার) কায়স্থ। পারিবারিক নাম জানা যায়নি। ১৯০৫ কিংবা ১৯০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বাঙ্গালোর মঠে আছেন।

৯। বোধানন্দ : হরিপদ চ্যাটার্জী, হুগলির তারকেশ্বরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের বাসিন্দা। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে নিউইয়র্ক কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত।

১০। ব্রহ্মানন্দ : (রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট), বসিরহাট-নিবাসী রাখালদাস ঘোষ। ১৮৭০ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি মিশনের কনখল শাখা-কেন্দ্রে রয়েছেন। খবর পাওয়া গিয়েছে যে, পূর্বে উল্লিখিত অবনীন্দ্রনাথ ঘোষও এঁর সঙ্গে (এই স্থানেই) বাস করছেন।

১১। ধীরানন্দ : কলকাতার আহিরীটোলা-নিবাসী ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জানা যায়নি। ১৮৯৭ সালে ইনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় (কার্যোপলক্ষে) ভ্রমণরত।

১২। গিরিজানন্দ : পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত, ১৯০৪ অথবা ১৯০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তমলুক এবং কাঁথিতে বন্যাত্রাণে দলের সঙ্গে কাজ করেন। বর্তমানে বেনারস মঠে রয়েছেন।

১৩। গোকুলানন্দ : প্রিয়নাথ, পূর্ববঙ্গ-নিবাসী কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। ১৯০৪ কি ১৯০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। সম্প্রতি তমলুক এবং কাঁথিতে বন্যাত্রাণে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখন বেলুড় মঠেই রয়েছেন।

১৪। কল্যাণানন্দ : পূর্ববঙ্গের গুহ, ১৮৯৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে কনখল সেবাশ্রমের (হাসপাতাল) দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

১৫। কর্মানন্দ : উপেন্দ্র, পূর্ববঙ্গ-নিবাসী কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। ১৯০৪ অথবা ১৯০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তমলুক এবং বাঁকুড়া জেলার কোতলনারায়ণপুরের বন্যাত্রাণে কাজ করেন। এখন মায়ের সঙ্গে উত্তর ভারতের তীর্থভ্রমণে রত।

১৬। মহিমানন্দ : মহীতোষ মিত্র, নদিয়ার শ্রীপুর-নিবাসী। ১৯০৩ অথবা ১৯০৪-এ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠেই রয়েছেন।

১৭। নির্ভয়ানন্দ : কানাইলাল সুবর্ণবণিক, আহিরিটোলা-নিবাসী। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। উড়িষ্যার কোতর-এ বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছেন।

১৮। নির্মলানন্দ : বোসপাড়া লেন-নিবাসী তুলসীচরণ দত্ত। ১৮৮৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাঙ্গালোর কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত। ১৯০৭ সালে বেলুড় মঠ পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি সে-সময় কলকাতার অনুশীলন দলের সদস্যগণের কাছে, যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে-সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯। নিশ্চয়ানন্দ : ইনি মারাঠি। ১৮৯৮ অথবা ১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে কনখল সেবাশ্রমে রয়েছেন।

২০। পরমানন্দ (১) : বসন্ত সেন, পূর্ববঙ্গ-নিবাসী। ১৮৯৩-৯৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে আমেরিকার বোস্টন কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন।

২১। পরমানন্দ (২) : কায়স্থ, নাম জানা যায় নি। রাখাল মহারাজ (৭নং)-এর আত্মীয়। ১৯০৪-০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মায়াবতীর অদূরে টনকপুরে রয়েছেন।

২২। প্রকাশানন্দ : কলকাতার বউবাজারে ন্যাড়াগির্জার বাসিন্দা, সুশীলকুমার চক্রবর্তী। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন আমেরিকার সান-ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রে রয়েছেন।

২৩। প্রেমানন্দ : রাম ঘোষ, হুগলি জেলার তারকেশ্বরের আঁটপুর-নিবাসী। ১৮৮২-৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে ময়মনসিংহে ভ্রমণরত। রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ।

২৪। পূর্ণানন্দ : আহিরিটোলার আশুতোষ সুবর্ণবণিক। ১৯১০-১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে কাঁথিতে বন্যাত্রাণ দলের সঙ্গে চিকিৎসার কাজে রত।

২৫। সচ্চিদানন্দ : দীননাথ সেন, ডাক নাম বুড়োবালিয়া, পূর্ববঙ্গ-নিবাসী। ১৮৯১-৯২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠেই রয়েছেন।

২৬। সান্ত্বনানন্দ : খগেন্দ্রনাথ ময়রা, হুগলি জেলা-নিবাসী। ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেনারস মঠে রয়েছেন।

২৭। সারদানন্দ : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, কলকাতার ৩৩নং কলেজ স্ট্রিট-নিবাসী। ১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি এবং বাগবাজার মঠের ভারপ্রাপ্ত। তাঁর ভাই নরেশ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২]

২৮। শঙ্করানন্দ : অমূল্যচন্দ্র গুপ্ত, কলকাতা শান্তি ঘোষ স্ট্রিট-নিবাসী। ১৯০৫-০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেনারসের মঠে আছেন।

২৯। সর্বানন্দ : ডাকনাম তেজনারায়ণ (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত), বেনারস-নিবাসী। ১৯০৭-০৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মাদ্রাজ কেন্দ্রের দায়িত্বে।

৩০। শিবানন্দ : তর্কনাথ ঘোষাল, ২৪ পরগণার বারাসত-নিবাসী। ১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন আলমোড়ায় আছেন।

৩১। সুবোধানন্দ : সুবোধচন্দ্র ঘোষ, কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেন-নিবাসী। ১৮৮৪-৮৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন। সম্প্রতি রাঁচি ঘুরে এলেন।

৩২। সুধানন্দ : সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীল (২২ নং) - এর ভাই। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মাদ্রাজ কেন্দ্রে রয়েছেন।

৩৩। ত্রিগুণাতীর্থ : সারদাপ্রসন্ন মিত্র, কলকাতার নন্দনবাগান-নিবাসী। ১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে সানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন।

৩৪। তুরীয়ানন্দ : হরিপদ চ্যাটার্জী, কলকাতার বোসপাড়া লেন-নিবাসী। ১৮৮৫-৮৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে দেরাদুন অথবা হৃষীকেশে (অবসরপ্রাপ্ত) রয়েছেন। এখন আর মিশনের কোনো কাজ করেন না।

৩৫। বিজ্ঞানানন্দ : হরিপ্রসন্ন চ্যাটার্জী, বেলঘরিয়া-নিবাসী। পুনা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন। ইনি ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে এলাহাবাদ মঠের দায়িত্বে আছেন। (ইনিই বেলুড় মঠের স্থপতি)।

ব্রহ্মচারীগণ

১। অতুলকৃষ্ণ দত্ত : কলকাতার রামবাগান-নিবাসী। ১৯০২ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে থাকেন।

২। বিশ্বরঞ্জন বসু : ঢাকা-নিবাসী। ১৯০৪-০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারসের মঠে বাস করছেন।

৩। চন্দ্রনাথ : কায়স্থ, ২৪ পরগণা জেলায় সোনারপুর পুলিশ থানার অন্তর্গত নিকটবর্তী রাজপুর গ্রাম-নিবাসী। ১৯০৩-০৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারস মঠে বাস করেন।

৪। চারুচন্দ্র দাস : কলকাতার ডাফ স্ট্রিট-নিবাসী। ১৮৯৯-১৯০০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। মিশনের সহকারী সেক্রেটারি, এখন বেনারস মঠে বাস করেন।

৫। গণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী : কলকাতার বাগবাজার-নিবাসী। ১৯০২-০৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাগবাজার মঠে ('উদ্বোধন' কার্যালয়) বাস করছেন।

৬। হরেন্দ্রনাথ : কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। স্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয়। ১৯০১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৭। জ্ঞান ব্যানার্জী : ২৪ পরগণার বরানগর-নিবাসী। ১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে কাঁথিতে বন্যাত্রাণ দলের সঙ্গে কাজ করছেন।

৮। জ্ঞানদানন্দ দাশগুপ্ত : বরিশাল-নিবাসী। ১৯০৭-০৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বাগবাজার মঠে রয়েছেন।

৯। বিলাস চক্রবর্তী : ঢাকা-নিবাসী। ১৯০৬-০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বাগবাজার মঠে রয়েছেন।

১০। নির্মলচন্দ্র বসু : নদিয়ার শান্তিপুরের নিকটবর্তী একটি স্থানে থাকেন। ১৯১০-১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাগবাজার মঠে বাস করছেন।

১১। প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী : কলকাতার ৩৩ নং কলেজ স্ট্রিট-নিবাসী। স্বামী সারদানন্দের ভাই। ১৯১১-১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারসের মঠে বাস করেন।

১২। পঞ্চানন : পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। কলকাতা-নিবাসী ব্রাহ্মণ। ১৯০৬-০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন এলাহাবাদের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বাস করছেন।

১৩। দেবব্রত বসু : কলকাতার ৫৫ নং গ্রে স্ট্রিট-নিবাসী। বর্তমানে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে বাস করছেন।

১৪। সদ্বন্ধু ভট্টাচার্য : কুমিল্লা-নিবাসী। ১৯০৫-০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন মাদ্রাজের মঠে বাস করছেন।

১৫। রাসবিহারী মিত্র : পূর্ববঙ্গের কৃষ্ণকাটি-নিবাসী। ১৯১০-১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে তীর্থভ্রমণে রত।

১৬। শচীন্দ্রকুমার সেন : ঢাকার সোনারঙ-নিবাসী। এখন রাঁচিতে আছেন।

১৭। সুধা চৈতন্য : ব্রাহ্মণ, মেদিনীপুরের গাঁতাল-নিবাসী। ১৯১১-১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বন্যাত্রাণ দলের সঙ্গে কাজ করেছেন। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন।

১৮। অতুলচন্দ্র বসাক : পাবনা-নিবাসী। ১৯০৯-১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারস মঠে বাস করছেন।

১৯। চারুচন্দ্র বসু : মেদিনীপুর-নিবাসী। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে আছেন।

২০। নরেন্দ্রনাথ মিত্র : হুগলির জনাইবক্ষ-নিবাসী। ১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে আছেন।

২১। প্রভাসচন্দ্র চ্যাটার্জী : হুগলি-নিবাসী। ১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছেন।

২২। অতুলচন্দ্র গুহ : ঢাকা-নিবাসী। ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন, এখন মায়াবতী আশ্রমে রয়েছেন। এই ব্যক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে।

২৩। যতীন্দ্র নাথ : কায়স্থ, মেদিনীপুর-নিবাসী। পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। ১৯১১-১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে আছেন।

২৪। অশোককৃষ্ণ দেব : কলকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের সন্তান। ১৯১১-১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। সম্প্রতি হরিদ্বারে তীর্থভ্রমণে রত।

২৫। সীতাপতি ব্যানার্জী : ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হীরালাল ব্যানার্জীর পুত্র। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমে বাস করছেন।

২৬। সুরেশকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : পূর্ববঙ্গ-নিবাসী। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মাদ্রাজের মঠে রয়েছেন।

অবেক্ষাধীন

১। শ্যামাচরণ : ঢাকার বীরগাঁ-নিবাসী ব্রাহ্মণ। এখন তীর্থভ্রমণে রত।

২। সতীশ চন্দ্র : বরিশালের কায়স্থ। ১৯০৫ অথবা ১৯০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে তীর্থভ্রমণে রত।

৩। সীতারাম : মাদ্রাজ-নিবাসী। ১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমান ঠিকানা অজ্ঞাত।

৪। নলিনীকান্ত দেব : কলকাতার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট-নিবাসী। ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন দেরাদুনে আছেন।

৫। বীরেন্দ্র নাথ : পূর্ববঙ্গ-নিবাসী। এঁর পারিবারিক নাম জানা যায়নি। ইনি অপ্রকৃতিস্থ মনের মানুষ বলে সর্বসাধারণের বিশ্বাস।[১০]

৬। উমাপদ : বীরভূম-নিবাসী বৈশ্য। ১৯১১ সালে (রামকৃষ্ণ মিশনে) যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন।

৭। প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত : পূর্ববঙ্গ-নিবাসী। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাগবাজার মঠে রয়েছেন।

B.S. Press - 12.5.1914 — 39x — 100-H.C. and G.H.R.

তথ্যসূত্র

১। Tegart Sir Charles, *Terrorism in India*, Calcutta (New Age), 1983.

২। *T.I.B.*, Vol. IV, P. XXXI.

৩। প্রকৃতপক্ষে এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তেইশ এবং সারদামণির নিজের বয়স পাঁচের কাছাকাছি।

৪। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নানা ধরনের বিপ্লবী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাইরন ফেলপসের সহযোগিতায় 'ইন্ডো-আমেরিকান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন' নামে এইরকম একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই সমিতি 'সোসাইটি ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইন্ডিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। আমেরিকার শিকাগো ও ডেট্রয়েট শহরে এই সমিতির একাধিক শাখা স্থাপন করা হয়েছিল।

৫। প্রকৃত নাম সারদাপ্রসন্ন মিত্র (১৮৬৫-১৯১৫)। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর এঁর নাম হয় ত্রিগুণাতীতানন্দ।

৬। এই অংশের অনুবাদ মূল রচনা অর্থাৎ 'বর্তমান ভারত'-এর 'ইংলণ্ডের ভারতাধিকার' শীর্ষক অংশটুকু থেকে নেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য : *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ১৭৭-৮ (সপ্তম সংস্করণ/পৌষ ১৩৯৬/জানুয়ারি ১৯৮৯)।

৭। ব্যবসা-বাণিজ্যর জন্য।

৮। টেগার্ট লিখেছেন : 'Yet a time will come, when there will be rising of the Sudra class, with their Sudrahood; that is to say, not like that as at present, when the Sudras are becoming great by acquiring the characteristic qualities of the vaisya or the kshatriya, but a time will come, when the Sudras of every country with their inborn Sudra nature and habits not becoming in essence vaisya or kshatriya but remaining as Sudras, – will gain absolute supremacy in every society.' – লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, টেগার্ট মূলের অনুবাদে যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন।

৯। এই অংশটুকু লেখক নিজে অনুবাদ করেছেন কেননা টেগার্ট এইখানে 'India is slowly and gently awakening from her long deep sleep', ইত্যাদি বাক্যটি স্বামীজি কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছে বলে দাবি করলেও, মূল 'বর্তমান ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধের কোথাও এই ধরনের উক্তি বর্তমান লেখকের চোখে পড়েনি। এইরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ টেগার্টের রিপোর্টে ইতস্তত খুঁজে পাওয়া যায়।

১০। টেগার্ট এখানে ভুল নম্বর উদ্ধৃত করেছেন। পরিশিষ্টাংশে স্বামীজিদের তালিকায় ২৭ নম্বরে সারদানন্দের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

১১। এই বিবৃতিটি সেকালের ইংরেজি কাগজ *Englishman*-এ, ১৯১৪ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

১২। লক্ষ করার বিষয়, ১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। এই তালিকার নানা স্থানে এইরকম আরো বহু ভুল রয়ে গিয়েছে। সন্ধানী পাঠকেরা প্রেমানন্দ, সচ্চিদানন্দ, শিবানন্দ, সুবোধানন্দ প্রভৃতির মিশনে যোগ দেওয়ার তারিখগুলি খতিয়ে দেখতে পারেন।

১৩। মূল রিপোর্টে এঁর নামের পাশে প্রথম বন্ধনীতে (mad) শব্দটি ছাপানো হরফে লেখা ছিল। পরে সেটি হাতের লেখায় কেটে দিয়ে সেই জায়গায় 'believed to be of unsound mind' মন্তব্যটি জুড়ে দেওয়া হয়।

উপসংহার

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সন্ন্যাসীগণের অনেকেরই যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সে-কথা গোয়েন্দা বিভাগের নানা রিপোর্টে বারে বারেই উল্লেখ করা হয়েছে। আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী উপেন ব্যানার্জীর নিজের হাতে পেন্সিলে লেখা একটি নোটবইয়ের কথা উল্লেখ করে টেগার্ট জানিয়েছিলেন যে, বিপ্লবীরা মনে করতেন, বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করবার দায়িত্ব একদল উদারহৃদয়, তরুণ ও বুদ্ধিমান ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। তাঁরা হয়তো বিপ্লবীদলের যোদ্ধাগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবেন না, তবু তাঁরাই হবেন বিপ্লব-মন্ত্রের প্রধান প্রচারক সঙ্ঘ — 'THE METHOD OF WORK. 1. Missionary Body – Should be a body of *Brahmacharis,* young, intelligent, large-hearted and active. ... This body should be kept apart from the (*sic*) not in direct touch with the actually fighting sections whose mode of life and method must necessarily be different.' টেগার্ট আরো লেখেন যে, উপেন ব্যানার্জী এই সময়ে তাঁকে অকপটে জানিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে বিপ্লবের 'আইডিয়া' প্রচার করার কাজে রাজনৈতিক সাধুরা এখনো যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছেন— 'I then again saw Upen Banarji. I first questioned him about political *sadhus*. He said there were many of them in India, spreading the "idea". ' [১]

টেগার্ট 'রাজনৈতিক সাধু' বলতে সঠিক কাদের নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনোরকম ব্যাখ্যা পেশ করেননি। কিন্তু তাঁর অনেক আগেই স্টিভেন্সন-মুর, ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'নোট অন পলিটিকাল সাধুজ' নাম দিয়ে যে নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদনটি রচনা করেছিলেন সেখানে উত্তরবঙ্গের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'-এ অংশগ্রহণকারী এবং হান্টারের ভাষ্য অনুযায়ী আইন-না-মানা সমাজবিরোধী (lawless banditti) সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে 'সিপাহী বিদ্রোহ'-এর ষড়যন্ত্রের অংশীদার অনেক চালচুলোহীন ভবঘুরে সাধু, কোলাপুরের 'শিবাজী ক্লাব' ও 'বেলাপুর স্বামী ক্লাব'-এর মতো আধা-ধর্মীয় (quasi-religious) সংগঠনের সদস্য সহ 'আর্যসমাজ' ও 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় মায় অরবিন্দ, বারীন্দ্র, রানাডে প্রমুখ ধর্মভাবাপন্ন গৃহস্থ মানুষেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় 'পলিটিকাল সাধুজ' নামে কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে ইংরেজ সরকার চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে বোঝার উপায় নেই। মনে হয় এক্ষেত্রে সরকার যেন একটা বিজাতীয় ধারণা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে 'রাজনৈতিক সাধু'র (monk) ধারণা একেবারে অপরিচিত ছিল না। সেখানে 'সেকুলার' ও 'রেগুলার' পাদ্রি সম্প্রদায় কিংবা 'কুনিয়াক রিফর্মেশন' (Cluniac reformation) অথবা ডানস্টান (Dunstan), টমাস বেকেট (Thomas Becket) ইত্যাদি নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বারে বারেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে রাজনীতি শব্দের অনুষঙ্গটি বড়োই বিসদৃশ

লাগে। হিন্দু সন্ন্যাসীরা ইহজগতের নানারকম বিড়ম্বনার সমাধানে পরাজাগতিক সাধনাতেই নিমগ্ন থাকেন। আর তাই হিন্দু পলিটিকাল সাধুর খোঁজ করতে যাওয়া একটা নিরর্থক প্রচেষ্টা হিসাবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। অবশ্য ঔপনিবেশিক আমলে হিন্দুর সনাতন ধর্মচিন্তার জগতে যে আদৌ কোনো অভিঘাত সৃষ্টি হয়নি, এমন নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় হিন্দুমানসে যে নতুন ধর্মচেতনা জাগ্রত হয়েছিল এবং যার ফলে হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার এবং রাজনীতি-চেতনা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল সেই বিচিত্র অনুঘটনের পারম্পর্য সমবেতভাবেই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। [২] বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনায় শুধু এইমাত্র বলা যায় যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ (political nationalism), আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের (spiritual nationalism) উপরেই বহুলাংশে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। [৩] ফলত পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সন্ন্যাসীসমাজ অন্তত একটা সময় পর্যন্ত কোনো-না-কোনোভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য একমাত্র বরিশালের শঙ্কর মঠ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, আর্যসমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ সাধুদের সংগঠনগুলিই রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও দায় এড়ানো যায়নি। [৪] হার্বার্ট রিজলে আর্যসমাজকে রাজনীতি ঘেঁষা সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত না করলেও ইংরেজ সরকার তাকে একাধিকবার রাজনীতি করার দায়ে অভিযুক্ত করেছিল এবং সেই কারণে সেনাবাহিনীর ব্যারাকে আর্যসমাজের প্রচার-পুস্তকগুলি যাতে পৌঁছাতে না পারে সে-জন্য সতর্ক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। অবস্থা শেষপর্যন্ত এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, আর্যসমাজকে একসময়ে এই মর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে, ওই সংগঠনের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। তবুও প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, এতরকম সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আর্যসমাজের আন্দোলন নানা কারণে অচিরেই স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। তার কারণ রামকৃষ্ণ আন্দোলনের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মিশন অচিরেই একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে গোটা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করে। এহেন একটি সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি বিপ্লব আন্দোলনের যোগাযোগ চলতে দেওয়া হয় তা হলে রাজশক্তির পক্ষে সেটা নিঃসন্দেহে বড়ো ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে মিশনকে যদি সবসময় রাজরোষের ভয়ে ত্রস্ত থাকতে হয় তা হলে তার সমাজকল্যাণের গোটা কর্মসূচিই রীতিমতো ব্যাহত হতে পারে। ফলে মিশনকে বাঁচিয়ে রাখা মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চ্যালেঞ্জ এই যে, মিশনের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষায় জারিত যে-আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধ মিশনের সন্ন্যাসী ও অনুরাগীদের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ সঞ্চার করেছিল তাকে তাঁরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেননি। আবার এই স্বাদেশিকতা তথা জাতীয়তাবোধকে প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বাধা সৃষ্টির জন্য গোটা মিশনের অস্তিত্বই যে বিপদাপন্ন হয়ে উঠতে পারে এ-কথাও সন্ন্যাসীদের অজানা ছিল না। এই উভয়সঙ্কটই ছিল মিশনের সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি যত সহানুভূতিই থাকুক না কেন, মিশন-কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতেই হয়েছিল যে, মিশন মূলত একটি

সমাজ-সংস্কার অভিলাষী জনকল্যাণকামী সংগঠন এবং রাজনীতির সঙ্গে এই সংগঠনটির কোনো যোগাযোগ নেই। বস্তুত রাজনীতি ও ধর্মের পারস্পরিক বিপরীত মেরুর অবস্থান, যে-কোনো হিন্দুই প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে থাকেন। সেই হিসাবে মিশনের এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্যে সত্যের বিন্দুমাত্রও অপলাপ ঘটেনি। মিশনের প্রধান পুরুষ বিবেকানন্দ তো ১৮৯৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কোনো একজনের সঙ্গে পত্রালাপে দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি রাজনীতির লোক নন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়াও তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাই তাঁর কোনো রচনা বা ভাষণের মধ্যে যেন রাজনৈতিক তাৎপর্য সন্ধান করার বৃথা চেষ্টা করা না হয়।[৫] বিবেকানন্দর জীবনীকার রম্যাঁ রলাঁ লিখেছেন যে, রাজনীতি বিষয়ে স্বামীজির বিরাগ ও বিরক্তির কোনো অবধি ছিল না।[৬] মিশনের রাজনীতি-সংক্রান্ত এই ঘোর অনীহার কারণেই ভগিনী নিবেদিতার মতো একজন রামকৃষ্ণগত প্রাণ ভারতবন্ধুকেও শেষপর্যন্ত স্বেচ্ছায় মিশনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল। আবার আমেরিকাস্থ 'বেদান্ত সোসাইটি'র প্রধান সংগঠক স্বামী অভেদানন্দকেও রাজনীতির সংস্পর্শদোষের মূল্য দিতে হয়েছিল এবং অনেকেরই অনুমান যে, সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে মিশন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, কারমাইকেলের দরবার-বক্তৃতায় মিশনের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই অভিযোগের জবাবে মিশন কর্তৃপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনে যে-যুক্তিগুলি অবতারণা করেছিলেন সেগুলির মধ্যেই মিশনের রাজনীতি-নিরপেক্ষ মতাদর্শের কথা সব থেকে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছিল। মিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, মিশন যে যথার্থই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে আগ্রহী সে-বিষয়ে তার আন্তরিকতা প্রমাণ করবার জন্য মিশন কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বহুবার পুলিশ অফিসারদের নানা অনুসন্ধানের কাজে সহযোগিতা করে এসেছে। ডেনহ্যাম এবং টেগার্টের মতো জাঁদরেল পুলিশ অফিসাররা তাঁদের অনুসন্ধানে ইতিপূর্বে অনেকবারই বেলুড় মঠে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন এবং সেই সময় মঠের পরিচালকবৃন্দ তাঁদের যে-ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার জন্য তাঁরা নানাভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া খোদ গভর্নরের স্ত্রী লেডি মিন্টো-ও একবার বেলুড় মঠে পদার্পণ করেছিলেন। মঠে এই সকল অভিজাত রাজপুরুষদের উপস্থিতি মিশনের অরাজনৈতিক চরিত্রের সন্দেহাতীত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। মিশন কর্তৃপক্ষ আরো উল্লেখ করেন যে, এই সময় একটি মামলার রায়দানের অবসরে হাওড়ার তৎকালীন জেলাশাসক ডিউক (Sir William Duke), ১৮৯৯ সালের ৩ আগস্ট তারিখে মিশনকে একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সাব্যস্ত করেছিলেন। এ-ছাড়া কারমাইকেলের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকায় 'On the Conning Tower' শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানেও রামকৃষ্ণ মিশনের অরাজনৈতিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। মোট কথা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যে রাজনীতি তথা 'অ্যানার্কিস্ট' আন্দোলনের কোনো যোগাযোগ নেই সে-কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে মিশন কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো ত্রুটি ছিল না।[৭]

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকায় উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর কিংবা ওই একই সময়ে মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামী কর্তৃক কারমাইকেলের

কাছে লেখা প্রতিবাদপত্রটি পাঠানো হওয়ার পর সরকারের তরফে মিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যোগাযোগের অভিযোগ বিশেষ আর শোনা যায়নি। কিন্তু এই সময়ের আগে মিশনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিল এ-কথা বলা চলে না। বস্তুত সরকার কর্তৃক প্রস্তুত ১৯১৫ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টেও রামকৃষ্ণ মিশন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসীদের ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী অশান্তির উসকানিদাতা ('first instigators of Indian nationalism') হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত আসামী হেমচন্দ্র কানুনগোও মিশনের সঙ্গে উগ্রপন্থী রাজনীতির যোগাযোগের কথা স্বীকার করে জানিয়েছিলেন যে, বিপ্লবী দলে যখন সহজে সদস্য জোগাড় করা যেত না তখন বিপ্লবীরা অনেক সময়েই রামকৃষ্ণ মিশনে সদস্য গ্রহণের মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে যুবকদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিতেন — 'When we found that recruitment was at a standstill, we had recourse to disseminating political nostrums in the guise of religion with the assistance of Ramakrishna Mission.' সি.আই.ডি. ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কর্তৃক 'সিক্রেট' মার্কা করে প্রকাশিত হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখা *An Account of the Revolutionary Movement in Bengal* শীর্ষক বইটিতে হেমচন্দ্রর এই স্বীকারোক্তির কথা লেখা আছে। মিশনের সঙ্গে রাজনীতির এই যোগাযোগের কথা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও বিস্তারিত ভাবে লিখে গিয়েছেন।[৮]

কিন্তু মিশনের সন্ন্যাসীরা সচেতনভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন কি না সে-কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। দুই-একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়তো উল্লেখ করা যায়। স্বামী অভেদানন্দ লিখিত *India and her people*, রাজনীতি-বিষয়ক একটি বিস্ফোরক গ্রন্থ (politically explosive) বলে বিবেচিত হওয়ায় বোম্বাই সরকার সেটিকে নিষিদ্ধ (proscribed) প্রকাশনা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুত অভেদানন্দর সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলেই পুলিশ দাবি করেছিল। অভেদানন্দ কলকাতায় ফিরে এলে 'বন্দেমাতরম' সমিতির সদস্যরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অ্যাবস্ট্রাক্টে লেখা হয় যে, কলকাতায় তাঁর সংবর্ধনাসভায় শ্রোতৃমণ্ডলী আশা করেছিলেন যে, তিনি রাজনীতি বিষয়েই বক্তৃতা করবেন এবং সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় তারা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আবার আমেরিকাতে মিশনের অন্য দু-জন সন্ন্যাসী — স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও প্রকাশানন্দকেও রাজনৈতিক যোগাযোগ রাখার জন্য সন্দেহ করা হত। আমেরিকাস্থ 'ইন্ডো-আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন', 'ইন্ডো-আমেরিকান ক্লাব' কিংবা পোর্টল্যান্ডের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত গালওয়ানি ইত্যাদি সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তেমনই মিশনের সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ এমনও সন্দেহ করেছিল যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ নাকি স্বয়ং 'যুগান্তর' প্রচারপত্র বিলি করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। অবশ্য এই সন্দেহ যে ভিত্তিহীন সে-কথা পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় পুলিশের কাছে ধৃত রাজনৈতিক অপরাধী যামিনী মজুমদারের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, মিশনের সন্ন্যাসীরা নাকি আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে সে-দেশ থেকে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তবে পুলিশ নিজেই এই অভিযোগ অসত্য বলে স্বীকার করেছিল।

কিন্তু উপরোক্ত কয়েকজন ব্যতিক্রমী সন্ন্যাসী ছাড়া মিশনের অন্য কোনো সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যোগাযোগের অভিযোগ দায়ের করা যায়নি। মিশনের অধিকাংশ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ছাড়াও একেবারে গোড়ার দিকে মিশনের অনুরাগী গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক মানুষ ছিলেন। কারমাইকেলের কাছে লেখা প্রতিবাদপত্রে স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছিলেন যে, মিশনের অন্তর্ভুক্ত মোট ২০১ জন সদস্যের (৭৮ জন সন্ন্যাসী, ১২১ জন গৃহী সদস্য ও ২ জন সহযোগী সদস্য) প্রত্যেকের অতীত এবং বর্তমান খুঁটিয়ে দেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, এঁদের মধ্যে কোনো একজনও কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।[৯] সারদানন্দ স্বামীর এই জবাবদিহি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যথাবিধ মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একই সময়ে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি স্টিভেন্সন এ-কথাও জানাতে ভোলেননি যে, মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার দরুণ কেউ বিপ্লবী হয়েছিলেন এমন হাস্যকর অভিযোগ সরকারের তরফে কখনোই দায়ের করা হয়নি। স্টিভেন্সন জানান যে, বস্তুত কারমাইকেল, এর বিপরীত কথাই বলতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁর মতে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বিপ্লবী বলেই মিশনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন — 'It is not for a moment suggested that these men are revolutionaries because of their connection with the Ramakrishna Mission, but... there is reason to suppose that in many cases they belonged to the Mission because they were revolutionaries.'

স্টিভেন্সনের বক্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ-কথা সত্যি যে মিশনের সন্ন্যাসীরা নিজেরা প্রায় কেউই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু পরাধীন জাতির অবরুদ্ধ স্বাধীনতালিপ্সা যে প্রবল আবেগের জন্ম দেয় হয়তো তারই প্রেরণায় তাঁরা অবচেতনভাবে বিপ্লবী কর্মীদের সম্পর্কে সহানুভূতির মনোভাবকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের মানস-প্রক্রিয়ার প্রকাশ্য স্তরে (surface level) যে-বাস্তববোধ তাঁদের বিপ্লবীদের সঙ্গ তথা রাজনীতি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করেছিল, নিজেদের মগ্ন মানস স্তরে (infra level) তার বিপরীত একটা ঝোঁকও হয়তো তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র জনচিত্তে সঞ্চার করে গিয়েছিলেন। বস্তুত বাংলা দেশে (Bengal) বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের যুগে, যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব এদেশের যুবসমাজকে উত্তাল করে তুলেছিল তার মানসক্ষেত্রটি বিবেকানন্দই রচনা করে গিয়েছিলেন বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। আর্মস্ট্রং তাঁর বাংলা দেশের (Bengal) বিপ্লবী সংগঠনগুলি বিষয়ে রচিত প্রতিবেদনে, অরবিন্দও যে বিবেকানন্দর আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সে-কথা নির্দ্বিধায় জানিয়ে গিয়েছিলেন — '...Arabinda Ghose had taken up the teachings of Vivekananda, adding to them the element of *Sakti*. ...'[১০]

বিপ্লবী কর্মীরা মিশনের সন্ন্যাসীদের এই সুপ্ত সহানুভূতির কথা টের পেয়েছিলেন বলেই কি বিপদের সময় মিশনে এসে আশ্রয়গ্রহণ করতেন? এই মামুলি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান হয়তো একেবারেই নিরর্থক। কিন্তু আমরা জানি যে 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন সমিতি'র অনেক

জানা এবং অজানা কর্মী বেলুড় এবং এমনকী বাংলা দেশের (Bengal) বাইরেও বেনারস, কনখল, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে মিশনের একাধিক কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বিভিন্ন অ্যাবস্ট্রাক্টে এঁদের কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'জার্নাল অফ হিস্ট্রি'তে রত্নলেখা রায়-এর লেখা নিবন্ধেও মিশনে, গোপন-আশ্রয় নেওয়া এইসব বিপ্লবী কর্মীদের নামের তালিকা দেওয়া আছে।

এটা সম্ভব যে, মিশনের সন্ন্যাসীরা এঁদের পরিচয় সম্পর্কে সব সময় সম্যকরূপে অবগত ছিলেন না। অন্তত সন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে সেই রকম বিবৃতিই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এমন একটি অঘটনের জন্য সন্ন্যাসীরা যে বিশেষ অপ্রস্তুত বোধ করেছিলেন তেমন মনে হয় না। সারদানন্দ অবশ্য লিখেছিলেন যে, মিশনকে রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু একই সময়ে তিনি এ-কথাও জানান যে:

> মিশনে আশ্রয়প্রাপ্ত কোনো কোনো ব্যক্তির চরিত্র হয়তো এককালে রাজনৈতিক কারণে দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু মিশন সব জেনেশুনেও তাদের আশ্রয় দিয়েছে যাতে তারা পুরোনো পথ থেকে ফিরে এসে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার জীবনে পুনর্বাসিত হয়। তাই রামকৃষ্ণ মিশনও যদি এইভাবে কাউকে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়ার জন্য নিজেদের সঙ্ঘজীবনে আশ্রয় দিয়ে থাকে, তবে সেই কারণে তাকে অভিযুক্ত করা সাজে না।'[১১]

মিশন ও রাজনীতির যোগাযোগ প্রসঙ্গটি এই উক্তির নিরিখেই বিচার করা প্রয়োজন।

সূত্র নির্দেশ

১। Confidential. Notes on Andaman Enquiry (August 1913) by C.A. Tegart, Addl. Superintendent of Police, Intellignece Branch, C.I.D., Bengal, dated the 7th September 1913, pp. 7, 9. এটি একটি মুদ্রিত সরকারি রিপোর্ট।

২। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Heimsath Charles, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton, 1964.

৩। Majumdar B.B., *Militant Nationalism in India*, Calcutta, 1966.

৪। রত্নলেখা রায়-এর মতে বরিশালের শঙ্কর মঠ প্রকাশ্যভাবেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল — '...the avowed politicised religious organizations like Sankar Math of Barisal.' *Journal of History, V*, Jadavpur University, p.46.

৫। 'I am no politician or political agitator ... No political significance be ever attached to any of my writing or saying.' দ্রষ্টব্য: Swami Gambhirananda, *Op. Cit.*, p.71.

৬। 'Vivekananda could not find sufficient strong terms of disgust wherewith to spurn all collusion with politics.' Romain Rolland, *The Life of Vivekananda and the Universal Gospel*, Calcutta, 1965, p.323.

৭। রায়চৌধুরী লাডলীমোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২, ১২০।

৮। History of Freedom Movement, Phase II, Reg. I, Bengal 25/2 – Ramakrishna Mission, based on I.B. Files in Calcutta. Preserved in New Delhi National Archives. Compiled by Professor R.C. Majumdar, Chairman, Freedom Movement Committee.

৯। Swami Gambhirananda লিখিত প্রাগুক্ত গ্রন্থে সারদানন্দর এই প্রতিবাদপত্রটি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১০। *T.I.B.*, Vol.II, p.388.

১১। রায়চৌধুরী লাডলীমোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

Government of Eastern Bengal and Assam 274/1909.

[CONFIDENTIAL]
CRIMINAL INTELLIGENCE OFFICE
CIRCULAR No.2 of 1909.
Dated Simla, the 24th February 1909.
NOTE ON POLITICAL SADHUS.

The following account of the *sanyasi* rebellion, which occurred in Bengal at the commencement of our rule in India, is found in Hunter's "Annals of Rural Bengal" :-

"A set of lawless banditti, wrote the Council in 1773, known under the name of *sanyasis or fakirs*, have long infested these countries, and, under pretence of religious pilgrimage, have been accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging, stealing and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practise. In the years subsequent to the famine, their ranks were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with, and the cold weather of 1772 brought them down upon the harvest fields of Lower Bengal, burning, plundering, ravaging in bodies of 50 to 1000 men. The Collectors called on the military; but after a temporary success, our sepoys were at length totally defeated and Captain Thomas, their leader, with almost the whole party, cut off. It was not till the close of the winter that the Council could report to the Board of Directors that a battalion under and experienced commander had acted successfully against them, and a month later we find that even this tardy intimation had been premature. On the 31st March 1774 Warren Hastings plainly acknowledges that the commander, who had succeeded Captain Thomas, unhappily underwent the same fate; that four battalions of the army were then actively engaged against the banditti, but that in spite of the militia levies called from the land-holders, their combined operations had been fruitless. The revenue could not be collected, the inhabitants made common cause with the marauders, and the whole rural administration was unhinged. Such incursions were annual episodes in what some have been pleased to represent as the still life of Bengal."

These incursions were confined mainly to Rangpur and the other neighbouring districts of Northern Bengal and occurred just before the strong hand of the British had rescued the country from the anarchy which accompanied the declining years of Moghul rule. These *sanyasis* were not the members of an organised religious order, nor were they a set of gypsies as was supposed at the time. They were merely men driven by discontent, cupidity and famine to bind themselves together by a *quasi*-religious bond. Then as now this was the only bond capable of holding them together for

combined and sustained action. Then as now they are the stormy petrels sent to warn us of approaching danger. their activity has formed a striking feature of all periods of political unrest in India.

A similar agency was at work in the days preceding the Mutiny of 1857. The following passage from the Meerut narrative of Mr. Williams, Commissioner, refers to one of the many religious emissaries who attained prominence at that time :-

"All the rumours by which the minds of the native soldiers were industriously disseminated at Meerut, especially those regarding the use of polluting grease in the preparation of the new cartridges, and the mixture of ground bones in flour, by which, it was said, Government desired to destroy the religion of the people. One of the many emissaries, who were moving about the country, appeared at Meerut in April, ostensibly as a *fakir*, riding on an elephant with flowers and having with him horses and native carriages. The frequent visits of the men of the native regiments to him attracted attention, and he was ordered, through the police, to leave the place; he apparently complied, but, it is said, he stayed some time in the lines of the 20th Native Infantry."

Forty years later a similar movement attracted serious attention :-

In October 1893 Mr. (now Sir E.R.) Henry, then Inspector-General of Police, Bengal, drew attention to the fact that it was believed that *sadhus* and *sanyasis* were beginning to carry on religious and other propaganda, and remarked that, until the last four or five years, these men were not systematically so engaged. He pointed out that their activity synchronised with the rise of the *anti*-kine-killing agitation, and that it had been establised that *sadhus* were unusually numerous and active in the locality just before certain outbreaks which occurred in connection with this movement.

In May 1894 a copy of the memorandum, which Mr. Henry drew up, was issued as a C.S.B. circular with the suggestion that similar confidential enquiries should be instituted in other parts of India, but the results of this enquiry were entirely negative; there was no evidence that either resident *sadhus* or those who wandered about the country were engaged in spreading political or even religious propaganda openly, although it was believed that in some cases they gave their support to the cow-protection movement in a quiet way. The replies, however disclosed that there was really very little known on the subject, and that the matter was generally regarded as one in which it was very undersirable to make any but the most cautious enquiries, and very difficult to obtain trustworthy information.

In the years 1894 and 1895 a mysterious phenomenon was observed first in the districts on the Nepal border and afterwards throughout Behar and parts of the United Provinces and the Punjab. This was the smearing of trees with daubs of mud and hair.

The opinion generally held was that it was being done by wandering *sadhus*, but the real object could not, for a long time, be ascertained. At the end of 1895, however, Sir John Lambert, Commissioner of Police, Calcutta, obtained the following account of the matter from an educated *sadhu*, called PARMANAND, whose real name was HIRA LAL MUKHERJI a native of Chandernagar. He said that soon after the passing of the Age of Consent Act, the Kumbh *mela* at Hardwar took place, and there a select number of Hindu *sanyasis* assembled to consider the best form of agitation to be set on foot to mark their displeasure at the new Act, and also to prevent further interference with the religious institutions of the Hindus. The particular form of agitation, which was then decided on at Hardwar, was to attack with increased vigour the Muhammadan practice of kine-killing. This method of agitation commended itself for two reasons: it was easy to put into practice, and it would probably meet with more general sympathy than any other method of attack. The object in view was to bring pressure on the Hindus on all religious matters, including the Age of Consent Act. The agitation was from one point of view successful; it created disorder in many parts of the country and a great feeling of unrest, but from another point of view, the kine-killing riots had for all practical purposes, the very opposite effect to that which was intended. The Hindus were regarded by Government as aggressors; protection was granted to the Muhammadans, the number of slaughter-houses increased, kine-killing continued unchecked, and in some localities, where it had been unknown, it now was licensed for the first time.

Therefore at the next Magh *mela*, which took place at Allahabad, the question again came up for consideration before the committee of *sadhus*. The conclusions arrived at were that the kine-killing agitation had not only failed to bring about the desired results, but had been positively harmful. Still it was necessary to adopt some plan likely to intimidate Government and create a general feeling of uncertainty; to think out something which would produce anxiety regarding coming events and thus divert public feeling from the mischief which had attended the kine-killing agitation, and at the same time to centre attention on the fact that something must be done to favour the advancement of a general Hindu religious revival.

The plan adopted at Allahabad was borrowed from the precedent of the circulation of the *chapties* at the time of the mutiny. The passing round of the *chapaties* at that time was believed to have had a terrorising effect, and it was hoped that the tree-marking would be regarded as a mysterious signal, warning the Government of general disaffection and of some impending danger.

The tree-marking was supposed to betoken disaster to all enemies of the Hindu religion – Europeans and Muhammadans alike. They could be uprooted as easily as the hair contained in the token, and their condition would be that

of the inanimate clay, which formed the remaining component part of the token agreed on.

The hair used at first by the *sadhus*, who carried out the task imposed by the committee, was generally the hair of deer of tigers, the skins of which animals are usually carried about by itinerant mendicants.

The daubing was confined to trees growing by the road-side or on the outskirts of villages, and was usually done at night. The *sadhus* took none of the villagers into their confidence, nor did they obtain assistance from them, and it is probable that many of the uneducated *sadhus*, who did the actual daubing, were themselves ignorant of the objects of their *gurus*. They were told to smear trees, and they carried out orders. The movement was purposely set on foot at first in districts where there had been most trouble in connection with kine-killing, and, as the attention drawn to the movement pointed to successful results, it was extended further into Oudh and to the Punjab.

This account was confirmed in several points, and in particular it was noted that a *sadhu* was actually caught in the act of tree-daubing in the Etah District in 1894. Whether it is entirely accurate or not, it shows how, in the opinion of an educated *sadhu*, their organisation can be employed for spreading a vague, and on that account none the less dangerous, feeling of uneasiness among the people.

Writing further on the same subject in March 1896, Sir John Lambert remarked that the political *sanyasi* was a creature of comparatively modern growth. In most instances he was a man with a bad social record; he was invariably a person of education and should be carefully watched. He gave the names of four such persons, all political agitators with bad records, who had either been convicted in criminal courts or were social outcastes. On the other hand, the mendicant *sanyasis* were persons of no education, and had nothing in common with the others except perhaps in matters such as the *anti*-cow-killing agitation or the tree-smearing movement.

Again, in September 1896, a C.S.B. circular was issued, in which it was stated that recent reports indicated that *sanyasi* and *sadhu* preachers were being more freely employed than was previously the case for the purpose of stirring up the people in connection with the Hindu religious revival then on foot, and that the aim of the preachers in many instances was political as well as religious. It was added that a certain number of these *sanyasis* were young men who had received an university education, and the request was made that these points might be verified. The result of these enquiries were also entirely negative, and during the next ten years no important signs of political activity among *sadhus* seem to have been noticed.

In 1907 the question again attracted attention in connection with the political unrest that spread over Bengal and the Punjab. From the reports which have been received, it may be said that there is no evidence that the

genuine Hindu *sadhus* of such places as Hardwar, Muttra, Allahabad and Benares, where they congregate in large numbers, take, as a body, any larger interest in politics than they have done hitherto — the majority it seems, form a harmless class whose one idea is to beg enough food to satisfy their hunger and enough *charas* to induce the daily stupefaction, but even in these centres there are many exceptions. There are instances of genuine *sadhus* who threw themselves whole-heartedly into the political movemnent in Northern India last year, and though not the agents of a religions organisation, they seem to have been commissioned by the political agitators to pay special attention to spreading disaffection in the army and were so numerous so as to constitute a real danger. Nor have attempts at organising on a religious basis been wanting.

The idea, of training up quite a different kind of *sadhu*, who should work for the regeneration of India, is not a new one; it is to be found in the writing of Bankim Chandra Chatterji of Bengal, and has more recent exponents among the agitators of the Deccan and the Punjab. In Poona Mr. GOKHALE'S "Servants of India Society" is intended to train up a kind of political *sadhus*. Lala LAJPAT RAI proposes to start near Lahore what is practically an imitation of it, and there are at Hardwar and at Kangni similar institutions allies to the Arya Samaj. The general question of training and organising *sadhus* for political work has, since 1904 at least, engaged the attention of TAHAL RAM GANGA RAM, a petty zemindar of Dera Ismail Khan, but his plans do not appear to have taken practical shape. This is a direction in which SHEOGAN ACHARYA, a *swami* of Muttra, has also experimented. DARSHANAND of Hardwar probably uses his disciples as political emissaries, but it is at Belur Math in Howrah District, Bengal, that the most successful attempts to create a new class of *sadhu* and to employ them, as a political organisation, have been made.

The advantages of having political work done by this agency seem to be, from the agitator's point of view, that a *sadhu* can move about without being conspicious, that his expenses are insignificant, as he can live on the charity of the people among whom he travels, that he is received without suspicion by all classes of Hindus, and that his teachings acquire a touch of religious authority which strongly influences a superstitious people. In this way the agitators hope to reach and influence the masses of the people who are inaccessible to newspapers even in their own vernacular. Besides being inconspicuous, the travelling *sadhu* is further protected from the surveillance of the authorities by the well-known policy of the Government to interfere as little as possible with anything religious in character, or even in appearance, and the recognised custom to adopting, on joining the fraternity, some colourless name such as PARMANAND or ANANDANAND affords additional security. An appendix attached to this memorandum gives brief

summaries of the doings of suspicious *sadhu* as reported by the police of the Punjab, United provinces and North-West Frontier Province. Northern India necessarily constitutes the main theatre for the activity of religious missionaries on occasions of unrest. It is the stronghold of Hinduism and the recruiting ground of many native regiments. This was a feature of the unrest through which we are passing, but it is said also that *sadhus* were being trained for political purposes at Wai in the Satara District and at Shankeswar in the Belgaum District, while a few well-educated Deccani Brahmans were visiting fairs and market places in the guise of *sanyasis* and preaching politics to the assembled people. With this movement Mr. TILAK's name has been connected, and it is at least very likely that he would support such proceedings.

The appendix shows that there were a good many political *sadhus* moving about, particularly in the Punjab and on the Frontier, who, if they did not always preach open sedition, at least did their best to rouse discontent among the people. Some of them are of good education and speak English fluently, and in one or two cases there are glimpses of their previous history, showing that they were formerly in good employment under Government or elsewhere. More than anything else, however, these summaries show the difficulty which would be experienced in exercising any surveillance over a movement of this kind if the country were really flooded with political *sanyasis*, as some of the Nationalist leaders have suggested. It will be observed that some of these men have disappeared often for months at a time and have come to notice at quite a different place, which seems to suggest that they may have visited many other places unobserved and perhaps done a lot of harm in the meantime. It is not suggested that the information furnished in the appendix is in any sense complete. It has been appended with the desire of attracting attention to those *sadhus* whose movement seem to require watching and to provide the groundwork on which more complete histories can be built up by Provincial Special Branches.

In 1907, particularly, in the earlier months of the year, it was found that religious mendicants were taking a large and dangerous part in attempting to undermine the loyalty of the native army. The matter came to notice first in the United Provinces and the Eastern Command, and afterwards numerous reports from widely separated and independent sources all tended in the same direction, and steps were taken to prevent *sadhus* from entering the regimental lines. Checked in their efforts to reach the troops directly, these emissaries of sedition set to work, it appears, at places like Hardwar and Amritsar in order to get into touch with soldiers on leave, and a few reports indicate that they were in some cases successful. An example may be given of the pernicious ideas which the *sadhus* tried to instill into the minds of the sepoys. One of the latter, who was seen at Hardwar in the company of a suspicious mendicant, afterwards made, in the course of conversation with a

correspondent, some very diseffected remarks about things in general. He referred to the plague and to the way in which English doctors had been caught red-handed spreading it by poisoning wells. Some of these doctors, he said, had been summarily dealt with and the plague was in consequence rapidly decreasing. They should join together and not allow a single Britisher to escape; for a short time the Muhammadans would rule the country and then a king would arise in India and a Hindu dynasty would be established.

In the course of the enquiry into the doings of the Anarchist Society, formed by ARABINDA and BARINDRA GHOSE in the Maniktolla Garden, Calcutta, it transpired that this institution itself was semi-religious in character; it was called an *Ashram*, the word usually applied to a place where *sanyasis* live and meditate, and the persons who frequented the garden, combined the study of the *Bhagwat Gita* with the preparation of bombs and explosives and revolver practice.

It was in fact a strikingly faithful reproduction in real life of the *Ananda Math* or Abbey of Bliss which Bankim Chandra Chatterji described in his novel of that name with this difference that the novelist's patriotic league was formed to revive Hinduism and free the country from the ruin of Moslem misrule, whereas the purpose of the Maniktolla *Ashram* was to end British tyranny. In both cases, however, the religious element was equally conspicuous in the rules of the order. The disciples dressed in the *sadhu* garb, studied the *Bhagwat Gita* and were bound by a strong religious vow to save the Motherland.

One of the most prominent members of the Maniktolla *Ashram*, UPENDRA NATH BANARJI, described in his confession how he had wandered about India as a *sanyasi* in the hope of finding some school of a similar kind already established, and failing in his quest returned to Calcutta and joined BARINDRA in the formation of this soceity. The approver, NORENDRO NATH GOSSAIN, also stated that he himself had become a *sanyasi*; he did not take any vow, he informed the court, but simply adopted the dress of the *sanyasi* and a pious look. Another member of this gang was JOTINDRA NATH BANARJI, *alias* NIRALAMBA, a *sadhu*, who, prior to wandering about the Punjab, the North-West Frontier Province and Kashmir, joined the Baroda army and became a member to the Gaekwar's bodyguard. He claims to have inspired ARABINDA GHOSE into his own revolutionary ideas. Another disloyal *sanyasi*, whose name came to notice in connection with this case, was SHIVGYANJI, *alias* SHEOGAN ACHARYA above mentioned, who was former Government servant, but afterwards became a *sadhu* and started an *Ashram* in Muttra, known as the *Shanti Ashram*. Under a certain amount of religious and social disguise he strives to spread the political propaganda.

A further instance of the connection between an apparently genuine *sadhu* and a dangerous political organisation came to notice in the course of a recent enquirey made in Kolhapur regarding a dangerous suspicious explosion which took place in Poona. It appears that in 1904 or 1905 some members of the "Shivaji Club" of Kolhapur formed a new society called the "Belapur Swami Club" which takes its name from a *swami* of Belapur on the River Godavari in the Ahmednagar District. He is said to be a very holy man and to have taken part in the Indian mutiny. The members of this Club go through some *quasi*-religious ceremonies before a picture of the *swami*, and whether he is actively concerned in it or not, his name forms a bond of union among several of the most dangerous extremist Brahmins of Kolhapur.

Another institution of a similarly suspicious character has been established at Belur near Calcutta. The *Math* at this place is the head-quarters of the RAM KRISHNA MISSION in India, founded by VIVEKANANDA, but the nature of the training imparted there seems to have undergone a change. The place where the *sadhus* live belongs to a certain Babu RASSIK LAL, and the *Mahant*, who calls himself BRAHMANAND *swami*, is described as an old man of very bad temper. The *sadhu*, who assemble here, are said to be well-educated and intellectual people, and political preachers are sent out to go round the country. At the beginning of July 1908 it was reported that for the last month this practice had been temporarily discontinued, as it was supposed that the place was being watched. That it is designed to be a revolutionary centre receives confirmation from the fact that BHUPENDRA NATH DUTTA, the first of the *Yugantar gang*, to be convicted, and the late VIVEKANANDA'S brother, adopted the garb of a *sadhu* and took up his residence there after his release from prison.

Again, on the borders of the Baroda State, there was a *quasi*-religous school with which the anarchist gang of Calcutta had a close connection and to which the following sympathetic reference was made in a Marathi paper of Baroda in August 1908 :-

"Ganganath Bharatya Vidyalaya." This institution is about 20 or 25 miles from this place and is on the banks of the Narbadda, near Chandod. It was opened about two years ago, and it was hoped that by this time it would have been in a prosperous state; but as Government looks with suspicion on all such private institutions and besides, on account of the evil deeds of some mischief-makers, it is liable to diverse dangers. It is helped by several eminent rich people and was visited last year by ARABINDA GHOSE, and for these reasons several detectives have been making minute enquiries about it. Yesterday many of the students from this institution came to Baroda, and it is under contemplation to transfer it before long to Baroda on account of the spite shown above."

The idea of opening this school originated with K.G. DESHPANDE, [a graduate of Cambridge and Barrister-at-Law, who is a close friend of TILAK'S, and is said to have defended him when he was tried for sedition in 1897], M.B. JADAV, ARABINDA GHOSE, BARINDRA GHOSE and A.B. DEVDHAR, who are said to have consulted the spirit of RAM KRISHNA PARAMAHANSA on the subject.

They approached a *sanyasi*, named KESHAWANAND, who had a school in the temple of Mahadev on the top of a small hill, called Ganganath, about $3^1/_2$ miles from Chandod, where he taught some 19 boys Sanskrit assisted by a certain BRAHMANAND from Benares.

KESHAWANAND collected some 25,000 rupees, principally from rich Bhatyas, but also, it is believed, from the Ruler of Baroda, and with the funds, built a new edifice at Ganganath which was opened on the 17th May 1905, under the title of Shri Ganganath Bharat Sri Vidyalaya with a staff of 4 teachers. M.B. TALVALKAR, B.A., LL.B, Government Prosecutor, Baroda District, acting as Secretary and Treasurer.

In June 1908 the institution was removed to Baroda and located in the Kashi Vashneshwar temple of Mahadev, which was secured chiefly through the influence of K.G. DESHPANDE, its principle supporter.

There are 37 students on the rolls of the school which consists of two divisions, Vedic and Vehabaric. To the former instruction is given in the Vedas and modern science. The latter are taught their mother-tongue, Hindi, Sanskrit, English, modern history, and science.

Only boys between the ages of 10 and 14, and who are unmarried are admitted; their guardians have, moreover, to promise not to withdraw them for a period of from 6 to 10 years after admission.

According to the last report of the school, the following persons compose the managing board :-

Directors.

1. SHRI KESHAWANAND *Guru* BRAHMANAND.
2. MEHERAN RANA SHARIJIT SINGHJI of Mandava.
3. MAGANBHAI PURUSHOTTAM BHAI, Baroda.
4. CHINUBHAI MADHAV LAL, C.I.E., Ahmedabad.
5. Rao Bahadur KRISHNARAO VINAYAK SARANGAPANI, B.A. LL.B, Baroda.
6. Professor VISHNU GOVIND VIJAPURKAR, M.A., Kolhapur.
7. RAMCHANDRA HARI GOKHALE, B.A., LL.B., Pleader, Baroda.

Managing Board.

1. Diwan Bahadur AMBALAL SAKARLAL DESAI, M.A. LL.B., late Chief Justice, Baroda.

2. Dr. MORESHWAR GOPAL DESHMUKH, M.D., Bombay.
3. Rao Bahadur KESHAV GANESH DESHPANDE, B.A., Barrister, Baroda.

Treasurer

1. SHRIMANT CHINTAMAN RAO NARAYAN, *alias* BHAN SAHIB MAJUMDAR, Baroda.

Secretaries.

1. HARI BALKRISHNA TALWALKAR, B.A. LL.B., Pleader, Baroda.
2. RAMCHANDRA MORESHWAR, Joga State, Karbari, Jawhar State.
3. GANESH BHASKAR SANE, B.A. LL.B., Pleader, Baroda.

The latest development in the movement is reported from Lahore where AJIT SINGH, SUFI AMBA PARSHAD, and a few others assumed the garb of *sadhus* on hearing of TILAK'S conviction, and also published an appeal for subscriptions in order to found a TILAK *Ashram* where youths are to be educated as political *sadhus*. A considerable sum of money has been collected already for the *ashram*, but beyond this nothing seems to have been done. LAJPAT RAI'S scheme to found an institution, called the *Dayanand Brahamachari Ashram*, in imitation of the Servants to India Society, has not advanced beyond the same preliminary state.

C.J. STEVENSION-MOORE,
Offg. Director of Criminal Intelligence.

Brief summaries of the doings of certain suspicious *sadhus*, as reported in the Police Abstracts and from other sources.

1. AMIDHAR PRASAD RUSHIRAJ, *alias* HARVIJAN, of Varsuda, Mahi Kanta Agency, was noticed in Broach on the 13th January 1908 with four *chelas*. Doctrine–religion with *swadeshi* and boycott; but a later report says that he confines himself to the singing of hymns and the publishing of religious books. Of loose morals and suspected of being a cheat.
2. ANANDANANDA, *alias* AMULYA PRASAD/ASUTOSH SUR, *swami*, whose real name is AMULYA PRASAD SUR, son of ASUTOSH SUR, was a resident of Khasari, Hooghly. He was educated at a village *pathsala* and soon after his father's death he joined the stage at Calcutta. Tiring tired of this, he came to Bombay as an apprentice in a jeweller's shop, but being dissatisfied with his employment, be took the garb of *sanyasi*. He has two brothers – MANMATHA NATH SUR, who is in a merchant's office in Calcutta, and SURENDRA NATH SUR, a pleader's muharriar in Howrah.

ANANDANANDA speaks Bengali, English, Hindi and Gujarathi, and is described as a *swadeshi*, boycott, self-government and political preacher.

It would appear that when he becomes an ascetic he struck up an acquaintance with a BARENDRA NATH RAI, of Alam-pore, Kushtia District, and a clerk on the Bombay, Baroda and Central India Railway, who resigned his appointment in March 1907 and eventually became a Brahmachari.

In May 1907 ANANDANANDA, accompanied by BARENDRA RAI, Brahmachari, was exploring the Gujarat District and advocating *swadeshi*, but their efforts to collect funds for establishing *swadeshi* shops were apparently unsuccessful. In the course of this tour they visited Surat, Balsar, Pardi and other places. Towards the end of June 1907 they were both back in Bombay where they delivered lectures on *swadeshi* to crowded audiences, composed chiefly of Brahamans and students and at which B.G. TILAK, KHARE, Professor RANADE and G.K. GADGIL were present.

On the 12th July they were warned against any attempt to create disaffection amongst the people, and about a fortnight later they both were amongst the principal speakers at a meeting held in the "Halai Bhattia Mahajan Wadi" Bombay, and on this occasion strongly advocated the *swadeshi* movement and the boycott of foreign goods.

ANANDANANDA was heard of again in December 1907, when he preached in Hindi in Bombay on *swadeshi*, but evidently in fear of his previous warning he treated the subject in much milder language.

Early in January 1908, he was in Broach and delivered lectures on the "Present State of India" and "Swadeshi" but they were reported to be of a mild type; he also spoke on the subject of foreign sugar, making the usual allusions to the methods of its manufacture and the evil effects resulting from its use. He returned to Ahmedabad on the 23rd January and again appeared in Naraid on the 31st March 1908, when he spoke on *swadeshi*. He re-visited Naraid on the 7th May and delivered a lecture on *swarajya*. About the same time he was in Thana and spoke against the administration of justice, the British system of taxation, and the Arms Act, and advocated boycott.

Descriptive roll :- Age about 23; native of Kharsari, Post Office Janai in the Hooghly District; has tattoo marks on the left forearm, "A.N.K.P."

3. ANANAND MANIRAM, *alias* ANANDANAND, *swami*, a Gujrathi Brahman of Junagadh, aged 16 years; was turned out of the Junagadh High School for lecturing on *swadeshi*. Lectured on *swadeshi* on the

8th and 9th February 1908 at Rahuri (Ahmednagar). Was seen at Kopergaon on the following week, and advocated *swadeshi* and boycott. Was noticed in East Khandesh on the 8th April 1908, where he delivered lectures on National Education, Mauritius sugar, causes of famine in India and the Mushti fund, and was said to have left a good impression. He came to Akola in May in company with TILAK and his subjects were *swadeshi* and *swarajya*, Nationalism, Temperance and the Present State of India.

The District Magistrate, East Khandesh, remarks that "he is a mere child and as a prophet, contemptible."

4. ANAND, *swami, guru swami* RAM TIRATH of Lahore, is a Rajput of Jaipur, and was a student in the Maharajah's College there. Was noticed in Broach in January 1908 in company with *swami* ANANDANANDA, where he delivered a lecture on "Physical Culture," but the speech was reported to be of a mild character.
5. ATMA NAND, a *sanyasi*, who used a little English in his conversation and appeared to be an educated man, was met at Naini Tal (July 1907). Refused to say where he had come from.
6. AVIRUDA VIDAYANATH MISRA, resident of Sambalpur, Central Provinces. Noticed in Dharwar on 24th March 1908. Knows English and Sanskrit and delivers *swadeshi* and religious lectures.
7. BAISAKHI RAM, son of HARNAM DAS, Khatri of Kartarpur, Jullundur, has been employed for the past two years by the *Arya Samaj*, Hoshiarpur, on a salary of Rs.19 per mensem; is extremely disloyal and inclined to be seditious. He has been warned by the *Arya Samaj* authorities to avoid political subjects and now confined himself to attacking the Christian religion.

   Spoke against Government at Hoshiarpur and urged Muhammedans to join Hindus (June 1907).

   At a meeting on 21st July 1907 at Hoshiarpur he spoke on the *Arya* faith and the necessity for obtaining converts.

   Lecturer in Hoshiarpur District in November 1907. Said Government was discouraging public education. Arrived at Hoshiarpur on 27th November 1907 and left for Lahore on 29th November 1907.
8. BALDEO SAHAI, said to be rich and well-connected; has put on the guise of a *sadhu* and is an agitator of an extreme type. Spends his time in Baroda, Bombay and Poona. Has sent students to Japan at his own expense. Met at Delhi on the 1st June 1908.
9. BHAG SINGH, *alias* "My dear" *alias* "Maulvi Sahib" is the son of DAYAL SINGH, Arora, of Chaul Mandi, Amritsar, and was a registered bad character. He was seen at Jullundur with four other *sadhus*, all somewhat suspicious. Four of the five knew English :- PARMANAND, BARMANAND, BRAHMACHARI and BHAG SINGH. BHAG SING left Jullundur for Lahore on the 19th June 1907. Left Lahore for Amritsar on the 2nd July. Came again to Jullundur on the 14th November and left for Amritsar on the 16th November.
10. BIHARI DAS, son of BANNU RAM, of Brindaban, District Muttra. Arrived on the 30th April 1907 at Dera Ismail Khan dressed as a *fakir*. Spoke fluent English. Seemed suspicious, but nothing was known definitely about him.
11. BISHAMBAR DAS, son of TULSI RAM. Tours the Punjab, United Provinces and Bombay for the *Arya Samaj*, Sometimes dresses as a *fakir* and sometimes in European clothes. Indulges in seditious conversation. Was seen at Hoshiarpur on the 31st August 1907.
12. BISHAN DAS, formerly school-master of the Government High School at Ferozepore. Lectured in April 1907 at Jullundur. Returned to Ferozepore on the 23rd July. Arrived Ludhiana 28th July 1907.

    Spoke against English medicine and English sugar. Said that Government were trying to ruin their religion, and that if the army had not sacrificed themselves in 1857, everyone would have been made a Christian. Hindus and Muhammadans should therefore make common cause against Government.

    Left for Ferozepore on the 30th July.

    Heard reciting in the Ferozepore bazar that Indians would eventually be able to go to England and fight the English with their swords. (On the 25th August 1907).

    Held a meeting early in October.

    Advised Hindus and Muhammadans to join. Reminded his hearers of Amir's remarks on cow-killing. Said both parties should combine and abolish laughter of kine as first step to unity.
13. CHAITANYA, *swami*. A Bengali *sadhu*. Was met in Hosiarpur about the 20th May 1908.
    Had crucibles with him and stated that he knew how to make bombs. Seemed well-off and had plenty of money. Said he would be in Calcutta in October and November 1908 and could be found between the hours of 8 and 10 P.M. in the *Kali* temple, but does not appear to have gone there.
14. *Swami* DARSHANAND is employed at Hardwar in the United Provinces by the Anarkali *Samaj* on Rs. 20 per mensem. He is hostile to British administration and occasionally publishes tracts advocating the *Aryan* religion.

At Budaun on the 21st August 1907 he lectured on "National Union." In March 1908 it was reported that he was manager of a *sadhu ashram*, established by himself at Hardwar, for the education and training of *sadhus*, and a later report showed that he had been tapping, but without much success, a sepoy of the 87th Punjabis, stationed in Jhansi.

15. DATTATRAYA GANESH GHANEKAR, a disciple of the late *swami* of Akalkot. Was seen in Nasik on the 29th January 1908. The object of his visit was ostensibly to collect subscriptions for the anniversary of his *guru*. Reported to have discussed political matters.
16. DAULAT GIRI, *sanyasi*, was seen at Hardwar in July 1907. Asked the people why they did not revenge themselves on the English who were harmless and could do nothing in return; that their honour and religion had been stolen from them, and that if LAJPAT RAI and AJIT SINGH were not released there would be another mutiny.
17. DEOKINANDA SHANKARCHARJI came to Delhi in May 1908. Appeared to be well-educated and knew a little English. Said he was formerly a Magistrate in Jodhpur and then became a *sadhu*.

    Left on the 5th June for Garhi Hasan Gurgaon, and delivered a rather violent lecture against Muhammadans and flesh-eaters, for which he was warned under section 107, C.P.C.
18. *Swami* DEOSARUP. Arrived in Lahore on the 24th December 1907 from Jullundur where he had been staying with Sardar PARTAB SINGH of Kapurthala. Says he is the *guru* to the Maharajah of Kashmir, has been living in Lahore for the past 10 years and receives an allowance from Jammu. He frequently visits Suket State and is known in Jammu and Kashmir. In 1904-05 he became implicated in political matters in Kashmir. He spent the summer of 1906 in Chamba State and was in Simla in 1907. He is reported to be harmless in himself, but is apt to fall into the hands of intrigues who endeavour to make use of him for their own ends.
19. DHARM SINGH of Sialkot District became an ascetic and raised 40 recruits. Said he was the incarnation of GOBINDA SINGH and would drive the English out of India and rule the Punjab (3rd August 1907). Convicted under the Arms Act in February 1908 and sentenced to two years' rigorous imprisonment.
20. DHAKSANANDA BRAHMACHARI, resident of Hardwar. Has passed the B.A. examination. Speaks English, Hindustani and Bengali. Attended the 1907 Congress meeting and has since been wandering about. Is in favour of *swadeshi* movement but reported to have very little knowledge of the *sadhu* business and little knowledge of science and electricity. Was noticed in Gauhati in March 1908 in company with two *chelas*. Is frequented by many Bengalis.

21. *Sadhu* GANAPATHI AYYAR. Was seen in Salem during May 1908. Was reported to be a dangerous individual of extremist views. He was closely connected with the organising of the Tinnevelly riots, and collected Rs. 150 for the defence of the accused.
22. GAYANAND, *sanyasi*. Passed through Fyzabad District in July 1907 from Benares for Hardwar. Said the English held India by causing hatred between the Hindus and Muhammadans.

    Quoted the partition of Bengal as an instance. Said if it were not for this either Hindus or Muhammadans would rule India.
23. HARDAS, Brahman, who hails from Poona, arrived in the Nagpur District on December 1907. Ostensibly a religious and moral preacher, but his lectures are not free from political allusions.
24. HARI CHANDA, *alias* HARI MUKHARJI, son of GURU DAS MUKHARJI, of Bali, Banarjipara, Hooghly. Is known to the Police as a suspicious character and apparently makes his living either by crime or by intrigue with criminals. Left Bali in 1905. Arrived in Batala, Gurdaspur, on the 10th August 1907, disguised as a *sadhu*. Enquired for BHAWANI SINGH, who was formerly head clerk to the Sessions Judge of Amritsar and under whose auspices AJIT SINGH lectured in Batala.
25. JAGANANDA SARASWATI. Noticed in Howrah in April 1907. Arrived in Benares on 22nd May. Said to be an M.A., but turned *sanyasi* and was bent on devising means for securing the independence of India.
26. JAMNADAS, MITRADAS, *alias* SARPADAS. *alias* RAMDAS, *fakir* of Patiala. A Sikh impostor. He was caught wandering about the lines of the 105th Madras Light Infantry, Karachi. Went to Hyderabad, Sind, on the 9th July 1907. In August he was back in Multan, hanging about the lines of the 27th Punjabis and watched by desire of the Officer Commanding. Left on the 9th August for Karachi, but was not traced there.
27. JANKI DAS, *chela of Sri swami* DWARKA DAS of Lahore. Arrived in Nowgong on 13th August 1907. It was stated that a sepoy (Kharga) of the 37th Dogras was one of his *chelas*.
28. JOGINDRA PAL, son of GANDA MAL, Khatri *sanyasi fakir*. Was originally a resident of Dananagar, Gurdaspur, but has resided in Jullundur a number of years. He preaches in Jullundur itself and in neighbouring villages where branches of the *Arya Samaj* exist. His preaching is of a particularly violent type, and is directed against all religions other than the *Arya Samaj*. His lectures generally excite ill-feeling against the adherents of the *Arya Samaj* on the part of Muhammadans and Sikhs in places where he visits. He is an ardent

advocate of *swadeshi* and exhorts the people to refrain from the use of foreign sugar, as the bones of cows and other animals are used in the refining process. As a rule, he only preaches in the immediate vicinity of Jullundur. He receives pay from the *Pratinidhi Sabha* at the rate of Rs. 30 per mensem.

29. KIRTAN DAS, a *bairagi*, was noticed in Hardwar in August 1907. Held forth on political questions of the day, but refused to say where he hailed from.
30. KUMAR ANAND BRAHMACHARI, *alias* KUARANAND, *sanyasi*. At Allahabad. Said to know English, Sanskrit and Urdu. He was on friendly terms with the Punjabi sepoys of the 9th Bhopal Infantry. He was staying in a temple in their lines. (May 1907)
31. MAHESHANAND, a *sadhu*, who visited Gwalior and Datia, preaching to the State officials and the general public to rise against the English. (On the 24th May 1908).
32. MOTIRAM, son of Babu BENI MADHO UPADHAYA, of Allahabad. He was at Sibi on the 22nd February 1908, travelling without a ticket. Spoke good English and seemed suspicious. His fare was paid by subscriptions raised among the Hindu clerks at Sibi. Nothing was elicited at Allahabad about him.
33. MUKTANAND, *swami*, *alias* SANT KARTAR SINGH, came to notice at Peshawar on the 5th May 1907. The object of his visit was said to be that of preaching to the Sikh soldiers on the topics of the day. Is said to have changed his religion several times, to have been once a member of the *Arya Samaj*, and is a follower of the Sikh *gurus*.
34. NARAYAN DAS, *bairagi sadhu*, resident of Jamauka. Was noticed in Mainwali (came from Bannu) on the 6th February 1908. Stated he had travelled in Russia and Afganistan. Writes Urdu and Gurmikhi, speaks Russian, Turkish, Persian and Pushtu. Arrived in Jhelum from Rawalpindi, accompanied by two other *sadhus*, on 14th March 1908.
35. NARANJAN DEA, with a *chela*, SATICHA BRAHMACHARI, was seen in Lucknow on 19th June 1908. He is a follower of, and successor to, the late *swami* RAM TIRATH, a noted political leader.
36. *Swami* PARICHANAND, *alias* FATEH SINGH, *alias* NARAYAN DAS, son of DULI SINGH, Jat, of Jagatpur, Bulandshahr, was noticed on the 12th June 1908 in Jhansi, where he stayed with Sowar KHEMIL SINGH, 30th Lancers. Left for Gwalior shortly afterwards having been turned out by the Officer Commanding. Did not lecture and appeared illiterate.
37. PARMANAND, son of DWARKANAND, Bengali, of Jahangira, and resident of Dhangora, Bombay, and BARMANAND, son of

DWARKA DAS, Chattri of Rani Khrattra Mohalla, came to notice at Jullundur with BHAG SINGH and others. Know English. At Ludhiana in May 1907 they were joined by one NARAYAN DAS. All three are *Arya Samaj* preacher. Arrived Saharanpur on the 29th May. Said to speak against Government.
Came to Haldwani (Naini Tal) from Bareilly on the 3rd June.
38. BARMANAND left Hardwar for Dehra Dun on the 14th July. Returned on the 16th and left for Ambala on the 26th.
Both also toured in the United Provinces.
39. PREMANANDA, *swami*, an English scholar and professing to be acquainted with occult sciences; said to be travelling about along with three others (one a *sahib*, possibly an American and two Marwaris) in Bengal, preaching *swadeshi* with a view to working out India's independence.
40. RAM DAS, son of NANAK, *Udasi fakir*, resident of village Karuntha, P.S. Naraul, Patiala, was noticed in Multan in August 1907, hanging about the lines of the 27th Punjabis. Used to be visited by a number of sepoys to whom he explained the Sikh scriptures. Left for Karachi on 9th August.
41. RAM DAS THAKUR DAS, *sadhu*, of Agra. Spoke in favour of *sawadeshi* at Allahabad; said that even if there is bloodshed, good is bound to result to the country. (May 1907)
42. RATAN GIRI, a Bengali *sadhu* of Benares, was noticed preaching to the pilgrims at Gaya that they should turn out the English. (April 1908.)
43. RATAN DAS, *alias* CHATAR SINGH, son of SEWA SINGH, Jat, of Dawar, P.S. Moga, Ferozepur. Was seen in Jullundur in June 1907. Says he turned *fakir* about seven years ago and before that he had served for seven years in the Guides Regiment. Seemed suspicious.
44. SAMANAND, *fakir*, was found travelling with an *Arya Samaj* lectures at Gujranwala on 14th June 1907. Left for Rawalpindi, but arrival not noticed.
45. SANCHAIT, *ailas* SUCHET, *alias* BHAGAT RAM, *fakir*, resident of Chellerie (?), Deccan. He was sent on under police surveillance from Peshawar to Hasan Abdal shortly before 21st September 1907.
Arrived at Amritsar on 27th September 1907.
46. ONKAR ISHAR SATCHIDANAND *alias* TRIMBAK, Brahman, son of BALKISHAN, Brahman, of village Dharanagri, Ujjain, Malwa. Was first noticed in Shahabad on the 29th January 1905, where he lectured on the doctrines of the Sanatan Dharm. He left Shahabad on the 22nd April 1906 for a place in the Shahjahanpur District, where his arrival was not noticed, and he was reported to have gone on to

Allahabad. On the 16th September 1906 he lectured at Murshidabad on *swadeshi*, and on October he visited Benares and distributed pamphlets on the *swadeshi* movement. In March 1907 he was at Kamalganj (Fatehpur), encouraging the boycott of Bombay sugar and salt. In April 1907 he lectured on *swadeshi* and cow-protection at Achnere (U.P.), and it was then reported that he was the manager of an orphanage in Rohu, Hoshiapur District, Punjab; but this statement was subsequently proved to be incorrect.

On the evening of the 2nd July 1907 he lectured on the Vedic religion at a meeting in College Square, Calcutta, which was presided over by the notorious LIAKAT HUSAIN, and some time before the 18th July be was found by a Calcutta detective at No.7, Nebutollah Lane.

He appeared in Allahabad in August 1907, and on the 20th October arrived in Unao from the direction of Lucknow. He gave no lectures.-but was heard to express the sentiment of "India for the Indians." From Unao he went to a village in the Fatehpur District and while there spoke on the necessity of using country made sugar, alluding to the unclean methods of manufacture of the imported article.

He returned to Unao on 8th November 1907, where he continued to give lectures on sugar. A week later he went to Cawnpur where he was well-known as an *Arya Samajist* of the most advanced views, an ardent Swadeshist and a member of the extremist party in his politics.

Towards the end of January 1908 he was noticed in Kumbh (Moradabad) where he spoke against the use of English sugar. In March he stayed a few days at Hardoi on his way to Sitapur and delivered one or two religious lectures.

In April 1908 he came to Lucknow and then went on to Fyzabad where he gave out that he was a stoic *sanyasi*, preaching truth and theology for the good of his people. On the 18th May he left Fayzabad on his way to Nepal, his ostensible destination.

From the report on the *Arya Samaj* in the Punjab (1907) it appears that *swami* SATCHIDANAND is employed by the vegetarian section of the *Arya Samaj*, Wachhowali, Lahore, on Rs. 20 per mensem, and is reported to be a supporter of the *swadeshi* movement with seditious views.

47. SATISH CHANDRA MUKHARJI, son of RAM LAL, Brahman, of Ballygunj, Calcutta, was noticed in Hoshiarpur in May 1907. He is reported to have attempted to give a seditious speech, but was prevented by the Rajah of Dadda Siba. He, however, spoke against Government service and lectured on *swadeshi*, and stated that he had

been touring the Hill States of Kangra, collecting subscriptions for the Rawalpindi patriots.

48. SEBANAND, *swami, alias* MONMATH NATH DAS, aged 25. Educated upto the Entrance Standard and was formerly a clerk in the Telegraph Office, Calcutta. Is suspected of being a *swadeshist*.

Left Calcutta for Benares in July 1908 in company with BEPIN BEHARI DE, a clerk in the same office, but on leave.

49. SHANKARANAND, *swami. alias* RAM NARAYAN, is a Hindustani Brahman of Bhind, Gwalior State. His father was Assistant Surgeon in the Baroda State service, and his son served for some time in the Police Department of that State, but was dismissed, but through his father's influence was re-instated as a Duffadar in the Baroda Cavalry. He took his gratuity and became a *sadhu* two years ago.

Knows English, Bengali, Marathi, Hindi and Urdu and has travelled in Bengal, Central Provinces and Bombay Presidency.

At Hardwar on the 17th June 1908 he, in conversation with Rajah FATEH SINGH of Pohwah, urged the necessity for unity for the regeneration of India, and it is reported that the Rajah was favourably inclined towards his views.

Was in Indore on 28th June 1908 and left for Barnagar on 4th July 1908.

Is employed by the Anarkali *Samaj*, Punjab, on Rs. 25 a month, and is a *swadeshi* lecturer with advanced political views.

50. SHANKAR DAS, a suspicious *Udasi sadhu*, of Gujranwala. He was seen hanging about the lines of 25th Punjabis at Rawalpindi on the 13th September 1907. Educated; understands and writes a little English. Formerly worked on the Rajputana-Malwa-Railway.

He left Rawal Pindi on 14th September 1907 for Jhelum and disappeared. Enquiries at Gujranwala shows that he gave false information as to his antecedents, and apparently associated with RALLA RAM, a plate-layer (N.W. Ry.), who is a bigoted *Arya*.

51. SHEO DUTT, *alias* PARMANAND, son of GAYA BAKHSH. Came to Allahabad from Benaras; a well-to-do person, Became *sadhu* seven years ago. Frequently visited by sepoys of the IX Bhopal Infantry and visited by a Subedar-Major. Has not been heard discussing politics.

Said to be non-political. (June 1907).

52. SHIV CHETAN, *alias* BALDEO, *alias* RAM SUKH, *sanyasi fakir*, of village Murkhamai, P.S. Mowas, Allahabad District.

Visited Kohat and Bannu in August 1907 where he gave incorrect accounts of his antecedents and early history, and was suspected of seditious inclinations.

Left his native place some seventeen or eighteen years ago; lived three years in Madras where he learnt something of medicine, and after leaving Madras travelled a good deal, visiting Kashmer, Jhelum and Jammu.

Is now at Rawalpindi.

53. SRI CHAND, *alias* SRI RAM CHAND, *alias* BANARJI. A Hindu *sanyasi fakir*, who speaks English and appears to be suspicious.

In March and April 1907 he visited the lines of the 59th Rifles at Peshawar; it is not known why.

He visited the lines of the Hindustani drivers of the Battery at Attock in May and left Campbellpur on the 15th for Hasan Abdal. Went to Rawal Pindi on 21st June begging. Passed through Lahore for Hardwar on the 24th and passed through Amritsar and Lahore on 4th July. He was at Rawal Pindi on 13th July. He left Rawal Pindi on August 4th for Kashmir on the 11th, having been expelled; he left the same day for Amritsar. Arrived there and left on 6th November for Lahore where he arrived on the 7th. Went to Nankana fair and returned to Lahore on November 19th.

During the next three months he was in Rawal Pindi, but his movements called for no comment. He came to Peshawar on the 8th April 1908, and on the 12th he was visited by a Jamadar and a Havildar of the 59th Rifles, and eventually was invited by them to come and stay in the lines of the regiment, but this he refused to do. He was seen in Attock on 27th April and left for Quetta on the 9th May 1908.

54. SRI KISHAN DAS, *alias* ANAND DAS, son of SRI RAM CHANDAR, Brahman, resident of Ramnagar State, arrived in Lahore on 3rd January 1908 and began to preach on religion. Claims a knowledge of Sanskrit, Gurmukhi, Nagri Bhasha and Urdu. Is a follower of the *Sanatan Dharm Sabha* and also of the Theosophical Society, is a pupil of Mrs. ANNIE BESANT and is travelling through India on foot.

55. SRI SAB NAND, (?) Brahmachari. Described as an educated devotee; took up his abode near the IX Bhopal Infantry Lines. (Allahabad, 6th April, 1907.)

56. SUNDAR SINGH, *ex-sepoy* of the 2nd Sikhs. Had a row with a Subedar, got two months' imprisonment and was turned out of the regiment. Said he became a *sadhu* four of five years ago. Was seen at Haripur (Kangra) in June 1907.

57. TEJA SINGH, resident of Magwan, Chakwal, Jhelum. Arrived in Peshawar from Amritsar on the 28th April 1907, and after visiting Hardwar returned to Peshawar on the 1st August. Combines the preaching of ordinary religious doctrines with the propagation of

seditious ideas.

58. TOGA NAND, Calls himself a Brahmachari *fakir* of Benares. From his accent he seems to be a Bengali. Knows English and Sanskrit, and is vague about his future movements. Lectured on religious subjects at Multan on 26th October 1907.

59. UPENDRA NATH DEB, of Calcutta. Suspicious character; dressed something like a *jogi*; speaks fluent English. Arrived at Delhi from Muttra on 22nd September 1907.

60. WARIAM DAS, *Arya Samajist* of Ludhiana, visited SANT RAM, Barrister of Jullundur on 9th June 1907. Was dressed as a *fakir*. Visited him again on 18th July, and went to Ludhiana. Returned on the 22nd and visited NIHAL CHAND, Pleader, on the 23rd.

His real name is BANSI LAL, and he is a suspicious character of loose morals. Visited well-known *Arya Samajist*.

Government of Bengal, Confidential, Special Branch,
Bengal 8/9/1909 (Intelligence Branch Serial No. 14/1909.)

[CONFIDENTIAL]

MEMORANDUM

The Ram Krishna Mission was founded by *Swami* **Vivekananda,** the favourite disciple of **Ram Krishna,** *Paramhansa*. Ram Krishna was an orthodox Hindu *pujari* (priest) in the *math* (temple) of Rani Rashmani at Dakhineshwar, in the Baranagar police circle of the 24-Parganas district, Bengal. He became a *Paramhansa* (superior *sadhu*) and lived in this temple till his death about 25 years ago.

The original name of *Swami* Vivekananda was **Narendra Nath Datta.** He was born in Calcutta in the year 1863 and was the eldest son of the late Babu Viswa Nath Dutta, a Kayasth who practised as an Attorney in the Calcutta High Court. He was educated in the Church of Scotland Mission School at Calcutta and afterwards became a graduate of the Calcutta University. He came under the influence of Ram Krishna, *Paramhansa*, who initiated him as a *Sanyasi* and gave him the name of *Swami* Vivekananda, by which he was henceforth known.

After visiting all the holy places in India, he first came to notice in 1892 when he toured through the various States in Kathiawar and was entertained by some of the petty Chiefs. His religious lectures did not exercise much influence on his hearers, but it was noted that he took an interest in politics.

Swami Vivekananda came to Madras early in 1893. at the time that it was proposed to hold the Parliament of Religions in Chicago. His lectures attracted much attention and he was selected by the Hindus of Madras as the fittest man to represent Hinduism at the Parliament. Funds were raised for him by the Hindu community and the **Maharaja of Mysore** and the **Raja of Ramnad** are said to have contributed.

Swami Vivekananda reached Chicago in May 1893 but found that the Parliament was not to be opened for some months. In the interval friends came forward and supported him. He made a great impression at the Parliament in September 1893 and henceforth his position as the leading exponent of Vedantism in America was secured. He appears to have travelled very extensively in that country during 1894-95 and to have attracted a considerable amount of attention. He held daily free classes in New York for some months and his sojourn there is said to have been eminently successful. Detroit, Boston, Harvard and Chicago were also visited by him.

In America he had two disciples :-

i) **Marie Louise** *alias Swami* **Abhayananda**, a French lady;

ii) **Leon Sandsbury** *alias Swami* **Kripananda**, a Russian Jew.

In April 1896, *Swami* Vivekananda left America for England and stayed with **Mr. Sturdy**, a member of the Theosophical Society of England. Here his preaching also was attended with much success and he made the acquaintance of Professor Max Müller.

From England the *Swami* went to Zurich to attend the Ethical Conference, and thence to Kiel to pay a visit to Professor Deussen, the German Vedantist, who accompanied him on his return to London.

In 1897 the *Swami* returned to India accompanied by two Americans, a **Mr. and Mrs. Sevier** and an Englishman, a **Mr. Goodwin**, who were said to be his disciples. He was given an address of welcome at Colombo on the 15th January 1897 and on the 26th idem was received in state at Pamban by the **Raja of Ramnad**. **Mr.** Justice **Subramania Iyar** and others gave him an enthusiastic reception at Madras on the 6th February 1897. *Swami* **Niranchananda** and **Avedananda** and a **Mr. Harrison**, said to be a Buddhist, appear to have joined the party at Colombo.

On the 19th February 1897 *Swami* Vivekananda arrived in Calcutta and was received with much enthusiasm. An address of welcome was presented to him at a crowded meeting presided over by **Raja Binai Krishna Deb** and it is noteworthy that members of the National Congress joined in the movement to welcome his return. Subsequently at a lecture delivered by the *Swami* early in March the following members of the Congress were present:- the Hon'ble **Mr. P. Ananda Charlu**, the Hon'ble **Mr. A.M. Bose**, the Hon'ble **Mr. Guru Prasad Sen, Mr. J. Ghosal, Mr. N.N. Ghosh** and **Mr. Narendra Nath Sen**, Proprietor of the *Indian Mirror* (Calcutta).

Swami Vivekananda established himself at Belur, in the Howrah district and inaugurated the Ram Krishna Mission for preaching practical Vedantism. He built a large house where his disciples had free board and lodging and were taught Vedanta philosophy. Here he was joined by a **Miss Müller**, a Theosophist. A little later, his lectures in Calcutta were said to have fallen flat and to have given offence to the Theosophists and the Brahmo community. The Brahmans, moreover, were said to look down on him as a *Sudra* and denied his claim to the title of *Swami*. This may have been because, unlike other disciples of Ram Krishna, he observed no caste distinctions or prejudices as to food after his visit to Europe and America.

In May 1897 *Swami* Vivekananda, accompanied by five other Swamis, left Calcutta for an extended tour in Northern Dehra Dun, Naini Tal, Bareli, Ambala, Dharmsala, Rawal Pindi, Jammu (where he is said to have been invited by the Maharaja of Kashmir), Sialkot, Lahore and Amritsar.

The object of his visit to Almora was said to be to establish his head-quarters there with a view to open communication with Tibet, and to avoid publicity and police surveillance. He was said to be assisted by one "**Damu**

Shaw who has dealings with Tibet." At Dharmasala he was accompanied by Mr. and Mrs. Sevier and stated his intention to open an orphanage there in charge of the two Americans.

On his return journey, on his way through Rewari to Alwar, the **Raja of Khetri**, who was said to be a follower of his, sent servants to minister to him. From Alwar he went to Jodhpur.

In 1898, *Swami* Vivekananda made a second tour in Northern India accompanied by four Bengali disciples and four English and American ladies. Among the latter were a Miss **Noble** and a Miss **Pitcher**. They visited Naini Tal, Almora and Kashmir, whence they returned to Calcutta on the 18th October 1898.

On his way through Lahore, in October 1898, the Panjab branch of the **Indian Association** is said to have paid Rs.500 to *Swami* Vivekananda "to continue agitating for the prevention of kine-slaughter."

His health having broken down he retired for rest to Deogarh. After a time his friends persuaded him to take a sea-voyage as a means of restoring it.

On the 20th June 1899, *Swami* Vivekananda, accompanied by Miss Noble and *Swami* **Turianand**, left Calcutta for England. Nothing more was heard of the *Swami* till September 1900, when the *Bengalee* (Calcutta) of the 14th idem, mentioned that after a short stay in England he had gone to America and had been given a splendid reception by his admirers in New York. After delivering a course of lectures there, he had made a lecturing tour through California, where one of his numerous friends gave him 160 acres of land in aid of his mission. He was said to have established a Vedanta Society in San Francisco. He then sailed for France to attend the Paris Exhibition, where he had been invited to speak before the Religious Congress.

At the close of the year 1900 *Swami* Vivekananda returned to India but his health again failing from overwork, he was obliged to give up all exertion.

In March 1901, he visited Dacca and, in the following month, started on a pilgrimage to Chandranath and Kamakhya. Thence he went to Shillong, where he is said to have been cordially received by **Sir H. Cotton**, the then Chief Commissioner of Assam. After a stay of a few days he returned to Calcutta.

Henceforth he remained quietly in Belur and his health seemed to be improving, when he died suddenly at the *math* on the 4th July 1902 at the age of 39.

In a letter written shortly before his death he urged that numbers of young Indians should be sent every year to Japan and he twitted his fellow countrymen with dissipation of their energy in vain discussions, and with their exclusiveness and adherence to caste obligations, which prevented their crossing the seas.

It appears to have been the *Swami's* intention to establish centres of the Ram Krishna Mission in Calcutta, Madras, Bombay and Allahabad. He built a house at Magavati near Almora as a Himalayan centre and a place of residence for such western disciples as might come to India.

Besides the *maths* at Belur and Magavati, he is said to have established others at Kankurgachi in the 24-Parganas district at Dacca and at Madras. He also founded *Sevasrams* at Benares and Kankhal (Hardwar) and an Orphanage at Bhabda in the Murshidabad district.

There are now (1905) said to be two Vivekananda Societies in Calcutta. The senior of these holds weekly meetings at which lectures are delivered on such subjects as theology, science and history. The President is Babu **Anathnath Palit, M.A.,** Professor of Science, in the Metropolitan College. The prominent feature of the Junior Society, founded two years ago, is to succour the poor and distressed. Daily classes and weekly meetings are regularly conducted by a *Sanyasi* from the Belur *Math*.

The movement at the beginning was undoubtedly a religious one, but even *Swami* Vivekananda gave it somewhat of a political character and urged that political union in India was to be obtained only through religious union and that the first thing to be done was to educate the people and teach them their religion. The Bra[illegible]man, the Sudra and the Pariah must have equal opportunities of studying the *Vedas*.

During his life-time the *Swami* [illegible]ed, from his head-quarters at Belur, a fortnightly journal called "*Udbodhan*" containing articles and instruction on Hinduism. This is still issued from the Saroda Press, Calcutta, belonging to Babu Lal Chand Datt on behalf of the Ram Krishna Mission. The branch at Dacca appears to be still active, for it last years issued a little pamphlet on *Swami* Vivekananda's life and teachings.

The branch at Madras was opened in April 1897 in charge of a disciple known as *Swami* **Ram Krishnananda** with *Swami* **Sadananda** and one **Alasinga Perumal**, B.A., a teacher in Pachaiyappa's College, Madras, as his Assistants. Classes of instruction were opened in three centres, *viz.*, Triplicane, Mylapore and Black Town, for imparting regular instruction in the *Gita*, *Upanishads*, and *Brahma Sutras*. This was shortly followed by the opening of a free school designated "Lotus Circle No. 2" with three classes for English, Telugu and Tamil.

Subsequently, a printing press known as the *Brahmavadin* Press was opened at Triplicane and here "*The Weekly Review*" (a paper in English consisting mainly of extracts, and having a circulation of about 500 copies) and the *Brahmavadin* (a fortnightly journal in English treating of Vedantic Philosophy) are printed. The latter publication is said to be on sale in London, New York and Calcutta, and to have a circulation of 1,500. In 1904, a home for poor students was inaugurated in Mylapore, and located in a house, placed

at the disposal of the Society by **Dr. M.C. Nanjunda Rao** and situated in the Kesavaperumal Kovil, South Mada Street.

Swami Ram Krishnananda still holds sole charge of the work of the Madras branch and last year made tours to Calcutta, Bangalore, Masulipatam, Bezwada, Tinnevelly, Aleppy, Cochin and Ernacolam. In the spring of the present year (1905) he visited and lectured at Rangoon. A proposal to open a centre of work in the Northern Circars is said to be under consideration.

In Benares the institution called "The Ram Krishna Home of Service" is maintained for the relief of the indigent pilgrims to the holy city.

In March 1897, **Gangadhar Ghattak** *alias Swami* **Akhandananda**, a Brahman of Bagh Bazar, Calcutta, came with *Swami* **Sureshanand** of the Ram Krishna Mission to Mahala in the Murshidabad district with the object of giving gratuitous relief to the famine-stricken people of the district. The *Swami's* energy and self-sacrificing spirit were much appreciated by the Collector and people at large. The *Swami* started a school for orphan boys at Mahala where they were fed, clothed and taught Bengali, but in spite of the good work done by the *Swami* the people were said to suspect him in consequence of his immoral character.

In connection with the *math* at Magavati near Almora, a printing press has been established which issues a monthly Theosophical Magazine, called *Prabhddha Bharata*, with a circulation in India of 300 copies. It is said to be supported by the members of the society and friends in Europe and America. In 1901, it was edited by *Swami* **Sarupanand** assisted by *Swami* **Birojanand** and **Bimalanand**.

The President and head of the Ram Krishna Mission is *Swami* **Bramananda**, who lives at the Belur *Math*, Howrah district, Bengal.

The following particulars are on record regarding the disciplines of the late *Swami* Vivekananda mentioned in the foregoing narrative :-

1. Madame **Marie Louise** *alias Swami* **Abhayananda** - She described herself as an American lady of French extraction. She met *Swami* Vivekananda at the Congress of Religions held at Chicago in September 1893 and became his disciple. She avers that the *Swami* ordained her to the Sivaite priesthood and that she eventually became a *Sanyasin* and adopted the name of *Swami* Abhayananda. She is the head of the Mission in America. She appears to have arrived in Calcutta in March 1899, and stayed with Narendra Nath Mitra, a solicitor. She attended and addressed Bengali meetings, and was in touch with several members of the Congress party. She had travelled through Germany and Russia. She declared that she had been empowered by *Swami* Vivekananda to ordain priests and had already ordained five priests to the lesser orders. Though ignorant of Sanskrit, she had learnt by heart the necessary portions of the ritual.

In April 1899 she was reported from Nagpur to be going about from place to place, entering temples and joining in the worship. The people believed her to be a Government spy sent round to watch the doings of the Hindus.

She left Calcutta for Bombay on the 1st June 1899 *en route* for America and has not been heard of since.

2. Miss **Henrietta Müller** – She is described as a leading member of the Theosophical Society in England, and is said to have joined *Swami* Vivekanda in 1897. In 1901 she was mentioned as one of the supporters of the '*Prabuddha Bharata*' magazine published at Magavati in the Almora District (*see page 6 ante*). She is not now in India.
3. Miss **Margaret E. Noble** *alias* Sister **Nevedita** – This lady is of Irish origin and is about 38 years of age. She met *Swami* Vivekananda in London in 1896, and subsequently followed him out to India. On arrival at Calcutta in January 1898, she put up at 82 Ram Kanta Basu's lane and started a Bengali girls' school at Bosepara Lane on the Kindergarten principle. She dresses in semi-native fashion and goes bare-headed and without shoes. She was not looked upon with much favour by the respectable natives of Calcutta, as from all accounts she did not bear a good character, and was living in a house with a number of young Bengalis. She appeared to be without funds and her expenses were paid by the Ram Krishna Mission.

   Miss Noble accompanied *Swami* Vivekananda to Naini Tal in May 1898.

   She is still in India and lectured at the Calcutta Branch of the Mission during 1904.

   She is the reputed authoress of a book entitled "*The Web of Indian Life*" published last year by W. Heinemann, London, which purports to give an intimate account of Indian life and thought. The Press opinions quoted in the fly-page are flattering in the extreme but a recent reviewer in the *Pioneer*, of the 12th May 1905, points out that the book is nothing more nor less than a political pamphlet in disguise, the real object of which is "the demonstration that India is a single nation and not a congeries of divided races and religions, and an appeal to that nation to realise its destiny by becoming independent." The reviewer's final criticism on the book is that "its leading characteristic is cunning and its contents are mischievous.
4. Miss **Pitcher** – This lady accompanied *Swami* Vivekananda to Naini Tal in May 1898.
5. Mr. **Goodwin** – He accompanied *Swami* Vivekananda on the latter's return to India in January 1897. The *Swami* in a letter to some Madras friends described him as "an unmarried young man who was going to travel and

live with him and that he was like a *Sanyasi*." Mr. Goodwin eventually jointed the staff of the *Madras Mail* and died at Ootacamund on the 2nd June 1898.

6. **Mr. Harrison –** He is described as a Buddhist from Colombo and came to India with *Swami* Vivekananda in January 1897. He has not been heard of since.

7. **Mr. Johnson –** He is said to be a retired officer of the American Army. He came to Magavati in 1900 and adopted the native dress, &c., but kept almost entirely to himself and took no part in the work of the Mission. He is not mentioned later than August 1901 when he was still at Magavati.

8. **Leon Sandsbury** *alias Swami* Kripananda. He is described as one of *Swami* Vivekananda's disciples in America in 1895 – "a Russian Jew, owning a pair of eyes in which the fire of the true fanatic burns." He has not been mentioned since and has not visited India.

9. **Captain** and **Mrs. Sevier –** They are said to be Americans and accompanied *Swami* Vivekananda to India in January 1897. Captain Sevier was said to have considerable property in England and he supported the Magavati branch of the Ram Krishna Mission and its press up to 1900 when he died. Mrs. **Sevier** then returned to England and has not since been mentioned **Captain Sevier** also started a school at Magavati for which he found everything but it was not popular and was soon closed.

10. **Mr. C.T. Sturdy –** Is a member of the Theosophical Society of England. He came to India in December 1892. During 1893 he lectured in different places on theosophy and vegetarianism and during part of his tour was accompanied by a Bengali Pleader of Ludhiana, in the Panjab, and President of the local Theosophical Society, one **Rai Baroda Kant Lahiri**, who under the names of **Powel, C.N. Paul** and **P.C. Roy** was concerned in the Dalip Singh intrigues and was supposed to have visited the ex-Maharaja in Paris on behalf of the conspirators. Lahiri was in the employ of the Raja of Faridkot and was sent to England in 1890 in connection with the Raja's appeal against an adverse decision of the Government of India in regard to certain of his *jagirdars*. From February to April 1893 Mr. Sturdy lived with Lahiri in Ludhiana, dressing in the native fashion. In March 1894 Mr. Sturdy joined Mrs. **Besant** and Colonel **Olcott** and accompanied these two Theosophists to Surat and Baroda. Shortly after he appears to have returned to England. As mentioned (*on page 2 ante*) Mr. Sturdy was *Swami* Vivekananda's host in London in the spring of 1896 and presided at the *Swami's farewell meeting on the 13th December 1896.*

11. ***Swami* Akhandananda –** His real name is **Gangadhar Ghattak** and the only mention of him is that in conjunction with one *Swami* **Sureshanand** he afforded gratuitous relief to the famine-stricken people in the Murshidabad district in March 1897 (*see page 6 ante*).

12. *Swami* **Akhandananda**, Saraswati, *alias* **Govindji**. He is a Kanojia Brahman of Calcutta, an Under-graduate of the Calcutta University and became a *Sanyasi* about 1896. Before joining the Ram Krishna Mission he was known as **Sukul**, or **Sukul Maharaj**. In 1904 it was reported that his lectures were purely on religious subjects and quite free from objection. He averred that the *Vedas* do not prohibit journeys to foreign countries and pointed out the advantages of travel in some lectures he delivered on his own visits to Europe, America and Japan. He was said to have been touring a good deal in the Bombay Presidency, and on his way from Calcutta to Bombay visited Puri, Midnapur, Nagpur, Bhusawal and Nasik. In October 1903 he went to Alibag in the Kolaba District and posed as a Panjabi from the Jalandhar District and falsely pretended to be intimate with Mr. Ghosal, I.C.S. The Alibag people thought he was a governemnt spy sent to watch their political movements. He left Bombay for Madras on the 27th February 1904.

    Descriptive roll in June 1904. – Age about 35, medium height, clean shaven; wore a reddish coloured gown. Speaks English well.

    He is now working under the Madras branch of the Ram Krishna Mission at Triplicane.

13. *Swami* **Avedananda –** His real name is said to be **Kali Charan Chandra,** and he is the son of a retired Schoolmaster named Babu Rasik Lal Chandra, of Ahiritollah, Calcutta. He is now about 40 years of ago. His education was indifferent and he was not able to pass any public examination. He knows English and Sanskrit. He became a *Sanyasi* about the year 1888. He left India for England in August 1896 and returned with *Swami* Vivekananda in January 1897.

    He appears to be identical with the *Swami* Avedananda who afterwards went to America where he excited a considerable amount of attention. He told his brother that he had assumed the role of a *Swami*, because it was the easiest and most pleasant way of earning a livelihood, and he evidently makes sufficient money as an ostensible mendicant to travel in comfort all over the world.

    From an article in the *Advocate* of the 24th April 1904, it appears that this *Swami* was then in New York where he had established a 'Vedanta Society' with a place of worship or lecture hall at house No. 102 Fifty-eighth street at which he regularly lectured on Vedantic Hinduism assisted by one *Swami* **Nirmalananda.**

    The principal officers of this Society are said to be –

    President –

    1. **Herschell C. Parker**, Instructor in Physics at the Columbia University.

2. Secretary – Miss **Cape** – said to be a Roman Catholic.

14. *Swami* **Birojanand** and **Bimalanand** – They were mentioned in August 1901 as Assistant Editors of the "*Prabuddha Bharata*."

15. *Swami* **Brahmananda** – Is mentioned incidentally in a letter from the Manager of the *Brahmavadin* (Madras) to the Editor of the *Mahratta*, Poona, which appeared in the latter paper on the 30th December 1900, as "President of the Ram Krishna *math*, Belur." In the annual report which was read at the Ram Krishna birthday celebration at Madras in March 1904, the following appears :- "The work of the mission is, as before, under the very able guidance of the President, His Holiness Swami Brahmandaji." This points to his being the present head of the Society.

16. *Swami* **Chidananda** – His real name is **Gangadara Patter** and is the son of Ullathomadathi Patter, who before his death, some 15 years ago, was a cook in the choultry attached to the Perintelmanna Tirumandhankunru temple, Walavanad taluk, Malabar district. Chidananda's mother is still alive and on that account, as a *Sanyasi*, he cannot return to his native village. In his younger days he was a vagabond and his actions were said to have been those of a non-Brahman. He is a man of very little learning. He kept a Sudra woman and being polluted by her suddenly left his village some 20 years back for Benares for the necessary purification ceremonies. Two years later he was brought back by the Tharagans of Angadipuram, who had gone to Benares on pilgrimage, and remained in the temple for a couple of years, eating little and praying day and night. He then went to Trivandrum and returned again to Angadipuram which he left for Kalahasti, North Arcot district, and other places saying that he intended becoming a *Sanyasi*.

Swami Atmanand of the Madras Branch of the Ram Krishna Mission, Triplicane, informed the Commissioner of Police, Madras, in August 1904 that *Swami* Chidananda had studied in the Palghat school for about four years. Also that he was disowned by the Mission as he was living in luxury and that it was in contemplation to advertise in the newspapers disowning him as a member of the fraternity.

He tours extensively in the Madras and Bombay Presidencies, and in June 1904 lectured at Poona under the auspices of Mr. **Bal Gangadhar Tilak**, whose guest he was.

Description – Age about 30; height 5 feet 7 inches; clean shaven; wears a red-ochre coloured coat and head-dress; speaks English, Hindustani and Malayalam. Says his head-quarters are at Limbi in Kathiawar.

17. *Swami* **Krishnananda** – His real name is **Satish Chandra Chatturji** and he is said to have become a disciple of *Swami* Vivekananda about 1887. He was said to hail from Kashmir, but the President of the Kashmir State Council reported that nothing was known of him.

His family was said to reside in Rajputana and his brother, Akshaya Kumar, to be practising as a Barrister at Lahore. On inquiry, however, it was found that there was no Barrister or Pleader of that name in Lahore nor could his family be traced in Rajputana.

He was last heard of, in October 1903, at Tarkeshwar (Bengal) on his way back to the *math* at Belur.

18. *Swami* **Ram Krishnananda.** – This *Swami* was deputed to carry on the work of the Mission in Madras in March 1897, which, under his management, seems to be the most progressive branch of the Society. He is still in charge. In March 1905 he visited Rangoon and on the 20th of that month was presented with an address to welcome by the *Ram Krishnananda Sevak* Samity. He left Rangoon for Madras on the 25th idem.

19. *Swami* **Niranchananda.** – He is said to have landed at Pamban, Madura, from Ceylon with *Swami* Vivekananda on the 26th January 1897; but whether he had travelled in Europe or only came from Ceylon is not clear. He has not been heard of since.

20. Pandit **Ram Tirath** alias *Swami* **Rama** *alias Goswami* **Ram Tirtha.** – His real name is **Tirath Ram** and he is the son of Hira Nand, a Saraswat Brahman of Muraliwala, a village in the Sadr Police Station circle, Gujranwala district, Panjab. Tirath Ram is married and has a son, Madan Lal, now a student in the Gujranwala Mision School. Soon after taking his M.A. degree, Tirath Ram was appointed Professor of Mathematics in the Forman Christian College, Lahore. He studied Sanskrit literature and occasionally lectured on Sanskrit philosophy and Hinduism. He was a member of the Theosophical Society, Lahore, and edited and published a vernacular periodical called *Risala Alif.* About the middle of 1900, he fell under the influence of the well-known religious enthusiast *Swami* **Shughan Chand** and became so enamoured of his doctrines that he made up his mind to renounce the world. With this object in view he severed his connection with the Mission College and with his wife set out for the Ganges (Hardwar ?) and for some time led the life of an ascetic. He then sent his wife home and determined to travel as a reformer and preach Hinduism and the Vedanta philosophy. He left India about four years ago to attend a Religious Congress in Japan and from there proceeded to America and lived in California preaching Vedanta philosophy.

The Commissioner of Police, Calcutta, states that the *Swami* originally belonged to the Ram Krishna Mission, but, while in America, fell out with *Swami* **Trigunatita** (of 40 Steiner Street, San Francisco) and *Swami* **Avedananda** (of 62 West, 71st Street, New York), left the Mission and worked by himself.

The *Swami* returned from America in the autumn of 1904 and landed in Bombay on the 8th December 1904 and was shortly after joined by *Swami* Shughan Chand and proceeded with him to Muttra. Thence he went on the 1st January 1905 to Ajmer and Pushkar where he was joined by a *Swami* **Narayan**, a Panjabi, who came from Madras. In the end of March 1905 the two *Swamis* left for Jaipur and then separated, Ram Tirath going to Dehra Dun and *Swami* Narayan to Sukkur.

The latest information about Ram Tirath is that he was making an extended tour in the United Provinces lecturing on the advantages of Indian students going to Japan and America. He is also credited with the intention of bringing into existence a University for the teaching of scientific agriculture.

Description :- Age about 45; average height; slight build; wheat complexion; head and face shaven; wears spectacles.

21. *Swami* **Saradananda.** – His real name is **Sarat Chandra Chakravati**, and he is the son of Grish Chandra Chakravati a Calcutta Druggist. He studied up to the B.A. standard but failed to pass the final examination. He became a *Sanyasi* about 1886. Encouraged by the success of *Swami* Vivekananda he left India for a tour in America in March 1896, and returned to India in 1898 arriving at Bombay on 12th February of this year. He is now the *Acharya* of the Senior Branch of the Mission at Calcutta.

22. *Swami* **Sarupanand.** – He was mentioned in August 1901 as Editor of the '*Prabuddha Bharata*' Magazine and member of the Ram Krishna Mission. He is said to be a Bengali and graduate of the Calcutta University.

23. *Swami* **Satya Charan Mitra.** – He was described on April 1901 as a member of the Ram Krishna Mission at Belur and delivered two lectures on "Hinduism" at the Bogra Town Hall.

24. *Swami* **Sivanand.** – This *Swami* is mentioned as a colleague of *Swami* Vivekanand. He went to Colombo about August 1897 with the object of elevating the spiritual condition of the Tamils in Ceylon and left the island for Calcutta in February 1898, leaving his work unfinished. No other particulars are known of him.

25. *Swami* **Sureshanand.** – Is mentioned as working in conjunction with *Swami* **Akhandananda** to relieve the famine-stricken people in the Murshidabad district in March 1897 (*see page 6 ante*).

In March 1898 he left Mahala for Alam Bazar *math*, Calcutta, leaving *Swami* Akhandananda to carry on the work alone and has not been mentioned since.

26. *Swami* **Turianand.** – His real name is **Hari Bhusan Chatturji** and he was a fellow disciple, with *Swami* Vivekananda, of Ram Krishna *Paramhansa* and is, according to the *Advocate* (Lucknow) of the 4th

July 1899, "well versed in Vedantic philosophy, possessed of a keen sense of observation, a good speaker and writer and a man with an extensive experience of India, having walked over almost the whole of Upper India." Nothing is known of his antecedents. He spent some months in Lucknow in 1896 and is said to have made a very favourable impression on all who were brought into contact with him. He left Calcutta with *Swami* Vivekananda for England on the 20th June 1899 and, after a short stay there, proceeded with him to America "to start," according to the *Bengalee* (Calcutta) of the 14th September 1900, "an institution to be called the *Santi Asram* which will be used as a summer school of the *Vedanta* as well as a retreat for the American Vedantists who may feel inclined to pass a few days' time there in holy contemplation."

No other particulars are on record regarding this *Swami*.

27. *Swami* **Kamega Sundar.** – W. Colvin *alias* U. Dhamoloka, the Buddhist pervert, when in Calcutta in March 1905 mentioned that there was an Indian *jogi* at Singapore, whose name he could not recollect, who said he had been in America. He used to take sulphur with milk and no other food. The Inspector General of Police, Straits Settlements, has now furnished the following particulars of this individual :- His real name is not known but he is a disciple of Ram Krishan *Paramhansa* and is engaged in teaching the Vedanta philosophy in the Straits Settlements, the Federated Malay States and Penang.

According to his own statement, he is a native of Chidambaram in the Madras Presidency, was educated in Madras and passed the Entrance Examination into the Madras University. He states that he has been a Schoolmaster, an Inspector of Police and subsequently was employed in the Commissariat Department in Burma. He lives sometimes at the Hindu Temple in Bras Basah road, Singapore and sometimes at the Chetty Temple in Tank Road. He makes frequent journeys to the Federated Malay States and Penang with the object of teaching the Vedic tenets. He professes to be on very friendly terms with the principal. Hindus residing in the Federated Malay States. He went to America and was at the Chicago Exhibition with *Swami* Vivekananda.

Description. – Age about 30 to 35, height about 5'9"; medium dark complexion; very long and rather delicate hands. Speaks English very well.

28. *Swami* **Nirbhavananda.** – Nothing is known of this *Swami* beyond that he is a member of the branch of the Ram Krishna Mission at Magavati near Almora. He is at present in the Kangra valley distributing food and clothes to the sufferers by the great earthquake of the 4th April 1905.

G.C. Press, Simla. – No. C20 D, C.I.D.– 21-11-05.– 200 – R.S.W.

Government of Bengal. Confidential, Special Branch, Bengal 8/9/1909 (Intelligence Branch Serial No. 14/1909.)

[CONFIDENTIAL]

MEMORANDUM ON THE RAM KRISHNA MISSION

The following note is intended to supplement the information on this subject already collected in the form of a memorandum in 1905, with one or two modifications on minor points regarding which more recent information shows that the previous note was inaccurate. An account is given first of the organization of the Vedanta Society in America, then of the branch of the Ram Krishna Mission at Mayavati near Almora, which forms the link between Eastern and Western Vedantism, and lastly of the relations of the Society with present day Indian politics at home and abroad.

New York.– The Vedanta Society in this city was founded in 1895 as the result of Swami Vivekananda's lectures during that and the previous year, and when he left America in 1896 Swami Saradananda was brought out from Calcutta to carry on the work. The latter lectured in many places in America, apparently without much success, for he returned to India in 1898, and meanwhile Swami Abhedananda, who was then lecturing in London, was invited to New York by the Vedanta Society and arrived in August 1897. He lectured in New York and elsewhere throughout the States, and organized the Vedanta Society which was incorporated under the State Law of New York in October 1898. A year later small head-quarters for the office and library of the Society were established, and in the spring of 1900 they were able to move into more desirable premises at 102, East 58th Street. During the next few years Swami Abhedananda's lectures attracted greatly increasing audiences, and in May 1904 he still further roused America's interest in his teaching by arranging to have the Society represented along with the other religions in the *World's Fair* at St. Louis. About the same time the Society again found it necessary to move to a larger building and established itself at 62, West 71st Street, where regular Sunday services were held and a *swami* remained constantly in charge.

In 1905 a *Yoga* class was organized in Brooklyn and regular weekly meetings were held throughout the season, and in the same year an attempt was made to form a branch at Washington.

In May 1906 Swami Abhedananda sailed for India, leaving Swami Bodhananda in charge and in December of the same year he returned to New York bringing with him Swami Parmananda to assist him in his work.

In January 1907 Abhedananda inaugurated a new branch of the Vedanta Society at Pittsburg, putting Bodhananda in charge, and on his return to

New York he delivered a special course of lectures in the Carnegie Lyceum on Sunday afternoons while Parmananda conducted the morning services at the Vedanta House.

In March 1907 the Society purchased No. 135, West 80th Street, and moved into these premises where they have remained since. The house is said to be centrally located and to have ample rooms for conducting lectures, classes, library and publication work; it also provides a home for the *swamis* in charge.

In 1908 Abhedananda revisited London where he lectured for six months and established a centre of Vedanta Society of London; he also lectured in Paris with some little success.

The New York Society regards its publication department as one of the most important, and claims to have published already nearly forty books and collected lectures by the *swamis*, besides translations from the Vedas and other Oriental works. It has also established agencies for the sale of its publications in Europe and America, as well as in the chief cities of the United States, and it distributes copies of the two leading monthly Vedanta Magazines, the *Brahmavadin* and the *Awakened India*.

In addition to the centres at New York, Brooklyn and Washington which have been mentioned above, the Society had also in 1906 established branches at San Francisco and Los Angeles in California, and at Vancouver, B.C.

The San Francisco branch was managed by Swami Trigunatit and had permanent head-quarters at 40, Steiner Street, where the Society had bought a plot of land and built a temple which it is claimed miraculously escaped destruction at the time of the earthquake.

On the evening of the 10th April 1907 a reception was given to Trigunatit and Prakashananda, a *swami* who left India to join him about the middle of 1906, in the Greek Theatre of the University of California at Berkeley. Six thousand people are said to have been present on the occasion and Professor Wheeler, the President of the University, welcomed the *swamis* as the leaders of their people and as representatives of the oldest Indo-European culture, an indication of the footing on which they are received in certain circles in America.

There was also in existence in California in 1906 a "Home for Meditation" called the "Santi Asram," said to be situated in a beautiful valley in the middle of a vast tract of land recently presented to the Society. The home was then in charge of a Mr. Helbom, who called himself Gurudas Brahmachari, and to it the students and the *swamis* were said to repair at certain seasons of the year for the practice of meditation. It is possible that the manager of the Home may be the same as American gentleman who was found to be residing at Mayavati in 1908 and whose name was reported as Mr. Heyblom.

The donor of the land for the California Santi Asram was one of Swami Abhedananda's lady disciples who seem to form by far the larger and more enthusiastic section of his admirers. However spiritual the teaching and life of Swami Vivekananda may have been, there is no doubt that some false prophets of Vedantism, and even some of those who are accepted as genuine *swamis*, are attracted to the work in Europe and America by the opportunities it provides for meeting on terms of intimacy the ladies of the West. Referring to the founder of the movement the *Indian Mirror* of 18th January 1896 said:- "We are glad to note that Swami Vivekananda has been attracting in London the attention of a distinguished company of ladies and gentlemen. The classes that he holds on Hindu Philosophy and *Yoga* are said to be enthusiastically and devoutly attended. 'It is indeed a rare sight,' says a London correspondent, 'to see some of the most fashionable ladies in London seated on the floor cross-legged, of course, for want of chairs, listening with all the *bhakti* of an Indian *chela* towards his *guru*.' It was perhaps not merely an accident that the first words spoken in public by Swami Vivekananda in America were 'Sisters and Brothers of America.' "

Mayavati. – When Swami Vivekananda visited England in 1896 Captain J.H. Sevier, who had formerly served in India and was then residing in Hampstead, became one of his disciples and he and his wife accompanied Vivekananda to India early in 1897. In August 1898, Captain and Mrs. Sevier came to Almora with Swami Vivekananda himself and four or five Bengali disciples to look for a suitable place of residence, and after living for nine months in the Thomson House, Almora, they bought *Mayavati*, which belonged to a General Macgregor, for Rs.7,000 and took up their residence there in April 1899.

While they were at Almora, the editor of the *Prabuddha Bharat*, a monthly Vedantic magazine of Madras, died, and Swami Vivekananda succeeded in persuading Captain Sevier to take up the work of editing the paper, Several books on Vedanta have been published and the paper *Prabuddha Bharat* has been regularly conducted at Mayavati since then, hut there have been several changes in the staff. Captain Sevier died in 1902 and of the three *swamis* left by Swami Vivekananda to help the editor, Swarupanand died about 1904 and Bimalanand in 1907 or 1908. Thus in the latter year there were left of the original staff only Mrs. Sevier, Brijanand, and a compositor named Mohan Lal Sah, and the vacant places were filled by Swamis Parmanand and Tej Narayan who were brought from Belur Math by Mrs. Sevier, and an American named Mr. Heyblom to whom reference is made elsewhere.

In 1908 the newspaper work was being done under Mrs. Sevier's supervision by the three Bengali *swamis*; Brijanand did the editorial work, Parmanand was general manager and looked after the estate, and Tej Narayan

acted as manager of the paper and also as doctor in the Mayavati Charitable Dispensary. Mr. Heyblom was in charge of the binding and packing department and also wrote articles for the *Prabuddha Bharat*.

In a report on the place dated September 1098 it is stated that, "The relation to one another of the members of the superior staff (including Mrs. Sevier) is of common brotherhood. They all dine together and live together in the same house. (Mrs. Sevier has been living in a separate house for the last three or four months with one Miss Christiania, teacher of a girls' school, Calcutta, who has come to Mayavati as a visitor.)

"The ordinary routine work of the members is to wake up early in the morning and do meditation for about two hours, then they all go together for a walk which takes them about an hour. They sit together for their morning meal at about 10 A.M., after which they attend to their respective duties referred to above, till 4 P.M. Then they play the game of croquet for two hours, after which they again go for meditation which takes them another two hours. They take their evening meal at about 9 P.M., and thereafter directly go to bed."

At that time Mrs. Sevier had full control over the institution and over the policy of the paper, and there was no ground for suspicion that either being used for political agitation. It was a rule of the Mayavati men never to speak on political subjects which they said was beyond the scope of their Mission, and this policy was publicly declared in the issue of their Magazine for September 1907. The circumstances in which three Bengalis, who were once resident at Mayavati, joined the Calcutta anarchist gang are described below.

The Vedanta Society and Politics. – There is not much that can be called directly political in the lectures of Swami Vivekananda, but it can hardly be supposed that a man who aspired to put all the other religions of the world in their proper place as mere aspects of his reading of Hinduism could reconcile his religious teaching with the political domination of Christians over Hindus. Speaking of the birth of his own Guru Ram Krishna Paramhansa he said, "The time was ripe, it was necessary that such a man should be born, and he came, and the most wonderful part of it was that his life's work was just near a city (Calcutta), which was full of Western thoughts, which had run mad after these occidental ideas, a city which had become more Europeanised than any other city in India. "Again in a speech addressed to the Hindus of Calcutta after his first return to India from the West, Vivekananda said – 'The secret of life is give and take. Are we to take always, to sit at the feet of the Westerns to learn everything, even religion? We can learn machines from them. We can learn many other things. But we have to teach them something, and that is our religion, that is our spirituality. For a complete civilisation the world is waiting, waiting for the treasures to come out of India, waiting for the marvellous spiritual inheritance of the Race which through decades of

degradation and misery, the nation has still clutched unto her breast." Further on in the same speech he said – "If you want to become equal with the Englishman or the American, you will have to teach as well as to learn, and you have plenty yet to teach to the world for centuries to come."

But perhaps the views of the *swami* on politics and nationality in India were put most briefly and clearly in the following paragraph which also forms part of a speech delivered in Calcutta:-

"Each nation has its own peculiar method of work. Some work through politics, some through social reforms, some through other lines. With us religion is the only ground through which we can move. The Englishman can understand religion even through politics. Perhaps, the American can understand religion even through social reforms. But the Hindu can understand even politics when it is given through religion. Sociology must come through religion, everything must come through religion. For that is the theme, the rest are the variations in the national life-music."

The Bengali magazine of the Society called the *Udbodhan* is said to be devoted principally to religious matters and not as a rule to discuss political subjects. At the same time the two following extracts form translations of recent issues furnished by the Bengali Translator to Government in December 1907, while they are described as quite exceptional, are certainly sufficiently objectionable :-

"You have all been hypnotised. Your rulers tell you that you are low, subjugated and without any strength, and for a thousand years you think yourselves to be a low, useless and defeated people. And constant brooding over such ideas made you what you believed yourself to be. This body of mine is also made of the earth of your own country, but I have not learnt to think of myself like that, Consequently, those very people who used to look down on us are now, by God's will, respecting me like a god. If you all can think that you are possessed of endless power and knowledge and of indomitable energy, and if you can rouse your power you will be able to become what I am."

"Piping cannot lead men into salvation. What is now wanted is the keen edged sword and a war to death. It is necessary now to worship Rama with the bow, Mahabir (i.e. Hanuman, the Monkey god) and Mother Kali. The worship of the mother requires blood – human sacrifice."

Although Swami Vivekananda did not concern himself much with practical politics as such, many of his followers were closely connected with the seditious movement in Bengal. The Anusilan Samiti of Calcutta was pretty closely connected with the Belur Math, for an entry dated 1st Magh 1314 (1907) in an exercise book belonging to a student named Kule Chandra Singh Roy showed that some 30-35 students of the National College combined with the members of the Anusilan Samiti to act as volunteers at the *Math* on

the anniversary of Swami Vivekananda's birthday. Further, Swami Vivekananda's younger brother, Bhupendra Nath Dutta, was one of the original promoters of the notorious *Yugantar* newspaper, and was the first of its staff to be convicted of sedition, and on his release in June 1908, after undergoing a sentence of one year's imprisonment, he is believed to have taken shelter for a time in Belur Math, the head-quarters of the Ram Krishna Mission in India, before he left for America.

Meantime in May 1908, the bomb conspiracy, which had its centre in the garden in Maniktolla, Calcutta, owned by Arabindo and Barendra Kumar Ghosh and other members of their family, was brought to light, and in the course of the statement made in his defence against the charge of conspiracy Arabindo said, "At one time I contemplated a large religious movement based on the Vedanta and spreading over India, England and America, as I firmly believed, and still believe, that Vedantism is the future religion of the world. In that view I worked hard for a few months, and approached many of my friends and acquaintances." This refers apparently, as the context indicates, to the period of his residence at Baroda before he threw up his appointment there to put his brain and pen at the service of the Calcutta extremists.

Arobindo, however, was not the only one of those implicated in the Maniktolla conspiracy who was interested in the teachings of Vivekananda. The house at Mayavati near Almora was always kept hospitably open to all seekers after truth, and advantage was frequently taken of this by monks and other visitors, chiefly from Bengal. So long as Swami Swarupanand was alive he gave lessons in Vedanta to all who cared to learn, and among his pupils were Upendra Nath Banerji and Hrishikesh Kanjilal, both of whom were sentenced to transportation for life under Section 121, Indian Penal Code, in the Maniktolla case.

Upedra Nath in the course of his wanderings arrived at Mayavati where he studied the Gita during 1903 and 1904, and while he was there he sent for Hrishikesh who had been his friend and fellow student at the Duff College in Calcutta. Both of them were being prepared for initiation into the order of *sanyasis*, but they left the place long before their term of probation was over. It was here that they made the acquaintance of Ram Chandra Prabhu of Bombay, who afterwards harboured some of the Bengal anarchists when they visited that part of India.

Another member of the anarchist gang, Indra Nath Nundi, who was also sentenced in the same case to transportation for life, visited Mayavati in 1904, but he had not been two months at the place when his father took him home again. Mrs. Sevier is said to have been much disgusted to learn that men who had studied at Mayavati had turned out unworthy of the teaching they had received, but she herself was apparently a sympathiser with nationalism of a somewhat extreme type, as, before she left India in February

1909, she paid a visit to Tilak's wife in Poona. Sedition was not, however, countenanced, at Mayavati in her time, and of the centres of the Mission in India the Belur Math alone seems to have been used as a rendezvous for conspirators owing no doubt cheifly to its proximity to Calcutta. This *Math* has been visited from time to time by people holding dangerous views and it is believed that political *sanyasis* received training and instruction there. Branches of the Belur Math have recently been established at Puri and Bangalore.

Of the extent to which the organisation of the Ram Krishna Mission outside of India has been used for extremist purposes there is not much direct evidence. As might be expected the Americans who were interested in Vedantism are also interested in the natives of the country which is the origin of the religion in which they profess to believe, and some of them show an inclination to accept their political as well as their religious views without discrimination. It is stated by an Indian who was in America for several years that there were some American members of the Indo-American Association, the seditious society of students at Berkeley, California, and that they called themselves Hindus as they were followers of Swami Ram Krishna. Of these the most prominent was Mr. G.W. Galwani, an attorney of Portland. Swami Abhedananda in New York does not seem to have taken much part, openly at least, in the organisation of any of the Indian political societies there, but he was a member of Myron Phelps' Society for the advancement of India, and after the India House was closed a few of its members found a meeting place at the premises of the Vedanta Society. It appears also that the new Indo-American Club is pretty closely connected with the Vedanta Society.

A Bengali, named Jamini Mazumder, arrested in connection with the anarchist movement in Calcutta recently committed himself to the statement that the *swamis* of the Ram Krishna Mission imported arms from America when they visited India, but this information has not been verified and seems an insult to the by no means deficient intelligence of the *swamis*.

C.J. STEVENSON-MOORE.
Offg, Director, Criminal Intelligence.

Simla, 22nd June 1909.

G.M. Press, Simla. – No. 12 Cr. – 5-8-09. – 50. – H.A.W.

Government of Bengal, Confidential, Special Branch,
Bengal 8/9/1909. I.B. Serial No. 14/1909

The Ramkrishna Mission

The headquarters of the Mission at Belur, Howrah are still under the presidency of Swami Brahmananda. The Belur Math is situated on the bank of the Ganges, about half a mile from the railway station. The ground consists of some 20 bighas with a large two-storied house which serves as the residence for the Swamis, their disciples and visitors.

Meetings are held at the Belur Math on Sundays which are attended by large numbers of people from Calcutta and the surrounding villages. The grounds of the Math are open to all and the poor take advantage of this to come and be fed on special occasions.

On the occasion of the celebration of the 49th anniversary of Vivekananda Swami, the founder of the Math, on the 29th January 1911, some 600 or more respectable people assembled at the Math. Amongst the assemblage were noticed about 20 Maharatta and Madrassi youths and several Americans. Speeches, eulogistic of Vivekananda Swami, were delivered by an American, Mr. Alexander and several others. It was also noticed that several men who had connection with the revolutionary movement were present among them being Jogin Thakur and Pulin Behari Mukherji of the Anushilan party.

Again on the occasion of the Ram Krishna anniversary, the 5th March 1911, there was an exceptionally large gathering at the Math. It was especially noticeable that the majority of the volunteers on duty at the ghats and elsewhere were men of Eastern Bengal. The function was reported to be of a purely religious nature but it was remarked that more than one suspect was present including one "Saroda", who, it has since been thought, was none other than Saroda Charan Chakrabatti at that time absconding in the Dacca Conspiracy Case and in the Adabari Arms Case.

About this time it was reported that Sachindra Nath Sen and Kunja Lal Saha, acquitted accused in the Alipur Bomb Case, Debabrata Bose and Tarapada Bose, who vowed to kill one of the officers connected with the investigation of the Nangla Conspiracy Case, were all living in the Belur Math. Later on in the year, about June, the inmates of the Math complained of the open enquiries that were made regarding the suspects that were residing there and seemed to be willing to assist the Police as to the movements of these suspects outside the Math.

Nothing was brought to notice in connection with the Math from then till the anniversary of Vivekananda Swami in January 1912. On this occasion about 400 people assembled. The feeding of the poor was done by members of the defunct Anushilan Samity under Pulin Behari Mukherji. Several

suspects of Eastern and Western Bengal were also present. On this occasion an informer reported that a meeting was held, after the religious observances were finished to discuss the political situation. The general opinion of the meeting was that the modification of the partition and the transfer of the capital were brought about with the purpose of confining the Bengalis to their own country and of disassociating them from the rest of India. It was proposed by Pulin Behari Mukherji that the result of the appeal in the Dacca Conspiracy Case should be awaited and that, till then, they should collect suitable men in order to renew the campaign with greater force. Although this report is not verified it appears that there is some truth in it and in view of subsequent events it should not be totally disregarded.

There was another large gathering at the Belur Math when the anniversary of Ram Krishna's birth was celebrated on the 25th February 1912. Pulin Behari Mukherji was again present as also were Satis Bose and Leakut Hossain. A song sung by the party of the last named was to the effect that the people should be prepared to serve their country and to sacrifice their lives.

In Bengal there are branches of the Ram Krishna Mission in Calcutta, Barisal and Dacca, in addition there is an orphanage at Mahula, Murshidabad. The orphanage at Mahula was founded by Swami Akhandananda in 1899, the orphanage is still in his charge and appears to be in good order it has not been remarked as a refuge for political suspects and there is but little on record concerning it.

The Calcutta branch is situated at 12, 13 Gopal Neogi's Lane, Bagbazar. The wife of Ramkrishna Paramhangsa lives at this branch which also comprises the office of the "Udbandhan" (*sic*) a monthly religious magazine published in the interests of the mission. Swami Sarodananda is in charge of the branch; one of his assistants, Brahmachari Pragyananda, is Debabrata Bose, one of the acquitted accused in the Alipur Bomb case.

In connection with the Calcutta Branch a girls school was founded at 17 Bosepara Lane, Bagbazar in 1904 by Sister Nivedita, who died last year, and Sister Christina. This school is still in existence but is not of any size. Although rather a digression, it is of interest to note that this year a medal has been offered in memory of SIster Nivedita to be played for by football teams of youths under 20 years of age.

The branch of Ram Krishna Mission at Barisal was started by Sarat Chandra Chakrabatti in 1904 but it was not till February 1911 that it was properly affiliated to the Belur Math. The three objects with which this branch was founded were the spread of unsectarian religion, the help of the needy and disressed and the carrying on of some work of practical beneficence. Besides the sale of books nothing has been done to spread unsectarian religion, the members are all Hindus and when they meet every Saturday only their own religion is discussed. Some good work has been done by the Branch to

help the poor and needy and great influence has been obtained thereby amongst both Hindus and Mahommedans. It is reported that the latter sympathise with the mission but cannot join openly owing to religious scruples. The number of patients attended in 1910 was 166, in 1911, 68 and upto the end of June this year - 103. The mission house is a tin shed crected on the land of Paramananda Das Gupta, the Secretary. The income of the mission is obtained by the sale proceeds of rice collected from door to door, from donations, subscriptions and from collections made on board the steamers which run through Barisal. It is reported that in 1911 the income of the mission was Rs.757-11-1 and the expenditure only Rs.275-14-6, it is not known what has been done with the balance but this discrepancy is hardly in accordance with the printed appeals issued by the Branch which nearly all contain the words "but it is bread that the suffering millions of burning India cry out for with parched throats". Most of the members of the Barisal Branch are government servants but undesirables visit the mission occasionally although none of them are permanent members. The branch is visited occasionally by representatives of the Belur Math.

The branch of the Ram Krishna mission at Dacca was started on the 6th Chaitra 1305 (1898) by Swamis Prakasananda and Berojananda of the Belur Math in the house of the late Babu Mohini Mohon Das of Dalbazar. As, however, nobody took any great interest in the mission, it ceased to exist in 1905. On the 5th Poush 1314 (1907) the mission was revived by some Government officers in the Secretariat under the supervision of Babu Sasi Mohan Basak; Professor, Jagannath College. A sevasram was added to the branch shortly after this resuscitation. Meetings are held every Saturday and Sunday afternoon. The members collect small sums amongst themselves for the help of the poor and the disabled of the Sevasram and attend to the sick and helpless poor when they receive information. Suspects Birendra Kumar Bose and Hem Chandra Chaudhury generally attend the meetings of the Dacca branch.

In March 1912 it was reported that a branch of the Ram Krishna mission had been started at Naraingunje, Dacca, by Dhirendra Nath Shome, a disciple of the Belur Math. It was further reported that an application had been made for affiliation with the Belur Math but it is not yet known whether this has been allowed. Rajani Kanta Roy whose connection with several political crimes is well known attends the meetings of this branch.

Sd. Illegible.
9-8-12.

Copy of a report from Deputy Superintendent, Pauparao Naidu, dated Camp Bangalore, 24th November 1909. Government of Bengal, Confidential, Special Branch Bengal 8/9/1909. I.B. Serial No. 14/1909

I beg to report that there are two maths of Ramakrishna Mission in Bangalore, both under the Bengalis, Nirmalananda and Yogisvarananda, one at Basavanagudi in city limits and the other at Alsoor in Cantonment limits. I visited both in disguise as a sympathiser and observed the following in addition to my enquiries outside.

The Mission building near Basavannagudi is a decent pucka building valued about six thousand rupees constructed by contributions from the people of Bangalore City and Mysore including even Mr. V.P. Madhavarao, the late Dewan, particularly under the patronage of Mr. Narasimha Iyengar, B.A., B.L., a Dy. Commissioner in Bangalore City and who was lately tutor to the Yubraj of Mysore. One Mr. Karve, a retired Engineer, a Mahratta Brahmin by caste, at present living in the City helped much in supervising the construction of the building which has a spacious compound. In the central hall, there are bromide enlargements of pictures of Ramakrishna Paramhamsa and Vivekananda with all the paraphernalia of an ascetic to attract the minds of any ordinary Hindu.

As I entered the hall I saw Vishudananda, a Bengali fair young man aged about 25 years. He talks English fluently. As I began to make some inquiries about Narayana Rao, whom I had known about six years ago as a good cricketer of Madras before his taking service in Pudukota State, Nirmalananda with his clean shaven face but with tuft of hair hanging to his neck and aged about 40 years, made his appearance. I was introduced to him by Vishudananda as a friend of Narayana Rao. When Nirmalananda took seat on a tiger's skin spread in the middle and told me that Narayana Rao who had joined the Mission at Bangalore only about two years ago is much advanced and devotes most of his time in meditation, that he has grown beard and hair very long, that during his absence at Tinnevelly and other places lately, he was here in his place and that he, Mr. Narayana Rao, went about a week ago to see the secretary Saradananda at the headquarters of Belur Math. Most likely he will be put in charge of a branch math. As the President of the Mission, Brahmananda is at Puri now, he might see him also on his way to Calcutta. He also told me that Abhedananda is in charge of all American Maths but Brahmananda, having been appointed by Vivekananda as his successor, is the President of all the branches in the world.

Nirmalananda holds meetings on Fridays and Sundays. On Friday he discusses on Rajyog and on Sundays Bhagavath Gita as is put on a notice

board outside the building. Thirty to fifty members meet on those days in the evenings including some high officers of the State. Besides these two Bengalis I did not find any others in this building or in the compound. But during my short stay in the math, a young man aged about 23, son of Mr. Karve, came with two other Mahratta Brahmins about the same age and paid their "namaskars" to Nirmalananda, but they did not stay long there as I was engaged with him. In short, he commands much respect from the people here and is reported to be not speaking on politics directly. Nirmalananda tells me that whenever he receives calls from the people in the districts, he will go and deliver lectures and be back here.

On asking him about the math at Alsoor, he tells me that it has no connection at present with Ramkrishna Mission, that one of this Mission by the name of Yogisvarananda who was in this math, discarded his connection and opened a math of his own but calls it as Ramakrishna Math. I then visited the math at Alsoor. It is also a decent building nearing completion. There is a big open hall in front of the building with a room on the upstairs. It was constructed also by public contributions amounting to about 3,000 rupees with the help of Mr. Marappa, a contractor at the Gold Mines of Kolar. As this building is not yet ready for occupation, the math is now in a small rented house close by. I saw Yogisvarananda. He is also aged about 40 with bald head and clean shaven, but he is much stronger person than Nirmalananda. There is no one with him. He tells me that thought he was in the Ramakrishna's Asram with Vivekananda, and though he was with Nirmalananda in the other math for some time till about 1904, he could not agree with other Swamis in their views, and therefore he separated himself and with the help of the Cantonment and Alsoor people, he opened his math here. He does not cook his food, but one Mudaliar supplies him with food for the present. He has about 30 or 40 disciples among the people who contribute each from 4 annas to two rupees a month. He also holds his meetings twice a week in Narainswamy Mudaliar's school and in Doddanna's hall teaching Ramayana at present. Yogishvarananda tells me that all the funds collected are in the hands of some responsible persons who defray the expenses, but that he does not want any money except his food. He will work without any remuneration as a Sanyasi. He says that he has some sympathisers at Secunderabad and some at Madras. He therefore goes to Secunderabad occasionally. He says he delivered a lecture in Patchappa's school at Madras last year, but never went to Mylapore branch during his stay there. From people in Bangalore City and from the heads of these maths, I learn that the 2nd is rival to the first and the popular opinion is that Yogishvarananda is taking more interest and exerting more influence than Nirmalananda.

I hear that one Bolananda or Bothananda who was in the first math is gone out towards Bowringpet on the line to deliver lectures.

Dr. Halook is not in either of these maths.

In "Prabudha Bharata", published in Mayavati, I find in October issue page 194, an advertisement for sale of "The Light of Swadeshism" by D.P. Mookerji, published by the Crown Electric Printing Works, Bombay. I surmise if this is not Devi Prasad Mukerji that disappeared from Bombay and is wanted by us. I have this day asked for a copy of this book. In the same page of the above issue, I see that lectures of Arabindo Ghose and some others of political character are advertised for sale.

From these advertisements and from some portions of the lectures delivered by these so-called "Anandas" published, I have reasons to suspect that these maths, some of them, may turn into political rendezvous, though at present they all appear to be innocent religious Ashramams. I will be visiting the Bangalore maths and Mylapore math occasionally and be reporting on them.

Government of Bengal, O.B. VIII/9/1909 (Intelligence Branch Serial No. 38/1908)

Confidential
No. 1445 S.B.

41 Park Street,
Calcutta the 4th March 1909.

Dear Sir,

With reference to my previous letter to you on the subject of the Jugantar leaflets, I am writing to inform you that it has been ascertained that one Brahmanando Swami, the President of the Belur Math which is the headquarters in the Howrah district near Calcutta of the Ramkrishna Mission has been away from the Math in Madras for the last 20 days or more. On a reference to paragraph 1048 of the Bengal Special Branch Abstract of 1906, I find that the Ramkrishna Mission has branch at Castle Kernan at Triplicane in Madras. The association of the Belur Math with the Revolutionary party in Calcutta is certain and it is considered just possible that Brahmanando Swami may have had something to do with despatching of the Jugantar leaflets, copies of which have come to us bearing postmarks of Inepate, Pondicherry and Colombo. I shall be greatly obliged if you would ascertain whether Brahmanando Swami is at the Triplicane branch of the Ramkrishna Mission, and let me have full details of its doings. A large number of members of the Belur Math are wandering about India.

Yours sincerely,
Sd. F.C. Daly
Offg. Deputy Inspector-General of Police, Crime II..

II

C.G.W. Clogston, Esquire,
Deputy Inspector-General of Police,
Crime and Railways, Madras.

Post Box No. 106 Madras, S.
P.F.46/4-37.

Office of the
Deputy Inspector-General of Police
C.I.D. and Railways,
Madras, dated the 17th March 1909.

Dear Sir,

Your D.O. No. 1445 S.B. dated the 4th March.

You will see from paragraph 462 of the Madras Abstract for 1908 that the Ramkrishna Mission has moved from Triplicane to Mylapore (another part of Madras). We have no information that the Mission takes any part in politics.

Enquiries were made about Brahmananda Swami of the Belur Math and it is reported that he arrived in Madras some months ago, and, after a stay of a few days, proceeded to Rameswaram on pilgrimage. After his return to Madras he visited Bangalore and came back to Madras about a month ago. He is now staying at the Mission house and it is understood that he will leave shortly for Puri. These movements have been reported in paragraphs 1815, 1837 and 1870 of the Abstracts for 1908.

The enquiries made in this Presidency do not support the theory that the Ramkrishna Mission has been responsible for the distribution of the Yugantar leaflets. Our information points to someone in the Tuticorin Swadeshi Steam Navigation Company. (Please see my letter No. P.F. 46/4-29 dated the 6th instant). This suspicion is strengthened by the fact that S. Somasundaran Bharati, an extremist vakil of Tuticorin who is clearly connected with the Company sent a number of those leaflets to the local Police with a story that the wrapper in which they had been received had destroyed but that he thought they had come from England. I am having enquiries made now in Tuticorin about these leaflets.

Yours sincerely,

To
F.C. Daly, Esq.

Sd. C.G. Clogston.

III

Puri
3-4-1909.

My dear Denham,

Four members of the Ram Krishna Mission arrived by the evening train yesterday and are putting up at Hari Ballav Bose's house at the sea side. All four wear the gerua cloth and appear to be very well-educated. They were heard to discuss on politics etc. and seem quite enthusiastic about the bomb case. From all accounts they are very dangerous youths and are being closely watched. I would be very grateful if you could get Daly to spare me one of his men (the same man if possible who was down here lately) to ascertain full particulars about them, as they appear to be very cautious. It was quite by a chance that their conversation was overhead yesterday. Their names are:

1. Dhirananda Swami
2. Brahmananda Swami, President of the Belur Math
3. Rakhal Maharaj
4. Shib Singa Prasad.

No. 2, I believe is well-known. Their descriptive rolls will follow. I send this in advance of the weekly diary.

Yours sincerely,
Sd. L.H. Burton.

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- পত্রপ্রাপক ডেনহ্যাম চিঠিখানি বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে মূল চিঠিখানির বাম পাশের মার্জিনে স্বহস্তে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি সমেত অধঃস্তন অফিসারের নিকট যথাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

D.C.S.

These men appear to be worth looking after, if Inspr. Promode Mukherji is (not ?) fit enough to go on with dacoity work a change to Puri might be a good thing.

IV

Puri
6-4-1909.

My dear Daly,

I have permitted P.N. Mukherjee to return to Calcutta as he wishes to make certain enquiries at the Belur Math about the movements of the two disciples here - Satish Chandra Gupta, the man who refused to give his name at first, appeared to be a rank extremist and is endeavouring to persuade other Bangalee youths visiting the town to refuse to give their names and harass the police. He is a professor of Hetampur College, Birbhum and is studying for the bar. As the Rath festival is drawing near I will be much

obliged if you will kindly place the services of P.N. Mukherjee or any of your men at my disposal till the festival is over, because there is a daily influx of Bengalees, especially from Calcutta and I have no doubt that some undesirable people come down here from Calcutta who require special watching.

Yours sincerely,
Sd. L.H. Burton.

V

To
The D.I.G., D.C.D.
Through the S.P. Pooree.

Sir,

In continuation of yesterday's report, I beg to inform you that besides those mentioned before there is one Ramesh Ch. Mazumder in the Victoria Club. Ramesh has just appeared in the B.A. examination from the Presidency College with honours in history. He is a university scholar and from what I see of him, he appears to be quite a sane sound man. About politics, he has little to think.

The professor Babu Satyendra Gupta however, appeared to be thoroughly conversant with the Jugantar politics. He has carefully got to heart all the doctrines taught by it in its issue published after the arrest of Barindra Nath Ghosh and others. But this sort of feeling and its sudden outburst have become quite general now a days amongst the educated classes. I have very stealthily searched their belongings in their absence but have found nothing of interest to report to you...

I have tried more than once to ascertain if they are in touch with Brahmananda and his companion and in each time met with reasons proving the fact to the contrary. I don't find that they move in the society of Belur Math men and it appears doubtful if they are known to each other. I think they are not.

Belur Math men are still staying in the late Vakil's house. I have closely watched them during yesterday evening. They are associating at times with old people of the locality and not with students in general. This morning I had followed them for some time, they moved on towards the temple and spoke to nobody. Yesterday evening one of them took for his companion an old man of the neighbourhood and went out for an evening stroll. I suspected that they have somehow or other got a scent of the police activity from before and so are carefully avoiding themselves from the society of young men. The saviour Deputy Magistrate might have warned them. As for myself, I am quite successful upto now in maintaining my incognito, but this cannot be continued any more without hazarding great changes. I am freely mixing,

eating and sleeping with the club men as a visitor. I think that the Belur Math men would not dare raise a little finger against the administration here for undoubtedly they have been warned of Police precautions. They may be watched so long as they are here, and in the meantime I can go back and make out a report for the information of the S.P. from Belur math itself. I will anyhow see the S.P. this night and take his orders abotu my proposal. I can hardly mention to see him when I find my road quite clear.

I have etc.,

Sd. Promode Mukherjee, Inspector (Undated).

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বার্টন ইন্সপেক্টর মুখার্জীর উপরোক্ত রিপোর্টের সঙ্গে ৫ মে ১৯০৯ তারিখে নিজস্ব মন্তব্য জানিয়ে লিখেছিলেন যে, মিশনের সন্ন্যাসীরা দিনের বেলায় সারাটা সময়ই হরিবল্লভ বসুর বাড়িতে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকেন এবং রাতের বেলাতেই জনসংযোগ করার কাজে বের হন। বার্টন এই কারণেই সন্ন্যাসীদের উপর রাতের গোপন নজরদারি আরো বাড়ানোর জন্য হুকুম দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত এই সমগ্র গবেষণা-নিবন্ধটি
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মুদ্রিত

NOTES

ক্রোড়পত্র

– গল্প

অনুবাদ সাহিত্য : গল্প

উপন্যাস

ভূমি এবং আকাশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমেই গণ্ডগোল লাগল ফাগুলালের সঙ্গে। প্রতিবছরই এরকম হয়। লোকটা যেমন বেপরোয়া, তেমনি ঠ্যাটা।

সব গ্রামেই সাধারণত এক ধরনের মানুষ থাকে, বাপ-ঠাকুরদারা যা বলে গেছেন, তা মেনে চলে, গণ্ডির বাইরে যেতে চায় না, সরপঞ্চ বা গুনিনদের নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পায় না।

আবার প্রত্যেক গ্রামেই থাকে একজন নিরেট বোকা। সে সব কথায় হে হে করে হাসে, যেমন ছোটে কুঁয়ার। আর থাকে একজন অতি চালাক। সে এই ফাগুলাল।

ছোটে কুঁয়ার মোটাসোটা, মাঝারি উচ্চতা, লুঙ্গি পরে, কখনো কখনো একটা ছেঁড়াখোঁড়া খাকি প্যান্ট, কিন্তু কেউ কোনোদিন তার ওপর গায়ে জামা-টামা কিছু দেখেনি। তার বাবা আর্মিতে ছিল, পুঞ্চের যুদ্ধে মাটি নিয়েছে। ওই খাকি প্যান্টটা ছোটে কুঁয়ারের বাবার উত্তরাধিকার।

আর ফাগুলাল লম্বা, ছিপছিপে, মাথা ভরতি চুল, সে ফুলপ্যান্ট আর শার্ট পরে, খুব গরমের সময় গেঞ্জি, আর সব সময় তার গলায় বাঁধা থাকে একটা সবুজ রুমাল। তার গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ, তাতে মিশে থাকে বিদ্রুপের ছোঁয়া।

ফাগুলাল মাঝে মাঝে শহরে ফুরন খাটতে যায়, তার মুখে পড়েছে সেই শহুরে ছাপ। অকারণেই সে রোজ দাড়ি কামায়।

ভালু আর গণেশদাস তার কাছে চাঁদা চাইতেই, সে ডান হাতের পাঞ্জা নাড়তে নাড়তে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'ভাগ হিঁয়াসে। চান্দা! যত্ত সব বুজরুক।'

গণেশদাস বলল, 'আরে হারামি, পঞ্চায়েত থেকে বলে দিয়েছে, সবকোইকো পাঁচ রুপ্যে চান্দা দেনেই হোগা।'

ফাগুলাল হাসতে হাসতে বলল, 'আমি হারামি, তুইও হারামি। ঠিক হ্যায়? তোর বাপও হারামি। আমি পঞ্চায়েতের খাই না পরি? আমি টাউন থেকে পয়সা রোজগার করে আনি; সেই পয়সায় খাই। কখনো মাঠে যাই না!'

পেছন থেকে ছোটে কুঁয়ার হে-হে করে হেসে উঠল।

গণেশদাস একটু চুপসে গিয়ে বলল, 'তুই পুকুরে গোসল করিস, সেটা পঞ্চায়েতের।'

ফাগুলাল বলল, 'সেটা আমার বাপের।'

গণেশদাস মনে মনে ঠিক করল, সরপঞ্চের কাছে এর নামে নালিশ করতে হবে। সে আর কথা বাড়াল না।

ওরা হাঁটতে লাগল অন্য একটা বাড়ির দিকে।

আকাশে যেন গড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরির লাভা। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি চলে এল। এখনো একটুও বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, এ-বছরে মেঘেরা যেন বুন্দেলাখণ্ডের কথা ভুলেই গেছে।

ভালু একবার পেছন ফিরে দেখল, ফাগুলালও আসছে তাদের সঙ্গে। ছোটে কুঁয়ারও আছে, কিন্তু তার তো কোনো কাজকম্ম নেই, মানুষ দেখলেই সে পেছন পেছন ঘোরে।

ভালু জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথা যাচ্ছিস রে ফাগু?'

ফাগুলাল বলল, 'মজাক মারতে যাচ্ছি, দেখি কে কে চান্দা দেয়!'

ভালু বলল, 'শালা, তুই ছাড়া আর সব আদমি দেবে! তোর মতন আর তো কেউ টৌনে গিয়ে কেরেস্তান হয়নি!'

ফাগুলাল বলল, 'তোর এক চাচা টাউনে গিয়ে সেপাই হয়েছিল, তাই না? সে কি কেরেস্তান?'

এরা কেউই তর্ক করা পছন্দ করে না। দুটো-একটা কথার পরই যুক্তি ফুরিয়ে যায়। তাই ভালু বলল, 'যা ভাগ!'

ফাগুলাল তবু সঙ্গ ছাড়ল না।

একটা খেজুরগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে সাহেবঝরি। তার সারা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ফুটিফাটা মাঠে পড়ে আছে তার হাত-লাঙল। এখন মাটি চষার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তার নাম কেন সাহেবঝরি, তা এখন আর কেউ জানে না। ছেলেবেলা থেকে সবাই এই নাম শুনে আসছে। ওর গায়ের রং অন্য অনেকের তুলনায় ফরসা। বাবুদের মতন।

গণেশদাসের হাতে একটা থলি। সে বলল, 'এ-সাহেবুয়া, দে, পাঁচ রুপ্যে চান্দা দে!'

সাহেবঝরি তার গামছার খুঁট খুলতে খুলতে বলল, 'তিন রুপ্যে এখন নিয়ে যা। আর দু-রুপ্যে পরসোঁ দিয়ে দেবো, কিরিয়া করে বলছি। ঠিক দিয়ে দেবো! আজ ঘরে ভাত নেই রে বুবুয়া!'

গণেশদাস বলল, 'বৃষ্টি না হলে যে সব্বাইকে না খেয়ে মরতে হবে! পরসোঁয় ঠিক দিবি তো বাকি দু-রুপ্যে?'

ফাগুলাল এগিয়ে এসে বলল, 'দিস না ঝরি। এক পয়সা দিস না। সব বুজরুকি!'

গণেশদাস আর ভালু দু-জনেই তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। এটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ফাগুলাল নিজে দিতে চাইছে না, সেটাই ক্ষমার অযোগ্য, তার ওপরে সে অন্যদের বাধা দিচ্ছে? এ-গ্রামে এরকম কখনো হয়নি!

মুখখানা হিংস্র করে ভালু বলল, 'শালে, এবার এক ঝাপড় খাবি!'

ভালুর গাঁট্টাগোঁট্টা পেটা চেহারা, সে এরকম কথা বলতে পারে। তার সারা গায়ে, এমনকী হাতের তালুর পেছন দিকেও বড়ো বড়ো লোম, সেই জন্যই বোধহয় তার ডাক নাম ভালু।

কিন্তু সে কিছু করবার আগেই ছোটে কুঁয়ার ছুটে এসে এক চড় কষাল ফাগুলালের গালে। বেশ জোরেই মেরেছে। ফাগুলাল একটু টলে গেল।

এসব ক্ষেত্রে কেউ বাধা দেয় না। অন্যরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ফাগুলাল প্রত্যাঘাত করল না, হাত বুলোতে লাগল গালে। তার পেশিতে আছে বিদ্যুৎ-গতি, শরীরে আছে নিহিত শক্তি। সে ইচ্ছে করলে ছোটে কুঁয়ারকে মেরে ছাতু করে দিতে পারে।

কিন্তু ফাগুলাল ভাবল বেচারি অবোলা, অবোধ। কেন মেরেছে তা ও নিজেই জানে না। কয়েক মুহূর্ত বাদে সব ভুলে যাবে।

শান্তভাবে ফাগুলাল বলল, 'এইসান কভি নেহি মারনা কুঁয়ার। মানুষকে মারলে তার খুব লাগে। তোকে মারলে তোরও খুব লাগবে। তখন কী করবি?'

ছোটে কুঁয়ার কী বুঝল কে জানে, হেসে উঠল হি হি করে।

এইসময় দেখা গেল, দূর থেকে দু-জন প্রবীণ ব্যক্তি হেঁটে আসছে। এ-গ্রামের সবাই তাদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সে-সম্মান শুধু বয়েসের কারণে, নইলে দু-জনের চেহারাতেই দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকট। একজনের গায়ে জড়ানো গামছাটাও শতচ্ছিন্ন।

সব বৃত্তান্ত শুনে, তাদের মধ্যে যার নাম শিবুমামা, সে বলল, 'এ কী কাণ্ড তুই করছিস রে ফাগু? তুই চান্দা দিবি না, তোর নাম আমি খারিজ করে দিয়েছি। কিন্তু তুই অন্যদের বারণ করছিস কোন সাহসে?'

ফাগুলাল বলল, 'বেঙা-বেঙির বিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে? ইয়ে সব বাকোয়াস! গরিবদের কাছ থেকে শুধু শুধু চান্দা নিচ্ছ!'

অন্য প্রবীণটির নাম মগনরাম। সে বলল, 'আলবাত হোবে! দু-সাল আগে হয়েছিল। মনে নেই? সবকোইকো ইয়াদ হ্যায়।'

ফাগুলাল হেসে উঠে বলল, 'বেঙা-বেঙির বিয়ে? মামা, তুমি বলো তো, কোনটা বেঙা আর কোনটা বেঙি কেউ চেনে? বলো না, কেউ চেনে?'

ব্যাঙ পাওয়া মোটেই সহজ নয়। বর্ষার সময় ব্যাঙ ডাকে, এই প্রখর গ্রীষ্মে তারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রধান পানীয় জলের পুকুরটাও এখন শুকিয়ে শুকিয়ে কাদা কাদা। সেখানে অনেক খুঁজে দুটো ব্যাঙ পেলেই হল। ডাক শুনে, ব্যাঙের লিঙ্গ চেনার মত কান এখানকার কারোরই নেই।

তবু দুটো ব্যাঙ পাওয়া গেলেই তাদের ফুল-দুব্বো দিয়ে পুজো করা হয়। যে-কোনো বিয়ের দৃশ্যের মতনই বউ-ঝিরা গান গায়, পুরুষরা নাচে, চাঁদার টাকায় মদ ও মাংস আসে। বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। খরাক্লিষ্ট মানুষরা এই সময় একটা দিন অন্তত দুশ্চিন্তা ভুলে আনন্দে মেতে উঠে।

যে-হেতু আষাঢ় মাস, তাই দেরি হলেও বৃষ্টি তো হবারই কথা। ওই উৎসবের দু-এক দিনের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামলে সবাই ধরে নেয়, ব্যাঙের বিয়ের জন্যই বৃষ্টি ঢেলে দিল আকাশ।

শত শত বছর ধরে এই ব্যাপার চলে আসছে। এর একটা ভালো দিক তো আছে অবশ্যই।

অন্য কেউ যদি এরকম বেয়াদপি করত, তা হলে পঞ্চায়েতের সামনে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত তাকে।

ফাগুলালের ব্যাপারে সবাই একটু নরম, তার কারণ তার বাবা ছিলেন এ-অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। বহুদিন ধরে তিনি ছিলেন পঞ্চায়েত-প্রধান। গরিব দুঃখীদের জন্য তার মনে ছিল অনেক দরদ। তিনিই নিজের উদ্যোগে একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন। সেই সিয়ারাম ভগত-এর নাম উঠলেই এখনো অনেকে কপালে হাত ঠেকায়। তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন সাপের কামড়ে।

ফাগুলাল তার বাবার কোনো গুণই পায়নি। ছেলেটা একেবারে লাফাংগা। খালি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। ও তো টাউনে থাকলেই পারে, মাঝে মাঝে ফিরে আসে কেন? ওর মা

এখনো বেঁচে আছে, সে-বুড়ি এখন অন্ধ। ফাগুলাল কি ফিরে আসে তার মায়ের টানে? মোটেই না। প্রতিবেশীরা দেখেছে, মায়ের সঙ্গে ও মোটেই তেমন সময় কাটায় না। এদিক-ওদিক ঘুরে খালি ফোঁপরদালালি করে, আর লোকের পেছনে লাগে।

সিয়ারাম ভগতের প্রতি শ্রদ্ধাতেই তার ছেলেকে এখনো পর্যন্ত কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। অল্পবয়েসী ছেলে ছোকরারা সিয়ারাম ভগতকে দেখেনি, তারা ফাগুলালের আস্পর্ধা সহ্য করবে কেন? কেউ কেউ বলে, 'পঞ্চায়েতের মিটিন্-এ সবার সামনে যদি ওকে শাস্তি দেওয়া না যায়, তা হলে একদিন মাঠের মধ্যে ওর গলাটা কেটে রাখলেই তো হয়!'

শিবুমামা বলল, 'তোকে চান্দা দিতে হবে না। তুই যা এখান থেকে। আর কথা বাড়াসনি!'

ফাগুলাল বলল, 'আমি মন বদলে ফেলেছি। হাঁ, চান্দা দিব। জরুর দিব। বিশ রুপ্যে। তবে এখন নয়। বেঙা-বেঙির শাদি হওয়ার দু-দিনের মধ্যে যদি বরসাত শুরু হয়।'

শিবুমামা বলল, 'যা, যা, আভি ভাগ হিঁয়াসে।'

শনিবার দুপুরে ব্যাঙা-বেঙির বিয়ে হল। তার মধ্যে একটা কোলাব্যাঙ, আর একটা বড়োই ছোটো। তাদের কি আর একজায়গায় বসিয়ে রাখা যায়? কোলাব্যাঙটার বোধহয় বিয়ে করার একেবারেই ইচ্ছে নেই, সে মাঝে মাঝেই তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে পালাতে চায়, আবার তাকে ধরে আনতে হয়।

হাঁড়িয়ার মদ জোগাড় হয়েছে প্রচুর। কয়েকজন ঢোল বাজাচ্ছে, স্ত্রীলোকেরা গাইছে সমস্বরে গান। এই একই গান তারা গায় বহু যুগ ধরে।

সন্ধে পর্যন্ত অনেক আমোদ-ফুর্তি হল। কয়েকজন এমনই মাতাল হল যে মাটি থেকে আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সারারাত ওখানেই শুয়ে থাকবে।

কোলাব্যাঙটা শেষ পর্যন্ত পালিয়েছে। ছোটো ব্যাঙটার নড়বার লক্ষণ নেই, মাঝে মাঝে কোঁক কোঁক শব্দ করছে। সে বেচারি বোধহয় বিয়ের দিনেই স্বামীহারা হয়ে দুঃখে কাঁদছে।

এই উৎসবের সময় ফাগুলালকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না। সে একটা গাছতলায় শুয়ে থেকে একটা ঘাসের ডগা মুখে নিয়ে চিবোয়। এটা তার খুব পছন্দের জায়গা।

একদিন, দু-দিন, তিনদিন, তবু বৃষ্টির দেখা নেই। সকাল থেকেই সূর্য কটমট করে তাকিয়ে থাকেন। তিনি কোনো মেঘকে এদিকে ঘেঁষতে দেবেন না।

সবার চোখ আকাশের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ লাল হয়ে যায়। এই সময় বীজতলা তৈরি করতে না পারলে আর ফসল তোলার আশা থাকবে না।

ভালুর সঙ্গে একদিন ফাগুলালের দেখা।

সে মিচকি হেসে বলল, 'বিশ রুপ্যে পেলি না তো?'

ভালু বলল, 'আরে যা যা। তোর টাকায় আমরা মুতে দিই। তোকে তো আর খেতির কাম-কাজ করতে হয় না।'

ফাগুলাল বলল, 'আমি টাউনে চলে যাব। সেখানে বরখা হচ্ছে, খবর পেয়েছি।'

বুড়ো বটগাছতলায় কয়েকজন প্রবীণ লোক প্রায় সব সময়েই বসে থাকে। বিকেলের দিকে মাধো নামে একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে একটা সাঙ্ঘাতিক খবর দিল।

পাশের গাঁ বরমোতিয়ায় একটা সার্কাসের দল এসে তাঁবু ফেলেছে।

এই সময় সার্কাস? লোকের হাতে পয়সা নেই, কোনো বাড়িতেই প্রতিদিন উনুন জ্বলে না। পানীয় জলেও টান পড়েছে। এ-গাঁয়ের পুকুরটা একেবারে খটখটে শুকনো, মেয়েরা তিন মাইল দূরের এক ঝোরা থেকে কলসি করে জল আনে। সে-ঝোরাও এখন ছিরছিরে, একটা কলসি ভরতেই অনেকক্ষণ লাগে, মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়।

তবু সার্কাস দেখতেও যায় মানুষ। যেমন মদের ঠেক এই দুর্দিনেও বন্ধ হয় না।

একজন বলল, 'সার্কাসে এবার হাঁথি এনেছে? হাঁথি?'

শিবুমামা দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'চুপ শালো! হাঁথি? হাঁথি তোর ইয়েতে আমি ঢুকিয়ে দেবো! ওই সার্কাসের হারামিরা এসেছে, এখন এক মাইনা এক ফোঁটাও বৃষ্টি হবে না!'

সার্কাসের সঙ্গে অনাবৃষ্টির কী সম্পর্ক তা কেউ কেউ বুঝতে পারে না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

শিবুমামা বলল, 'ঝড়-বৃষ্টি হলে সার্কাস চলে? তাই ওই শুয়োরের বাচ্চারা বৃষ্টি রুখে দেয়।'

'ওরা কী করে বৃষ্টি রুখে দেয়?'

'তুক করে।'

'কী করে তুক করে?'

'ওরা তাঁবু খাটাবার জন্য বড়ো বড়ো পেরেক আর গজাল পোঁতে মাটিতে। ওই লোহার গজালে মন্ত্র পড়ে দেয়। যতদিন সেই গজাল পোঁতা থাকবে, ততদিন আকাশে মেঘ আসবে না!'

যুক্তিটা এবার সবারই অকাট্য মনে হয়।

সত্যিই তো, বৃষ্টি পড়লে ওদের বেওসার ক্ষতি। বৃষ্টি হলে মানুষজন যাবে না। তাই ওরা মেঘ তাড়িয়ে দেয়। আর বৃষ্টির অভাবে যে এতগুলো গ্রামের মানুষ ধুঁকছে, তা ওদের খেয়াল নেই।

সার্কাসওয়ালাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে থাকে। প্রথমে কেউ কেউ বলে, সার্কাসের ম্যানিজারকে গিয়ে অনুরোধ করবে, সেই মন্ত্র-পড়া গজালটা তুলে দিতে মাটি থেকে।

ম্যানিজার যদি সে-কথা না শোনে? কিংবা লোক-দেখানো ভাবে অন্য একটা গজাল তুলে দিয়ে বলে, 'এই তো ফেলে দিলাম।'

দল বেঁধে সবাই চলল সেই সার্কাসের তাঁবুর দিকে। ক্রমশ দল বাড়তে লাগল। কারুরই এখন কোনো কাজ নেই, এই একটা ভর-উত্তেজনার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

ম্যানিজারবাবু প্রথমে ওদের কথা হেসে উড়িয়ে দিল। তারপর শুরু হল তর্কাতর্কি। আচমকাই শুরু হয়ে গেল ভাঙচুর।

লোকজনের হল্লার সঙ্গে মিশল জন্তু-জানোয়ারের নানা রকম রব। বাঁদর আছে। দুটো ভাল্লুক, তিনটে হাতি, এমনকী একটা বাঘও রয়েছে।

খুব বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে ম্যানিজারবাবু একটা বন্দুক নিয়ে এসে দু-বার গুলি চালাল আকাশের দিকে।

তারপর কড়া গলায় বলল, 'ঠিক হ্যায়। তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কত গেরাম আমাদের সেধে সেধে ডাকাডাকি করে, আমাদের কি যাওয়ার জায়গার অভাব? কিন্তু কেউ যদি আমার জানবারদের গায়ে চোট লাগায়, তা হলে আমি গুলি চালাব!'

দু-দিনের মধ্যে উৎখাত হয়ে গেল সার্কাস। তবু, কোথায় বৃষ্টি?

সার্কাসের তাঁবুগুলোর খুঁটি যখন উপড়ে ফেলা হচ্ছে, তখন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল ফাগুলাল। যেন একটা মজার দৃশ্য।

গোটা তিনেক মেয়েও ছিল সার্কাসের দলে, তারা ঝলমলে জাঙ্গিয়া আর গেঞ্জি পরে খেলা দেখায়। তারা নিজেদের পুঁটুলিগুলো বুকে নিয়ে গরুর গাড়িতে উঠতে উঠতে যা-তা গালাগালি দিয়ে গেল এই গ্রামের মানুষদের।

দু-দিন পরেও যখন বৃষ্টি হল না, ফাগুলাল ভালুকে রাস্তায় ডেকে বলল, 'লোহার খুঁটি আর গজালগুলো সব উঠাকে লে গিয়া কি নেহি, তা ভালো করে দেখেছিস তো? উ লোগ রাগ করে যদি মন্তর করা গজালটা পুঁতে রেখে যায়, তা হলে এ-বছরই আর বৃষ্টি হবে না!'

তাই তো, এ-কথাটা তো ঠিক। অনেকে দৌড়ে গেল সেই পরিত্যক্ত মাঠে। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর দেখা গেল, সত্যিই তিনটে গজাল এখনো পোঁতা আছে মাটিতে। সেগুলো তুলে ফেলা হল, এর মধ্যে কোনটা মন্ত্রপূত? এদের ফেলা হবে কোথায়?

এক জায়গায় কাঠকুটো জড়ো করে আগুন লাগিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল সেই তিন লোহার টুকরোকে। সবাই জানে, আগুনের আঁচে সব খারাপ মন্ত্র খারিজ হয়ে যায়।

ওদিকে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। এ-জন্য চান্দা লাগে না। মন্দিরেরই অনেক সম্পত্তি আছে। প্রতিদিন সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। শিপ্রা নদীর ধারে বহু মানুষ জমায়েত হয়ে দেখল সেই যজ্ঞ। কাঠ পুড়ল কয়েক মণ। তার মধ্যে কিছু চন্দনকাঠ। সত্যিকারের টিকি আর মোটা পৈতেধারী ব্রাহ্মণদের উঁচু গলায় মন্ত্র শুনে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়। উপস্থিত সবাইকে দেওয়া হল খিচুড়ি ভোগ।

তবু তো বৃষ্টি আসে না। গুজব শোনা গেল, এই যজ্ঞের ফলে সুদূর রেওয়া জেলায় কালো মেঘ জমেছে, কিন্তু এদিকে হাসিরপুরে আকাশ এখনো খাঁ খাঁ করে আছে।

এরপর আর একটাই পূজা বাকি আছে। তাতে উদ্যোগ নিতে হয় শুধু মেয়েদের। এ-তল্লাটের নারীরা অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে না। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যাবার সময় তারা মাথা ঢেকে রাখে পাল্লুতে। হিন্দু, মুসলমান সব একই রকম। এবারেই তো সরপঞ্চ হয়েছে শবনম বানু, খুবই তেজি নারী। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটা পরদার আড়াল থাকে।

এ-গ্রামে এখনো ইলেকটিরি আসেনি, দূরদর্শন নেই, কিন্তু রেডিয়ো তো আছে কয়েকজনের। তারা আকাশবাণীর হিন্দি সমাচার শোনে। এ-বছর পরধানমন্ত্রীর সিংহাসন সোনিয়াজি না নিয়ে মনমোহন ভাইয়াকে ছেড়ে দিলেন, তা সবাই জানে। বাজপেয়িজি হেরে গিয়ে মনের দুঃখে এখন সারাদিন ঘুমিয়ে থাকেন, ইন্দিরাজির ছোটি বহু বলে দিয়েছেন, আদমি লোগোকো মরনে দেও, লেকিন গরু-ভঁইস জবাই নেহি চলেগা। এসব খবরের চেয়েও সবাই শুনতে চায় মেঘের কথা।

ভগবানকা কেয়া বিচার, একই তো দেশ, তবু বঙ্গাল আর গুজরাতে এত বৃষ্টি হয়েছে যে গাঁও কে গাঁও ডুবে যাচ্ছে, আর বুন্দেলাখণ্ডে ছোটো ছেলের কান্নার মতন কয়েক ফোঁটা বারিষও দিলে না? বুন্দেলাখণ্ড কী দোষ করেছে?

একজন বলল, 'আরে ভগবানকো আউর বহোত কাম-কাজ আছে, উসি লিয়ে ভগবান অন্য দেবতাদের ডিউটি ভাগ করে দিয়েছেন। বারিষকা দেওতা মালানদেব।'

এরা এখানে ইন্দ্রকে বলে মালানদেব। তাঁকে পুজো করার অধিকার শুধু নারীদের। সে-সময় পুরুষদের ধারে কাছে যাওয়াও নিষেধ!

বহু বছর ধরেই এরকম ইন্দ্রপূজা চলে আসছে। কিন্তু গত দু-বছর হয়নি, কারণ কিছু ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে। খবর পেলেই টৌন থেকে ক্যাম্‌রা কাঁধে করে দলে দলে লোক ছুটে আসে, তারা কোনো কথাই শোনে না, ফটাফট তসবির খিঁচে নেয়। যে-পূজা পুরুষদের দেখাই নিষেধ, তার তসবির যদি তুলে নেয়, তা হলে সারা গ্রামের মানুষেরই যে পাপ হয়।

তাই ওই পূজা বন্ধ করে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যই কি মালানদেব ক্রুদ্ধ, এই আকাশে মেঘ পাঠাচ্ছেন না?

বয়স্ক পুরুষরা কয়েকজন মিলে ঠিক করল, এবার ওই পূজা আবার চালু করতেই হবে। উপায় তো নেই। এটাই শেষ চেষ্টা।

তবে সব কিছু সারতে হবে অতি গোপনে।

ইন্দ্রপূজা হয় অমাবস্যার রাতে।

সরপঞ্চ শবনম বানো ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিল, ওই দিন রাতে, সূরযদেও অস্তাচলে যাওয়ার পর কোনো পুরুষ আদমি ঘর থেকে বার হবে না। বড়কা মন্দিরের পূজারিনী রুকমাণি দেবীও জানিয়ে দিল যে, সেদিন কোনো বেহদা কিংবা মতলববাজ যাই-ই হোক, পুরুষ যদি বিশেষ একজন রমণীকে দর্শন করে ফেলে, তা হলে সে-পুরুষটির তো শাস্তি হবেই, নারীটিকেও দিতে হবে প্রচুর জরিমানা। কেন, নারীটিকে জরিমানা দিতে হবে কেন? নারীটি নিশ্চয়ই আগে কোনো পাপ করেছে কিংবা পুরুষটিকে জাদু করে টেনে এনেছে। স্ত্রীলোকটির সে-জরিমানার পরিমাণ কম নয়, গ্রামশুদ্ধ সবাইকে খাওয়াতে হবে এক রাত। তাতে যদি তার ঘটি-বাটি, চাটি হয়ে যায় তো হোক।

একটাই রাস্তা বাইরে থেকে এ-গ্রামে ঢুকেছে। সাত-আটজন নওজোয়ান বিকেল থেকে গ্রামের বাইরে একটা কালভার্টের ওপর বসে থাকবে। তারা আর সারারাত ঘরে ফিরবে না। টৌনের কোনো আখবারের লোক কিংবা ক্যাম্‌রাওয়ালারা যদি ইন্দ্রপূজার খবর শুনে ছুটে আসতে চায়, আটকানো হবে তাদের। প্রয়োজন হলে এরা লাঠি-ডান্ডা চালাতেও পিছ-পা হবে না। যেমন করে হোক এরা গ্রামের ইজ্জত রক্ষা করবেই।

সমস্যাটা হতে পারে ছোটে কুঁয়ারকে নিয়ে। সে-বুদ্ধুটা কিছুই না বুঝে রাত্রে বেরিয়ে পড়তে পারে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে শিকলি এঁটে রাখা হল। সূরযভান আর জুগনু নামের দুটো লোক, এক-এক রাতে খুব বেশি নেশা করে ফেলে, তখন তারা কী করে ফেলবে ঠিক নেই। সূরযভান তো এক রাতে চুরচুর হয়ে, তার নিজের চাচিকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ঝোপের দিকে, চাচির চ্যাঁচামেচি শুনে অনেকে ছুটে এসে সূরযভানকে বেদম মার দিয়েছিল। এদের দু-জনকে রাখা হবে চোখে চোখে।

আর ফাগুলাল? সেটাকে তো সামলানো দরকার। বাপের সুনাম ভাঙিয়ে সে হারামিটা আর কত বেয়াদপি চালাবে? কয়েকজন অবশ্য বলল, 'না না, ওকে কিছু বোলো না, দেখি না, ও কী করে?' মেয়েদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওকে দেখলেই সবাই মিলে একসঙ্গে চিৎকার করবে। তারপর মেয়েরাই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দেবে ওর শিরদাঁড়া। একজন মেয়ের হাতে তো শাবল থাকবেই। এরপর দেখা যাবে, ফাগুলালের কত রস!

কিন্তু ফাগুলালের দেখাই পাওয়া যায়নি গত দু-দিন। ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে চলে গেছে টৌনে। একবার গেলে সে একমাসের মধ্যে ফেরে না।

বৃদ্ধরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মারামারি জিনিসটা ভালো নয়। আর যাই হোক, সে তো সিয়ারাম ভগত-এর ব্যাটা। তাকে হাড়গোড়-ভাঙা অবস্থায় দেখলে অনেকেরই দিমাগ খারাব হয়ে যেত।

ইন্দ্রপূজা হয় একটা অশথগাছের তলায়।

এ-পূজায় কোনো মূর্তি লাগে না, একটা কাঠের দণ্ডের ডগায় লাগানো থাকে একটা তেকোনা শাদা ঝাণ্ডা। চিঁড়া, গুড় আর কলা হচ্ছে এই দেবতার উপচার। আগে তিলের সন্দেশও দেওয়া হত, কিন্তু এবারে যে পয়সার বড়োই অনটন।

সবাই জানে। বহুত বরস আগে একবার বৃন্দাবনে এ-রকম বর্ষণের খুব অভাব হয়েছিল। তখন অন্য মহিলাদের সঙ্গে রাধামাঈ এই পূজা করেছিলেন। সেবারে যা কাণ্ড হয়েছিল! পূজা শেষ হওয়ার আগেই কিষণজি কোথা থেকে দৌড়ে এসে পূজা কা পরসাদ খেতে শুরু করেছিল। আরে ছি ছি ছি, ইন্দর দেব্‌তা অন্য কোনো পুরুষের দর্শনই সহ্য করতে পারেন না, এখন কী হবে? পূজা সব বিফলে গেল? সকলের মাথায় হাত, ভয়ে মুখ আমসি।

তখন আকাশে দৈববাণী হয়েছিল। স্বয়ং ইন্দ্রদেব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আরে আনপড় আদমিলোগ, তোরা জানিস না, কিষণজি তো হামসে ভি বহুত বড়া দেওতা, সব দেওতাসে বড়া। আমি কিষণজির ওপর রাগ করতে পারি? হাঁ, দুসরা কোই আদমি এইসান কিয়া তো আমি তোদের গ্রামে আগ লাগিয়ে দিতাম!'

কিষণজি তো এই কলিযুগে যখন-তখন আসেন না, তাই কঠোর নিয়ম হয়েছে, কোনো পুরুষের ছায়াও দেখা যাবে না এই পূজাকা টাইমমে।

রাধামাঈ যে-গান গাইতেন, সেই গানই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে :

> চিঁড়া কুটেছি ইন্দর দেবতার জন্য, ফুলের মতন তাজা
> এসো এসো ইন্দর দেবতা, তুমিই তো আমাদের রাজা।
> কেলা এনেছি, গুড় এনেছি, মিশিয়েছি বুকের লহু
> লহু হল মধু আর কাউয়া কোয়েলা কুহু।
> কিষণ মহারাজ, দূরে থাকো, আমরা দুখিনী নারী
> বালবাচ্চার মুখ সুখা হল, গানা ভি গাইতে না পারি!

মোটামুটি এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, একই রকম সুরে, গাওয়া হতে লাগল বারবার। মোট একশো আটবার। কে গুনল কে জানে?

গান শেষ হওয়ার পরে গড় হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল সবাই। এ-সময় বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকতে হয়।

এরপরে আসল পর্ব।

ইন্দ্র দেবতাকে গান শোনানো হল, খাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হল, তারপর তাঁকে অন্যভাবে খুশি করতে হবে না?

এখন এইসব নারীদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে পাঠানো হবে কৃষির মাঠে। যাকে নির্বাচন করা হবে, তার শরীরে কোনো রোগ-ভোগ থাকবে না। খোস-পাঁচড়া, ঘা, কাঁটা-ছেঁড়া থাকবে না, স্বাস্থ্য হবে ভালো।

আগে বসেই অনেকটা ঠিক করা ছিল, সকলেই একবাক্যে বলল, প্রথমে পাঠানো হবে সরিতাকে। তার উমর খুব কম নয়। দেড় কুড়ি আরো পাঁচ তো হবেই। সরিতা আবার বিধবা, সন্তানও নেই।

সরিতার আর শাদি হবে না, কিঁউকি পণ্ডিতজি ছক কেটে বলে দিয়েছেন, আবার শাদি হলে আবার তার দুলহা মরবে। তার ভাগ্যে তার নিজস্ব ঘর-সংসার নেই। সে থাকে তার বড়ো ভাইয়ের বাড়িতে।

অন্তত চার-পাঁচজন জোয়ান মরদ সরিতাকে ঘরওয়ালি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিতজির গণনা শুনে পিছিয়ে গেছে। একজন মেয়েমানুষের জন্য কে আর মরতে চায়।

হাতে একটা লোহার শাবল নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল সরিতা, তার সঙ্গে চলল আরো দু-জন। ঠিক মেপে মেপে পঞ্চাশ পা গিয়ে থামবে, এর পর আর সঙ্গে কেউ যাবে না।

শাড়ি খুলল সরিতা। বুকের জামা, কোমরের শায়া সব খুলতে হল। সারা গায়ে আর একটুও সুতো নেই। তার, ছাড়া-পোশাক নিয়ে চলে গেল অন্য মেয়ে দুটি। ওরা পৌঁছে গেলে সবাই মিলে কয়েকবার উলু দেবে, তারপর সরিতার একলা যাত্রা শুরু।

একেবারে মিশমিশে অন্ধকার, নিজের হাত-পাও দেখা যায় না।

মেয়েমানুষ নিজের স্বামীর সামনেও নিভৃতে সব বস্ত্র খোলে না, স্নানের সময়ও কাপড় পরে থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান হবার পর থেকেই সারা শরীর ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখাই অভ্যেস হয়ে গেছে। এই প্রথম সে পুরোপুরি নগ্ন, কেউ না দেখলেও হাঁটতে গেলে জড়তা এসে যায়। কিন্তু ইন্দ্রপূজার যে এটাই রীতি।

কেউ দেখছে না, কিন্তু ইন্দ্র দেবতা তো দেখছে। দেওতারা আন্ধারেও দেখতে পায়। ইন্দর দেওতা তো পুরুষ। সরিতা যেন সেই অদৃশ্য পুরুষের দৃষ্টি টের পাচ্ছে।

আন্দাজে আন্দাজে হেঁটে সরিতা পৌঁছে গেল কৃষির মাঠে। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এই সময় মাঠ পানিতে ভিজে ভিজে থাকার কথা। আহা রে, এক ফোঁটাও জল না পেয়ে ঝিঁঝি পোকাগুলোরও ডাক যেন ফাটা ফাটা।

হাতের শাবলটা তুলে মাটিতে একটা কোপ দিল সরিতা। ঠিক সাতবার কোপ দিতে হবে।

তারপর সেই গর্ত ঘিরে নাচতে হবে সাত পাক। তবে যদি ইন্দর দেওতা খুশ হন। আজ রাত্তিরেই যদি বারিষ হয়, তবে বুঝতে হবে ইন্দর দেওতার খুব পসন্দ্ হয়েছে এই মেয়ের নাচ।

মাটি এত শক্ত যে এক-একবার ঠং ঠং করে শব্দ হচ্ছে শাবল মারার পর। ভালো করে গর্ত খুঁড়তে হবে, কাল সকালে এসে পরীক্ষা করে দেখবে পুরুষরা। যদি বোঝে যে মেয়েটি ফাঁকি মেরেছে, তা হলেও শাস্তি পেতে হবে।

কোনো কোনো বছর ইন্দ্র দেবতা নাকি এই সময় একেবারে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ান।

শাবল চালাতে চালাতে সরিতা ভাবতে লাগল, আকাশের দেওতা কি সত্যি সত্যি জমিতে পা ছোঁয়ান? বারবার সে এদিক-ওদিক ফিরে ফিরে দেখতে লাগল, যদিও সে জানে, এত অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না!

কিংবা দেওতাদের গায়ের রং-ই তো চেরাগ বাতির মতন।

মোটামুটি একটা গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। এইবার নাচ।

জীবনে আর কোনো পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে কিছু করতে হবে না। পুরুষরা তাকে ভয় পায়। তার স্পর্শেই আছে মৃত্যু।

দেওতাদের তো সে ভয় নেই। দেওতারা অমর।

এক পাক নাচের পরই শরীরটা কেঁপে উঠল সরিতার। কিছু একটা শব্দ শোনা গেল কি? না, কীসেরই বা শব্দ হবে। একটু বাতাসও নেই যে উড়বে গাছের শুকনো পাতা।

একটু পরে আবার শব্দ। কেমন যেন অশরীরী, অপ্রাকৃত ব্যাপার।

সরিতার একবার ইচ্ছে হল, ছুট্টে ফিরে যেতে। সাত পাক নাচ হোক বা না হোক, কেউ তো বুঝবে না।

কিন্তু দেওতা ঠিক বুঝবে। পূজার নিয়ম ভাঙা হবে। পাপ হবে সারা গ্রামের মানুষের।

মন দিয়েই সে সম্পূর্ণ করল সাত পাক নাচ।

তারপর চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই মনে হল, এক জায়গায় যেন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। পুরুষ মূর্তির মতন।

তার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সে কি চোখে ভুল দেখছে? এখানে এখন কোনো মানুষ আসবে কী করে? তবে কি দেবতা স্বয়ং? তাও কি হয়?

দেওতা হলে সেই চেরাগ বাতি কই?

কোনো পুরুষ দেবতার গায়ের রং কালো হয় না।

ছুটে যে পালাবে সরিতা, সে-সাধ্যও নেই, পা-যেন গেঁথে গেছে মাটিতে। কাঁপা কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কউন?'

সে খুব আশা করেছিল, কোনো উত্তর পাবে না। ওখানে আসলে কেউ নেই। ওই জমাট অন্ধকার তার মনের ভুল।

কিন্তু উত্তর এল।

এক ভরাট পুরুষকণ্ঠ বলল, 'ম্যায় হুঁ মালানদেও।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল সরিতার। কেটে গেল ভয়। মালানদেও না ছাই! ও-গলার আওয়াজ সে চেনে না!

লজ্জা নিবারণের জন্য এক হাতে বুক ও অন্য হাতে যোনিদেশ চাপা দিয়ে সে বলল, 'আরে বেওকুফ কাঁহিকা! তু ইধার আয়া? মরনেকা ডর নেহি তুহার?'

লঘু হাস্য করে সেই অন্ধকার মূর্তি এক-পা এগিয়ে এসে বলল, 'তেরা নাচ বহোত আচ্ছা লাগা! আগেই থামলি কেন? পুরা সাত পাক হয়নি। তুই ফাঁকি মেরেছিস!'

সরিতা বলল, 'আলবাত সাত বার নেচেছি। তা ছাড়া, তুই গুণবার কে? তুই কি নালিশ করতে যাবি?'

ফাগুলাল বলল, 'না, নালিশ করতে যাব না। আর একটু নাচ না!'

সরিতা বলল, 'তুই তো এখনই মরবি! এবার ভগতজির নামেও কেউ তোকে বাঁচাবে না!'

ফাগুলাল বলল, 'আমায় কে মারবে? কার সাধ্য আছে?'

সরিতা বলল, 'আমি চিল্লাব। সবাই ছুটে আসবে, তোকে ছাতু করে দেবে! যদি ওরা দেরি করে, আমার কাছেও লোহার শাবল আছে!'

আবার হেসে ফাগুলাল বলল, 'তুই মারবি আমাকে? তা হলে তো পণ্ডিতজির কথাই সত্যি হয়ে যাবে। তোর কাছে এলে মরদরা বাঁচে না! তবে, মার আমাকে।'

সে আরো কাছে এসে সরিতার কাঁধে হাত রাখল।

সরিতা বলল, 'সত্যি আমি চ্যাঁচাব! আরে ছি ছি, তোর একটুও কি শরম নেই রে? আমি মালানদেও-র পূজা দিতে এসেছি, তুই ছুঁয়ে দিলি, আমার কত পাপ হল। এখন মালানদেও আর বারিষ দেবে না! রাগ করে আকাশে আগুন ছড়িয়ে রাখবে!'

ফাগুলাল বলল, 'শোন সরিতা, আমি পাপ জানি, পুণ্যও জানি। গাঁয়ের বেহুদা আদমিলোগ শাস্তর ভুলে গেছে, পড়া-লিখা তো কিছু করে না। এই ইন্দ্রপূজার রাতে, যে পূজা দিতে আসে, সে হয় ভূমি। আর পুরুষ হয় আকাশ। ভূমি আর আকাশের মিলন না হলে বারিষ হবে কী করে? সরিতা, তুই বুঝিস না, আমি তোর জন্যই টাউন থেকে বারবার গাঁয়ে ছুটে আসি। তোকে আমি টাউনে নিয়ে যাব, মন্দিরে পূজা দিয়ে তুই আমার ঘরওয়ালি হবি। টাউনে কেউ জাতের পরোয়া করে না।'

সরিতা এবার কান্নাভেজা গলায় বলল, 'অমন কথা আর বলিস না! তুই আমায় শাদি করলে তোর মরণ হবে। তুই যা, যা, এখনো চলে যা! আমি তোর মরণ চাই না!'

ফাগুলাল বলল, 'আমি চাই! তুই আমাকে মেরে ফ্যাল সরিতা, তা হলে আমার শরীর জুড়োবে! আর ছোটাছুটি করতে হবে না। মরণের আগে, শুধু একবার...'

সরিতা বলল, 'না, না। ফাগু, তুই কেন মরবি। আমি মরলে বরং কারুর ক্ষতি নেই দুনিয়ায়। আমার মতন বেওয়ারিশ মেয়েমানুষের তো মৃত্যুতেই মুক্তি মেলে!'

ফাগুলাল বলল, 'টাউনে গিয়ে তুই আমার সঙ্গে বাঁচতে পারিস। অন্তত যতদিন বাঁচা যায়। ভালোবাসা দিয়ে আমরা পণ্ডিতজির কথা মিথ্যে করে দিতে পারি।'

সরিতা বলল, 'এসব তুই কী বলছিস ফাগু? আমার সারা শরীর কাঁপছে। হা ভগওয়ান, আমায় আর কত দুঃখ দেবে?'

হঠাৎ আকাশ চিরে দেখা গেল বিদ্যুৎঝলক। সেই আলোকে সরিতাকে দেখল ফাগুলাল। একেবারে আদিম মানবী।

তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বজ্রগর্জন।

সরিতা বলল, 'ওই দ্যাখ, মালানদেও ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধমকাচ্ছে!'

ফাগুলাল বলল, 'বারিষের আগে আকাশ ডাকে। সেই গর্জন তো পৃথিবীকে ধমকায় না। ঝড়কে বকুনি দেয়। বলে, হঠ যাও, হঠ যাও! এখন আর কেউ থাকবে না! এখানেও আর কেউ নেই। আয় সরিতা।'

তারপর সরিতা হল ভূমি আর ফাগুলাল হল আকাশ। তাদের মিলন হল। সেই মিলনখেলা যেন চলতে লাগল অনন্তকাল।

খানিক বাদে দু-জন শুয়ে রইল পাশাপাশি। দু-জনেরই শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আকাশে বিদ্যুৎচমক এখন ঘন ঘন। বৃষ্টি একেবারে আসন্ন। হয়তো কাকতালীয়। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, বৃষ্টি একদিন-না-একদিন তো আসবেই। তবু আজই, এখনই বৃষ্টি নেমে সরিতাকে পুণ্যবতী করে দিল।

জুঁইফুলের মতন এক-একটা বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল ওদের শরীরে।

সরিতা আবেগ-জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'যা ফাগু, তুই এবার জঙ্গলের দিক দিয়ে চলে যা।'

ফাগুলাল বলল, 'তুই আমার সঙ্গে টাউনে যাবি না?'

সরিতা ত্রস্ত হয়ে বলল, 'ওই যেন অনেকের গলা শুনতে পাচ্ছি। যা, এখন যা। তোকে দেখলে সব ঝুট হয়ে যাবে!'

ফাগুলাল বলল, 'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না যে।'

তবু সরিতার তাড়নায় তাকে উঠতে হল। নিজের পোশাক তুলে নিয়ে সে মিলিয়ে গেল বিপরীত দিকের অন্ধকারে।

আগে ছুটে এল মেয়ের দল। একজনের হাতে সরিতার শাড়ি, জামা। তারপর এল গাঁয়ের সমস্ত পুরুষ। সবাই ইন্দ্রদেবতার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। নাচ শুরু করেছে মেয়েরা, সরিতা তাদের মধ্যমণি।

মাটিতে পড়ে আছে ফাগুলালের কয়েক ফোঁটা বীর্য। এখুনি তা বৃষ্টির সঙ্গে মিশে যাবে!

সরকারমশাই

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

কিরণময়ী কাশীবাসী। বাবা বিশ্বনাথের পায়ে দিনযাপন। গত তিরিশ বছর ধরে আছেন। কত কী দেখলেন কিরণময়ী। এখন কাশীতে বিধবারাও ম্যাক্সি পরে।

যে-বাড়িতে আছেন কিরণময়ী, সেটা পাঁচু দত্তের বাড়ি। হাটখোলার চুনের কারবারি পাঁচু দত্ত এই বাড়িটা সুবর্ণবণিক সমাজকে দান করেছিলেন।

সমাজ এই আশ্রমটা চালায়। আশ্রমের নাম 'ভাগ্যবতী নিবাস'। হিন্দিতে এবং বাংলায় লেখা আছে। বিধবাদের এই আশ্রমের নাম ভাগ্যবতী দেখে কেউ কেউ মুচকি হাসে। কলকাতার এক নারীবাদী অধ্যাপিকা, কাশী বেড়াতে এসে এই আশ্রম দেখেন এবং আশ্রমের বিধবাদের সঙ্গে দেখা করেন। পরে কলকাতায় একটি পত্রিকায় ফিচার লেখেন — 'ভাগ্যবতীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ'। সেখানে বলা ছিল, স্বামীশাসন থেকে মুক্ত হয়ে এই স্বামীহীনারা কত স্বাধীন। সত্যিই ভাগ্যবতী।

তবে ওই লেখায় তিনি জানাননি যে, আশ্রমের এই নামকরণের কারণ হল পাঁচু দত্তের মাতাঠাকুরানি। তারই নাম ছিল 'ভাগ্যবতী দত্ত। পাঁচু দত্ত তার মাকে দাস-দাসী-সখীসমেত থাকবার জন্য বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর কয়েক বছর পর এই বাড়িটি সমাজকে দান করা হয় এই শর্তে যে, এখানে কেবলমাত্র বিধবারাই থাকবেন এবং ওই বিধবাকে সুবর্ণবণিক সমাজের হতে হবে। এই বাড়িতে মোট বাইশটি ঘর আছে। ম্যানেজার, রাঁধুনি ছাড়া কমপক্ষে ষোলোজন বিধবা এখানে থাকতে পারেন। কিন্তু এখন আছে মোটে ন-জন।

এ-বাড়ির পুরুষ বলতে একজনই। তিনি ম্যানেজার ভুজঙ্গনাথ দে। তিনি পরিবার নিয়ে একটা ঘরে থাকতেন। নিঃসন্তান। সম্প্রতি বিপত্নীক। ন-জন বিধবাকে নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁর কাছে একটা কালো রং-এর বাঁধানো মোটা খাতা আছে। তাতে আশ্রমিক বিধবাদের নাম, বয়স, ছেলেমেয়েদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লেখা। একেবারে ডানদিকের কলমে মন্তব্য। সেখানে কারুর নামের পাশে লেখা ডায়াবিটিস। কারোর পাশে হাইপ্রেশার, কারুর পাশে গ্যাস্ট্রিক। ওই খাতায় অনেক নাম লাল কালিতে কাটা। আর নামের বাঁদিকে একটা চন্দ্রবিন্দু। ওই চন্দ্রবিন্দুর ফোঁটাটির মধ্যে ম্যানেজার ভুজঙ্গনাথের দীর্ঘশ্বাসটি লিপ্ত থেকে যায়।

ভুজঙ্গনাথের বয়স এখন সত্তর। কলকাতায় একটা ব্যাংকে কাজ করতেন। ব্যাংক ফেল হয়ে গেলে পাঁচু দত্তের নাতি ভুজঙ্গকে এই কাজটি দিয়েছিলেন। ভুজঙ্গের বয়েস তখন ছিল বত্রিশ। তখন ওই খাতায় ১০৫ পর্যন্ত নম্বর ছিল। এখন ২৯৫ পর্যন্ত আছে।

২৮৫ নম্বর কিরণময়ী দেবীর। স্বামী ব্রজমোহন চন্দ। ১২২ হাটখোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৫। প্রবেশ-১৫.৬.১৯৮২, বয়স-৫৬, পুত্র-১, কন্যা-১, পুত্রের নাম প্রণবরঞ্জন চন্দ। পেশা-ব্যবসা। ফোন নম্বর...। মন্তব্যের ঘরে ডায়াবিটিস, বাত, হাই ব্লাডপ্রেশার। আর দুটো 'ব' অক্ষর। ব-ব। এটা সাংকেতিক চিহ্ন। নিজের বুঝবার জন্য।

ব-ব মানে উনি একটু বকবক করেন। দুটো ড্যাশ (- -) মানে চুপচাপ থাকা। দুটো গোল (০ ০) মানে একটু ঝগড়া করার স্বভাব। তিনটে গোল মানে বেশিমাত্রায় ঝগড়া করার অভ্যেস। (+ +) মানে শুচিবাই। (ঃ) মানে ক্রন্দনশীলা। দুটো ফুটকি দু-ফোঁটা চোখের জলের প্রতীক। ২৯০ নম্বর সরস্বতী দত্ত-র ঘরে (০০০, + +, ঃ) রয়েছে।

এখন ২৮৫ কিরণময়ীর সঙ্গে ২৯০ সরস্বতীর কথা হচ্ছে।

কিরণময়ী : অ দিদি, ছেলের চিঠি এল?

সরস্বতী : আমার ছেলে বেকার নয়, বোয়েচ? অত চিঠি লেখার সময় নেই। তা এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করো কেন বলো তো? তোমার ছেলে কির-ম চিঠি লেখে জানা আচে! আমার বাপু ওর-ম দ্যাকানো পিরিতের দরকার নেই। আমার ছেলে যা ট্যাকা পাটায়, কারুর ছেলে তেমন পাটায় না। ম্যানেজারকে জিগেস করোগে যাও। আর কে আছে লা, আমার মতো খরচ করনেওলা? কোই নেহি হ্যায়। ম্যানেজারবাবুকে ১০০ ট্যাকা দিয়েচি। বাঙালিটোলা থেকে পাটালি গুড় আনবে, মোষের দুধ আনবে। নলেনগুড়ের পায়েস রাঁধাব পোষ-সংক্রান্তিতে। পাঁচ বছর ধরে সব্বাইকে খাওয়াচ্ছি। হনুমান মন্দিরে রোজ দু-ট্যাকা দি। গঙ্গায় গেলে পাঁচ ট্যাকার কমে ফেলি না। আর কারুর হিম্মত আছে?

কিরণময়ী : ঘাট হয়েছে। হরি-হরি! ভালো মনে জিগেস করতে গেসলুম। অত কথার দরকার নেই। আমরা ক-জনই বা আছি। সুখদুঃখের কথা নিজেরাই তো একটু বলি বই তো নয়।

সরস্বতী : আমি আমার ছেলেকে নিয়ে খোঁটা মারা পছন্দ করিনে। আমার ছেলে হীরের টুগ্‌রো। ক-জন এমন ছেলে গভ্ভে ধারণ করেচে।

কিরণময়ী : আমার ছেলেও কম কিছু নয়কো। তবে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে চাই না।

কিরণময়ী ঘরে চলে যায়। ঘরের জানলা দিয়ে এক চিলতে রোদ্দুর এসে পড়েছে। ওখানে পা মেলে বসেন। বজরংবলীর গেরুয়া পতাকা উড়ছে। সামনের একতলা বাড়িটার ছাতে ভরন্ত রোদ্দুরে কাচের বয়ামে আচার। চোখের দৃষ্টি যদিও কমে এসেছে, তবুও বুঝতে পারেন কোন বয়ামে লেবু, কোন বয়ামে লাল লংকা। তিন-চার বছর আগেও আচার বানিয়েছেন কিরণময়ী। লাল কাশীলংকার ভিতরে আমচুর মৌরি মেথি জোয়ানের পুর দিয়ে। বউমা ভালোবাসে। নাতনি ভালোবাসে। নাতনি এখন দিল্লিতে ম্যানেজারি পড়ে। পাশ করলে ম্যানেজার হবে। দিল্লি যাবার সময় কাশীতে নেমেছিল ওরা। দু-দিন হোটেলে ছিল। কত হইচই। কত রাবড়ি। নাতনিটা ফোন নম্বর নিয়ে গেল। একবারই ফোন করেছিল, আর না। ও কি কলকাতা যায় না? পথে একবার তো নামতেও পারত।

ছাতের ওপর একটা কেঁদো হনুমান এসেছে। ইস্, আচারের বয়ামগুলো না ভাঙে। 'হ্যালা ও রামশরণ কা মা, ছাদমে হনুমান আয়া।' কিরণময়ী জানলার শিক ধরে চেঁচায়। কাশীর হনুমান মানুষের ভাষা বোঝে। হনুমান চলে যায়। যাক। বাঁচা গেল। আমি তো আর ফোটো

তুলতে পারি না, তা হলে হনুমানের ফোটো তুলে তোকে পাঠাতাম। নাতনিটার উদ্দেশে বলেন কিরণময়ী। নাতনির নাম চুনকি। ভালো নাম কী একটা যেন আছে, বিদ্যুটে। চুনকির সঙ্গে চিড়িয়াখানা যাওয়া মনে পড়ে। হনুমানের খাঁচার সামনে কি হাততালি। এখানে কত হনুমান। কেঁদো হনুমান, হুলো, বাচ্চা বাচ্চা হনুমান, আর বাঁদরও কত। লালমুখো। 'আয় না, আয় একবার, তোকে দুগ্‌গা বাড়ি নিয়ে যাব, হনুমান দেখাব, এই হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি? অ্যাই চুনকি, এবার হাততালি দিবি।' হাততালি কি আর দিবি রে? তুই তো বড়ো হয়ে গেছিস। আয়, তোকে তবে সালোয়ার কামিজ দেবো। লখনউ-এর চিকন কাজ, নাকি বেনারসি নিবি? ওই তো সরমা কিনে আনিয়েছিল ম্যানেজারবাবুকে দিয়ে। বেনারসি সিল্কের সালোয়ার কামিজ, ওর নাতনির জন্য। পার্সেল-টার্সেল সব ম্যানেজারবাবুই করে দেয়। তুই যদি আসতিস, তোকে সঙ্গে নিয়ে টাওয়ার মার্কেটে যেতুম, যা চাইতিস কিনে দিতুম। ডাঁড়া, আসবি কি না আসবি ঠিক নেই, একটা বেনারসি শাড়ি কিনিয়ে রাখব। তোর বিয়ের। ফিরোজা রং-এর। আমার বিয়ের বেনারসিও ছিল ফিরোজা রং-এর। একটা গেরো দিই কাপড়ে। নইলে আবার ভুলে যাব পরে...।

কিরণময়ীর থান কাপড়ের আঁচলে এরকম অনেক গিঁট আছে। কিন্তু কোনটা যে কোন প্রতিজ্ঞার গিঁট, সেটা আর মনে থাকে না। কিরণময়ীর শাড়িগুলি এরকম প্রতিজ্ঞা আর শপথে পরিপূর্ণ থাকে।

কিরণময়ীর স্বামী ব্রজমোহনের ছিল পারিবারিক ব্যবসা। কলকাতার বউবাজারে সোনার দোকান। হাটখোলায় বিরাট বাড়ি, ছ-খানা ঘর ভাগে। মার্বেল বসানো। বারান্দায় ডানাভাঙা পরী। বড়ো ছেলে মরে গেল আট বছরে। কলেরায়। এরপরই প্রণব।

প্রণব খুব পড়াশুনোয় ভালো। এম.এসসি. পাশ দিয়েছিল। প্রণব বাপের ব্যবসায় গেল না। কেমিকালের ব্যবসা শুরু করল। বিয়ে করল নিজে নিজে। বামুনঘরের মেয়ে। এসব বিয়ে তো আর মন্তর পড়ে হয় না, রেজিস্টিরির বিয়ে হল। বামুনের মেয়ের প্রণাম নিলে পাপ হয়। তবু নিয়েছে। কাশীর গঙ্গায় ওই পাপ ধুয়েছে কি না কে জানে? স্বামী গত হলেন ছেলের বিয়ের এক বছরের মাথায় মাথায়। এক বছরের মাথায় বাড়িতে উচ্ছব। বন্ধুবান্ধব। মাংস, পোলাও। একগাদা এঁটো বাসন চাতালের কলে। ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়লেন ব্রজমোহন। হার্ট অ্যাটাক। বে-জাতে বিয়ের শোকেই কিনা কে জানে। কিরণময়ী বললেন, কাশী পাঠিয়ে দে। সমাজের আশ্রম আছে। আসলে, কিরণময়ীর মাসতুতো দিদি ছিলেন ওখানে, আরো কোন আত্মীয়। কলকাতায় এলে বড়ো বড়ো বেগুন, প্যাঁড়া আর পেয়ারা নিয়ে আসতেন।

সেই কাশী আসা। অভিমান? তার চেয়ে বলা ভালো স্বাধীনতা। সংসার হয়ে গেল বউ-এর। কুটুমরা সব বামুন। অজানা, অচেনা। জ্ঞাতিরা মুখ টিপে রগড় দেখে। তার চে এই ভালো। বাবা বিশ্বনাথ আছেন, মা গঙ্গা আছেন, সুখদুঃখের কথা বলার সাথি আছে।

ছেলে কিন্তু টাকা পাঠায়। যা লাগে তার থেকে বেশি। বছরে একবার তো আসবেই। প্রতিবারই বলে অনেকদিন বিশ্বনাথ হল। এবার নিজের ছেলেকে দ্যাখো। কিরণময়ী বলেন— এখান ছেড়ে যাব না। মনিকর্ণিকার ঘাট আছে, এখানেই থাকব। বারকয়েক কলকাতা গেছে, ছেলে নিয়ে গেছে। যাবার সময় বয়াম ভরতি লংকার আচার, নেবুর আচার নিয়ে গেছে, নয়তো ছেলের হাতে তুলে দিয়েছে। এখন আর হয় না। হ্যাপা পোষায় না।

রোদ্দুর খাওয়া আচারের বয়ামগুলোর দিকে তাকান কিরণময়ী।

বাইরে উত্তরদেশের পাখিদের ডাক। একটা বাচ্চা হিন্দিতে কাঁদছে।

ছেলের একটাই বাচ্চা। সে আবার এই কাঁচা বয়সে দিল্লিতে। কী করে থাকিস রে? ওই বাড়িটাও তো ছেড়ে দিয়েছিস। আটতলার উপরে ফ্ল্যাট নিয়েছিস। ছেড়ে আসতে পারলি ওই বিরাট বাড়ি? যে সেগুন কাঠের পালঙ্কে শুতুম, সেটাও নাকি বেচে দিয়েছিস। সব বউয়ের বুদ্ধি।

তুই খুব ভালো। গতবার একটা গেঞ্জি ফেলে গিয়েছিলিস। আমি মাঝে মাঝে শুঁকি; জানিস, তোর গায়ের গন্ধ পাই।

আগে তো বেশ মানি অর্ডারে টাকা পাঠাতিস। মানি অর্ডারের তলায় ছোট্ট ফালিতে দু-কলম লিখতিস। চুনকির কথা, ওর ইশকুলে ফাস্ট হওয়ার কথা, আমাকে স্বপ্নে দেখার কথা। 'তোমার হাতের শুক্তো খাই নাই কতদিন', 'তোমার বউমা চুল কাটিয়া ফেলিয়াছে'— এটাও তো লিখেছিস। এখন চেক পাঠাস কেন রে? আগের মতো মানি অর্ডার পাঠাতে পারিস না? মাসে মাসে যা হোক চিঠি পেতুম।

চিঠি একদম লিখিস না বলব না। পয়লা বৈশাখের পর পাঠাস, বিজয়ায় পাঠাস, আরো মাঝে মাঝে পাঠাস। এখন তো চোখে দেখি না ভালো, ম্যানেজারকে দিয়ে পড়িয়েনি। ছানি কাটিয়ে দিবি বলেছিলিস, এবার কাটিয়ে নেব। তখন তোদের কাছে কিছুদিন থাকা যাবেখনে। চুনকিকে আসতে বলিস।

বাবা বিশ্বনাথকে কত করে বল্লুম, বাবা, চুনকির একটা ভাই দাও, ভাই দাও। বাবা শুনলেন না।

এই দ্যাখ রোদ সরে গেল। আবার নেড়ে বসতে হবে। চারটে বাজলেই রোদ সরে যায়। তারপর পাথরগুলো ঠাণ্ডা হতে থাকে। তখন পায়ে মোজা পরে নিই। সাতটা থেকে ঘড়ির কাঁটা আর নড়ে না। কাঁটা কি ছাই দেখতে পাই? আর একবার চা দিয়ে যায় বলে বুঝে যাই সাতটা। তারপর আরো দু-ঘণ্টা। নীচে যারা আছে ওরা টিভি দেখে। ম্যানেজারের বারান্দায় টিভি রেকেচে। আমার বাপু ভালো লাগে না। ওঠা-নামা বড়ো হ্যাপা। তার চে বাবা ঘরে বসে খাতার মধ্যে শ্রী দুর্গা শ্রী দুর্গা লেখা ভালো। ওটা দেখবার দরকার হয় না। হাত এমনিই চলে। একবার হয়েছিল কী, ডাঁড়া, একটা মজার কথা বলি। খুব তো দুর্গা লিখেছি, সকাল হলে দেকি কি, ও হরি! লেকা ফোটেনি কো। ডটপেনের রিপিল ফুরিয়ে গেস্‌ল।

তুই চিঠি লিখিস না কেন রে? আরো ক-টা তো লিখতে পারিস। কীইবা এমন রাজকম্ম। কারবারের জন্য তো কত চিঠি লিকতে হয়। ওরই মধ্যে মাকে নয় আর দু-খানা লিখলি।

তোরা এমন হলি কেন রে? ওই যে সরস্বতী, কত বড়ো ঘরের মেয়ে। ওর নিজের নামেই দুটো বাড়ি। ওর ছেলেও মোটে চিঠি লেকেনাকো। যতদিন বাড়ির সরকার বেঁচে ছিল, সরকারকে দিয়ে চিঠি লেকাত। সেই এক বয়ান। 'পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় কুশলেই আছেন, আমরা এক প্রকার। আপনার নাতি-নাতনিরা কুশলেই আছে। মাস্টার নিয়মিত আসিতেছে, ব্যবসার হাল সুবিধার নহে। চিন্তা করিবেন না, আপনার আশীর্বাদে ঠিক হইয়া যাইবে। এই মাসের টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। আশীর্বাদ দিবেন।' ব্যাস, হয়ে গেল। আর খালি

ছেলের সই। সই ছাড়াও চিঠি এসেছে। সব চিঠিতেই 'ব্যবসার হাল সুবিধার নহে, আপনার আশীর্বাদে ঠিক হইয়া যাইবে।' সাধে কি কথায় বলে...

ওই বুড়ো সরকারবাবু দেহ রাখলেন, ব্যাস, চিঠি আসা বন্ধ। সরস্বতীটা মিছিমিছি পিওন বেচারাকে মুখ করে। এই কাশীধামে কাউকে ওলাউঠো বলতে হয়? এসব শাউড়িদের আমলের গাল পুরোনো ঝুলি থেকে বের করে লাভ কি?

আমি বাপু কাউকে গালও দিই না, শাপান্তও করি না। যার যা অদেষ্ট। চটিটা গলাই এবার। বড্ড শীত। তুই সোয়েটারটা পরেছিস তো পানু? তোর বড্ড ঠান্ডা লাগার ধাত। শিকনি মোছাতে মোছাতে আঁচল খড়খড়ে হয়ে যেত। আর টনসিল ফুলত গলায়। নুনের পুঁটুলি হারিকেনের মাথায় বসিয়ে গরম করে সেঁক দিতুম। ...ওই শোন রামনাম সত্ হ্যায়। মনিকন্নিকায় নিয়ে যাচ্ছে।

দু-হাত জোড় করে প্রণাম করেন কিরণময়ী। যে হও, সগ্‌গে যাও।

বাড়ির ছাত থেকে মনিকর্ণিকার ঘাট দেখা যায়। গঙ্গাও। ছাতে ওঠার পাথরের সিঁড়ির ধাপগুলো খুব বড়ো বড়ো। কত দিন ওঠা হয় না।

রান্নার মেয়েটি আসে। আগে যে ছিল, সে বাঙালি ছিল। বড়ি-টড়ি দিয়ে পালং রাঁধত, মেথি দিয়ে লাউ। বামুন ঘরের বিধবা। ছেলেপুলে ছিল না। সে গত হয়েছে। এখন যে, সে হিন্দুস্থানি। জিজ্ঞেস করল—

— ও দাদি, রোটি কি ভাত?

— রোটি খায়গা। সবজি ক্যা হ্যায়?

— আলুগোবি।

— বাঁধা নাকি ফুল?

— বান্ধা।

— ধুস্। রোজ রোজ বান্ধা। তা হলে খই খাকে শুয়ে পড়েগা।

— আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।

— ক্যা ঠিক হায়। বোস না থোড়া। সরস্বতী ক্যা খাতা হ্যায়?

— দুধ রোটি।

— দুধ কেইসে? আজকাল তো দুধ নেই রাখতা হায়।

— ইস্পেশাল হ্যায়। হাম খুদ লে আতে, পইসা দেতে হ্যায় না... দুধ কা...

— ও। বলিসনি তো পহেলে, তা হলে হামিও পয়সা দেতা হ্যায়...

— ঠিক হ্যায়, বাদমে বাত করেঙ্গে।

— বোস না আউর থোড়া।

রান্নার মেয়েটি উঠে চলে যায়। ও এবার রাঁধবে। এখন গ্যাসের রান্না। আগে যখন কয়লায় হত, উনুনের কাছে গিয়ে ওম পোহাত।

আগে রাত্তিরে দুধের ব্যবস্থা ছিল। বেড়ালে খাওয়া নিয়ে কিম্বা ভাগাভাগির কম-বেশি নিয়ে একটু-আধটু ঝগড়া-ঝামেলার পর ওটা উঠে যায়। যে যার মতো আলাদা করে রাখত। ঘরে যার যার মতো আলাদা স্টোভ থাকত। কিরণময়ীর স্টোভে এখন ধুলো। চুনকি এলে জ্বালাবেন খনে।

মকর-সংক্রান্তি চলে গেল। সরস্বতী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কস্তুরীকে দিয়ে পিঠে করালেন। পাটিসাপটা, মুগপুলি আর পায়েস। যাদের ডায়াবিটিস আছে, তারাও খেল। কিছু বেশিই ছিল। পরদিন এসে গেল পিওন।

যে পিওনটি আসে, সে বাঙালি ঘরের। বাংলা কথায় যদিও টান আছে, তবু বাংলা পড়তে পারে। এখনো দু-জনের টাকা মানি অর্ডারে আসে। বিভাময়ী আর ঝর্নার। পিওন বকশিশ পায়। পিওনটির নাম অজিত। বছর পঁচিশ বয়স। দু-বছর হল চাকরি পেয়েছে। বেশ দেখতে। ও এলে সবাই খুশি হয়। ছেলেটি বেশ ভালো। ঘরে ঘরে গিয়ে টাকা বলো, চিঠি বলো, পৌঁছে দেয়। অ্যালাউ আছে।

কিরণময়ীর চিঠি এসেছে, লম্বা খামে। শুধু কিরণেরই, আর কারু নয়। কী গর্বটাই না হচ্ছে।

ওকে দেখতে পেয়ে সরস্বতী বলল— ভালো দিনেই এয়েচো বাছা, দুটো পিঠে খেয়ে যাও। ওলো কস্তুরী...

অজিত বলে— পিঠে! বাঃ বহুত ভালো। মা আগে বানাত, আজকাল উসব খতম হয়ে গেছে।

কিরণময়ী খাম খুলতে খুলতে ভাবে সরস্বতী লো, যতই পিঠে খাওয়াও, পুলি খাওয়াও, তোমার চিঠি নেইকো। তোমাদের বাড়ির সরকারমশাই মরেছে, চিঠিও সেরেছে। যাই বলো আর তাই বলো, আমার ছেলে কিন্তু...

কিরণময়ী দেখল ছাপা চিঠি। একেবারে কাগজে ছাপানো, ঝকঝক করছে। বড়ো বড়ো অক্ষর। 'পরম পূজনীয়া মা, কেমন আছ? শীত পড়েছে বুঝি খুব! শীতে কষ্ট পাচ্ছ? আমি তোমার কথা ভাবি। সময় পেলেই যাব। চুনকির খুব পড়াশুনার চাপ। তোমার বউমা যেমন, তেমনই আছে। চেক পাঠানো আছে, ইচ্ছামতো খরচ কোরো। ডা. সমাদ্দারের কাছে মাসে একবার যেও। মাগো, প্রণাম নিও। ইতি আশীর্বাদের কাঙাল তোমার পানু।'

আঁচলে চোখের জল মুছলেন কিরণময়ী। পিওন ছেলেটি বলল—এটা কম্পিউটারের চিঠি।

কম্পিউটার শব্দটি কিরণময়ীর অচেনা নয়। উনি জানেন কম্পিউটার এমন একটা মেশিন যে সব কাজ করে দেয়। কিরণময়ী বলেন—কী বলতে চাস? পানু লেখেনি? পানুর লেখাই তো। মানি অর্ডারের কুপনেও তো শেষকালে লিখত আশীর্বাদের কাঙাল।

পিওন ছেলেটি বলে — উনিই লিখেছেন, কিন্তু একবারই। আর বারবার লিখতে হবে না। কম্পিউটার খুব ভালো জিনিস। হিসেব রাখে, চিঠি লেখে...

কিরণময়ী পরের চিঠিটি পেলেন বৈশাখ মাসের পাঁচ তারিখে।

'পরম পূজনীয়া মা, কেমন আছ? গরম পড়েছে বুঝি খুব? গরমে কষ্ট পাচ্ছ? আমি তোমার কথা ভাবি। সময় পেলেই যাব'... শেষকালে আশীর্বাদের কাঙাল তোমার পানু।

এই 'মেশিন সরকারমশাই'-এর কথা যেন সরস্বতী না বোঝে হে বিশ্বনাথ...।

নীহারিকা নিয়ে খেলা

সুনীল দাশ

রাজধানী এক্সপ্রেস দু-ঘণ্টা দেরি করল।

থিয়েটার ওয়ার্কশপের গোড়াপত্তনের আসরে তাই শিলাদিত্য দস্তিদার গরহাজির। সে যখন দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার চত্বরে পৌঁছল তখন সেখানে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী আরো কুড়িজন নাট্যপরিচালক সদস্যদের একজনকেও পাওয়া গেল না।

শিলাদিত্য ঢুকল বাজাজজির ঘরে। এন.এস.ডি.-র অধ্যক্ষ বাজাজজি চা-আপ্যায়নে জানালেন যে, আজ, ওয়ার্কশপের শুরুটা কেবল হয়েছে। সদস্যের পারস্পরিক পরিচয় দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল থেকে কাজ শুরু হবে। তিন সপ্তাহ ধরে রোজ টানা চার ঘণ্টা কাজ চলবে। মাঝখানে থাকবে মিনিট পনেরো চায়ের বিরতি। জানা গেল, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা থিয়েটার ওয়ার্কারদের মধ্যে শিলাদিত্য দস্তিদার — বয়স সাতান্ন — সিনিয়র মোস্ট, বাকি কুড়িজন পঁচিশ থেকে চল্লিশ।

শিলাদিত্য হেসে বলল, 'ভাগ্যিস আমার চেয়ে অন্তত একজন প্রবীণতর থাকছেন—স্বয়ং ট্রেনার। কতটা সিনিয়র জানি না — পনেরো থেকে বিশ বছরের ফারাক হবে। তবে জানি, জার্মান-থিয়েটার ডিরেক্টরদের মধ্যে উনিই সবচেয়ে সিনিয়র।'

বাজাজজি হেসে বললেন, 'উনি তো আমারও গুরু। ভোল্ফরাম মেহরিং-এর কাছে প্যারিসে ওয়ার্কশপ করেছি। উনি সত্তর পেরিয়েও সাতাশ বছরের সপ্রতিভ যুবক, তাই না?'

অল্প পরে, বাজাজজির ঘর থেকে বেরিয়েই শিলাদিত্যের দেখা তার পুরোনো ছাত্র সাত্যকির সঙ্গে। সাত্যকির সঙ্গে ওর এক সহপাঠিনী ছিল। প্রণাম করে সাত্যকি টেনে নিয়ে গেল স্টুডেন্ট ক্যান্টিনে। এন.এস.ডি.-র ওই ক্যান্টিনেই শিলাদিত্যের প্রথম দেখা কবিতাকে। সাত্যকি কবিতাকে ডেকে শিলাদিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

কথকের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী কবিতা। পাঁচ মিনিট পরে কবিতার ক্লাসের সঞ্জীবকুমার এসে বসেছিল তাদের টেবিলে। ওরা দুজনেই জম্মু থেকে স্কলারশিপ নিয়ে দিল্লির কথককেন্দ্রের শিক্ষার্থী। নিজেদের আলাদা বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত কথককেন্দ্রের ক্লাস এন.এস.ডি. ক্যাম্পাসেই হচ্ছে।

কবিতা মেয়েটি প্রথম নজরেই খুব টানে। বছর কুড়ি, একুশ কি বড়োজোর বাইশ। জম্মু-কাশ্মীরের ছেলেমেয়েদের দেখতে সুন্দরই হয়। সঞ্জীবকুমারের চেহারাটাও, বিশেষ করে মুখশ্রী, বেশ সুন্দর। তবে কবিতার মতো অত বেশি চোখ-টানা রূপ নয়। কবিতার চোখদুটোর দিকে তাকালে, ওই ডাগর আঁখির সম্মোহন ছিঁড়ে বেরোনো মুশকিল।

পরের দিন কবিতা আর সঞ্জীবকুমারের কোথাও একটা নাচের প্রোগ্রাম আছে বলে ওরা দুজনেই একটু তাড়ায় ছিল। 'আবার দেখা হবে' জানিয়ে ওরা চলে যাওয়ার পর, সাত্যকি আর তার সহপাঠিনীও বেশিক্ষণ থাকল না। এন.এস.ডি.-র পরীক্ষায় দেখানোর জন্যে সাত্যকির একটা প্রোজেক্ট নিয়ে দু-জনে ব্যস্ত রীতিমতো। 'আগামীকাল দেখা হবে' বলে শিলাদিত্য চলে এল এন.এস.ডি.-র লাইব্রেরিতে।

ঘণ্টাখানেক লাইব্রেরিতে কাজ করে, তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে যেখানে, সেই হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থের পনেরো তলার একটি ঘরে ফেরার জন্যে সে মান্ডির মোড়ের একদিকের চওড়া রাস্তা পেরিয়ে পেভমেন্টে উঠতেই দেখল উলটোদিক থেকে একা একা হেঁটে আসছে কবিতা।

শিলাদিত্যকে দেখে ভারি সুন্দর করে হাসল কবিতা। হাসলে যথার্থই যেন মুক্তো-মানিক ঝরে। কবিতা দাঁড়িয়ে পড়েছে। থমকে গেছে শিলাদিত্যও।

'আবার এন.এস.ডি.? ক্লাস আছে?' শিলাদিত্য প্রশ্ন করে।

'না। আমি যাব এখন সংগীত-নাটক একাডেমির অফিসে—ওই বাড়িটায়।' বলে চোখ তুলে বাড়িটাকে দেখাল কবিতা।

'একেবারে কাছেই তো। আমিও ভেবেছিলাম যাব একবারটি।'

'চলুন না। একসঙ্গে যাই।' ডাকের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, বেশ আন্তরিকতা বাজল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কবিতা বলল, 'আপনি তো তিন সপ্তাহ থাকছেন। এর মধ্যে দু-একদিন আপনার সময় বুঝে অভিনয়-বিষয়ক একটু আলোচনা করতে পারলে আমার কোর্স-এর ব্যাপারে কাজে আসবে।'

'বেশ তো। এখন তিন সপ্তাহ ধরে রোজই দেখা হবে।'

'আগামীকাল থেকে তিনদিন আবার থাকব না দিল্লিতে। লখনউ রওনা হব আমাদের পারফরমেন্সটা শেষ হলেই। একটা অ্যাড-ফিল্মের শুটিং রয়েছে আমার আর সঞ্জীব শর্মার।'

'কত্থক কোর্স করতে করতে বাইরের কাজও করো?'

'করি, মানে সুবিধেমতো যা পাই আর কি! খুব একটা বেশি ক্লাস কামাই তো সম্ভব নয়। শুধু স্কলারশিপের টাকায় আমাদের কুলোয় না। জম্মুতেও টাকা পাঠাই মাঝেমধ্যে।'

দিল্লির মান্ডি মোড়ের চারপাশ জুড়ে কালচারাল কমপ্লেক্স। সাহিত্য অকাদেমির অফিস থেকে শুরু করে, আর্ট গ্যালারি, নাট্যমঞ্চ—অভাব নেই কিছুর। পথ হাঁটতে হাঁটতে, কয়েক মিনিটের মধ্যে জনা দশেক পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হল কবিতার। হাসিখুশি মেয়েটা এ-এলাকায় বেশ জনপ্রিয় বোঝা গেল।

জম্মুর হিন্দু-ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে কবিতা। বাবা স্কুল শিক্ষক। কবিতার পর দুটি বোন। ওদের ভাইটা সবচেয়ে ছোটো। জম্মুতে তিন ভাইবোনই স্কুলে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে শুনছিল সে, সবসময়ই জম্মুতে কেমন পর্যুদস্ত, অস্থির, উদ্বেগের জীবনের মধ্যে থাকতে হয় ওদের।

সংগীত-নাটক একাডেমিতে দু-জনেরই কাজ সারা হয়ে গেল মিনিট পনেরোর মধ্যে। তারপর একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কবিতা শিলাদিত্যকে বলল—এন.এস.ডি.-র স্টুডেন্ট ক্যান্টিনে বসে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে।

ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার বড়ো গেটটা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকের একতলায় ছোটো ছোটো একসার ঘর কত্থক-কেন্দ্রের। তবলার বোলের সঙ্গে ঘুঙুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ক্লাস চলছে। মাঝখানে গোল একটা বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর জানুয়ারি মাসের রোদ্দুর উপভোগ করছে কয়েকটি ছেলেমেয়ে।

বছরের শুরু থেকেই দিল্লিতে জমাট শীত। তাপাঙ্ক নেমে এসেছে চার ডিগ্রিতে। শিলাদিত্যর গরম পাঞ্জাবির নীচে পুলওভার, ওপরে শাল। সঙ্গে চুড়িদারের নীচে ড্রয়ার। কবিতার পরনে গরম কাপড়ের কালো ট্রাউজার্স। ওপরে ঘন হলুদ রঙের জ্যাকেট।

ক্যান্টিনে খাওয়ার পর, শিলাদিত্য দাম দিতে ওঠার আগেই কবিতা কাউন্টারে গিয়ে বিল মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'আর একদিন যখন আপনার সঙ্গে খাব, সেদিন আপনি দেবেন।' এরপর ওর দলবল এসে যাওয়ায় চলে যেতে হল কবিতাকে।

মান্ডি মোড় থেকে অটোয় শিলাদিত্য ফিরল হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থে। তন্দুরি কেলেঙ্কারির পর, অশোকা যাত্রী নিবাসের নাম বদলে হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থ। আগেরবার এন.এস.ডি.-র 'ভারতের রঙ্গোৎসব' ড্রামা ফেস্টিভাল-এ, দলের সঙ্গে নাটক করতে এসে শিলাদিত্য এই হোটেলের ঠিক পনেরো তলাতেই ছিল। এবার থিয়েটার ওয়ার্কশপের সকলেই চোদ্দো আর পনেরো তলায় রয়েছে।

পরের দিন সকালে ওয়ার্কশপ আরম্ভ হওয়ার আগে, এগিয়ে এসে পরিচয় করল আসামের বাহিরুল ইসলাম আর ভাগিরথী। ওরা দুজনেই এন.এস.ডি.-র পুরোনো ছাত্রছাত্রী। নাটকের ভালোবাসার টানে ওদের হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের দূরত্ব ঘুচে গিয়ে থিয়েটারের সংসার। ওদের এক বছরের শিশুসন্তানটিকে ওয়ার্কশপের সময় দেখাশোনার জন্যে একটি কাজের মেয়েকে এনেছে আসাম থেকে। মুসলমান মেয়েদের 'তালাক' প্রথার বিরুদ্ধে ওরা নাটক নামাচ্ছে শুনে আরো কৌতূহলী হল শিলাদিত্য।

শিলাদিত্যের সঙ্গে দেখা-হওয়ামাত্র ভোল্ফরাম মেহরিং যারপরনাই খুশি। বললেন, 'ইচ্ছে থাকলেও এবার আর কলকাতায় যাওয়ার কোনো উপায় নেই, তবে রোজ আপনার সঙ্গে দেখা-হওয়া মানে কিছুটা করে কলকাতাকে কাছে-পাওয়া তো চলবে তিন সপ্তাহ।' বলে সবাইকে নিয়ে অভীমঞ্চের দিকে এগোলেন প্রবীণ তাজা মানুষটি।

যার ওপর দু-পা দিয়ে মানুষ দাঁড়ায় সেই ভূমি হল তার দেহের শক্তির উৎস। আর কটিদেশ হল দেহের ভরকেন্দ্র। এক পা এগিয়ে, এক পা পেছিয়ে — ডাইনে থেকে বাঁয়ে ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন করার আগে দু-পা ফাঁক করে ভূমির থেকে শক্তি-সঞ্চার করতে হবে।

মানুষের দেহের সামনের দিকটাই তীব্র অনুভূতিপ্রবণ। নাক, চোখ, ঠোঁট, বুক, নাভি এবং লিঙ্গ—দেহের সম্মুখভাগে থাকায় স্বাভাবিকভাবে যে-কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দেহের এই অংশগুলোই নাড়া খায় আগে। কিন্তু একজন অভিনয়শিল্পীকে তার পৃষ্ঠদেশের শক্তি সম্পর্কেও সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। নানা অভিমুখে চলনের জন্য তাকে পৃষ্ঠদেশ থেকেও শক্তি আহরণ করতে হবে। এমন একটা অবস্থা—যে মন চাইছে না তবু দেহ যেতে বাধ্য হচ্ছে—এই দোটানায় মানুষের পৃষ্ঠদেশের শক্তি কাজ করে।

একসময় অভিনয় ছিল বাস্তবের প্রতিফলন। কিন্তু আজকের বাস্তবের মধ্যে তো কোনোই বৈচিত্র্য নেই। কমপিউটারাইজড সমাজে আছে কেবল পুঞ্জীভূত খবর বা ইনফরমেশন। আজকের মানুষের বিস্মিত হওয়ার অবস্থা চলে গেছে। বিস্ময় নেই বলে সৌন্দর্যে মুগ্ধতা নেই। আর মুগ্ধতা না থাকলে জীবনের কীই-বা রইল?

ওয়ার্কশপের এই পর্যায়ে শিলাদিত্যের, কবিতার মুখের রেখা মনে পড়ল। কবিতার মুখের রেখার সৌন্দর্যে কি তার মুগ্ধতা জাগেনি? জীবনে সৌন্দর্যের মুগ্ধতাই মূলত বেঁচে থাকা। একুশ বাইশ বছরের হাসিমুখ থেকে সাতান্ন বছরের, আগামী তিনদিন কোনো মুগ্ধতা সংগ্রহের

অবকাশ থাকবে না। লখনউয়ের তিনদিনের শ্যুটিং সেরে কবিতা এই এন.এস.ডি. চত্বরেই শিলাদিত্যের সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।

ওয়ার্কশপের টি-ব্রেকে পরিচয় হল দিল্লির বাবলি, মহারাষ্ট্রের কমলা আর মহীশূরের মন্দাকিনীর সঙ্গে। ভাগিরথী ছাড়া আসাম থেকে আরো একটি বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের মেয়ে এসেছে। কল্পনা নাম মেয়েটার। অবশ্যই রীতিমতো সুন্দরী। নাচ থেকে নাটকে আসা মেয়ে। মোটেই গায়ে-পড়া নয় কিন্তু একটু কাছাকাছি এলেই খুব নেশা ধরিয়ে দেওয়ার। চেন্নাই আর হায়দ্রাবাদের দুই যুবক-নাট্যনির্দেশক, প্রথম দর্শনেই 'কল্পনা'য় যেভাবে কাত হয়ে পড়েছে—এই একুশ দিনে তার থেকে টেনে বার করা যাবে বলে মনে হয় না।

হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থর পনেরো তলার যে-ঘরটা শিলাদিত্য দস্তিদারের, তার কমন ওয়ালের উলটোদিকের ঘরটা আমেদাবাদ থেকে আসা অভিষেক দাভে-র। অভিষেকও কথক থেকে অভিনয়ে এসেছিল। এন.এস.ডি.-তে দুরন্ত রেজাল্ট করেছিল। চলায় বলায় বড্ড এফিমিনেট। প্রথমদিন সন্ধেবেলা থেকে শিলাদিত্য দেখতে শুরু করল—এক তাগড়াই শিখ যুবক অভিষেকের ঘরে ঢুকছে। বোঝা যাচ্ছে দু-জনে মদ্যপান করছে খুব। ক্যাসেট বাজছে। পান করতে করতে অভিষেকের নাচের শব্দ পেরিয়ে আসছে মাঝের দেওয়াল। কখনো কখনো দু-জন পুরুষের হাসি আর হুটোপুটির সঙ্গে খাটের শব্দও শোনা যায়।

শিলাদিত্য সন্ধের পর প্রেস ক্লাবে নির্মলকান্তি ও দিল্লির বাছাই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তুখোড় আড্ডা মেরে, একেবারে বুঁদ না হয়ে, বেশ ভারসাম্য রেখেই ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসে। পনেরো তলার জানলার কাচের ওপর শীতের বাতাস তখন জোর আঘাত করছে।

পরদিন ওয়ার্কশপে চর্চা তীক্ষ্ণ হয়। আজকের নাটক বহতা বাস্তবের প্রতিফলন না হয়ে, ভবিষ্যতের কল্পপ্রতিভা হয়ে উঠতে চায় কেন—এই আলোচনায়। চারপাশে যখন যা যা প্রয়োজন তাই তাই রয়েছে—সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক প্রযোজিত—তখন তো তার থেকে নাটক হয় না। নাটক হয় যখন সবকিছু ঠিকঠাক নেই।

দেখতে দেখতে তিনদিন পেরিয়ে গিয়ে, চারদিনের মাথায় কবিতা আর সঞ্জীবকুমার শর্মা ফিরে এল লখনউয়ে শ্যুটিং সেরে। ওরা দুজনে একদিন বিকেলের দিকে অনেকটা সময় হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থে শিলাদিত্যের ঘরে এসে, আজকের থিয়েটারে অভিনয়রীতি প্রসঙ্গে কথা বলে গেল। প্রশ্ন বেশিরভাগ কবিতারই। কথায় কথায় কবিতা জানাল, দিল্লি ম্যাক্সম্যুলর ভবনের পিটার জেভিৎসের সঙ্গে তার পরিচয় আছে।

কয়েকদিন পরে দিল্লি গ্যেয়টে ইন্সটিটিউটের প্রোগ্রাম অফিসার পিটার জেভিৎসের সঙ্গে কথার এক ফাঁকে শিলাদিত্য জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কবিতাকে তো আপনি চেনেন?'

'কথককেন্দ্রের কবিতা? ওকে তো চিনি, এখানে জার্মান ডান্সারদের নিয়ে একটা কথক ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল, তখন থেকে। কবিতা এখানে দারুন একটা প্রোগ্রাম করেছিল। মেয়েটা খুব স্পিরিটেড, স্মার্ট এবং খুব বোল্ড ক্যারেকটার।'

পিটার জেভিৎসের মুখে বিশেষণগুলো শুনে শিলাদিত্য হেসে বলল, 'তাই? আমি তো দেখছি স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই ও দিল্লির কালচারাল সার্কেলে যথেষ্ট পরিচিত। বেশ ডিমান্ড। বুঝতে পারছেন কী বলতে চাইছি? ঠিক গায়ে-পড়া ধরনের নয় অবশ্যই, তবে ভেতরে ভেতরে একরকমের টান ধরানোর ব্যাপারটা রয়েছে। স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট তো বটেই।'

'অন্তত একটা সময়ের জন্য আমি কবিতার কাছে ঋণী।'

শিলাদিত্য রীতিমতো চমকে উঠল জেভিৎসের মুখে 'ঋণী' কথাটা শুনে। তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার চোখে শিলাদিত্য তাকিয়ে থাকে পিটারের মুখের দিকে। পঞ্চাশোর্ধ্ব লম্বা টিকোলো নাক; দাড়িগোঁফ সমেত জেভিৎসের প্রশান্ত মুখের রেখায় কেমন যিশুর আদল জড়ানো।

পিটার জেভিৎস খুব ধীর গলায় বলতে থাকেন, 'আমি মানুষটা তো অনেককাল নিঃসঙ্গ। বহুকাল আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর আমার প্রাক্তন স্ত্রী আমার ছেলেকে নিয়ে চমৎকার রয়েছে জার্মানিতে। ছেলে বড়ো হয়েছে, বিয়ে করে সন্তানের জনক হয়েছে, কিন্তু কোনোদিন, কোনো অবস্থাতেই আমার খোঁজখবর করেনি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন তা করার প্রশ্ন ওঠে না। ভারতে চাকরি নিয়ে এসে হায়দ্রাবাদে আমি এক অনাথ ছেলেকে আমার সন্তান হিসেবে মানুষ করি। আমি কলকাতার ম্যাক্সম্যুলর ভবনে ছিলাম যখন—সেই সময় আমার এই ছেলে, সানি জেভিৎসের সঙ্গে শুভলক্ষ্মীর বিয়েতে তো আপনি এসেছিলেন শিলাদিত্য। আমার ছেলের বউ এখন দিল্লির এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। শুভলক্ষ্মীর তুলনা হয় না। আমার জীবনের সেরা আনন্দ—সানি আর শুভলক্ষ্মীর ছেলে—অমৃত। এ-ছাড়া, দু-বছর আগের সেই ট্র্যাজেডির কথাও তো আপনি জানেন।'

'জানি' বলে শিলাদিত্য চুপ করে গেল। কথা বাড়াল না। জেভিৎসের মুখ থেকেই ঘটনার বিবরণ শুনেছিল শিলাদিত্য। ঘটনাটি ঘটেছিল সেকেন্দ্রাবাদ রেল-স্টেশনের অল্প দূরে। ছোট্ট ছেলে অমৃতকে নিয়ে সানি আর শুভলক্ষ্মী ফিরছিল ট্রেনে। মা-র কোলের কাছে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল তিন বছরের অমৃত। আচমকা মা-র কোলের খাঁজ থেকে বেরিয়ে ট্রেনের কামরার মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে মজা করে দৌড়তে আরম্ভ করেছিল ছোটো ছোটো পা ফেলে। আতঙ্কে উঠে পড়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে গেছে সানি ছেলেকে ধরে নিতে। সানি হাত বাড়িয়ে অমৃতকে ধরে টেনে নেওয়ার আগেই, খোলা দরজা দিয়ে শিশু পড়ে গেছে বাইরে, পাশের ট্রেন ট্র্যাকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সানি। পাশের ট্র্যাকে ঝাঁপিয়ে পড়েই সে অমৃতকে তুলে সরিয়ে দিয়েছে লাইনের বাইরে, তারপর নিজেও লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে, অনেকটা এসেছে কিন্তু পুরোটা পারেনি।

উলটোদিক থেকে ট্রেন আসছিল। সানির শরীর তার একটা পা সমেত লাইনের বাইরে চলে এসেছিল, কিন্তু তার অন্য পা-টা টেনে নেওয়ার আগেই ট্রেনের চাকা চলে গিয়েছিল ডান পায়ের হাঁটুর নিচ দিয়ে। ডান পায়ের পাতা এবং তার ওপরের খানিকটা অংশ কেটে আলাদা হয়ে গেছিল। হাসপাতালে অ্যামপিউট করে ওই ডান পা-র হাঁটুর ওপর থেকে বাদ দিতে হয়েছিল—সানিকে বাঁচানোর জন্যে।

শোকে পাথর পিটার জেভিৎস; সানি, শুভলক্ষ্মী আর অমৃতকে হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লিতে, তার নিজের কোয়ার্টার্সে নিয়ে এসেছিলেন। বড়ো কোয়ার্টার্স। থাকার কোনো রকমের অসুবিধেই নেই। কিন্তু ওই রকম শোকবিহ্বল পরিস্থিতিতে সানির শুশ্রূষা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত শুভলক্ষ্মীর পক্ষে ঠিক মতো অমৃতকে দেখার অবস্থা ছিল না। এই সংকটে, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত বাড়িটাতে কবিতা মেয়েটা নিজের থেকেই এগিয়ে এসেছিল, দিনরাতের অনেকটা সময়—প্রতিদিন যতটুকু পেরেছিল সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিল খুব নিকটতম আত্মীয়ের মতো। সেই দুঃসময়ের

দুটো মাস, কবিতার সহযোগিতা ছাড়া জেভিৎসদের সব কিছু কোনোভাবেই ঠিক মতো চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কথা ছিল ন্যাশন্যাল স্কুল অফ ড্রামার থিয়েটার ওয়ার্কশপ শেষ হবে যেদিন, সেদিন রাতে জেভিৎসের কোয়াটার্সে ছোট্ট গেট-টুগেদারে ভোল্ফরাম আর শিলাদিত্যের সঙ্গে এই দুই কমবয়সী—কবিতা আর সঞ্জীবকুমার শর্মার নিমন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ডিনারের সে-আসর বাড়ির তিনজন আর বাইরের চারজন, এই মোট সাতজনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আরো জনা সাতেক নারী-পুরুষ, যারা দিল্লির কথক জগতের চূড়োয়, সেই আসরে আমন্ত্রিত।

শুরু থেকেই শিলাদিত্য লক্ষ করেছে, কথকগুরু ভানু মহারাজকে ঘিরে রয়েছে তিন যুবতী; রাজেশ্বরী, অনামিকা আর জয়া। মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্যা বলে দিল্লির সংস্কৃতিজগতে সকলের পরিচিত। পার্টি চলাকালীন সকলের সঙ্গে ভোল্ফরাম এবং ভানু মহারাজের আলাপ জমে উঠতে উঠতে, শিলাদিত্য এটাও বুঝতে পারল যে, বয়সে ছোটো হলেও কবিতাকে ওই তিন যুবতীর খুব অপছন্দ।

কথকগুরু গোটা জীবন ধরে এত নাচের রেওয়াজ করেছেন, তবু মধ্যশরীরে তার মেদের ভার কম নয়, বিশেষ করে একই বয়েসী জার্মান থিয়েটার রেগিয়ার মানুষটির পাশে বেশ চোখে লাগে। ভানু মহারাজের সেক্রেটারিটিও রীতিমতো হোঁতকা মিশকালো গুরুভার গড়নের। নাম মহেন্দ্রজি। একটা লম্বা ঝুলের মেরুন রঙের পাঞ্জাবি পরে মহেন্দ্রজি মেয়েদের সঙ্গে রঙ্গরসে মেতে থাকলেন সারাক্ষণ। কবিতা একসময় নামানো গলায় শিলাদিত্যকে বলল, 'মারাত্মক নারীমাংসের চাহিদা এই মহেন্দ্রজির। গুরুমহারাজের সেক্রেটারি তো — এখানে বড়ো বড়ো আসরে কিংবা মিডিয়ায় পাত্তা পেতে গেলে ওর মদত জরুরি। গুরু মহারাজকে ঘিরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে একেও কীরকম কারো আওতায় এগোতে দিচ্ছে না ওই তিন সুন্দরী, সারাক্ষণ নজর রাখছে, পাছে ওদের রাজ্যপাটে কেউ আচমকা ঢুকে পড়ে।'

হেসে শিলাদিত্য বলে, 'কেউ বলতে তুমি ছাড়া আর তো কোনো প্রতিযোগী নেই ওদের। আরে, মহেন্দ্রজিই দেখছি গ্লাস হাতে নিয়ে তোমার দিকেই আসছেন। বেচারা তিন সুন্দরী!'

সি.ডি.-তে হালকা হয়ে বাজছিল সাম্ফির স্টিল পাইপ। শিলাদিত্যের খুব প্রিয় সাম্ফির এই স্টিল পাইপের সুরটা বুকের মধ্যে কেমন যেন কেটে বসে যায়। আচ্ছা, সুরের কি কোনো গন্ধ থাকে? অদৃশ্য বর্ণ তো থাকেই। ব্যথার নীল কেমন গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে যায়। শিরা-উপশিরার অন্তর্গত রক্ত ছলকে দেওয়ার সিম্ফনি আলাদা। মিস্টার মেহরিং, রুদ্রবীণার আওয়াজ আপনার কেমন লাগে?

মহেন্দ্রজি এগিয়ে এসে, বড়ো ঘর থেকে কবিতাকে বাইরের বারান্দার দিকে নিয়ে যেতে আগ্রহী যখন, দূর থেকে, সঞ্জীবকুমার যেখানে সানির পাশে বসে ভোল্ফরামের সঙ্গে খুব মগ্ন হয়ে কিছু একটা আলোচনা করছে, দক্ষিণ কোনার সেই দূরত্ব থেকে, আচমকাই অনামিকা অতিরিক্ত উঁচু গলায় বলে উঠল, 'কি মহেন্দ্রজি, এর মধ্যেই ঘুম পেয়ে গেল? আর কত নতুন মালদের চান্স দেবেন?' বলতে বলতে গ্লাসের তরলে আরো একবার চুমুক দিয়ে অনামিকা

যেন কিছুটা বেপরোয়া হয়ে ছুঁড়ে দেয় মোক্ষম কথাটা, 'কচিগুলো মনে করে কী? নাচের রেওয়াজের চেয়ে আপনার সঙ্গে শোওয়ার রেওয়াজটা বেশি জরুরি?' শিলাদিত্য বুঝতে পারে নেশার ঘোরে আর তীব্র ঈর্ষার জ্বালায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে অনামিকা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছে কবিতা। কবিতার কণ্ঠস্বর যে এত জোরদার আর চাঁচাছোলা হতে পারে, গত তিন সপ্তাহে পরিচয় প্রতিদিন প্রগাঢ় হলেও শিলাদিত্য ভাবতে পারেনি।

সেক্রেটারি মহেন্দ্রজিকে নয়, সরাসরি ভানু মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বলে কবিতা, 'গুরু মহারাজ, নাচকে কোথায় টেনে নামিয়েছেন আপনারা? নাচের দুনিয়ার চূড়োয় বসে এর পাবলিসিটি পাওয়ারের পাভারা ভাবছেটা কি? এ-লাইনে নাড়া বাঁধলেই তাদের হুকুমের নোকরানি হবে? ঘেন্না, ঘেন্না, এক বিদেশি মানুষের সামনে শোওয়ার ফিরিস্তি মারছে? উনি না হয় হিন্দি বোঝেন না, কিন্তু আপনার নাকের ডগায় এই বেহায়াপনা আপনি বরদাস্ত করছেন? আপনারা তেল মারার প্রতিযোগিতা চালু করে নতুন শিল্পীদের আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করার এই জঘন্য খেলা আর কত খেলতে চান?' একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে পটভূমি যেন অগ্নিবর্ণ করে দিল কবিতা।

পরিস্থিতি একেবারে অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে, জেভিৎস, সানি, শুভলক্ষ্মী-সহ শিলাদিত্য আর সঞ্জীবকুমার ব্যাপারটা সামাল দিতে শুরু করে দেয়। সাউন্ড সিস্টেমে জোরে তখন আলী আকবরের সরোদ।

এই ক-দিনে কবিতা সম্পর্কে শিলাদিত্যের ধারণাটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না ঠিকই; প্রতিদিনই একটু একটু করে বদল হচ্ছিল। কিন্তু আজ, খানিক আগে, একেবারে পুরোপুরি বদলে গেল। তাতে মেয়েটা সম্পর্কে তার টান ঘুরপথে আরো বেড়ে গেল যেন। আজই তো, এখানে আসর যখন সবে জমতে শুরু করেছিল, সঞ্জীবকুমারের কাছে ভোল্ফরাম যখন কয়েকটি মুদ্রা দেখছেন কথকের, কবিতা তখন ঘুরছে ভোল্ফরামের কাছ থেকে সানি, তারপর সানির কাছ থেকে মহেন্দ্রজি হয়ে ভানু মহারাজ। তারপর বিক্রম আর মকবুল, প্রত্যেকের কাছে কিছুটা সময় পাক খেয়ে, শেষে শিলাদিত্যের পাশে এসে দাঁড়ায় যখন কিছু একটা বলবে বলে, তখন শিলাদিত্যই বলে বসল, অবশ্য অনেকটাই মজার গলায়, খেলাচ্ছলে, 'কবিতা, কোনো কোনো মেয়ে কি এক পুরুষের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে আর এক পুরুষের শরীরে বন্দী হতে চায়?'

উত্তরে কবিতা বলেছিল, 'সব বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি থাকে, আবার সব মুক্তিই ফিরে ফিরে নিয়ে যায় ক্রমশ এক বন্ধনে।' ওর কথাটা শুনে শিলাদিত্যের সংশয় হয়েছিল—কথাটা কি বাইশ বছরের তরুণীর নিজের উপলব্ধি থেকে উঠে আসা, নাকি অন্য কারো কাছ থেকে শোনা কথা?

এই তো আগের রবিবার, আর্ট গ্যালারি থেকে বেরিয়ে কবিতা যখন বলল যে, সংলাপের ভাষা না বুঝলেও, সে সন্ধে থেকে শিলাদিত্যের সঙ্গে বসে বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা দেখবে, কেন না কত রাতে গুরগাঁও থেকে সঞ্জীবকুমার একটা মডেলিংয়ের কাজ সেরে ফিরবে তার ঠিক নেই, তখন খুব কাছের মানুষের গলায় শিলাদিত্য শুনিয়েছিল, 'কবিতা, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার সান্নিধ্যে না এলে জানা হত না, আমার

মধ্যে সৌন্দর্যে মুগ্ধতার এত আনন্দ লুকিয়ে আছে যা কিনা এমন অসমবয়সী বন্ধুত্বের টানে হু হু করে বেরিয়ে আসতে পারে।'

তখন মজার গলায় জানতে চেয়েছিল কবিতা, 'মুগ্ধ হয়ে সবাইকে কি আপনার এই একই কথা বলার অভ্যেস? জানেন, প্রথম আলাপ থেকেই ভাবছি, এই বয়সে এত সৌন্দর্য-মুগ্ধতার, এত ভালোবাসার দাপট আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে?'

পরপর দুটো কট্টর বাস্তববাদী বাংলা একাঙ্ক নাটকের অভিনয় দেখে কবিতাকে হস্টেলে পৌঁছে দিতে দিতে শিলাদিত্য জানিয়েছিল, 'বুঝলে, সুন্দরের উৎস খুঁজতে গেলে তা কতখানি বাস্তব হয়েছে দেখলেই চলবে না। দেখতে হবে তার মধ্যে সুন্দরের প্রতিশ্রুতি কতটা রয়েছে।'

'তাই নাকি? তা হলে তো জানতে কৌতূহল হয়, আপনার মূল্যায়নে আমার মধ্যে আদৌ কোনো সুখের প্রতিশ্রুতি আছে কি না?'

সঙ্গে সঙ্গে অকপট স্বীকারোক্তির স্বরে বলেছিল সে, 'ওটাই তো সবটুকু বুঝতে পারছি না—ঠিক কবিতাশিল্পের মতো ধরার মধ্যেই অধরা মাধুরী। সবটুকু বুঝে ফেললে আর কবিতা-রহস্য রইল কোথায়?'

তখন কবিতা রিনরিন করে হেসে উঠেছিল।

উত্তপ্ত আবহ শান্ত হওয়ার পর, রাতের ভোজ শেষে জয়া জয়সোয়ালের প্রশ্নের জবাবে ভোল্ফরাম মেহরিং বলছিলেন, 'ভারতীয় তথা এশিয়ার মানুষের শরীরের ভরকেন্দ্রটি সবসময় থাকে মাঝখানে—দু-পায়ের মাঝখানে তা প্রোথিত। মুনিঋষিদের ধ্যানমগ্ন মূর্তিতে এই কেন্দ্র খুব স্পষ্ট। আর শরীরের মাঝখানে ভরকেন্দ্র থাকলে তো আত্মবিশ্বাস বাড়ার কথা। আমাদের য়ুরোপে কিংবা আমেরিকায় মানুষের ভরকেন্দ্র দু-পায়ের মাঝখানে নয়। স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে যেমন—পুরোনো গ্রিক ভাস্কর্যেও তেমনি—ভরকেন্দ্র মাঝখানে নেই।'

ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত ছুঁলে একে একে নিমন্ত্রিতরা যে-যার বাড়ি ফেরার জন্যে উঠে পড়ে। কথকগুরু ভানু মহারাজ আজ সারাক্ষণ প্রায় নীরব থেকেই তাঁর গুরুত্ব ধরে রাখতে চাইলেন মনে হল। অবশ্য কেউ কেউ বেশি মদ্যপানে কথা থেকে ছুটি নিতে ভালোবাসে। ভানু মহারাজ এবং মহেন্দ্রজির গাড়িতে রাজেশ্বরী, অনামিকা আর জয়া লিফ্‌ট পায়। বিক্রমের বাইকে মকবুল উঠে যায়। ক্রাচে ভর করে সানি বিদায় মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গ দেয় প্রত্যেক অতিথিকে।

ভিড় কমে যাওয়ার পর শিলাদিত্য ট্যাক্সি নিয়ে ভোল্ফরাম মেহরিং আর সঞ্জীবকুমারকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, বিদায় নেয় জেভিৎসদের কাছ থেকে। কবিতা আজ রাতটা থেকে যাবে শুভলক্ষ্মীর কাছে। মেহরিং নীচে নামার আগে কবিতা জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি তো অনেকবার ইন্ডিয়ায় এলেন। আচ্ছা আপনার কি এখনো মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বের এই একটা দেশ যেখানে নিম্নবর্গের মানুষ অনাহারে মরে, স্কুল বিল্ডিং-এ আগুন লেগে পুড়ে যায় শতাধিক শিশু; সেখানেই একদিকে গোধরা—অন্যদিকে টেস্ট আর ওয়ানডে ক্রিকেটের উল্লাস—এমন কঠোর বাস্তবতার মাঝখানে—আমাদের মতো কিছু মানুষের কথক নৃত্যচর্চা—ভারতবাসী হিসেবে দায়িত্বহীনতার পরিচয়?

শিলাদিত্য বলে উঠল, 'শোনো, রম্যাঁ রলাঁর মতো মানুষও দেশের উত্তপ্ত পটভূমিতে, স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ অধ্যায়ে, রবীন্দ্রনাথের আত্মমগ্ন সাহিত্যচর্চা দেখে বিব্রত হয়েছিলেন। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের নিম্নবর্গের মানুষদের সমস্যা সংকট-সহ যা কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক, জ্বলন্ত-বাস্তবতা; তাই শিল্পসাহিত্যের একমাত্র বিষয় হবে—এমন গোদা কথা ভাবার মানুষ উনি নন—এ-টুকু তোমাকে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

বেরিয়ে আসার মুখে ভোল্ফরাম মেহরিং বললেন, 'দ্যাখো কবিতা, একজন শিল্পী তার চারপাশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, আবার সেই শক্তিকেই বিলিয়ে দেয়। শিল্পীর কিছু ধরে রাখার নেই। সে যা সংগ্রহ করে, নিজের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তা ফিরিয়ে দেয়। পায়ের পাতার বাইরের ধারটা ভূমিকে আঘাত করে—সেইখানে তার জোর। কথাকলি নাচেও তো তাই — চরণের বাইরের ধারটাই ঘা দেয় জমির ওপর।'

শিলাদিত্যরা যখন বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠল, জেভিৎস পরিবারের সঙ্গে কবিতাও এসে দাঁড়াল বাইরের লোহার গেটের সামনে। পিটার, সানি এবং শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে বিদায়-দৃষ্টি বিনিময় করে, শেষে কবিতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে গিয়ে শিলাদিত্যের মনে পড়ল শেষ দিনের ওয়ার্কশপের কয়েকটি মুহূর্ত।

একুশজন নাট্যকর্মী সারিবদ্ধ হয়ে অভীমঞ্চে দাঁড়ানো। প্রত্যেকে তার সঙ্গীকে অনুভবের সমস্ত শক্তি উজাড় করে আদর করে চলেছে — স্পর্শ নয়, স্পর্শের গতি-তরঙ্গ জাগিয়ে তোলা দু-হাতের মুদ্রায়। তখন আদর দিতে দিতে, আদর পাওয়ার স্পর্শকাতরতা — আদর পাওয়ার শিহরন সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে শরীরের রেখায় রেখায়। নারীপুরুষ নির্বিশেষে—চর্চারত এক শরীর থেকে পরবর্তী সঙ্গীর শরীরে — তার থেকে তার পরের শরীরটি ঘিরে সানুরাগ — কাউকে স্পর্শ না করেই দেওয়া ও নেওয়ার সেই অনুভবমালা — দেহ ছাড়িয়ে — দেশ ছাড়িয়ে — বিশ্ব ছাড়িয়ে — নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে — নীহারিকা থেকে নীহারিকায় সঞ্চারিত এই অন্তর্গত দেহছন্দের ভেতর থেকে সাড়া পাওয়ার আঙ্গিক ও অনুভবের ঐশ্বর্য।

এখন দিল্লির শীতের মধ্যরাত পেরিয়ে ট্যাক্সি ছুটে যেতে থাকে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এক সময় 'আউফহুইদারজেন' জানিয়ে ভোল্ফরাম নেমে যান তাঁর হোটেলের প্রবেশদ্বারের সামনে।

ট্যাক্সি আবার চলতে থাকলে শিলাদিত্য জানতে চায় যে কবিতা আর সঞ্জীবকুমারেরা জম্মুর একই এলাকার কি না?

'ছোটোবেলা থেকেই আমরা দু-জনে এক স্কুলে পড়েছি, একই গুরুর কাছে কথকের তালিম নিতে শুরু করেছি, একসঙ্গে বড়ো হয়েছি।'

সঞ্জীবকুমার শর্মা বরাবর অল্প কথা বলে। শুনতে ভালোবাসে।

'এক একটা মানুষ থাকে, প্রথম নজরেই মনে হয়, তাদের সবটুকু চেনা হয়ে গেল। পরে ভুল ভাঙে যখন, মনে হয়, কী করে এতটা উলটো ভাবা গিয়েছিল?' বলে শিলাদিত্য কিছু সময় চুপ থেকে আবার বলে, 'কবিতার ভেতরের জোর আমাকে চমকে দিয়েছে। ভানু মহারাজের মতো তোমাদের জগতের প্রচণ্ড প্রভাবশালী মানুষকে ওইভাবে বলতে শুনে আমি আরো বুঝেছি ওর ভালোবাসার জোরটা, তোমাদের দু-জনের দু-জনকে ভালোবাসার শক্তিটা কোথায়।'

'কবিতা আপনাকে ভালোবাসে। কবিতার প্রতি আপনার ভালোবাসাকে ও শ্রদ্ধা করে খুব। এ-ভালোবাসার তো অন্যরকমের আলো।' ইংরেজি আর হিন্দি মিশিয়ে আরো কিছু একটা বলতে গিয়ে সঞ্জীবকুমার শর্মা, ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবে না বলে থেমে যায়।

'দ্যাখো, ভালোবাসার আবেগ প্রকাশ শিল্পের সবচেয়ে ব্যাপক বিষয়। ''ভালোবাসা'' শব্দটা এখন এত অসংখ্য অর্থব্যঞ্জক হয়ে গেছে যে এই শব্দটা দিয়ে মানুষের অনুভবের বিশাল এলাকাকে ধরা যায়। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষায় ভালোবাসার বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য কত রকমের শব্দই না ছিল। নিছক বিষয়-সংগ্রহকারী আধুনিক মানুষ তার জীবনের চারধার থেকে যত বেশি করে পারে শব্দ ছাঁটাই করে দেয়।

'হয়তো এমনও হতে পারে, একজনের সঙ্গে যখন ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন সে সামনে আছে বলেই তার গুরুত্ব জাগে না তেমন। তখন দ্বিতীয় আর-একজনের জন্য আকর্ষণ বোধ করে প্রথমজনকে ক্রমশ হারাতে থাকি। আবার হারিয়ে যেতে যেতেই প্রথম জনের গুরুত্ব বেড়ে যেতে থাকে ক্রমে। একজনের সম্পর্কটা যত পাই—অন্যজনের সম্পর্কটা যে ততই হারাই। ওই হারানো-বিষাদ যে মানুষের অনন্ত অনুভবের। প্রতিনিয়ত, প্রতিটি মুহূর্ত, তার ভেতরে এই হারানো বোধটার মধ্যেই তার ইচ্ছার জন্ম হয়। আর ইচ্ছার জাগরণের শব্দে, বর্ণে, গন্ধে, স্পর্শে মানুষের বেঁচে থাকার মানেটা খুঁজে পাওয়া যায়। ইচ্ছা জাগলে নদী, পর্বত, অরণ্য—সব রকমের বাধা; বাইরের বাধা, ভেতরের বাধা, পেরিয়ে যায় মানুষ।'

সঞ্জীবকুমার শর্মাকে তার ডেরার সামনে নামিয়ে দিয়ে এবার ট্যাক্সি ছুটতে থাকে হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে।

শিলাদিত্যের একসময় মনে হয় — এই শীতের রাত্রির অন্তহীন টানেলটার মধ্য দিয়ে ট্যাক্সিটা কেবল ছুটতেই থাকবে... পৌঁছবে না কোথাও... ... ...

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. অভীমঞ্চ : দিল্লির এন.এস.ডি.-এর যে-মঞ্চে নাটক অভিনীত হয় সেই মঞ্চটির নাম।

২. রেগিয়ার : জার্মানভাষায় পরিচালক।

৩. সাম্ফির স্টিল পাইপ : সাম্ফি একজন জার্মান সংগীতস্রষ্টা। 'স্টিল পাইপ', তাঁর একটি সংগীত রচনার নাম।

ইতিহাসের এক টুকরো

বিজনকুমার ঘোষ

আমার প্রথম যৌবনের গল্প এটি।

নতুন পাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়েছি। ঘরে আড়াই বছরের একটি শিশু। ওর দারুণ স্মরণশক্তি। কানে একবার গেলেই হল, অন্তত দু-বছর সে-কথা মনে রাখবে। ওই বয়সের কিছু বাচ্চাকে দেখেছি কোনো প্রিয় কথা ছ-মাস মনে রাখে। প্রিয় কথা বলতে 'চকলেট কিনে দেব', 'রেলগাড়ি', 'বন্দুক'— এই সব। কিন্তু বিলু সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের। এসবের বাইরের কথাবার্তাও দিব্যি মনে রাখে। যেমন কেউ হয়ত বলল, 'বর্ধমানে ধানের দর এখন চারশো টাকা কুইন্টাল', বিলু চোখ বড়ো বড়ো করে শুনে সে-কথাটা মুহুর্মুহু স্থানে-অস্থানে বলে বেড়াতে লাগল। এতে কারো কারো হাসি পেলেও অনেকেই ভাবতে শুরু করল, এ-শিশু বড়ো হয়ে ডেঁপো ছোকরা হবে।

আমি কারখানায় কাজ করি। ফোরম্যান। দু-সপ্তাহ ডে, এক সপ্তাহ নাইট। এইভাবে কাজ ও বছর এগিয়ে চলে। নাইট ডিউটির সময় আমার মুশকিল হয়। সন্ধ্যায় অন্যদের যখন জমিয়ে আড্ডা দেবার সময়, তখন আমাকে খেয়েদেয়ে বেরুতে হয়। তবে সকালটা পাই। তখন অন্যদের অফিস যাওয়ার তাড়া। পাছে কথা বলতে গিয়ে লেট মার্ক পড়ে সেজন্যে কেউ চোখের দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

তবে একজন আছেন, জগৎবাবু, পরিচয় অল্পদিনের, কিন্তু বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছে। জমে উঠবার কারণ ভদ্রলোক বেশ রসিক। বালিগঞ্জের ওদিকে এক প্রাথমিক স্কুলের টিচার। ভোরে স্কুল। দশটার মধ্যে বাড়ি চলে আসেন। আমিও ঠিক ওই সময় যাই। চা, জলখাবার সহযোগে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত জোর আড্ডা। এর মধ্যে সদাশয়া বউদি ফের জিজ্ঞাসা করেন — আর এক কাপ চা চলবে?

বেরোবার সময় একটা উৎপাত স্ত্রী হাতে ধরিয়ে দেয়, তার নাম বিলু। বলে — আমাকে রান্না করতে দেবে না, জ্বালিয়ে মারবে।

আমি বলি — জগৎদার ছোটো ঘর, বাচ্চা-টাচ্চা নেই, কার সাথে খেলবে?

— একটা বল হাতে তুলে দেবে, নিজের মনেই খেলবে। তোমরা তো আড্ডা মারবে, আমার কত কাজ!

সেদিন আড্ডার মাঝখানে এক ভদ্রলোক এলেন। আমার চাইতে বড়ো, জগৎদার সমবয়সী। খুবই রোগা ও দুর্বল চেহারার লোক। জগৎদা বললেন — এসো অমর, আলাপ করিয়ে দি। আমার বন্ধু অটলবাবু। এ-পাড়ার প্রবীণ বাসিন্দা। মস্ত বড়ো শিল্পী। একদা অবন ঠাকুরের কাছে ছবি আঁকা শিখেছেন।

আমি মুগ্ধ হয়ে বলি — তাই নাকি?

উনি প্রতিনমস্কার করে বলেন — আজ্ঞে হ্যাঁ।

হ্যাকেল সাহেব তখন ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমির প্রিন্সিপাল। অবন ঠাকুর ভাইস প্রিন্সিপাল। আমি তাঁর প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলাম।

আমি বিস্মিত! মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। রোজ ছাইভস্ম আড্ডা দি, খালি ইস্কুলের গল্প আর কারখানার গল্প! এতদিন বাদে এক গুণী মানুষের দেখা পেলাম।

বউদি দু-খানা আটার রুটি, তরকারি আর চা নিয়ে এলেন। খুব খুশি অটলদা। বললেন — অবন ঠাকুরের শেখাবার স্টাইলই ছিল আলাদা। কখনো অভিনয় করে, কখনো মুখভঙ্গি করে অথবা ছড়া বলে শিক্ষা দিতেন। বলতে বলতে একটু নেচেও নিলেন অটলদা। অবন ঠাকুর নাকি একদিন ক্লাসে এভাবেই নেচেছিলেন। মুখে ছিল গ্রাম্য ছড়া। তার একটা লাইনই শুধু মনে আছে অটলদার, 'ধর্মষাঁড়ের পোঁদে কাদা'...

সেকালে বাঙালি রুচির ঠিকাদারি নিয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। সেক্ষেত্রে অবন ঠাকুরের মুখ দিয়ে 'পোঁদ' শব্দটি বের হবে ভাবা যায় না। জগৎদারও একই মত। তবে গ্রাম্য ছড়া যখন, তা বদলে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ছেলে কোলে বাড়ি ফিরি।

নতুন পাড়ায় জগৎদা বন্ধু ছিল, আর একজন জুটল, তিনি অটলদা। বিকেলের আড্ডা সকালে পুষিয়ে নেওয়ার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। একদিন বাজার করে ফেরার পথে অটলদার সঙ্গে দেখা। আমাকে এক রকম জোর করে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। পুরোনো আমলের বেশ বড়ো বাড়ি। বোঝাই যায় বহুকাল রাজমিস্তিরির সেবা-বঞ্চিত। এখানে-ওখানে আস্তর খসে পড়েছে। যে-ঘরে এনে বসালেন অটলদা সে-ঘরও ভয়াবহ। ছাদ ফুটো করে একটা বটগাছ উঠে গেছে আকাশে। জিজ্ঞাসা করি — বৃষ্টি পড়ে না?

— পড়ে। বালতি পেতে দি।

— সারান না কেন?

— কী করে সারাব? একটা পয়সা আর নেই। ছেলের সামান্য মাইনে। তাও প্রায়ই চাকরি চলে যায়। আবার আর একটা ধরে। কোনো রকমে ঠেকা দিয়ে চলছে।

হঠাৎ বিপরীত দেওয়ালে চোখ ঠিকরে পড়ল। বিশাল এক অয়েলপেইন্টিং। বনপথে হরিণশিশুর সঙ্গে শকুন্তলার খেলা। এক কথায় জীবন্ত। পথের পাশে ভুঁইচাপা ফুলটি যেন এইমাত্র ফুটে উঠল। বটের ঝুরি একটু পরেই মাটিতে ঠেকবে।

নীরবতা ভাঙলেন অটলদা — আপনার ভালো লেগেছে?

— দারুণ, দারুণ! অবন ঠাকুরের শিষ্যের হাতেই এই ছবি সম্ভব।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল খোঁচা খোঁচা দাড়িভরতি অটলদার শীর্ণ মুখ। এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ একটি মানুষ শুধুমাত্র ছবির দুনিয়ায় রাজা!

মিনিট কুড়ি অটলদার বাড়িতে ছিলাম, কিন্তু বউদির সঙ্গে আলাপ হল না। জগৎদার মুখে শুনেছি বউদির বয়স কম এবং সুন্দরী। এ-কারণে অটলদা একটু সন্দেহবাতিক।

দিনকয়েক পর সুন্দরী বউদি সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য জানা গেল। আড্ডার মাঝখানে হন্তদন্ত হয়ে অটলদা এলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাল তাঁকে। এসেই হুকুম করলেন — আমার জন্যে চা করতে হবে না।

— কেন, খাবেন না কেন? সবার জন্যেই তো করছি।

জগৎদা হেসে ফেলে বললেন — যত রাগ চায়ের ওপর! চাঁপার সঙ্গে কিছু হয়েছে নাকি?

— ওর সঙ্গে কিছু হয়নি। তবে বিষ্টুকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি। অবশেষে মুখ খুললেন অটলদা।

আমি স্তম্ভিত। এই চেহারায় একজনকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া সহজ কাজ নয়! নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ব্যাপার আছে।

জগৎদা বললেন — বিষ্টুর কি তাতে উচিত শিক্ষা হবে?

— এর পরে গায়ে হাত তুলব। আজই হয়ে যাচ্ছিল এক চোট!

আমার হাসি পেল। যার বুকের হাড় ক-খানা গোনা যায়, সে তুলবে কী না গায়ে হাত! যদিও বিষ্টুকে আমি দেখিনি।

— কী হয়েছে খুলে বলবেন তো? জগৎদা তাড়া দেন।

— আমি বাড়ি না থাকলেই ওই ব্যাটা এসে ঘরে ঢুকবে। বেরিয়েছিলাম এক জায়গায় যাব বলে। কাজ না হওয়ায় তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। দেখি বিষ্টু আমার বিছানায় বসে চা খাচ্ছে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল। চিৎকার করে উঠলাম — হারামজাদা আমার বউয়ের সঙ্গে প্রেম হচ্ছে? বের হ শিগগির, দা দিয়ে তোর গলা কেটে ফেলব, এই বলে খাটের তলা থেকে দা-খানা তুলেছি।

— বলেন কী? তারপর?

— চায়ের কাপ ফেলে ভোঁ দৌড়। আমিও পেছন পেছন রাস্তায়।

— আর চাঁপা?

— ওর তো একটাই কাজ, আমাকে গালাগালি করা। — ভদ্রলোকের ছেলেটা এসে বসেছে, এক কাপ চা দিয়েছি, সহ্য হল না, দা দিয়ে কাটতে গেল! অসভ্য, ইতর, ছোটোলোক! বাবা কার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল? একদিনও শান্তি পেলাম না। কোপটা যদি গলায় পড়ত, তা হলে এতক্ষণে পুলিশে ছেয়ে যেত বাড়ি। আমিই সাক্ষী দিতাম আদালতে।

— তো আপনি কী বললেন?

— এসব ফালতু কথার উত্তর দেওয়ার লোক আমি নই। বলেছি, যদি ফারদার বিষ্টু ঘরে ঢোকে তা হলে এক কোপে গলা নামিয়ে দেবো।

— বাঃ, তা হলে তো আপনারই জিত। তবে চা খাবেন না কেন?

অবশ্য বউদি তার আগেই চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল। আমার কল্পনায় একটি দৃশ্য উঠে এসেছে ততক্ষণে। অবন ঠাকুরের প্রথম ব্যাচের ছাত্র অটলদা সঙ্কল্পে অটল হয়ে দা হাতে ছুটতে ছুটতে রাস্তায়। আর ভদ্রলোকের ছেলে বিষ্টু প্রাণভয়ে চায়ের কাপ ফেলে আরো জোরে ছুটছে। রাস্তায় কি তখন ভিড় জমে গিয়েছিল? ওরা কি তখনই ব্যাপারটা জানতে পেরে হাসাহাসি করল? তবে যে শুনেছি স্ত্রী অসতী হলে স্বামীর আগে প্রতিবেশীরাই জানতে পারে! কল্পনায় আরো একটা ব্যাপার ছিল। দা-টার ওজন কত? ওই লিকলিকে হাতে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল? চাঁপা বউদির সমর্থন কার দিকে, অটলদা না বিষ্টু? অটলদা একে বৃদ্ধ তায় দুর্বল। অন্য দিকে বিষ্টুর নিশ্চয়ই সুস্বাস্থ্য এবং বয়স কম। ডায়ালগ শুনে মনে হয় চাঁপা বউদির সায় বিষ্টুর দিকেই। কৈশোরে আমি একটি প্রবাদবাক্য শুনি! পাশাপাশি দুই

বাড়ির ঝি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে নিচু স্বরে। আমার উপস্থিতি কেউই টের পায়নি। একজন আর একজনকে ধাক্কা দিয়ে হেসে বলছে — ভাতার হলি ব্যথা পায়, নাং হলি সুখ পায়।

কথাটার মানে তখন না বুঝে পুষে রাখি মনের মধ্যে। পরে বুঝতে পেরে হেসেছি।

জগৎদা কিংবা তাঁর স্ত্রীর, এই সিরিয়াস বিষয়ে কোনো হেলদোল নেই। তারা হাসিঠাট্টা চালিয়ে যেতে লাগল। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠে বিলুকে কোলে তুলে নিই।

বাড়ি ফিরে বিলু যে এমন ঝামেলা পাকাবে সে কে জানত! সদ্য বিয়োনো বাছুর যেমন ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁকি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে তেমনি বিলু বলতে লাগল — হারামজাদা, আমার বউয়ের সঙ্গে প্রেম? দা দিয়ে তোর গলা কেটে ফেলব।

সর্বনাশ! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস ওর মা শুনতে পায়নি, রান্নাঘরে ব্যস্ত। আশ্চর্য, অবিকল ডায়ালগ মনে রেখেছে, স্পষ্ট উচ্চারণে! বিলু তো ঘরের মধ্যে একটা লাল বল নিয়ে দাপাদাপি করছিল! কখন শুনল? ওকে কাছে ডেকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করি। — লক্ষ্মী সোনা, ও কথা বলতে নেই। আজ বিকেলে তোমাকে অনেক চকলেট কিনে দেবো।

বিলু মাথা কাত করল।

হা কপাল! চান করতে ঢুকেছি আর বেরিয়েছি, পাঁচ মিনিটই লাগুক, এর মধ্যে হা হা করে তেড়ে এল স্ত্রী। — ছেলেকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে? বস্তির হাবিজাবি ভাষা শিখে এসেছে।

হেসে ফেলে বলি — কেন, কী বলছে?

— ছেলের মুখেই শোনো তা হলে। এই বলে স্ত্রী বিলুকে দাঁড় করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অটলদার স্টাইলে বলে উঠল — হারামজাদা, আমার বউয়ের সঙ্গে প্রেম? দা দিয়ে তোর গলা কেটে ফেলব। শিগগির দূর হ...

সত্যি, হাসি চেপে রাখা কঠিন। মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে নিই। হায় হায়, একটু আগে চকলেট কবুল করেছিলাম! যত বারণ করব ততই বলবে। ভারি বিপদ হল! স্ত্রীও হেসে ফেলে বলে — কী গল্প করো তোমরা? এ দেখছি মেয়েছেলেরও অধম!

বিলু অন্য ঘরে গেলে সংক্ষেপে অটলদার দুঃখের কাহিনী বলি। শুনে জগৎদা ও বউদির মতো স্ত্রীও মুচকি হাসে। একজনের দুঃখ আর একজনের হাসি! সত্যি, মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন ভেবে পাই না। এটা যদি তোমার ক্ষেত্রে হত তা হলে দাঁত বের করে হাসতে পারতে?

বিলু কিন্তু অল্পতেই রেহাই দিল না। পাশের বাড়িতে গোটা পাঁচেক মাসি আছে, যাদের কাছে বিলুর খুব আদর এবং যথারীতি তাদের কানেও গিয়ে পৌঁছল। পাঁচটি শরীর যেন পাঁচটি নদী, হাসির দমকে আঁকাবাকা হয়ে ভেঙে গেল। ওর মুখে নাকি শুনতে ভালো লাগে। মাসিদের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন কেউ এলেই বিলুকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমৃতবাণী শোনায়, 'হারামজাদা, আমার বউয়ের সঙ্গে প্রেম? দা দিয়ে তোর গলা কেটে ফেলব।' শুনে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

আরো মুশকিল, পুরোনো লোক বলে অটলদাকে পাড়ার সবাই চেনে, রাস্তায় দেখতে পেলেই এক মাসি আর সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে। পাঁচটি শরীর ফের পাঁচটি নদী হয়ে যায়!

আমার স্ত্রীর সৌজন্যে ঘটনার পটভূমি সবারই জানা হয়ে গেছে। শিশু ও মহিলাদের মুখে লাগাম পরানো বেজায় শক্ত!

আমার ভোগান্তির আরো অনেক বাকি ছিল। তিন বছর হলে পাড়ার এক কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে বিলুকে ভরতি করে দিই। একদিন ওকে আনতে গেছি, আন্টি ডাকলেন — শুনুন। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

— আপনার ছেলে ক্লাসে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলে। অন্যেরা শিখবে। আমি কিন্তু এসব অ্যালাউ করবো না। বলেই ফিক করে হেসে ফেললেন।

আমি গম্ভীর হয়ে সারেন্ডার করি। — কী করি বলুন তো ম্যাডাম? আমার এক বন্ধু দুঃখের কথাটা বলেছিলেন। কোন ফাঁকেও শুনে ফেলেছে। অনেক চকলেট ঘুষ দিয়েছি ম্যাডাম, কিছুতেই ভুলছে না।

অল্প একটু হাসলেন আন্টি। বললেন — জোর করবেন না, নিজে থেকেই ভুলে যাবে। আর আপনাদেরও বলি, কক্ষনো ছোটোদের সামনে নোংরা কথা বলবেন না। জানেন না, শিশুদের ক্যাচ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?

এই ঘটনা অন্তত সাতাশ বছর আগেকার। এই সাতাশ বছরে কত কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি রিটায়ার করেছি। রাস্তার ধারে পশ্চিমমুখো দোতলার ফ্ল্যাটটি আমার নিজস্ব। রোজ বিকেলে বারান্দায় বসে পার্কে দেবদারু গাছের আড়ালে সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখি। দিনের আলো কী করে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায় তাও লক্ষ করি।

বিলু এখন আমেরিকায়। যাওয়ার আগে আই.আই.টি. থেকে ইলেকট্রনিক্সে ডক্টরেট করে গেছে। আর আমি আমার কাজ করেছি, বি.ই. পাশ এক ইঞ্জিনিয়ার কন্যার সঙ্গে বিলুর বিয়ে দিয়ে। দু-জনে চুটিয়ে ডলার উপার্জন করছে। সপ্তাহে একদিন রাত্রে ফোন করে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে। আমাদের কথা, দেশের কথা শুনতে চায়। আমি বলি — ওরে ছাড়, অনেক মাশুল লেগে যাবে। ছেলে ধমক দেয় — তা লাগুক না, তোমার কী!

পাড়ার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। যত পুরোনো বাড়ি ছিল ভেঙে সেখানে বহুতলের মাথা মেঘ ছুঁয়েছে। কত নতুন মানুষ তার খোপে খোপে, কত নতুন পরিবার আর শিশুদের কলকণ্ঠ। তাদের সঙ্গে পরিচয় নেই। পরিচিতরা অনেকেই চলে গেছেন। জগৎদা নেই, বউদিও নেই, তারও কিছু আগে বিদায় নিয়েছেন অটলদা। অটলদার একমাত্র ছেলে ভালো চাকরি খুঁজতে খুঁজতেই বিদায় নিয়েছে। বউদি আছেন। বিকেল হলেই বউদি আমাদের বাড়ি চলে আসেন। পশ্চিমের বারান্দায় আমি, আমার স্ত্রী ও বউদি চেয়ার পেতে মুখোমুখি বসি। মাঝখানে সেন্টার টেবিলে তিন কাপ চা জুড়োতে থাকে। কথাবার্তা কমই হয়। দিনের আলো কীভাবে রাতের শরীরে মিশে যায় তিনজনেই সেটা লক্ষ করি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম — বউদি, বিষ্টুবাবু এখন কোথায়?

চমকে উঠে বউদি উত্তর দেন — বাইরে মাস্টারি নিয়ে যান। শুনেছি মারা গেছেন।

এখন আর কোথাও দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যায় না। স্মৃতি... স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকি আমরা। শ্বশুরমশাই বিয়েতে একটা খাট দিয়েছিলেন। খাটের ডাঁশায় দা-এর যথেচ্ছ কোপ।

বিলুর কীর্তি। এই তো যখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে, তখন দোলের সময় বন্ধুরা মিলে ঘরের মধ্যে দোল খেলেছিল। দেওয়ালে তারই চিহ্ন পড়ে আছে। ওই দিকে তাকিয়ে থাকি। সময় কেটে যায়।

বিলু ফোন করে — বাবা, তোমার কী দরকার জানাও। ঘরের সব আসবাবপত্র ফেলে দাও। আমি ডলার পাঠাচ্ছি। আমেরিকানরা এক বছরের বেশি পুরোনো জিনিস ঘরে রাখে না। সব সময় নতুন ডিজাইন চাই।

আমি বলি — বাবা, বেশ আছি। আমাদের কিছুই দরকার নেই। আর পুরোনো খাটের ডাঁশায় তোমার হাতের চিহ্ন আছে। তোমাকে সেদিন খুব বকেছিলাম। কিন্তু নতুন খাটে তো সেই চিহ্ন থাকবে না।

ছেলে একটু ক্ষুণ্ণ হল। — ওই চিহ্ন নিয়ে তোমরা পড়ে আছ! জানো, পৃথিবীটা কত দ্রুত এগোচ্ছে?

মনে মনে বলি — জানতে চাই না। আমাদের মতো করে শুধু বাঁচতে চাই!

আবার পশ্চিমের বারান্দায় ফিরে আসি। বিষ্টুবাবুর কথায় স্ত্রীও আমার মুখের দিকে তাকায়। সেটা লক্ষ করে বুঝতে পারি সাতাশ বছর আগের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। বিলুরও কি মনে আছে, ক্ষণে ক্ষণে নতুন বাছুরের মতো লাফিয়ে উঠে বলত, 'হারামজাদা, আমার বউয়ের সঙ্গে প্রেম?'...

না। ডলার আর ফাস্ট লাইফ ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। যাদের মনে থাকার কথা সেই অটলদা, জগৎদা ও বউদি বহু বছর আগে বিদায় নিয়েছেন। বিষ্টুবাবুও নেই। বেঁচে আছি আমি আর অটলদার স্ত্রী। আমরা দু-জনেই মাত্র জানি, আজ থেকে সাতাশ বছর আগে পৃথিবীর এই কোণটিতে এক অপরূপ দৃশ্য তৈরি হয়েছিল। বিষ্টুবাবু সদর রাস্তা দিয়ে প্রাণভয়ে কাপড় তুলে ছুটছেন, পেছনে পেছনে অটলদা। সকাল দশটার রোদে হাতের দা-খানা ঝলসে উঠছে।

বউদির নানান রকম অসুখবিসুখ। হাঁপানি, প্রেশার, ডায়াবিটিস থেকে কী নেই? সুতরাং বউদি নামক হলুদ পাতাটি তাড়াতাড়ি খসে পড়বে। আর হারাধনের একটি ছেলে হয়ে আমি আরো কিছুদিন পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করব। তারপর আমার সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের ওই টুকরো ইতিহাস চিরতরে নিশ্চিহ্ন হবে।

জনৈক হরিজনের মৃত্যু

বিপুল দাস

তখন ধীরে ধীরে আলো আস্রাবিত হচ্ছিল। সমস্ত রাত্তিরের কালো ব্যাপ্ত হয়ে ছিল আকাশপটে। এখন অন্ধকার যেন ছেঁকে ফেলা হচ্ছে। ঘোলাজল পরিষ্কার হয়ে আসছে। আস্রাবণের ফলে পূর্বদিগন্ত বিষয়ে প্রতীতি জন্মায়। আলো বস্তুর অবস্থানকে চিহ্নিত করে। মগজে বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত আলো যে প্রতিবিম্ব তৈরি করে, তার ফলে দর্শক অস্তিত্ববান হয়। সংশয় দূর হয়। কিন্তু কালো অন্ধকারে ডুবে থাকা সাংসারিক অভিজ্ঞান যখন ছুঁয়ে-ছেনে দেখা যায় না, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের কাঙালপনায় তীব্র হয় পরিচয়ের বাসনা, তখন আলোর জন্য মানুষ ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে। সমস্ত রাত্রি ধরে প্রেমলাল যেমন ছিল। এখন যে-দিকে জল-কাদা ছেঁকে ফেলা হচ্ছে, সেদিকেই — ই হে পুরব হো, নিশ্চিত হয় প্রেমলাল।

প্রেমলাল এ-গাঁয়ের পুরোনো লোক। নতুন হলে প্রথম প্রথম দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পুরোনো হতে হতে মানুষ তার মগজে কিছু দিগ্‌দর্শী চিহ্ন বসায়। তেঁতুলগাছ, হরিমন্দির, মেলার মাঠ, নিজাম দিঘি, এইসব। তখন আর সূর্যের উদয়াস্ত দরকার হয় না। পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সড়গড় হয়ে যায়।

কিন্তু চিরকালের চেনাজানা দৈনন্দিনতার সংসারেও মানুষ অনেক সময় নিজেকে খুঁজে পায় না। তখন তার মনে হয় সে বুঝি ভুল পৃথিবীতে এসে পড়েছে। সব কিছু অচেনা লাগে। সন্তানের মুখ, শ্যামলা গাই, বাজ-পড়া তালগাছ, শিক-ভাঙা ছাতা—সব অজানা হয়ে যায়। তখন মানুষের মনে ত্রাস উঠে আসে। তখন সে ভয়ংকরভাবে একটি দিক্‌চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ওই চিহ্নসাপেক্ষে তার অবস্থান। সন্তান, বউ, শ্যামলা গাই, বার্থ সার্টিফিকেট, পে-রোলে নির্মিত স্থানাঙ্ক মানুষের দিক্‌চিহ্ন হয়। মানুষকে আশ্বস্ত করে। আসলে ওদিকে ওপরে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারার চলন, এদিকে নীচে ভুঁই-এ গেড়ে বসা বস্তুসকল, এই দুইপ্রকার বস্তুর আপেক্ষিক অবস্থানের হদিশ খুঁজে না পেলে নিজের জায়গা খুঁজে পাওয়াই বড়ো গোলমেলে হয়ে পড়ে। তখন এ-জগতে হাঁটাচলা এক দিকদারি।

প্রেমলাল এ-গাঁয়ের পুরোনো বাসিন্দা। তথাপি অন্ধকার আস্রাবিত হওয়ার পর সে টের পেল — ই হে পুরব হো। কিন্তু এই বোধও তার মস্তিষ্কে অনেক ধীরগতিতে পৌঁছচ্ছিল।

যখন আকাশ থাকে ঘন কালো মেঘে ঢাকা, ঢেউ-এর প্রবল দাপটে নৌকোর মুখ এদিক-সেদিক হয়ে যায়, রাতের সমুদ্রে কম্পাসহীন নাখোদার বড়ো মুসিবত হয়। পরিচয়ের অভিজ্ঞান, যা আসলে বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করে, সেই বাতিঘর অথবা কম্পাসকাঁটার সাপেক্ষে নৌকোর চলন — সব বানচাল হয়। ফ্যাকাশে হয় নাখোদার বদন।

যেমন বা এখন প্রেমলালের সর্ব অঙ্গ। পুরোনো লোক। ইস্কুল ঘর, মেলার মাঠ, পুরোনো কুঠিবাড়ি ইস্তক বাংলাদেশের বর্ডার যে দক্ষিণে—সবই জানা। তবু এই দুনিয়ার ওপর উপুড়-করা বাটির একটা অংশে আস্তে আস্তে আমানির রং ধরছিল — তখন সে বুঝল দিক। এমন কী ওটাই যে পুবদিক সেই ধারণাও অনেক সময় ধরে তার মগজে পৌঁছয়। এর জন্য দায়ী

রক্তের ক্রমাগত ক্ষরণ, ফলে স্নায়ুকোষে অক্সিজেনের স্বল্পতাহেতু কার্যকারিতা হ্রাস এবং চক্ষু দুটি, যা আসলে প্রতিসারক মাধ্যম মাত্র — প্রায়ান্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ওই মিছিলকে কায়াহীন কিছু ছায়াছবির চলন মনে হয় প্রেমলালের।

শুখার দেশে বছর বছর এরকমই হয়। প্রেমলাল হাত আড়াল দিয়ে আকাশ দেখছিল। পোড়া নীল রং। পাঁশুটে ছাই, দন্তমঞ্জনের পাউডার হয়ে নীলের সঙ্গে মিশেছে যেন। এই গ্রাম, পুবে পাঙা নদীর ওপর নতুন ব্রিজ, পশ্চিমে হরিমন্দিরের চূড়া, উত্তরে দিগন্তবিস্তারী সিংহবাবুদের তালুকের অনির্দেশ্য সীমা এবং দক্ষিণে, যেদিকে এক বেলা হাঁটাপথের ইস্টিশন — সেসব কিছুর ওপর গোল বাটিটা যেন এইসব খেতিবাড়ি ইত্যাদি দিক্‌চিহ্নগুলোকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার একটা বিশাল ধামা দিয়ে ঘিরে রাখে। ধামাচাপা থাকে। যেন প্রবল ঝড়ে শেকড় উপড়ে আঁধির পাল্লায় পড়ে মানুষের দরকারি এসব চিহ্ন বেমালুম হাপিশ না হয়ে যায়। এইসব পাহাড়পর্বত, জমিজমা, নদীনালার ওপর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে, ওপর নীচে অজস্র রেখা যদি টানা যায়, তা হলে কাটাকুটির বিন্দুগুলোর ওপর দেখা যায় এই সব দিক্‌চিহ্ন। খুব সহজেই লোকজন খুঁজে পায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, থানা, পরমেশ্বর আইচের পুকুর। তখন ছকবন্দি হয়ে যায় তামাম বাতিঘর ও বয়া।

আর তা না হলে নিদারুণ ত্রাসে কেঁপে ওঠে সমস্ত অস্তিত্ব। শুধু প্রেমলাল বলে নয়, সৃষ্টিব্যাপী অন্ধকারে কর্তার সিং, নদেরচাঁদ মন্ডল, রসিক গন্ধবণিক, নীনা পারেখ, মাইকেল হেমব্রম, সেবাস্টিয়ান মুর্মু হঠাৎ হাউমাউ কেঁদে ওঠে। আচমকা যদি মনে হয় পায়ের নীচে আকাশ দেখা যাচ্ছে, মাথার ওপর খেতিবাড়ি, যদি কাটাকাটির ওই ছেদবিন্দু থেকে, ছকবন্দি সংসার থেকে বটগাছ, প্রাইমারি স্কুল, পাঙানদী, বিলকুল হাওয়ায় উবে যায়; যদি একরাতে বাড়ি ফিরতে গিয়ে গিরীন্দ্র বর্মন চিরকালের চেনা সেই সরু পথটা আর খুঁজেই না পায়, স্যার যদি বলে, 'তোর নাম তো আর খাতায় নেই রে সতু,' তখন ঘন কালো একটা অন্ধকার, থকথকে কালো পিচের মতো — সর্বত্র ছড়ায়। নাক-চোখ-মুখ দিয়ে ওই সান্দ্র কালো ঢুকতে থাকে। বাইরে-ভিতরে সেই আবরণ অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পর্ক থেকে। তখন 'হারিয়ে গেছি আমি', এই এস.ও.এস. ছড়িয়ে পড়ে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। আপৎকালীন সতর্কবার্তা লাগু হয় উপকূল বরাবর।

পোড়া আকাশ। ভালো করে অনেকক্ষণ দেখলে মনে হয় ওই নীল আসলে অভেদ্য। হাওয়াই জাহাজ, আশ্বিনের শাদা মেঘ ওই অভেদ্য পর্দা ছুঁই ছুঁই করে ভাসে। কিন্তু এ-জগতেই দৃশ্যমান থাকে। প্রেম যাকে হাত দিয়ে আড়াল করল, সেই গোলার দাপে ওলটানো-বাটি নরম ছাই, দন্তমঞ্জনের পাউডার আর নীল মিশে যেন এঁটেল মাটি, গোবরের প্রলেপ। লেপে দেওয়া হল ধামার ভেতর-দেওয়াল। পেছনের পোড়া নীল পরদার এই কাঠিন্য-মায়ার ফলে উড়োজাহাজ ও আশ্বিনের শাদা মেঘ মনে হয় বুঝি ছুঁয়ে দিল ওলটানো বাটির পেট। অনন্তের আভাস খর তাপে জমাট। এখন আর মনে হয় না অসীম আকাশ। বরং উড়োজাহাজের একটু ওপরেই যে নীলছাই, এখন আরো পাঁশুটে একটা দেওয়াল গেঁথেছে — স্পষ্ট মনে হয়। নিশ্ছিদ্র। ফলত সিংহবাবুদের খেতিবাড়ি, প্রাইমারি স্কুল এবং অন্যান্য বস্তুনির্গত তাপপ্রবাহ ভূমিসংলগ্ন বায়ুস্তরকে উত্তপ্ত করে এবং ঊর্ধ্বগমনে যেন ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। মাটি কিছুতেই ঠাণ্ডা হতে চায় না।

শালার কী ধক্ — প্রেম মনে মনে বলেছিল। পিচিত করে খইনির থুক ফেলেছিল মাটিতে।

গাঁ শুনশান হয়ে গিয়েছিল। কারণ, সবাই ভেবেছিল 'বকাচদাটা মইচ্ছে'। শালা, শয়তানের ন্যাটো। পুলিশ নির্ঘাত আসবে। বর্ডার এলাকা। খুচখাচ ঝামেলা লেগেই থাকে। কোনোটা বি.এস.এফ.-এর বুটের লাথি, কোনোটা পুলিশের লাঠি, কখনো পঞ্চায়েত মারফত ফয়সালা হয়। কিন্তু সে-সব ছাগল চুরি, বেওয়া-বিধবার ঘরে রাতবিরেতে ঢুকে পড়া গ্রামের কোনো কামার্ত পাঁঠা। বড়োজোর জমির সীমানা নিয়ে ছোটোখাটো কাজিয়া। প্রেমলাল নির্ঘাত মরে গেছে।

প্রেমলালের কোমরে চকচকে ছুরি ছিল। মনঞ্জয় লাথি মারলে সেটা মাটিতে পড়ে যায়। সবাই স্পষ্ট চোখে সে-ছুরি দেখেছে। প্রেমলালের পেটের নীচে প্রথমে ছুরিটা চাপা পড়ে ছিল। প্রেমলাল উপুড় হয়ে থাকার ফলে প্রথমে কিছুক্ষণ ওটা অদৃশ্য থাকে। তা ছাড়া উপুড় অবস্থাতেও সে মাঝে মাঝে উবু হয়ে বসার চেষ্টা করছিল। দু-হাত দিয়ে মাথা আড়াল করার চেষ্টা করছিল। তখন অটোম্যাটিক দু-হাঁটু ভাঁজ, পাছা উঁচু, পিঠ বেঁকিয়ে দিচ্ছিল। বিপদের সময় সাধারণত এই পোজ এসে যায়। সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ফলে কশেরুকা নমনীয় হওয়ার চেষ্টা করে, যাতে কেন্নোর মতো গোল হওয়া যায়। মাতৃগর্ভের নিরাপদ-তরলের অভ্যন্তরে যেমন ছিল পশ্‌চার। অথবা সামনে বুকের খাঁচার আড়ালে যে-প্রাণপক্ষী অবিরত কুব কুব করে, সেই কুবো পাখির কথা আগে মনে পড়ে।

কিন্তু ছুরি হল ছুরি। এরোপ্লেনের ছায়ার মতো, অস্বাভাবিক কিছু নয়, অথচ দৈনন্দিন সংসারের বাইরে। লোকজন একটু থমকে যায়। বিশেষত ওই ধাতব শীতলতা মানুষের মনে এক ধরনের নৈঃশব্দ সৃষ্টি করে, রক্তের কথা মনে পড়ে যায়।

প্রথমেই সবাই ছুরিটা দেখে ফেলায় ওটা পেটের নীচে থাকলেও সবার চোখে ভাসছিল। প্রেমলালদের কাছেই তো এরকম ছুরি থাকে। গাঁয়ের সবাই জানে এ-ছুরির কার্যকারিতা। তা ছাড়া ছুরিতে তখনো রক্ত। এ-রকম ছুরি দেখলে প্রথমে ভয় আসে মনে। বাদে গা ঘিনঘিন করে। পরে বিতৃষ্ণা তীব্র হলে একটা অহেতুক রাগ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে মানুষটা বিচ্যুত হয় পরিচিত ছক কাগজ থেকে। তখন যদি জুতসই কারণ একটা খুঁজে পাওয়া যায়, সেই মানুষের হাড্ডি চুরচুর হয়ে যায়।

পিছড়ে-বর্গ বিষয়ে গৃহীত সরকারি নীতির কিছুই জানত না প্রেমলাল রুইদাস এবং সম্প্রদায়। ক্রমে ক্রমে পালটে যাচ্ছিল ওরা। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ভক্তিবাদী প্রচারক রুইদাস তো দূরের কথা, ড. ভীমরাও আম্বেদকরের নাম পর্যন্ত মূর্খগুলো জানে না।

প্রেমলাল তার ঠাকুরদার কাছে আদিপুরুষ রুইদাসের নাম শুনেছিল। রঙ্গলাল ছিল সমাজের মাথা। ঠাকুরদার কাছে প্রেমলাল শুনেছিল বংশের ইতিহাস। উঁচুঘরের সঙ্গেও তাদের লেনদেন আছে। বহুকাল আগে সেই বনারস (বেনারস) থেকে ক্রমাগত পথ চলা। ক্রমাগত দিক-পরিবর্তন। শেষে উত্তরবাংলার এই সীমান্তে, পাঙা নদীর পারে এই গ্রামে থিতু হওয়া। এ-জমির মোট পরিমাণ প্রথমে ছিল সাতান্ন বিঘা। জমির মালকিন ছিল সখীসোনা আইচ। সাতান্ন বিঘা জমি দিয়ে একটা পত্তন বসাতে চেয়েছিল রঙ্গলাল। আটশো টাকায় খরিদ করা সেই

জমিতে দু-নম্বরি ব্যাপারও ছিল। সেটল্‌মেন্টে দেখা গেল জমি আদতে ছত্রিশ বিঘা। বাকি জমি সরকারি। সখীসোনার দখলে ছিল। সবসুদ্ধই বিক্রি করে দিয়েছিল সখীসোনা আইচ।

তো সেই ছত্রিশ বিঘা নিয়ে আটটা পরিবার বসল। হরিজনপল্লির মোড়ল হল রঙ্গলাল। তখনো পুরোনো রীতরিয়াজ অনুসারে জীবন চলেছে। চামড়া জোগাড় করে মহাজনের ঘরে দিয়ে আসা। কখনো কাঁচা চামড়া দিয়ে টুকটাক জিনিস বানানো। মুখের জবান তখনো সেই নাগ্‌রি। প্রেমলাল তার বাপ-ঠাকুরদা, পুরোনো লোকজনকে সেই ভাষায় কথা কইতে শুনেছে। তখনো ধরম-করম, বিহা-শাদি, এমনকী শাড়ি পরার ধরনটিও ছিল বনারসি।

একগ্লাস জলে যেমন একদানা মিছরি ফেলে রাখলে কখন যে সেটা জলে মিশে যায় — কেউ টের পায় না, ঠিক তেমনই, যা ছিল 'অবহি' সেই মাগধী। নদী যেমন — পশ্চিমা, মৈথিলী হয়ে আবার পূর্ববাহিনী, পূর্বীর দিকে ঘুরে প্রথমে স্থানিক 'অখনই' বাদে আরো ছোটো নদী হয়ে 'অ্যালা'।

তার কারণ এ-পাড়ার দক্ষিণে পাঙার পার ঘেঁষে কৈবর্ত চাষিদের মালোপাড়া, দাসপাড়া। বেলদার বস্তি। সব চরুয়া। চরের মাটি, বাঁজা ডাঙায় শালারা যেমন ফসল ফলায়, এখানকার লোকজন দেখে অবাক হয়ে যায়। যে-জমিকে এতকাল নিষ্ফলা জেনে অবহেলায় ফেলে রেখেছে সবাই, বুনো ঝোপঝাড়ে বোঝাই সে-জমি হাসিল করে দিব্যি ফসলের খেত বানিয়ে ফেলল ওরা। হাল মেরে, মই দিয়ে জমি তৈরি হল। বীজতলা থেকে চারা এনে বপন করল। ওই মাটি অনাবাদী বলে যারা এতকাল কপালের দোষ দিয়েছে, প্রথম প্রথম তারা খুব মজা পায়, হাসাহাসি করে। বলে যে, 'গাধাক্ ডাঙোয়া ঘোড়া হয় না।' কিন্তু সেই আচোট জমিতে যখন সোনার ফসল দুলে উঠল, তখন শস্যদানার বাড়বাড়ন্ত দেখে বিস্ময়ে 'হায় আল্লা' ছাড়া আর কিছুই তারা বলতে পারে না। চোখের সামনে এই অবাস্তবতা তাদের মনে বিহ্বলতা আনে। মনে হয় হাড়ভাঙা পরিশ্রম নয়, এর পেছনে তন্ত্রমন্ত্র থাকতে পারে। নিশ্চয় ওরা কুহকী। মায়া জানে। ওদের বলদগুলো আসলে জাদু-বলদ। ওদের লাঙল নির্ঘাত মায়াদণ্ড। ওদের নিড়ানি, জলসেচ, সার, ঝাড়াই-মাড়াই, এমনকী ওদের কাকতাড়ুয়াও বোধহয় অলৌকিক। নইলে এই ভানুমতীর খেল কেমন করে হয়। শুকান ভুঁইয়োত্ রোঁয়া গাড়া — এই প্রবচন মাঠে মারা যায় ওই নোয়াখালি, ময়মনসিংহ থেকে আসা মানুষগুলোর হলকর্ষণের চমৎকারিত্বের কাছে।

ওই মালোপাড়া, দাসপাড়া আর এই চর্মকারপল্লির লোকজন ছাড়া বাদবাকি সব রাজবংশী জন। চাষবাসের ম্যাজিকওয়ালা ওই লোকগুলো হরিজনপল্লির মতো শুয়োর-মুরগি পোষে না। বরং গরুর দিকেই ঝোঁকটা বেশি। এখন এই চামারপাড়ায় সবাই স্বচ্ছন্দে রাজবংশী ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে। 'অখনই' এখন হয়েছে 'অ্যালা'। এমনকী ওদের মতো বাড়ির উঠোনে গ্রামঠাকুরের ছোট্ট ঘর পর্যন্ত সবাই বানিয়ে নিয়েছে। প্রেমলালের মনে আছে তার মা কীভাবে শাড়ি পরত। এখন আর কেউ সেভাবে শাড়ি পরে না। প্রেমলাল এখন নিজেই তার ছেলের বউকে হাঁক দেয়—এ-ছোটোবউ, এত্তি আয়। বউকে ঠ্যাঙায় — শালি, ঘরত্ মন টিকে না তোর। খায় দায় পংখি, বনের ভিতি আংখি।

কে জানে কেমন করে এসব হয়। কেউ খেয়াল করে না। জলের সঙ্গে মিছরির দানার মতো এই মিশে যাওয়া। উপনদী, শাখানদীর মতো ভাষার এই চলন, লোকাচারের গ্রহণ-

বর্জন, শাড়ির আঁচলের ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরণ — উত্তরবঙ্গের এক সীমান্তঘেঁষা গ্রামে এই আশ্চর্য ঘটনা নিঃশব্দে ঘটতে থাকে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো তাপ, আলো বা শব্দ উৎপন্ন হয় না, ফলত নীরব থাকে বাজারি ঢাকঢোল। নীরবে বদলে যায় গোটা একটা সম্প্রদায়ের যাপনচিত্র।

রঙ্গলাল আজ বেঁচে থাকলে খুবই আশ্চর্য হয়ে যেত। নামগুলোর ধরন পালটে যাচ্ছে। মুখের ভাষা পালটে যাচ্ছে। শাড়ি পরার কায়দা পালটে যাচ্ছে। এমনকী জীবিকাও। প্রাণধারণের উপায়। কীভাবে একটি গোষ্ঠীর মূলস্রোতে অন্য গাঙের জল, নহরের পানি এসে মিশে যাচ্ছে। রং পালটে যাচ্ছে রঙ্গলাল, ছবিলাল, প্রেমলাল রুইদাসের জীবনপ্রবাহের।

এভাবেই গ্রহণ-বর্জন চলে। আর এই প্রক্রিয়া এমন ধীরগতিতে হয় — যেমন বা ছাউনির টিনে মরচে ধরে। রুপোলি শাদা ঝকঝকে ছাউনি কবে যে লালচে হয়, বোঝাই যায় না। জল আর বাতাসের কেরামতি চলে অহরহ। নতুন জলের ধারা সংগোপনে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে সাবেক ধারার সঙ্গে। কেউ টের পায় না। নতুন বাতাস নাক মুখ দিয়ে ফুসফুসে ঢুকতে থাকে। এই জল আর বাতাস জন্ম দেয় রঙ্গলালের নতুন জবান, ছবিলালের হাল-বলদ কেনার বাসনা, প্রেমলাল ছেলের নাম রাখে ন্যাদো।

প্রেমলাল ফিরছিল ঘুঘুডাঙা থেকে। তাদের একঘর অনেকদিন আগে এ-পল্লি ছেড়ে ঘুঘুডাঙায় উঠে গেছে। রঙ্গলালের আমলেই ঘটেছিল। রঙ্গলালের সর্দারি মানতে চায়নি উঠতি জোয়ান রামানন্দ রবিদাস। নদীর পারের এক কৈবর্ত চাষির মেয়েকে সে চামারপল্লিতে তুলে এনেছিল। খুন হয়নি কেউ, কিন্তু মারামারিতে জখম হয়েছিল বিস্তর। 'কাইট্যা ফ্যালামু'— এই ধ্বনির সঙ্গে মশাল এবং রাম-দা ছিল।

রামানন্দকে রঙ্গলাল তার আগেই সরিয়ে দিয়েছিল। তো সেই রামানন্দ রবিদাস আর কুসুমবালাকে অনেকদিন বাদে ঘুঘুডাঙায় দেখা যায়। এ-গ্রাম তখন প্রায় গঞ্জ হয়ে গেছে। তাদের এ-পল্লির যত ঘর, ঘুঘুডাঙার এখনকার বসতিতে যত ঘর রয়েছে, রামানন্দর ব্যাটা রাজা রবিদাস ছাড়া সব গেরস্ত এখন চাষবাসে পেটের ভাত জোগাড় করে। ছুরি ধরা ভুলে গেছে সবাই। মরা গরুর শরীরের ঠিকঠাক জায়গায় তীক্ষ্ণ ছুরির মাথা ঢুকিয়ে সঠিক চাপ দিয়ে চিরে নামানো, পুরো চামড়া কোথাও নষ্ট না করে খুলে আনা, পরিষ্কার করা, চুন আর হুতমন গাছের ছাল মিশিয়ে লোম ঝরানো, নরম করা — সব ভুলে যাচ্ছে প্রেমলালের দল। একা রাজা জাতব্যবসা ধরে রেখেছে। গঞ্জের দোকানে বসে বসে কাঠের লাসে চামড়া মুড়ে পেরেক ঠুকছে। জুতো সেলাই, রং, পালিশ — সব এখন এই এক ঘরের জিম্মায়। সরু একটা ধারা এখনো প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে উৎসমুখের সেই প্রাচীন প্রবাহকে টিকিয়ে রাখতে। নতুন দেশের নতুন মাটি, নতুন বাতাস শুষে নেয়, গিলে খায় জীর্ণ প্রবাহ। রাজা রবিদাস একা, হাতুড়ি-পেরেক-ছুরি-বাটালি-বুরুশ-কালি আগলে রাখে।

ছুরিটা ধার নিয়েছে প্রেমলাল। এবারের মতো পোড়া আকাশ বহু বছর দেখেনি এখানকার মানুষ। যেমন গরম পড়তে শুরু করেছিল, সবাই বলাবলি করেছিল এবার খুব ঢালবে।

কোথায় জল? চৈত্র থেকে আকাশ দাপট দেখাতে শুরু করেছে। বৈশাখের মাঝামাঝি কুয়ো থেকে ঘোলাজল। আর এখন তো থকথকে কাদা শুধু। প্রেমলালের বাড়ির সামনের টিউকল, শুকনো হল জ্যৈষ্ঠের গোড়ায়। বাকি রইল সরকারপাড়ার ইঁদারা। সেখানে এই অচ্ছুতপল্লির লোক যায় কেমন করে। সুতরাং সেই নদী। পাঙা। সে তো ঘোরা পথে গেলে দু-কিলোমিটার। সোজা পথ আছে। এ-পাড়ার লোকজন সে-পথ মাড়ায় না। তারপর উঁচু বাঁধ বেয়ে ওঠানামা। পাঙার জলে যদি চামারের কলসি ডোবে, যদি জল ভরে আনে কোনো রুইদাসের বউ, কী জানি, তাতেও না অপরাধ হয়ে যায়। এই ভাবনা প্রেমলালের মাথায় এক ঝলক খেলে যায় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভোটের আগে মাইকে শোনা কিছু কথা মনে পড়ে যায়। এখন সময় পালটাচ্ছে, এখন গরিবের সরকার — এসব কথা মনে পড়লে সে জল বিষয়ে আশ্বস্ত হয়। সুতরাং বাঁক বানিয়ে সে দু-পাশে টিন ঝোলায় এবং জল আনতে যায়।

এমন খরা প্রেমলাল জীবনে দেখেনি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আকাশ থেকে সারাদিন যেন আগুনের স্রোত নেমে এসে সমস্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। ক্রমশ গভীরে যেতে যেতে জল চলে গেছে পাতালপুরীতে। সামান্য ঘাসের শেকড়ের সাধ্য নেই সেই জল পর্যন্ত পৌঁছয়। খয়েরি হয়ে যাচ্ছে সবুজ ঘাস। ছোটো ছোটো গাছগুলো, ভিখারি মায়ের কোলে কঙ্কালসার বাচ্চার মতো আমসি বুক চেটে যাচ্ছে। রসহীন শুকনো সেই গ্রন্থি। পাতাগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে। চাষবাস মাথায়। জল কোথায়? বীজতলা যদি নরম না হয়, থকথকে কাদার মাঝে বীজ ছড়াতে না পারলে কোথা থেকে চারা হবে। বীজের প্রাচীর ফাটিয়ে যে-শিশুটি বেরিয়ে আসবে, তার তো চাই আঁতুরঘরের নরম বিছানা। যতদিন প্রাণ ছিল বীজের আড়ালে, খোসার ভেতর জমাট শস্যল খাবার পেয়েছে। এখন চাই মায়ের দুধ। সবুজের প্রাণ-বাঁচানো সেই দুধ এখন কোথায়। কত নীচে। পাতালপুরীতেই বুঝি। দুই পিঁড়ির কৃষক প্রেমলাল দিশেহারা হয়ে যায়। সব ছারখার। আকাশের রং হয়েছে পোড়া ছাই-এর মতো। আলের ধারে দাঁড়িয়ে দূরে তাকালে খেজুরগাছটা কাঁপে। মাটি জুড়ে গরম ভাপ উঠছে। প্রেমলাল এবার কী করবে! জাত-ব্যবসা তো কবেই ভুলে গেছে। ছুরি খুঁজতে গেলে এখন হাতে উঠে আসে কাস্তে, ঘাসুয়া দা, নিড়ানি।

রামানন্দ রবিদাসের ব্যাটা রাজা রবিদাসের দোকানের নাম 'মিঠুন শু হাউস'। রাজা যখন ঘুঘুডাঙার মোড়ে ঘরভাড়া নিয়ে দোকান খোলে, তখন মিঠুনই টপ ছিল। ঋত্বিক বা সুনীল শেঠ্‌ঠির তখন জন্মই হয়নি। এ-মোড়ে তখন বাবুর সাইকেল সারাই-এর দোকান, চায়ের দোকান দুটো — গোপাল ঘোষের আর বছিরের। দু-তিন রকম বিস্কুট আর বিকেলে জিলেপি — এ-হল গোপাল। চায়ের দোকানের লাগোয়া পান-বিড়ি-সিগারেটের কাউন্টার — এ-বছির। একটু দূরে তারক মণ্ডলের মুদি দোকান। তার পাশে ইন্দু সাহার টেরাই ফার্টিলাইজারের এজেন্সি। এই জমায়েতকে পূর্ণতা দিয়েছে বাবুলালের সেলুন। আমগাছের ওপর পেরেক পুঁতে সে তার সনাতন আয়না ঝুলিয়ে সামনে একটা চেয়ার পাতে। শোনা যায় ওই চেয়ারে ঘণ্টাখানেক বসে থাকলে শরীর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

প্রেমলাল রাজার দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে সাইনবোর্ডটা দেখছিল। শালা, সেবার তোর বাপ রামানন্দকে আমার ঠাকুরদা না বাঁচালে তুই এখন কোথায় থাকতি। কোথায় থাকত তোর 'মিঠুন শু হাউস' আর তোর মোচের বাহাদুরি। মনে মনে এ-রকম একটা ভাবনা তার মাথায় খেলে যায় বটে, কিন্তু মুখে 'মিঠুন শু হাউস' বিড়বিড় করে।

— কা কহ তানি?

— না, এইবার মানষিলা সবে মরি যাবার ধইছে। আষাঢ় মাসখান আসি গেইল, জলের কুনো দেখা নাই।

— হমার ভি সেল নাই। নয়া ওডার নাই। মালুম হোয় কি অব মুয়ে (মরণ) মে পড়ি। বহুত আদমি মরবে। আদমিকে চামড়াসে জুতা হো লা?

ছোটো চারমিনারের প্যাকেট খুলে প্রেমলালকে রাজা একটা দিল। প্রেমলাল সিগারেট ধরায়। দেশলাই-এর ওপরে কলসি-কাঁখে মেয়ের ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ঘাড় ঘুরিয়ে মুলিবাঁশের বেড়ার ওপর মাধুরীর ছবি দেখে। কাঠের লাসগুলোর ওপর অনেকক্ষণ দৃষ্টি আটকে রইল। এই একটা ঘর, জাতব্যবসা ধরে রেখেছে। মুখের ভাষা ধরে রেখেছে। ঘরে নিশ্চয় পুরোনো চালেই রীতরিয়াজ বজায় আছে। অথচ এরই বাপ প্রথম নিয়ম ভেঙে ঘরে তুলে এনেছিল কৈবর্তপাড়ার কুসুমবালাকে। মরা গরুর চামড়া কীভাবে খিঁচে আনতে হয়, সে-কারুকুশলতা প্রেমলাল কবেই ভুলে গেছে।

আহা, এখন ধানের বদলে চাই একটা মরা গরু। তা হলে প্রাণটা বাঁচে। রাজাকে দেখে মনে হয় না দেশে আকাল। রাজা চারমিনারের প্যাকেট খুলে কাস্টমারকে সিগারেট খাওয়ায়। রাজার তো এখন সুখের সময়। আকাশে গনগনে গোলার দাপ যত বাড়বে, মাটির তাপ যত চড়বে, জল যত নীচে যাবে, সবুজ যত হলুদ হবে — গরু-বাছুরের জানটা ততই গলা বেয়ে শেষ বাতাস ছাড়বে বলে নাকের দিকে মুখের দিকে এগিয়ে আসে। আর আখেরি দম ছেড়ে দিলেই ওই হাড়মাস ঢেকে-রাখা চামড়া আর মালিকের থাকে না। বাঁশে-বাঁধা মরা গরু দোল খেতে খেতে ভাগাড়ে যায়। শকুন ওড়ে আকাশে। ওদের নজর মাংসের দিকে। চামার তাকায় ওপরে। উপগ্রহের মতো বিচরণশীল শকুনের ওড়া দেখে চামড়ার অবস্থান নির্ণীত হয়। রাজা রবিদাস দু-বেলা ঠেসে ভাত খায়। তার মোচ দেখলে বোঝা যায়। নেতিয়ে পড়া নয়, রীতিমতো পাক খেয়ে ওপরে ওঠা মোচ।

প্রেমলালের সঙ্গে রাজা রবিদাসের প্রচুর আলাপ আলোচনা হল। চাষাবাদের প্রতি রাজার ঘৃণা এবং চামড়ার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রেমলালকে বেশ সংশয়ে ফেলে দিল। রাজা আবার প্রেমলালকে দোঁহাও শুনিয়েছে। প্রেমলাল নাকি জলের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেও ধোপার মতো পিপাসায় মরছে।

ধুবিয়া জল বিচ মরত পিয়াসা
জলমে ঠাড় পিঁয়ে নহি মুরখ
অচ্ছা জল হৈ খাসা।
অপনে ঘটকে মরম ন জানৈ
করৈ কৌন জলকে আসা।

আরে মুরখ, অপনা ঘাট ছোড়কে গেলে এইসান পিয়াস লাগে। অপনা দাদা পরদাদার ঘাটে কি জল নহি?

কতদিন বাদে প্রেমলাল ওই শব্দগুলো শুনল। এত মিঠা নাকি এই ভাষা। ঠাকুরদার কথা মনে পড়ল। বারান্দায় বসে ঠাকুরদা সন্ত রুইদাসের গল্প বলছে। সন্ত রামানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ

শিষ্য সাধক রুইদাস। সেই যে একবার গঙ্গাপুজোর দিন, ঘাটে কত বড়ো বড়ো মানুষ এসেছে, দারোগা-বালিস্টার-মহারাজ-মহামন্ত্রী। কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা আর কিছুতেই বাজে না। মুখ শুকিয়ে গেছে সবার। রাজ্যের সমস্ত ধর্মাত্মা, পুণ্যাত্মা, সাধক হাজির। কোন সে সন্ত আসেনি, যাঁর জন্য ঘণ্টা এখনো বেজে ওঠেনি। রুইদাস তো আপন মনে রাস্তার পাশে বসে জুতো সেলাই করছিল। তাকেই একজন ডেকে নিয়ে গেল। দেশসুদ্ধ লোক গঙ্গার ঘাটে, মন্দিরের সামনে। আর তুমি এখানে। চলো ভাই। পুজো দেখে আসি। আর যখনই রুইদাস ধীর পায়ে সেই ঘাটের চাতালে পা রাখে, অমনি বেজে উঠল ঘণ্টা, ঢং ঢং ঢং ঢং।

সব মনে পড়ে যায় প্রেমলালের। তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। ঠাকুরদার মুখে শোনা গান এখন ভয়ংকরভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে।

সন্তন জাত ন পুছো নিরগুনিয়াঁ।
সাধ ব্রাহ্মণ, সাধ ছত্তরী,
সাধৈ জাতী বানিয়াঁ।
সাধন মাঁ ছত্তীশ কৌম হৈ
টৈঁটী তোর পুছনিয়া॥
সাধৈ নাউ, সাধৈ ধোবী
সাধ জাতি হৈ বরিয়াঁ।
সাধন মাঁ রৈদাস সন্ত হৈ
সুপচ ঋষি সো ভঁগিয়া॥

ঠাকুরদার মুখে শোনা সেই সব গান, কথা, কেমন করে তাদের ঘরের এক রূপসী কন্যাকে স্নানের ঘাটে দেখে উঁচু জাতের জমিদার পাগল হয়ে গিয়েছিল — সেই গল্প। সব, সব মনে আছে প্রেমলালের।

তবে, এ-কোন দুনিয়াদারি করে বেড়াচ্ছে সে! তার তো চলন হওয়ার কথা ছিল শকুনের দৃষ্টি বরাবর। তার হাতে থাকবে ছুরি। লাঠি ছুঁড়ে মরা গরুর শরীর ছুঁয়ে দিতে পারলেই বখরা পাওয়া যাবে। তারপর সেই মহার্ঘ চামড়া। তৈরি হয় জুতো, চপ্পল, বেল্ট, মানিব্যাগ, বাজনার ছাউনি। সে তো এক কারিগর। এ, কোন ভুলভুলাইয়ার ঘোরে হাল-বলদ-নিড়ানি-বিদার সংসারে সে জড়িয়ে পড়েছে। রাজার মতো দোকান কি সে-ও দিতে পারত না। চপ্পল, বুটজুতো, কাবলি শু। দোকানের নাম হবে 'প্রেম শু হাউস'। সব রকম মাল রাখবে সে। মানিব্যাগও।

রাজা রবিদাস তাকে ছুরি দিল একটা। কাগজের পুরিয়া দিল একটা। ভেতরে কালো পাউডার। বুদ্ধি দিল অনেক। বাঁচা কিংবা মরার।

বড়ো ছাতিমগাছটার নীচে প্রেমলাল বসে আছে। হাত আড়াল দিয়ে কয়েকবার আকাশ দেখেছে। সেই পোড়া নীল, যা প্রায় ছাই ছাই। আর ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়। মনে মনে 'থুস' বলে সে ভয় কাটাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তার ঠোঁটদুটো কাঁপে। কিন্তু তার মনটা দো-ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল।

— প্রেমলাল।

— জেহ্।

— মনের ভিতরত্ পখি ডাকাছে?

— জে, হলদিরাম।

— না হয়, শেগুন হোবা পারে।

— জে, শেগুন।

— রুহিদাস কায় রে?

— হামারলার গুরুদেব।

— তাঁয় কী কহছে?

— জেহ্...

— যাঁয় বাম্‌ভোন, তাঁয় শূদ্র। সগায় মানষি। কর্মে ভিন্ন, ফলে এক।

— অ্যালা মুই কী করি। ঘরত একদানা শইস্য নাই। ভোক নাগিছে — হামার ছাওয়া কান্দে, ন্যাদোর মাও কান্দে। কামকাজ নাই। বেড়া বান্ধিবার তানেও কাহ্ ডাকে না। আকাশের পানত্ চায়্যা দেখিলে বুকের ভিতরত্ দেওয়া ডাকে। মনটা কহে এইবার মরণ।

— তুই শালা মুচির ব্যাটা মুচি, হালুয়া হবার ধইচ্ছিস। তোক কায় বাঁচায়।

— রাজার বুদ্ধি ধরিম্ অ্যালা। রাজা হামাক পথ দেখায় বুঝি। মনত্ লাগে বাঁচিবার উপায় ওইঠে।

রাজার ছুরিটা প্রেমলাল কোমরের কষি থেকে বের করে আনল। খুলে ফেলল। দাপুটে আলোর ঝলকানি এসে পড়ল প্রেমলালের চোখে, ছাতিম গাছের পাতায়, শুকনো ঘাসে।

২

নাম-সংকীর্তনের আসরে কলিন বর্মন শেষপর্যন্ত থাকে। এক হাতা খিচুড়ি ও ছোটো এক হাতা তরকারি তার চাতুর্যে দশ হাতা হয়। এবার সুবিধা ছিল, কারণ অন্তত পাঁচ জায়গায় ব্যাচ বসে। প্রত্যেক ব্যাচে কলিন দু-বার করে চান্স নেয়। রিস্ক থাকলেও কলিন উতরে গেছিল। কিন্তু পেটে ব্যথা উঠলে সে ভাবে, ফেরার পথে পাঙার বাঁধের ওপাশে নদীর পারে বসবে।

সোনাবন্ধু মণ্ডলের গরু ছাতিমতলায় শুয়ে ছিল। প্রেমলাল পাশে মাদার গাছের নীচে গিয়ে বসল। সে কী যেন ভাবতে থাকে।

কোমরের কষি থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করে কলিন একটা বিড়ি ধরায়। পুত পুত করে ধোঁয়া ছাড়ে। এগুলো নাম-সংকীর্তনের আসর থেকে অনেক কায়দা করে জোগাড় করা। কলিনের এসব ব্যাপারে নামডাক আছে। বিড়ি দেশলাই পাশে রেখে একটা ঝোপ দেখে তার আড়ালে কলিন লুঙি তুলে বসল। ঝোপের আড়াল থেকে একটা তৃপ্তিসূচক শব্দ শোনা যায়। কালু মহম্মদের হাতে-বাঁধা বিড়ির ধকই আলাদা।

প্রেমলাল রাজার দেওয়া পুরিয়াটা একটা কলাপাতায় মুড়ে গরুটার মুখের সামনে এগিয়ে দিল। কলাপাতা সে জোগাড় করে এনেছিল। সোনাবন্ধু মণ্ডলের গরু, লম্বা খসখসে জিভ দিয়ে মালটা সাগ্রহে টেনে নেয়। খায়। প্রেমলাল ছুরি বার করল।

কর্ম সেরে কলিন নদীর দিকে জলের জন্য যাচ্ছে। তার পেট এখন বেশ হালকা। লুঙি কোমরের ওপর তুলে পা ফাঁক করে বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছে।

পাঙার জলে কলিন পরিষ্কার হয়। লুঙিতে হাত মোছে। এদিক-ওদিক তাকায়। গুনগুন করে, 'তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই' — গানটা করতে থাকে।

গরুটা শুয়ে পড়েছে। জিভটা একটু বেরিয়ে আছে। প্রেমলাল মাদার গাছের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে বসে গরুটার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এককাত হয়ে শুয়ে গরুটা পেছনের দুটো পা টানটান করল। আবার গুটিয়ে আনল। শাদা শাদা প্রচুর ফেনা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। লম্বা জিভ বারে বারে নাকের ফুটোয় ঢোকাতে চেষ্টা করছে। শুয়ে শুয়েই গরুটা চোনা ছাড়ল। জায়গাটা ভিজে গেলে গরম মাটি মুহূর্তে টেনে নেয় সেই হলুদ তরল। প্রেম দেখছে। ঝোপের আড়াল থেকে তার ঘাড় উঁচু করে এইরকম দেখা — মনে হয় শেয়াল কিংবা শকুন। কিন্তু প্রেমলাল একটু অধৈর্য হয়। গরুটা এখনো বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও প্রেমলাল ঝোপের আড়ালে, তাকে এখন কেউ দেখছে না, তবু গরুটার চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসা জলের ফোঁটা দেখে প্রেমলাল ঘাড়টা নিচু করল।

বাঁধের ঢাল বেয়ে কলিন নেমে আসছে। একবার এদিকে তাকিয়ে ছাতিমতলায় শুয়ে থাকা গরুটা দেখল। কিন্তু বেশ দূর বলে সে অস্বাভাবিক কিছু টের পায় না। প্রেমলাল ঝোপের ফাঁক দিয়ে কলিনকে দেখতে পায় এবং টিভিতে যেরকম দেখা যায়, সৈন্যদের মতো, মাটিতে-শোয়া পজিশন নেয়। তার বুক ঢিস ঢিস করছিল। মাঠের আলপথে নেমে কলিনের চলে যাওয়া, ওই অবস্থাতেই প্রেমলাল দেখে। এবার সে মুন্ডুটা আবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। গরুটা একইরকম আছে।

কোমরে গোঁজা ছুরিটা বার করল প্রেমলাল। গরুটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন জিভ আরো অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। ছুরিটা খুলে ডানহাতে নিল প্রেমলাল। এখন আর আশেপাশে কেউ নেই। মাথার ওপর দাপুটে সূর্য আগুন ঢেলে দিচ্ছে জগৎ জুড়ে। বাতাসেও যেন একটা ছাই ছাই গন্ধ। বাঁ হাত দিয়ে ওপরের চোয়াল টেনে তোলার চেষ্টা করে প্রেমলাল। গরুর ওপরের পাটিতে দাঁত থাকে না। নীচের পাটির দাঁতের ফাঁকে বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিল সে। জিভটা ধরে টেনে অনেকটা বাইরে নিয়ে এল।

বাতাসে সেই পোড়া গন্ধটা এখন আরো কড়া। যেন আকাশ থেকে ধেয়ে আসা ওই আগুনের স্রোতে বাতাসও পুড়ে যাচ্ছে। সেই পোড়া বাতাস প্রেমলালের নাকমুখ দিয়ে তার ফুসফুসে ঢুকে যাচ্ছিল। সমস্ত শরীর জুড়ে রক্তের ভেতরে বয়ে যাচ্ছে আকালের বাতাস। লোহিতকণিকার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে গরমে। রক্তের ভেতরে জেগে উঠছে প্রাচীন বনারস। মোগলসরাই, দ্বারভাঙা হয়ে যোজনব্যাপী পথপরিক্রমা। হাজার বছরের বঞ্চনা, মানুষের ঘৃণা, ঠাকুরদার গল্প, আদিম ছুরি, শকুন, মরা গরু, ঢাক, বেল্ট, মানিব্যাগ, টাকা, ভাত কিংবা রুটি।

বাঁ হাতের মুঠোয় জিভটা ধরে ডান হাতে ছুরি চালায় প্রেমলাল। এবার তাড়াতাড়ি মরে যাবে ওটা। প্রেমলাল অধৈর্য হয়ে পড়ছিল।

প্রথমে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ অর্থাৎ চোনা, বাদে চোখের জল এবং এখন ওর রক্ত চলে যাচ্ছে মাটির গভীরে। দ্রুত।

কিছুটা যাওয়ার পর কলিনের মনে হল এখন একটা বিড়ি খাওয়া দরকার। যদিও কোষ্ঠ সাফ, কিন্তু পেটের বাঁ দিকে নীচে একটা ব্যথা চিনচিন করে যাচ্ছে। এটা অন্য কোনো কারণে

হতে পারে। বেশ কিছুদিন যাবৎ ভরপেট খেলেই এটা হচ্ছে। তবে খিচুড়িটা বড়ো সুন্দর হয়েছিল। পাঁচ জায়গায় ড্রাম বসানো। সবগুলো ড্রামের পেছনেই লম্বা লাইন। সে পাঁচ জায়গাতেই দু-বার করে লাইন মেরে পাঁচ দুগুণে দশ হাতা খেয়েছে। এক নং ড্রামের পেছনে তৃতীয়বার লাইন দিলে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক ছোকরা গোসাঁই-এর কলিনকে বড়ো চেনা চেনা মনে হয় এবং একটা লম্বা হাতা দিয়ে জয়গুরু বলে তাকে টেনে আনে। কাগজের প্লেট ফেলে কলিন পালিয়ে এসেছিল।

কোমরের কষিতে হাত দিয়েই কলিন বুঝল সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিড়ি দেশলাই নদীর পারে।

গরুটার সামনে দাঁড়ালে এখন স্পষ্টই বোঝা যায় ওটা মরে গেছে। যদিও খুব একটা বেশিক্ষণ ধরে রক্তক্ষরণ হয়নি, কিন্তু এই আকালের বছরে দুনিয়ার সমস্ত সবুজ প্রথমে হলুদ, পরে আস্তে আস্তে বিবর্ণ খয়েরি হয়ে যাচ্ছিল। সোনামনি, দীনবন্ধু, চুনিলাল, ভ্যাদরা বর্মন, জহিরুল — ওরা আর গোকুলদানা কিনতে পারে না। তখন কোটাশিঙে, বুগদা, শ্যামলী, ধবলী, পিয়ালা ইত্যাকার গোধনের রক্তের জোর কমে আসে, শুয়ে পড়লে আর উঠতে চায় না। পাঁজর দেখা যায়। একটুক্ষণের রক্তক্ষরণে সোনাবন্ধু মণ্ডলের বুধিগাই-এর মরে যাওয়া তাই কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। তার ওপর কালো পুরিয়ার অ্যাকশন।

সূর্য সরে যাওয়ার আগে যেখানে ছায়া ছিল, এখন সেখানে গনগনে রোদ। তার আঁচে ঝলসে যাচ্ছে সবুজ। ঠা ঠা রোদ্দুরে গরুটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মুখ থেকে গলা বেয়ে নেমে আসা রক্তধারার চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায়, কিন্তু সমস্ত রক্ত চুষে খেয়েছে গরম মাটি। গলকম্বলের নীচে সামান্য ভেজা ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায় না। তবু মরা গরু চিনতে কলিনের অসুবিধা হয় না। সে বিড়ি দেশলাই-এর কথা ভুলে গেল।

গরু এক আশ্চর্য জন্তু বটে। সে গাইগরু হোক, বাছুর বা ষাঁড়, মানুষের নিত্যকর্মে বেশ আছে। কত হাজার বছর আগে মানুষ পশুপালন শিখেছিল। তখন থেকে এই খুরওয়ালা প্রতিরোধহীন প্রাণীটি দোহনের জন্য মানুষের চিরকালের পোষ্য। সন্তানকে দুধে ভাতে রাখার জন্য, হলকর্ষণের জন্য, শ্রাদ্ধে উৎসর্গের জন্য মানুষ গরু পোষে। আবার বোকাসোকা লোক দেখলে সবাই বলে — শালা গরু। অবশ্য পুজোআচ্চাও হয়। পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি, কার্তিক মাসের অমাবস্যায় গো-পূজার নিয়ম আছে। দেওয়ালি অমাবস্যায় গো-বন্দনা উৎসবের শুরু। দ্বিতীয়া পর্যন্ত চলে। গরুর কপালে, শিঙে, ভালো করে তেল মাখিয়ে পেট ভরে খাওয়ানো হয়। গলায় শালুক ফুলের মালা, মাথায় ধানের শিষের মুকুট দিয়ে সাজানো। অমাবস্যার দিন বিকেলে গঠপূজা। রাত্তিরে গোয়ালে প্রদীপ জ্বলে। ঢাক ঢোল ধামসা বাজে। নাচ-গান, বাড়ি বাড়ি কপিলামঙ্গল পাঠ।

দেবতাও আছেন। তিনিই রক্ষা করেন গো-সম্পদ। গোরখনাথ, তিরনাথ, সোনা রায়, গাজী পীর। চাষাভুষোর গরু ছাড়া কী-ই বা আছে। তার তো আর ক্রেডিট কার্ড, কেব্‌ল লাইন, মোজাইক, মার্বেল নেই। তার রয়েছে বাঁশঝাড়, আলপথ, হরিমন্দির, বীজতলা, পদ্মপুকুর আর গরু। এই তো তার জীবনযাপনের মাটি আর বাতাস। এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই বেলা গড়িয়ে আসে। তো গরু চলে গেলে আর কী থাকে! মানুষ বড়ো আদর করে বাছুরের গলায় কাঠের ঠরকা (ঘন্টি) বেঁধে দেয়। গরু নিয়ে কত প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, গাথা।

ওই যে এক একঠেঙে নাচুনে ঠাকুর। একহাতে ডমরু, অন্যহাতে ত্রিশূল। তৃতীয় চক্ষু জ্বলজ্বল করে। সম্বৎসর পুকুরের ঠাণ্ডা জলে ডুবে থাকেন। যখন পৃথিবী পুড়তে থাকে, তখন পাটের ঠাকুর পুকুরের ঠাণ্ডা ঘর থেকে উঠে আসেন। তারও তো চাই এক ষাঁড়। কুমারী বলো, বাঁজা বউ বলো — সবখানে তার আসা যাওয়া। স্বপনে ও জাগরণে।

আর এই গরু যদি বাঁধা অবস্থায় পুড়ে মরে — গৃহস্থের বড়ো মুসিবত। তখন তাকে দাঁতে কুটো, গলায় দড়ি ঝুলিয়ে হাম্বা বলে প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

অনন্তকালের বোকাসোকা গরু মরে গেলেও উৎপাদন ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে। খাদ্য হিসেবে শরীরে শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা। ঢাকঢোল, জুতোচপ্পল, বেল্ট, মানিব্যাগ — পিওর লেদারের মহিমাই আলাদা। এমনকী গাড়িতে যদি ভালো চামড়ার ওয়াশার না থাকল, তবে মবিল লিক।

গরু যতক্ষণ চলে ফিরে বেড়ায় — ঘাস খায়, জাবর কাটে। তখন তার পিঠে মশা কিংবা মাছি বসলে গরু লেজ দিয়ে মশা-মাছি তাড়ায়। পেশির আক্ষেপে চামড়া কেঁপে ওঠে। মশা-মাছি উড়ে যায়। ওই চামড়ার তলা দিয়ে রক্তবহ-ধমনী, শিরা, উপশিরায় গরম রক্ত বয়ে যায়। কিন্তু মরে গেলে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর মশা-মাছি বসলেও লেজ নড়ে না। কলিন বুঝতে পেরেছিল।

গরু মরলে পেছনে সার বেঁধে অপেক্ষা করে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া, লোকাচার, পুরোহিত, শকুন ও মুচি।

এই সময়ে প্রেমলাল একটা মারাত্মক ভুল করে বসল। মরা গরুর খোঁজে নদীর পার দিয়ে মুচি ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে আকাশে শকুন খুঁজছে — এ তো হতেই পারে। সুতরাং সে দিব্যি ভালোমানুষের মতো মাদার গাছের পাশে, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

— মরি গেইসে। য্যানং আকাল পইছে।

কলিন ফিরে প্রেমলালকে দেখল। শালা ঠিক হাজির—মনে মনে বলল, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে তলপেটের বাঁ দিকটা টিপতে লাগল। প্রেমলালের কথার কোনো উত্তর সে দিল না। এখন আর বিড়ি দেশলাই-এর কথা মনে পড়ছে না। মাথায় অন্য ভাবনা খেলা করে। রক্ত কেন? খুরে বা মুখে ঘা-এর কোনো চিহ্ন নেই, শরীরে কোথাও আঘাতের লক্ষণ নেই, ছ্যারানির চিহ্ন নেই। মুখের কশ থেকে রক্তের ধারা গলকম্বল পর্যন্ত। তার নীচে মাটি এখনো ভেজা।

— না হয়। মনত্ লাগে কাহ মারি ফালাইসে। কায়?

— ক্যানং করি কও। মুই না জানো। মুই শেগুন দেখিয়া আসিনু।

— কুনঠে শেগুন?

কলিন তলপেটে হাত চাপা রেখেই এদিক-ওদিক শকুন খুঁজতে থাকে। ছাতিমগাছের ওপরে হাত আড়াল দিয়ে, নদীর বাঁধের ওদিকে।

চিনচিনে ব্যথাটা কমছে না। তরকারিটায় গণ্ডগোল হতে পারে। তৃতীয়বার শক্তমতো কী একটা দাঁতে ঠেকেছিল। কুশের দাঁত দিয়ে প্রবল চাপে কচকচ করে চিবিয়ে সেটা সে গিলে ফেলেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ, ফেলা যায় না।

শকুনের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। প্রেমলালের হাবভাব, চোরা চাউনি, আচমকা এখানে তার উদয় হওয়া — কলিন একটু একটু যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল। সে-ও হালুয়া চাষি বটে। তাদের মতো হেলে চাষিদের জীবনে, তাদের বেঁচে থাকায়, গরুর তাৎপর্য কেউ শিখিয়ে দেয় না। হাজার বছর ধরে পশুপালনের জীবন, তারপর কৃষিসভ্যতার পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে রক্তের ভেতর গরুর দাম ধার্য হয়। বাড়িতে ডাকাতি হলে, ছোটো ছেলেটা জলে ডুবে মারা গেলে মানুষ কাঁদে। কিন্তু জীবন বয়ে চলে পাঙা নদীর নিস্তরঙ্গ স্রোতের মতো। স্মৃতিতে ক্ষীণ একটা দাগ থেকে যায়। সেইবার বড়ো বানের বচ্ছর, মোর ছোটো বাউটা চলি গেল্—এসব কথা অনেক পরে আলোচনায় ওঠে। কিন্তু গরু চলে গেলে কৃষক বড়ো অভাগা হয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় অনেক বেশি।

কলিনের চোখ দুটো সরু হয়ে এল। প্রেমলাল একবার তার দিকে তাকায়, একবার চোখ সরিয়ে নেয়। কলিনের চোখের মণি খয়েরি। প্রেমলালের ধূসর, একটু যেন সব্জে ভাব আছে। কলিনের চৌকো চোয়াল, ভারী চোখের পাতা, দাড়িগোঁফ, ভুরু না থাকার মতো। গায়ের রং কালচে খয়েরি। বেঁটে শরীর, একটু থলথলে।

প্রেমলালের সরু থুতনি। লম্বাটে মুখ, টানা চোখ, ঘন কালো মোচ, গায়ের রং মরচে পড়া লোহার মতো। কলিনের চেয়ে অন্তত আধহাত উঁচু পেশিবহুল পাকানো শরীর।

কলিনের রক্তে বয়ে যায় দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে বার্মা, মালয়, উত্তরপূর্ব অসম, উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হয়ে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি — দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সমস্ত লক্ষণ। মঙ্গোলীয় রক্তে এসে মিশেছে কত নতুন রক্তধারা।

প্রেমলালের চেহারায় এখনো রয়ে গেছে আরা, বিহারশরিফ, গঙ্গাকে ওহ্পার হাজিপুর, সমস্তিপুর, দ্বারভাঙা, প্রাচীন মগধের লুপ্তপ্রায় অভিজ্ঞান। ঠাকুরদার মুখে শোনা, সে কতকাল আগে বনারস থেকে নাকি তাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। শোন, পুনপুন, গঙ্গা, কোশি — কত নদী পার হয়েছে। গ্রাম থেকে দূরে দূরে কখনো ঝোপড়ি বানিয়ে, কখনো কাপড়ের তাঁবুর নীচে, কখনো বা খোলা আকাশের নীচে দিন কেটেছে। ঝড়-জল-রোদ্দুরে গায়ের রং হয়েছে মরচে ধরা লোহার মতো।

সেইসব দিনগুলোতে সবসময় আকাশে চোখ রাখতে হত। শকুনের ছায়া মাটিতে পড়লে খবর হয়ে যেত। রামপুরিয়ায় ধার পড়ে। বুড়ো সর্দার সন্ধেবেলা রুইদাসী রামায়ণ পড়ে শোনায় বালবাচ্চাদের। জওয়ান লড়কা-লড়কি পেটভরে শুয়োরের মাংস আর মদ খেয়ে তখন বেহোঁশ।

এখন পায়ের তলায় নরম মাটি। শেকড় চলে গেছে পাঙা নদীর ধারে। গোটা সমাজটার স্বভাবধর্ম পালটে গেছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে রাজবংশী সমাজ, দাস পাড়া, সরকার পাড়া। এক ক্ষীণ জলধারা ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে বৃহত্তর জলভারের সঙ্গে। একটা গোষ্ঠীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো মিশে যাচ্ছে অন্য এক সমাজের সঙ্গে। মিছরির দানার মতো।

বেলদারদের একটা দল যাচ্ছিল নদীর বাঁধ-বরাবর। সব ওপারের। দিনভর কাঁধে জাল নিয়ে খালবিল চষে বেড়াচ্ছে। ওদিকে দাসপাড়ায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ঘর মিলে বস্তিটা। কলিন হাঁক দিলে দলটা এগিয়ে এল।

একটা মরা গরু পড়ে রয়েছে। তার এপাশে কলিন, ওপাশে প্রেমলাল। সামনে এসে দাঁড়াল মনঞ্জয় মালোদাস। ব্যাপারটা সে ঠিক ধরতে পারছিল না। গরুটা যে মরে গেছে, সেটা সে এক নজর দেখেই বোঝে। প্রেমলালকেও সে চেনে। মুচিপাড়ার লোক। জাতব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এখন এর-ওর জমিতে মুনিশ খাটে। কিন্তু এবার যা হাল, লোকজনের মুনিশ রাখারও মুরোদ নেই। প্রেমলাল জাতব্যবসাতে ফিরে গেল নাকি। মরা গরুর খোঁজ পেয়ে হয়তো ছুটে এসেছে।

ওপারের লোকগুলো বড়ো রগচটা। আশপাশের লোকজনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ঝামেলা হয়েছে। কথায় কথায় 'কাইট্যা ফালামু, পাঙায় ভাসাইয়া দিমু' বলে রাম-দা বার করে। তেমনি মুখ খারাপের তোড়। 'তর বুইনরে...তর মায়রে...' বলে যখন শুরু করে, যে শোনে তার মাথায় মুহূর্তে আগুন ধরে যায়। আর বড়ো একজোট হয়ে থাকে। একজনকে কেউ কিছু বললে, গোটা দাস পাড়া ছুটে আসে। রাম-দা, হেঁসো, লাঠি, বঁটি — কারো হাত খালি থাকে না। কয়েকবার হুজ্জত হওয়ার পর লোকজন একটু সমঝে চলে ওদের।

প্রেমলালকে বেলদারদের জিম্মায় রেখে কলিন দৌড়ল সোনাবন্ধুকে খবর দিতে। এ-গরু সোনাবন্ধুর। প্রেমলালই জানিয়েছে। মনঞ্জয়ের প্রথম লাথিটা সোজা প্রেমলালের পেটে পড়তেই ছুরিটা মাটিতে পড়ল। তখন প্রেমলালের মুখ দিয়ে আচমকা 'মাঈ গে' বেরিয়ে আসে। পেটে হাত চাপা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল প্রেমলাল রুইদাস। ছুরিটা পেটের নীচে, কিন্তু সবার চোখে ভাসছে। প্রেমলালের পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছিল।

ছুরিটা কুড়িয়ে নিল যুধিষ্ঠির। বাঁট থেকে টেনে খুলতেই সবাই দেখল রক্ত। কলিন তা হলে মিছে বলেনি। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে আর একটা লাথি ঝাড়ল মনঞ্জয়। ঝাড়ুক, সর্দারের একটা বউনির হক থাকে। তা সে পড়ে-পাওয়া মেয়েছেলে হোক, আর গাঁজার কলকে হোক। অতঃপর একে একে যুধিষ্ঠির, অনিরুদ্ধ, বাণেশ্বর, পরি—সবাই গণধোলাই-এ অংশগ্রহণ করে। তখন কলিন — 'মুই পং করি আসিছু', বলে গাঁয়ের দিকে ছুটল। সোনাবন্ধুকে সে-ই প্রথম খবরটা দিতে চায়। এখন আর পেটের ব্যথাটা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। বরং সে লম্বা লম্বা পা ফেলে মুরগি কিংবা ডাহুকের মত দৌড়চ্ছিল।

এখন সূর্য উঠবে। পাঙা নদীর পুবপাড় জুড়ে প্রথমে কমলা-লাল, আস্তে আস্তে হলুদ কুসুমের মতো রং ধরবে। ছাতিম গাছের ও-দিককার পাতাগুলো উজ্জ্বল, এ-পাশের পাতাগুলো কালচে সবুজ দেখাবে।

শরীরে অজস্র ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সমস্ত রাত প্রেমলাল ছাতিমতলায় শুয়ে ছিল। সমস্ত রাত ধরে তার শরীরের বিভিন্ন ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে। মাটির গভীরে চলে গেছে খয়েরি তরল। বুভুক্ষের মতো তৃষ্ণার্ত মাটি চেটেপুটে খেয়েছে প্রেমলাল রুইদাসের রক্ত। মাটি যেন সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে হাঁ করে আছে। ধুলোয় ঢাকা নোংরা এই সংসারকে ধুয়ে মুছে দেবে বলে আকাশ থেকে জল নামেনি এবার। মাটি চুষে খায় গরু ও মানুষের রক্ত। করালবদনা হাঁ করে আছে। জগৎ ভরে যাচ্ছে ধুলোয়। নদীর দিক থেকে বাঁধ পেরিয়ে এক-একটা বাতাস ছুটে আসে। সে-বাতাসের লকলকে তাপে ছোট্ট এক-একটা ঘূর্ণি ওঠে। খয়েরি পাতা ধুলো-সহ শূন্যে ওড়ে। নাচ দেখাতে দেখাতে বে-শরম নাঙ্গা আওরতের মতো ঘূর্ণিটা টেনে নেয়

মুখিয়ার ধুতি, ধনেশ্বর দেওয়ানের লুঙি, এমনকী টান মারে শিশুদের কাঁথাকানি। বাতাস গরম হলে এ-রকমই ঘূর্ণি ওঠে। সব কিছু টেনে নিতে চায় ঘূর্ণির কেন্দ্রে। সব কিছু উড়ে-পুড়ে যায় আকালের দিনে। খরার সময়। গরম হাওয়ার দিনগুলোতে। ওই ঘূর্ণির কেন্দ্র, যার নাম 'চোখ' — গিলে খায় বীজধান। মানুষের সারাৎসার।

প্রেমলালের ক্ষতস্থানে ধুলো লেগেছিল। গ্যাংগ্রিনের অনতিক্রম্য ভাইরাস দ্রুত কলোনি স্থাপনের তোড়জোড় শুরু করে। আকালের দিনে কোথাও অ্যান্টিবায়োটিক থাকে না। তখন ধুলোর রাজত্ব। প্রতিরোধের প্রাচীর পলকা হয়ে যায় সবুজের অভাবে।

মনঞ্জয়ের লাথি, স্বপনের ঘুষি এবং যুধিষ্ঠিরের লাঠি তাকে পেড়ে ফেলেছিল। উপরন্তু সোনাবন্ধু এবং তার ভাইপো দীনবন্ধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লুঙি তুলে তার মুখে মূত্রত্যাগ করেছিল। কাকা-ভাইপো একসঙ্গে এ-কর্মটি করে। তাদের যথার্থ ঘৃণা নির্গমনের এর চেয়ে ভালো কোনো পথ জানা ছিল না।

প্রেমলালের মাথায় চোট লেগেছিল। সেটাই ছিল মোক্ষম। আসলে, ছুরিতে রক্তের দাগ — নইলে প্রেমলাল বেঁচেও যেতে পারত। বিষের ব্যাপারটা তো কেউ বুঝতেই পারেনি।

সবাই ভেবেছিল প্রেমলাল মরে গেছে। তখন তারও জিভ কেটে দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে। তাকে যারা ঘিরে রেখেছিল, সেখানে ছিল তিনজন বর্ণহিন্দু। দেশবন্ধু মজুমদার, অনিল দত্ত, অঘোর ভট্চাজ। ছিল নম-দের একটা দল। বাকি সব রাজবংশী। প্রেমলালেরও জিভ কেটে দেওয়ার প্রস্তাব উঠলে একটা সানন্দ হুংকার ওঠে। সেই চিৎকারে আবহমান কালের আদিম হিংস্রতা ছিল। গরুর হত্যাকারীর প্রতি নিষ্ঠুরতার অনুমোদন ছিল। এই বিস্তীর্ণ ধুলো, গরম বাতাস, পোড়া নীল রঙের আকাশের জন্য অসহায়তা ছিল। জলের জন্য হাহাকার ছিল।

এই অসহায়তা ও হাহাকার জন্ম দেয় নৃশংসতার, হিংস্রতার। প্রকৃতির জলহীনতার মতো পুরুষেরও হৃদয় হয় নির্জলা। নাম-না-জানা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ধুলোর আড়ালে আড়ালে সংসারে ছড়িয়ে পড়ে। ঝলসানো বাতাসের ঘূর্ণি খাক করে দেয় যা কিছু দুর্দিনের সম্বল। ওপরে যা ছিল মেদুর নীল, পুড়ে পুড়ে এখন জমাট ছাই। এই হল উৎসন্নে যাবার সময় — সেই ত্রাসে, ছক-কাগজ থেকে উৎখাত হওয়ার আতঙ্কে যা কিছু মনে হয় অকল্যাণকর, অশুভ, বেঁচে থাকা অবাঞ্ছিত জীবাণু, তাকে টিপে মেরে ফেলার জন্য নিরুপায় মানুষের হিংস্রতা জেগে ওঠে। জলহীনতার শেষ প্রান্তে এসে অস্তিত্ব যখন খটখটে হলুদ, ন্যাবা যেমন, তখন 'মার মার' শব্দে শতাব্দী কেঁপে ওঠে। ডাইনির মাংসপোড়া গন্ধে উল্লাস শোনা যায় হাজার হাজার বছর ধরে।

প্রেমলালের জিভ অবশ্য শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকে। প্রথম কারণ, সবাই ভেবেছিল প্রেমলাল মরেই গেছে। দ্বিতীয় কারণ, লাঠি আর ছুরি এক কথা নয়। এই বর্ণহিন্দু, নম-দের দল এবং স্থানীয় রাজবংশী সমাজ লাঠালাঠি, ঘুষোঘুষির মাধ্যমে ঘৃণা প্রকাশ করেছে চিরকাল ধরে, কিন্তু ছুরির কথা মনে পড়েনি। ওই ধাতুর ব্যবহার — কাস্তে, কোদাল, নিড়ানি এবং লাঙলের ফালে। কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় জড়িত অবশ্যম্ভাবী এই শক্ত এবং প্রাচীন ধাতুকে রক্তক্ষরণের হাতিয়ার এরা কোনোদিন করেনি। তৃতীয়ত, এমনিতেই প্রেমলালের মরে যাওয়ার কথা। মানুষ মরলে পুলিশ আসে। মনঞ্জয়ের দল এবং ভাইপো-সহ সোনাবন্ধু আন্ডারগ্রাউন্ডে যায়। পাঙার ওপারে। বাংলাদেশে।

যতক্ষণ অন্ধকার, প্রেমলাল দিকচিহ্নবিহীন যেন। অন্ধকারে, একা, ছাতিমতলায়। সে পুব-পশ্চিম গুলিয়ে ফেলছিল। কোনদিকে নদী। হরিমন্দির কুনঠে। যখনই তার মনে হয় সে দিক ভুলে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মাঘের ভোরে লাঙলের ফলার মতো একটা তীক্ষ্ণ কঠিন কনকনে অনুভূতি তার বুকের ভেতরে ছুঁয়ে দিচ্ছিল। উষ্ণ রক্তের পৃথিবীতে, চলমান জগৎসংসারে, বহমান জীবনের স্রোতে নিজের অস্তিত্ব জাহির করার উদগ্র বাসনায়, ছক-কাগজের ছেদবিন্দুতে, নিজের দখল কায়েম রাখার লক্ষ বছরের অভ্যন্তরীণ তাগিদে, প্রেমলাল চেষ্টা করে যাচ্ছিল মাথাটাকে সাফ রাখার।

অথচ ঘুম পায় শুধু। মনে হয় চুলোয় যাক উত্তর-দক্ষিণ। 'মাঈ গে' — উচ্চারণের চেষ্টা করলে তার ঠোঁট দুটো শুধু অন্ধকারে নড়ে ওঠে। সে 'মাও রে, মাও' একথা না বলে 'মাঈ গে' বলার চেষ্টা করে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক উৎসমুখী উল্লম্ফন সে খেয়ালই করে না।

শেষে গোল বাটিটার একদিকে কালো পাতলা হয়ে গেল। 'ই হে পুরব হো' — নিশ্চিত হয় প্রেমলাল।

পাটের আঁশ পাকিয়ে বেশ দড়ি বানানো হয়েছে। গরুটার সামনের এবং পেছনের চারটে পা সেই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। একটা পুরোনো বাঁশে ঝুলিয়ে অন্ধকার থাকতেই ভাগাড়ে ফেলে আসবে বলে দলটা রওনা হয়। মাংসখেকো ব্যাকটেরিয়া কাজ শুরু করে দেবার ফলে বুধি ফুলে উঠেছিল।

চক্ষু দুটি প্রতিসারক মাধ্যমমাত্র। মানুষ আসলে মগজ দিয়ে দেখে। কিন্তু মগজে যদি রক্তের বহমানতা কম থাকে, সেই দেখাতেও ম্যাজিক আসে। তা ছাড়া ছাতিমতলা থেকে নদীর বাঁধ কাছেও নয়। উপরন্তু আলোর স্বল্পতা।

প্রেমলাল দেখার চেষ্টা করছিল। একটা মিছিলের মতো মনে হয় দলটাকে। কতগুলো ছায়া চলে যাচ্ছে। কাঁধে কিছু একটা ঝুলছে।

হাজার বছরের রক্ত এখনো শরীরে সামান্য অবশিষ্ট আছে। প্রতিটি রক্তকোষে সংকেতে লিপিবদ্ধ থাকে বেঁচে থাকার নিশানা, কায়দাকানুন, আপৎকালীন ব্যবস্থা। মানুষ কত পথ পাড়ি দিল। নিরক্ষরেখার উষ্ণতা, বরফের হিংস্র কামড়, ঘুমমাছি, মড়ক, যুদ্ধ — তবু প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে, মরণজয়ী হয়ে উঠতে চায়। বীজের ভেতরে অপেক্ষা করে সুসময়ের, নরম বীজতলার।

প্রেমলাল শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়ার আগে ফিসফিস করে — 'ই হে পুরব হো'। কিন্তু এখন আর ভৌগোলিক পুবদিক নয়, ওই মরা গরুর চলে যাওয়ার দিকেই পূর্বদিগন্ত, সিদ্ধান্তে আসে।

বিশ্বরূপ

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

এ-ঘরে যে-খাটের ওপর আমি শুয়ে আছি ঠিক তার ওপরেই আমার বাবার শেষনিঃশ্বাস পড়েছে আজ থেকে ঠিক তিন মাস আগে। একে খাট না বলে অনেকটা হাসপাতালের বেড-এর ধাঁচ বলা যায়। তবে লোহার বদলে কাঠের তৈরি আর ভারি পুরোনো। এর ওপর মাঝে মধ্যে আমার পিতামহ দুপুরে গড়াতেন। তারও আগে তাঁর মা। আমার বাবার ঠাকুমা— আমরা যাঁকে বড়োমা বলে ডাকতাম। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, সে-বছরই তিনি গত হন। প্রায় একশোর কাছাকাছি বয়স পেয়েছিলেন। তিনি কিশোরী অবস্থায় একবার বিদ্যাসাগরকে দেখেছিলেন।

এ-বাড়িতে এখন আর আমরা কেউ থাকি না। বাবা-মা-র সঙ্গে দীর্ঘ বছর কোনো সম্পর্ক ছিল না এক বাড়িতে বাস করেও। কারণটা সামাজিক আর অসামাজিকতার মাঝামাঝি। ফলে আজ থেকে ঠিক বারো বছর আগে মা আর আমার স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাই কিংবা বিতাড়িত হই। আমরা আলাদা একটি পরিবার গড়ে ইছাপুরে বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে আরম্ভ করি। বাবা এই প্রকাণ্ড বাড়ি আগলে একাই পড়ে থাকেন—তাঁর ভাষায় স্বপাক খেয়ে। অথচ স্বপাকাহারী বলতে যে ধরনের মানুষ ধরা হয় বাবা তার ধারে কাছেও নেই। দেবদ্বিজের থেকে চিরকাল শতহস্ত। গলায় পইতে নেই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই। সেই সঙ্গে উপরি হল প্রায় অহোরাত্র মদ্যপান। বাবা নিট রাম দিয়ে ভোরবেলা মুখ প্রক্ষালন করতেন। থামতেন রজনী নিশীথে। অথচ মহালয়ার দিন দেয়ালের পেরেক থেকে পইতে পেড়ে পিতৃতর্পণ করতেন পাঁজি ধরে। দোহারা গড়নের মানুষটির শরীরে বার্ধক্য আর রোগভোগ চেপে বসেনি। দিনভর সাইকেলে চরকিপাক। দিনান্তে একবার, বিকেল নাগাদ একবাটি মাংস আর ভাত। এই বাবা চলে গেল পর পর দুটি সেরিব্রাল আক্রমণে—প্রায় দু-বছর বিছানায় শুয়ে। দেখাশোনা করত একজন সেবিকা। আমার ছোটো বোনের কাছেই বিয়ে হয়েছে। তারাও দেখত। আর হপ্তায় হপ্তায় আমি আসা যাওয়া করতাম। আমরা যখন এ-বাড়ি ছেড়ে যাই, বাবা তখন বাহাত্তর। আর চলে যাওয়ার দিন তিনি চুরাশি।

এই খাটের নীচে পর পর তিনটি পেরেক পোঁতা। একটি আমার বড়োমা অর্থাৎ বাবার পিতামহীর দরুন, একটি আমার ঠাকুরদার জন্যে। আর তৃতীয়টি সম্প্রতি, আমার বাবার কারণে। মা-বেটা দুজনেই ঠিক এইখানটিতে চলে গিয়েছিলেন মেঝেয় পাতা বিছানায়। বাবা গেল খাটে।

বাবা চলে যাওয়ার তিন মাস পর এ-ঘরের তালা খোলা হল। ভেতরে ঢুকলাম আমি। অন্ধকার অন্ধকার পুরোনো আমলের ঘর। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দিলাম। আলো জ্বেলে দিলাম দিনের বেলাতেও। মাকড়সার জাল আর ঝুল বেশ ভালোভাবেই দখল করে নিয়েছে বাবার পরিত্যক্ত সংসার। দেয়ালে ঠাকুরদার ছবির বুকে টিকটিকি। শূন্য আলনায় বাবার কাউবয় টুপি, যেটা পরে তাঁর সাইকেল ভ্রমণ হত। তার নীচে বাড়িতে পরবার হাওয়াই

চপ্পল। একটা জলের জাগ। ঠাকুরদার আমলের দম-দেয়া ঘড়িটা বন্ধ। তার ওপরে বিপ্লবী সূর্য সেন আর মাদার টেরেজা। ওধারে টেবিলের ওপর কয়েকটা ডায়েরি, কিছু কাগজপত্র, জলখাবার গ্লাস, ডট পেন আর একজোড়া বাঁধানো দাঁতের পাটি। জানলার ধাপে জনতা স্টোভ, থালা, বাটি, ছোট্ট হাঁড়ি আর এক বোতল কেরোসিন।

সঙ্গে করে একটু চাল-ডাল-আলু আর ডিম এনেছিলাম। একসঙ্গে চাপিয়ে দেবো। কিন্তু মনে হল—কী আশ্চর্য, এ-ঘরে বাবার একটাও ছবি নেই তো! পরে আরো মনে পড়ল, এই তিনতলা কিন্তু মোটামুটি বড়োসড়ো বাড়িটার কোথাও বাবার কোনো ছবি টাঙানো নেই। তবে মজার কথা হল ছবি আছে আমার পিতামহের, তাঁর মা জননী—আমাদের বড়োমার। দিব্যি চকচকে ঝকঝকে জীবন্ত ছবি। বাবা আমাদের ভেতর-বাগানে বোগেনভেলিয়া গাছের সামনে বসিয়ে তুলেছিলেন। পশ্চাৎপটে এ-বাড়ির ভেতর-রোয়াকে দাঁড়িয়ে বাবার মামাতো ভাই গণেশকাকা; পাজামা পাঞ্জাবি, ফাঁপানো কোঁকড়া চুল, চায়ে চুমুক মারছে। লম্বা খড়্গের মতন নাক। বাবার নাকের ধারাও অমনি। তাঁর মাতৃকুলের মতন। যাকে বলা হয় উন্নত নাসা—তার চেয়েও অধিক। একমাথা কোঁকড়ানো চুলের অধিকাংশই কাঁচা। কেবল কপালের এক পাশ থেকে এক গোছা পাকা চুলের বক্রেরেখা ওপরে ঠেলে উঠেছে অনেকটা ইন্দিরা গান্ধির স্টাইলে। কঠোর বজ্রপুরুষ বাবার মুখের ধাঁচে কোথায় যেন ইন্দিরার কমনীয়তা লুকিয়ে ছিল। বিশেষত টলমল অবস্থায় তাঁর আয়ত আর প্রশস্ত চক্ষুজোড়া কি যে রমণীয় আর রোমান্টিক বোধ হত। কে বলবে চরিত্রটি ঠিক তার বিপরীত। তা না হলে জীবনে পরনারীর বালাই না নিয়েও আমাদের সুন্দরী মায়ের সঙ্গে তাঁর চিরকাল বিসম্বাদ। হরেক কারণের মধ্যে এক হল অপরিমিত মদ্যপান। দ্বিতীয়টি আমার মামার বাড়ির অকারণ হস্তক্ষেপ আমাদের সংসারে, তাঁর ধারণা আন্দাজ। আমার দাদু অর্থাৎ মাতামহ অতীব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রেলের অফিসার আর দিদিমা ততোধিক শান্ত ধীর। এখানে ঘটি-বাঙালের চোরা বিবাদ বর্তমান ছিল। বাবা খাস বর্ধমান আর মাতৃকুল কাঠ ময়মনসিং। মনে আছে ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে গেলে মামা-মামীরা আমায় বদ্ধমেনে ভুত বলে পেছনে লাগত। সে-নিয়ে বাবা-মায়ে দণ্ডকারণ্য অবস্থা।

বাবার মতন ওইরকম নাকপ্রধান চেহারা আমরা চার ভাইবোনের কেউই পাইনি। আমার পরে যে বোন, সে বড়ি-নাকি শিলিগুড়ি প্রবাসিনী। পরের ভাই দিল্লিস্থ এবং কেন্দ্রীয় সরকারি আমলা। ছোটো বোনের কাছেই সংসার। তবে তার আর আমার মুখাবয়ব কতকটা বাবা বাবা। বিশেষ করে চোখ আর চুলের প্রসঙ্গে। তবে আমার নাক প্রসঙ্গে মা-র কাছে শুনেছি, শিশুকালে বাবার পিসিমা বলতেন — নাক ডুবু ডুবু চোখ ভাসা, তবে জানবে ছেলে খাসা। সে-সময় আমার মা আমায় রোদে তেলেভাজা করার সময় তেলে আঙুল ডুবিয়ে আমার নাক টেনে টেনে যাকে বলে চুঁচে দিয়ে নাক লম্বা করার বৃথা চেষ্টা করত।

ভেতরের দরজা খুলে বারান্দায় গেলাম। জানলাগুলো খুলতে গিয়ে দেখি কোথাও কোথাও উই মচমচ করছে। একরাশ নারকোল ছোবড়া জানলার বেদিতে। গামবুট, জুতো পালিশের ব্রাশ, খুরপি, হাত-কোদাল কি নেই। ও-ধারের ভাঁড়ার ঘরের দরজা হা হা করছে। ও-ঘরে মা শুত। খানকতক চেয়ার, খাবার টেবিলটা বেঁকে আছে, বহু প্রাচীন লম্বাটে ড্রেসিং টেবিল,

দু-মানুষ পরিমাণ উঁচু কাঠের আলমারি। তার মাথায় মদের খালি প্যাক—বড়ো বড়ো কাগজের বাক্স। ক-খানা উইয়ে খাওয়া বিকট ছবি। ফ্রেম কাচ সবই আছে, মাঝখানের ছবিটা ফাঁকা। ভেতর-রোয়াকে দাঁড়িয়ে উঁচু দো-ফলা আমগাছটায় দেখলাম প্রচুর আম ধরে আছে। নীচে বেশ কিছু হনুমান-খাওয়া আধাখেঁচড়া আম ভূপাতিত অবস্থায়। ঢ্যাঙা সুপুরি গাছতলায় বৃদ্ধ সুপুরিদের এলোমেলো বিছিয়ে থাকা। পুরোনো টিনের-চাল গোয়ালের দিকে ঘন গাছপালা, বুনো ঝোপ। পরিত্যক্ত খাটা পায়খানার সামনে ক্ষীররঙা হাজারি নারকেল গাছ খাঁ খাঁ। বেশ উঁচু পাঁচিল টপকানো সহজ না হলেও, হয়েছে বোঝা গেল। ইঁদারার পাড়ে ঝিলিমিলি বর্ষা ঋতুর লিচু গাছ। ছেলেবেলার কামিনীগাছটি বিচিত্র এঁকেবেঁকে একজন ন্যুব্জ মানুষ। গোয়ালের ভাঙা টিনের চালের ওপারে গাঙ্গুলিদের ঘোর ঘোর বাগানের আন্দাজ। তার এধারে বাবার পোঁতা আর একটি মস্ত হিমসাগর। নালির টঙে টাইমকল বয়ে জল পড়ে চলেছে ছড়ছড়িয়ে। ডান পাঁচিলের ওধারে চৌধুরিবাড়ির ছাদে রাজমিস্ত্রী কীসব পেটাপিটি করছে। বাঁ দিকে টিভি, রেডিও-মেকানিক টাকুদের দোতলা ঘরে পুরোনো দিনের মহম্মদ রফি গাইছেন — বাহারো ফুল বরসাও, মেরা মেহেবুব আয়া হ্যায়...। ছেলেটার পুরোনো ডিস্ক রেকর্ডের বাতিক। আর রফি বলতে অজ্ঞান।

বালতি ভরে জল এনে হাঁড়িতে ভাত ইত্যাদি চাপিয়ে বাবার খাটের সামনে নিচু চেয়ার টেনে, খাটে পা তুলে দিয়ে বসে প্রথমেই মনে হয় বাবার মাথাটা কোন দিকে ছিল। পা একটু সরিয়ে মাঝখানে রেখে এবার সিগারেট ধরাই বেশ লম্বা ধোঁয়া সহকারে। বেশ একটা পিকনিক পিকনিক মেজাজ। হাতব্যাগটা টেনে রামের বোতলটা টেনে নিই। তুলে নিই ছোলার প্যাকেট। ছাপোষা সামান্য সরকারি চাকরিতে এ-বিলাস না মানালেও মাঝে মধ্যে ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যাই বইকি। বিশেষ করে এমন নিষ্কণ্টক আর রাজকীয় পরিবেশে এ-সুযোগ কে ছাড়ে। তবে নিষ্কণ্টক কথাটা ভুল বলা হল। এর আগে বহুবার বাবার বোতলে জল মেরে ও-কর্ম সেরেছি। সেই সঙ্গে টুকটাক কবিতা লেখার সুবাদে ওতে আমার অধিকার আছে। ঈশ্বরগুপ্ত তো এ-বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ। বারা টের পেয়ে যেত কিকটা ঠিক মতন হচ্ছে না বুঝে। আমায় কিছু বলত না। তবে বোনের কাছে গিয়ে নালিশ জানাত, বাবলু এলে এবার থেকে আমার ড্রিংকস লুকিয়ে রাখতে হবে। ও তো দেখছি পাকা চোর। খেতে চাইলে কি দিতাম না। প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে...

তবে বাবার মতন নিট নিতে পারি না আমি। গ্লাসে দেড়খানা, মানে পাতিয়ালা পেগ সাজিয়ে জল ঢেলে দিই বেশ খানিক। স্যরি বাবুজি, (বাবাকে আমরা ওই নামেই ডাকি) জল ছাড়া পারি না। তোমার মতন লোহার লিভার কোথায় পাব।

বাবুজি মাথা কাত করল, হুঁঃ, রাবিশ। আমরা হলাম শাক্ত বংশ। আমার বাবা ইসকুল মাস্টার আর অনুকূল ঠাকুর করে একজন একসেপশান। তবে বর্ধমানে দেশের বাড়িতে, আমার ঠাকুরদা, বংশের দেবী সিদ্ধেশ্বরীর নিত্য পুজোরি ছিলেন। পালা-পাব্বণে স্বহস্তে পাঁঠা বলি দিতেন। আর মদ না হলে তন্ত্র হয় না। বাবা রোজ একশো আটটি নিশ্চক্র বেলপাতা যূপে দিতেন। একটি পাতায় যদি কলঙ্ক থাকত আর রক্ষে নেই। বাবার পিঠে খড়ম ভাঙতেন ঠাকুরদা।

— হুঁ, দাদুর কাছে শুনেছি, তোমার ঠাকুরদা নাকি সকাল থেকে পুজোয় বসতেন। দরজা খুলতেন দুপুরবেলা। তখন তাঁর চোখ টকটকে লাল। সেই সঙ্গে দু-হাতের তালু আর বুকের মাঝখানটাও।

— তা হলে। তা হলে। ইট প্রুভস্ দ্যাট, হি ওয়াজ এ রেগুলার ইয়ে — মানে মদ খেতেন। বাবা মাঝখানে একটা গ্যাপ। আর একটা গ্যাপও আছে।

— কী গ্যাপ?

— সেটা আমার বাবার সময় থেকেই। আমার ঠাকুরদা রোজ পুজো সেরে একদলা আখের গুড় আর জল খেয়ে থেলো হুঁকো হাতে কালীমন্দিরের সামনেকার মেটে রাস্তার ধারে গিয়ে বসে থাকতেন। বেলা যতই হোক না কেন, যে-কোনো একজন অভুক্ত অতিথিকে বাড়িতে এনে যা জুটত খাওয়াতেন। তারপর নিজে সেই বিকেল নাগাদ ভাতে বসতেন। একাহারী ছিলেন তো। আমরা আর সেটা পারি না।

— তোমার ঠাকুরদা ওই অজ গ্রামে মদ পেতেন কোথায়?

— হুঁঃ, ফুল। আরে বাবা, বিলিতি না হলেও ধান্যেশ্বরী তো মিলত। মদের ইতিহাস তো প্রাচীন। কিস্যু জানো না অথচ কোব্‌তে লেখো।

— খোঁচা মারা অব্যেসটা তোমার গেল না।

— খোঁচা মারা নয়, সত্যি কথা বলা। রাঢ়ের লোকের এটা একটা ফিচার। তোমার মতন ময়মনসিং-বদ্ধমান খিচুড়ি ফিরিঙ্গি নই আমি।

— এই তোমার মুশকিল। কথায় কথায় মাকে টেনে আনা।

— টানব না। ওই মহিলা — তোমাদের গর্ভধারিণী, আমার জীবনটা একেবারে স্পয়েল করে ছেড়ে দিলেন।

মুখে এসে গিয়েছিল—বিয়ে তো করেছ প্রেম করে। কেউ তোমায় গছিয়ে দেয়নি। কিন্তু বলি না নতুন করে অশান্তির ভয়ে।

বাবুজি আবার কপচায় — আরে বাবা আমি প্লেয়ার মানুষ। ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলেছি, তারপর নাটক করেছি, আবৃত্তি করে, মানে একবার 'বিদ্রোহী' করে স্বয়ং নজরুলের হাত থেকে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়েছি কাঁচরাপাড়ার রেলওয়ে মঞ্চে। আমি কাউকে কখনো পরোয়া করিনি, করবও না। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যি সত্যিই তোমরা আমার ঔরসে হয়েছ তো! যতসব মেনিমুখো।

এর চেয়েও কটু কথা হাজারবার শুনেছি বলে ছিঃ বলি না। কারণ বললেই বাবুজি বলবে — তা হলে আমি কি বেজন্মা!

এ-কথা শোনার আগেই আমার পিতামহ — যামিনী রায় ধাঁচের আদল — সু-অর্থে পণ্ডিত আর সজ্জন মানুষ, দু-কানে আঙুল ঠুসে বলে উঠলেন — রামশ্চন্দ্র রামশ্চন্দ্র। এই জন্যেই তো বলি ভাই, ও যে কী করে আমার ছেলে হল! আমার দেহান্ত হলে তুমি আমার মুখাগ্নি করবে। না হলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

আমি দু-পেগের শেষাবস্থায় একটি চমকাত্মক ইঁক্ করি। দাদু ইহশরীরে আমায় এ-অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলে কি বলতেন! অতএব তিন নং ঢালা জরুরি। ওদিকে স্টোভে ভাত-ডিম-আলু

চমকে চমকে উঠছে। উঠে গিয়ে ঢাকনাটা সরিয়ে দিই। ধোঁয়ার ঝাঁজ আমার চোখ চটকে দেয়। হাতা দিয়ে কিঞ্চিৎ ভাত তুলে টিপে দেখি গলে পাঁক। তাড়াতাড়ি স্টোভ নিবিয়ে দিই জলের ছিটে মেরে। বিশ্রী পোড়া কেরোসিন আমায় আর একবার চটকে দেয়। পিতামহ বলে ওঠেন — এ-বাড়িতে আমার একখানা কালো পাথরের থালা আছে। কানা উঁচু। হরিদ্বার থেকে কেনা। তুমি ওতে ভাত খেতে পারো।

— ডিমসেদ্ধ আছে যে। তুমি তো নিরিমিষ।

— আরে ভাই, তুই একবার ছেলেবেলায় আমার পাতে মুতে দিয়েছিলি। আমি ভাত সরিয়ে জল হাত বুলিয়ে ওই থালাতেই খেয়েছিলাম। ডিম আছে তো কি হয়েছে!

বাবুজি হেসে বলে — আলু-ডিম-ভাতের সঙ্গে একটু নিট রাম আর কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ মেখে খেয়ে দেখো কি ফ্যানটাসটিক্। আরে বাবা জীবনটাই তো এক্সপেরিমেন্ট। এখন না করলে আর করবে কবে! হুঁঃ।

বাবার পিতামহী, আমার বড়োমা দু-পা ছড়িয়ে বসে, কোলের ওপর জামবাটি রেখে আটাভাজা খেতে খেতে বলে ওঠে — আমি কোনো কম্মের নই গো ঠাকুরঝি, ভালো করে দুটি ভাত বাড়ো, আমি বালস পোয়াতি। এত কুঁড়ে হলে হয়? দুটো আলুও তো ভেজে নিতে পারতিস ওই বাটিতে।

— 'বালস' মানে কী?

ঠাকুরদা কপচান — মানে, মনে হয় 'বাল' মানে বালক বা শিশু।

— কেমন একটু গোঁজামিল মনে হচ্ছে না?

বাবুজি মাথা নাড়ে। — কোব্‌তে লিখে লিখে মাথাটাই ব্লান্ট হয়ে গেছে। সবটাতেই প্রশ্ন।

ঠাকুরদা যামিনী রায় সম পাকা ভ্রূ-সমেত চশমা নাচান। — যে-মানুষের প্রশ্ন নেই সে মানুষই নয়। ইমপোটেন্ট মস্তিষ্ক।

— বাঃ, বাবা, বাঃ। বেড়ে বলেছেন। তবে আমার মস্তিষ্ক, মানে স্মৃতিশক্তি এখনো এ-বয়েসেও কীরকম তা তো সবাই জানে। ও সব বই-টই আমায় দেখতে হয় না। কী শুনবেন বলুন, 'দেবতার গ্রাস'? 'এবার ফিরাও মোরে'? 'বিদ্রোহী'? বলুন বলুন বাবা। বলো বাবলু, তুমিও বলো।

ভেতর-বাগানে দুপুরের কুঁড়ে কাক ডেকেই চলে। বিশ্রী একঘেয়ে, কতকটা আর্তনাদের কাছাকাছি। চৌধুরিবাড়ির ছাদে মিস্তিরিদের উচ্চ গলায় খেউড় আর হরেক প্রকার শব্দ। এ-পাশে রফি-প্রেমিক টাকুর রেকর্ড-প্লেয়ারে পরের গান বলে ওঠে — ও দুনিয়াকে রাখওয়ালে...। এ-গানের রেকর্ডিং-এর সময় বাজারে গপ্পো আছে, একেবারে শেষের দিকে ওপরে, আরো ওপরে গলা তুলতে গিয়ে তাঁর নাকি গলা চিরে রক্ত বেরিয়েছিল। এ-নিয়ে গান গবেষকরা ভালো বলতে পারবেন। আমার মতন দু-চার কিসিম পদ্যজীবীর কাজ নয়। কিন্তু বাবুজির আবৃত্তি শুনে শুনে বালককাল থেকেই আমার কখনো অবাক ঘটেনি। বরাবরই এমন এক্সটেম্পোর শুনে শুনে অভ্যস্ত আমি। আমার ভাই বোনও। তাই যখন তাবড় আবৃত্তিকাররা নাকের মুড়োয় চশমা ঝুলিয়ে পদ্যপাঠ করেন তখন এই আটকোঠা পার মানুষটির জন্যে আমার বিরক্তি বোধ হয়। কী দরকার ছিল এত রক্তঘাম পাত করে মুখস্থ করার। চটজলদি

থাকতে কোন উন্মাদ এমন কর্ম করে। আমার এই ভাবনা কিংবা মনে করার ফাঁকতাল দিয়ে বাবা বয়ে চলেন — সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত/তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো...

পিতামহ বলে ওঠেন — গীতার বিশ্বরূপদর্শন-এর স্তোত্রটাও তো তোমার মুখস্থ ছিল। কিংবা ব্রুটাসেস সরিলকি?

বাবুজি মিচকে মিচকে হাসে। — আরে বাবা আপনিই তো বলতেন আমার দ্বারা কিস্যু হবে না। আমি নাকি গর্ভস্রাব। বলতেন না?

— অতশত মনে নেই বাবা। তবে তুমি বলতে, পড়তে বসলেই তোমার বইয়ের পাতায় ফুটবল নৃত্য করে। বলোনি?

— হুঁ বলেছি। হাজারবার বলেছি। তাই তো আমি টি.টি.এম.পি.। টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাশ। কিন্তু আমার রক্তে বহুমুখী প্রতিভা। কি না পারি আমি!

বড়োমা আটাভাজা গলায় আটকে বিষম খান। তারপর গতিক সামলাতে সামলাতে বলেন — হ্যাঁ, সব পারিস তুই। অমন সুন্দর বাগান, কি ফুল নেই তাতে। তারপর একদিন আওতা হচ্ছে বলে সব গাছ কেটেকুটে একশা। অমন সাধের হাজারি নারকেল গাছটাও তো কেটে ফেলবি বলে লোক ডেকেছিলি। কত করে বললুম — ওরে নারকোল গাছ হল বামুন, কাটতে নেই। বেম্মহত্যা হয়।

— কাটিনি তো ঠাক্‌মা। তবে ওসব বামুন-টামুন বলে নয়। এমনি মনে হল। ব্যস কাটলাম না আর।

ঠাকুরদা মিষ্টি মিষ্টি হাসেন — আমি জানি। কারণটা জানি।

— কী? কী কারণ শুনি?

— বললে চটে যাবি, তবু বলি, সন্ধেবেলা গোটা বাড়ি ধুনো দেয়া তোর এক বদ অভ্যেস। সেই সঙ্গে বিনি পইতেয় গায়ত্রী পাঠ। ঠিক বলিনি?

— হুঁ, খানিকটা!

— বাকিটা তো সোজা। নারকোল গাছ কাটলে অত ছোবড়া আসবে কোত্থেকে?

আমি আর একবার গ্লাসে চুমুক মেরে ঠাকুরদার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করি মনে মনে, আর মাত্র আড়াই বছর পিছিয়ে দেখতে পাই ভোর চারটের সময় বাবা খাবার টেবিলে জোরালো টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে ডায়েরি লিখতে লিখতে নিট রামে সিপ করছে। বড়ো আলো না জ্বালার কারণ পাশের ঘরে শুয়ে থাকা আমার যদি ঘুম চটকে যায়। এ-সত্ত্বেও আমার ঘুম চটে এবং আমি সামান্য গলা তুলে মশারির জালে চোখ সেঁটে বলি — এই ভোর রাতে নিয়ে বসেছ!

টেবিল ল্যাম্পের ধরাবাঁধা আলোর বাইরে থেকে বাবার আয়ত চক্ষু জোয়ার ঠেলে জেগে ওঠে বেশ কসরতের পর। — হ্যাং ওভার কাটাচ্ছি বাবা, হ্যাং ওভার।

এরপর আর কিছু বলার থাকে না আমার তরফে। শুধু পরের নাট্য দেখার অপেক্ষা। একটু পরে বড়ো মালসায় ছোবড়া আর ধুনোর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর-দালান চৌপাট। বাবা টলমল করলেও খেলোয়াড়সুলভ স্টেডি অবস্থাতেই একতলা থেকে উঁচু উঁচু সিঁড়ি টপকে টপকে তিনতলার ছাদে উঠে যায়। ঝনাত করে শেকল খোলার তাণ্ডবে আমি তাড়াতাড়ি উঠে

যাই কোনো দুর্ঘটনার ভয়ে। চিলেকোঠার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি বাবা ছাতময় চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে মালসার ধোঁয়া ঘোরাচ্ছে আর বিনি পইতেয় আবৃত্তি-সাধা মন্ত্র গভীর গলায় কিঞ্চিৎ নাসিকা-ব্যবহার সহযোগে গলা তুলে আবৃত্তি করে যাচ্ছে — ওঁ ভূর্ভবস্য তৎসবির্তু-বরেণ্যং...। শেষরাতের তারাদের ঝিমুনি কিংবা খোয়ারি কেটে গিয়ে তাদের পুব-পশ্চিম ঘুলিয়ে যাচ্ছে। তারাদল ছায়া হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। বাবার অস্পষ্ট ছায়া ক্রমশ আলো আলো ভাব হচ্ছে।

বড়োমা আটামাখা মুখগহ্বরে জল ঢালেন কাঁসার ঘটি উপুড় করে। ত্যালতেলে গলগণ্ডে সড়াত সড়াত জল নামতে থাকে। ঠাকুরদা — আস্তে খাও, আস্তে খাও বললেও তিনি কানে নেন না। তারপরে মোলায়েম এক টুকরো ঢেঁকুর তুলে বলে ওঠেন — সমস্‌কিতো! হুঁ আমি বিদ্যেসাগরকে স্বচক্ষে দেখিছি নবদ্বীপে আমার মামার বাড়ি। আমার দা-মশায় পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যেরত্নর সঙ্গে বিধবাবিবাহ নিয়ে তক্কো করতে এসেছিলেন।

ঠাকুরদা ধমকে ওঠেন — রাখো তো মা, তোমার ওই এক বস্তাপচা গল্প। শুনে শুনে কান পচে গেছে।

— ও মা, সে কি কথা র‍্যা! বিদ্যেসাগর কি আলু যে বস্তাপচা বললি!

আমার এই সুযোগে মুখে কথা জোগায় — হ্যাঁ বড়োমা, ইদানীং তিনি বস্তাপচাই হয়েছেন। সাক্ষরতা সাক্ষরতা করে কত ফোটো উঠল, মিডিয়ার লোক দৌড়ল, নেতা-মন্ত্রী সব কোমর বাঁধকে লাগলেন। নীচের তলার নেতারা বিস্তর গাড়ি চড়লেন, দিঘায় ফিস্টি করলেন। কলকাতার তাবড় হোটেলে বহুত খানা-সহকারে মিটিং হল। কিন্তু হাসেম শেখ আর রামা কৈবর্তরা শুধু কেন, লেখাপড়াওয়ালা লোকেরাও ভোট দিতে গিয়ে টিপসই দেয়।

— তাতে বিদ্যেসাগরের কী এল গেল!

— কিচ্ছু না। শুধু তাঁর নাম করে মহা মহা মোচ্ছব হল, আর তাঁর মস্তকে কাকে হেগেই চলল।

বাবুজি মাথা ঝাঁকায় — কী যে সব কথা হচ্ছে মাথা নেই মুন্ডু নেই। সব দেখছি মালের ঘোর।

বড়োমা হাসেন — হুঁ, মালসাভোগ হত বইকি। নবদ্বীপে আমার দা-মশায়ের পাঠশালে রাসপুন্নিমের সময়। সে কী ধুম!

বাবা কড়কে ওঠে — ধুম মানে ধোঁয়া। সবই ধোঁয়া। বিদ্যাসাগরও।

ঠাকুরদা এবার তেড়ে ওঠেন — তা হলে বিবেকানন্দর ভাই মহেন্দ্র দত্ত ও-কথা লিখলেন কেন?

— কি কথা দাদু?

— কিছু পড়বিনে, জানবিনে ভাই। তোর বাপ না হয় ওকম্মো। তা তুই তো পদ্যটদ্য লিখিস।

— কথাটা শুনি না।

— একদিন নরেন্দ্র দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে একখানা বর্ণপরিচয় পড়ছেন। গিরিশ ঘোষ এসে দেখে তো অবাক। — কী হল নরেন, তুমি এখন বর্ণপরিচয় পড়ছ! নরেন্দ্র মুখ তুলে বললেন — হ্যাঁ, আগে বর্ণপরিচয় পড়েছিলুম, এখন বিদ্যাসাগরকে পড়ছি। তা হলে এ-সবই ধোঁয়া কি বলো!

বাবুজি মাথা নাড়ে। — কীসব গ্যাঁড়াকলের কথা। তবে হ্যাঁ, নাট্যাচার্য গিরিশবাবুও খুব মদ্যপান করতেন।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে স্টোভ থেকে ভাত নামাই। বাতিল গামছা দিয়ে হাঁড়ি সাপটে ধরে ঘরের নালির কাছে ধরে ফ্যান গালি। তারপর আবার যথাস্থানে এনে বসিয়ে দিই। স্টোভ নেভানো, এ-এক ঝকমারি! তাই একটু জল ছেটাতেই হয় বাধ্য হয়ে। বিকট কেরোসিন পোড়া গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে। বাইরে জানলার ওধারে ভেতর-বাগানে একজন বীর হনুমান এসে পাঁচিলে উপবিষ্ট অবস্থায় আমগাছ জরিপ করে। আমি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে যাই। বাগান থেকে ঢিল কুড়িয়ে যথাসম্ভব হুঙ্কার দিয়ে সেটি তাগ করি। হনুমান আমার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে একবার দেখে। তারপর এক লম্ফে গাছে উঠে পড়ে।

বাবুজি এসে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে — সরো দেখি। এ তোমার কর্ম নয়।

আমি জানি বাবার পক্ষে কোনোটাই অসম্ভব নয়। কেন না, সত্তর বছরেও বাবা, সকাল থেকে পুকুরে নেমে বিকেল অবধি পানা পরিষ্কার করেছে। রিটায়ারমেন্টের আগে শীতের ভোরে ইঁদারার জলে চান করে সাইকেলে স্টেশন গেছে যথারীতি। গায়ে হাফশার্ট মাত্র। তারপর বাঁধা কমপার্টমেন্টে উঠে জানলা নামিয়ে, বসা-যুবকটিকে তাচ্ছিল্যভরে উঠিয়ে দিয়ে জামার বুকের কাছের বোতাম খুলে বসেছে হু হু কনকনে হাওয়ার মুখোমুখি। হাজারি নারকেল গাছের সঙ্গে নিজেকে গামছা দিয়ে বেঁধে পাকা গাছ-ঝুড়ুনির মতন টঙে উঠে গাছ ঝুড়িয়েছে এই তো ক-বছর আগে। পিতামহের বইপড়া-জ্ঞানের পরিধির পাশাপাশি, বাবার এ হেন বুনো পাণ্ডিত্যের কোনো তুল্যমূল্য বিচার করবার উপায় পাই না আমি। কখনো কখনো মনে হয়, বই-পড়া জ্ঞানপিপাসার চেয়ে এটি কোনোভাবেই কম নয়। বরং আর এককাঠি ওপরে।

পিতামহের পিতৃদেবের, অতিথি ভোজনান্তে দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় অপরাহ্ন, তার নাতি আমাদের বাবারও সেই একই ধারায় দুপুর-সন্ধের মাঝখানের এলাকা। সেই মোতাবেকই আজ আমার খাওয়ার সময়, বেশ খানিক রাম-সেবনান্তে বিকেল বিকেল। তবে বাবার নিয়মে মাংস ভাত নয়। ডিম, আলু সমেত পুরোপুরি সিদ্ধপুরুষ। খেতে বসে একবার মাত্র বাবার টিপ্পনি হয়েছে — শেষকালে একাদশী করলে বাবা। মাংস ছাড়া কি শাক্তবংশের চলে!

যেহেতু খিদে বেশ চনমনে আর বেলাও অনেক, তাই আর তর্কাতর্কিতে যাইনি। সুপুরি গাছে কাক ডাকে। পাশের রাস্তা দিয়ে সাইকেল, ভ্যানরিকশো গড়ায়। বড়োমা ঘরের কোণে বসে থেকে থেকে আফিমের হাই তুলে যান। ঠাকুরদাও মা-র নেশার বশ। তাই তাঁরও ঘন ঘন খড়ম চালনা, ভেতর-বারান্দায় বৈকালিক ঘন ক্ষীরের জন্যে। মা-বেটার যুগল নেশার একপাশে বাবা আর একপাশে আমি। হাত থেকে ডিমসেদ্ধ ফসকে ফসকে যেতে চায় সরষের তেল বেশি হওয়ার কারণে কি? আলুগুলো খুন্তি দিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করায় জুত করতে পারে না। কাঁচা লঙ্কারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঝাল সহযোগে তো ফসকে যাওয়া রোধ করা যায় না। তবু কী জানি, মনে মনে যে-তত্ত্বটি বুদবুদ কাটল, তা না বললে বিবরণে ফাঁক থেকে যায়। লঙ্কা, আলু-ভাতের সঙ্গে টিপে চটকে দিতেই বাবার মন্তব্য — যেটা সয় না, খাও কেন! মদ খেয়ে বেচাল করতে কখনো দেখেছ আমায়!

মনে মনে বলি — তুমি পাকা বস্তু। তোমার কাছে আমি তো নস্যি।

অবাক কাণ্ড! বাবুজি আজকাল মনের কথাও শুনে ফেলছে। অমনি বলে ওঠে — আসলে কি জানো, জীবনে তো খেলাধুলো করলে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই হাঁচি কাশি। শরীরটাকে একেবারে আতুপুতু করে রেখেছ। ফলে যা হওয়ার তাই।

বড়োমা ঘরের কোণে পা ছড়িয়ে বসে ভয়ঙ্কর শব্দে, কতক আহ্লাদি কতক প্রাণবিদারী হাই তুলে যান। তাই না শুনে বারান্দায় পিতামহের খড়ম চটে যায়। তিনি আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠেন। — তোমার এই বিকট হাই তোলার স্বভাবটা বন্ধ করো তো মা। মনে হয় প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে গেল।

— বালাই ষাট, বালাই ষাট।

— আমার নয়, তোমার, তোমার। লোকে বাইরে থেকে শুনে ভাববে কেউ বুঝি তোমার গলা টিপে ধরেছে। আর তুমি আর্তনাদ করছ। কি হরিবল্।

— হরিবোল, হরিবোল। তোদের ঠাঁয়ে বাস করাও দেখছি দায়। একটু আয়েস করে হাই তুলতেও পারব না!

— তোলো মা, যত খুশি হাই তোলো। কিন্তু এ-বয়েসে আমার হাতে দড়ি পরাবার ব্যবস্থা আর কোরো না।

— ছিঃ বাবা, ছিঃ। মা কি ছেলের হাতে দড়ি দেয়। ছেলেই তো মা-র মুখে আগুন দেয়। না হলে যে মা উদ্ধার হয় না।

— কে আগে যায় আর কে পরে, কেউ বলতে পারে না।

— আমি এত পাপ করিনি বাপ, এত পাপ করিনি।

— তা হলে তুমিই বলো, আমার বাবা কেন আমার মতো চোদ্দো বছরের ছেলে রেখে মাত্র বিয়াল্লিশ বছরে চলে গেলেন।

— তোর বাপ ছিলেন সাধক পুরুষ। তাঁর কি আমার মতন আটফাটা কপাল।

— সংসারে ভালোমানুষ বেশিদিন থাকে না মা।

বাবা খাটের ওপর এ-পাশ থেকে সে-পাশ করতে করতে বলে — রবীন্দ্রনাথের 'হে বন্ধু বিদায়', মনে পড়ে যাচ্ছে।

ডিমের সঙ্গে আলু চটকে তেল লঙ্কা সহযোগে এই অবেলার গরম ভাত যে কি অমৃত। তা ছাড়া অ্যাপেটাইজারের কারণে ক্ষুধা তো চনমনে। বাইরে কাক ডাকছে নিরীহ আমডালে আর অলিগলি দিয়ে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে প্রপিতামহের কথা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আয় বলতে যৎসামান্য দেবত্র জমি, যা দিয়ে ক-মাসও চলে না। মা সিদ্ধেশ্বরীর ঠাঁয়ে চাল-কলার ভুজ্জিও তো তেমন বাঁধাধরা নেই। বরং প্রায়ই ঘর থেকে চাল দিয়ে ভুজ্জি দিতে বাড়ন্ত হয়ে যায়। সেদিন মা জননী গঙ্গা, জল-বিল্বিপত্তরেই আহার সারেন। প্রপিতামহ করজোড়ে বলেন — তুমি যেমন চালাও তেমনি চলি মা।

সেদিন আর অতিথি সৎকার ঘটে না। পূজা কিংবা রণক্লান্ত তন্ত্রাচারী ব্রাহ্মণ বেলপাতা চিবিয়ে ঢকঢক করে জল পান করে উদরপূর্তি করেন। তাঁর বালক ছেলেটি দুটি মুড়ি চিবিয়ে চার ক্রোশ পথ চষে হাইস্কুলে পড়তে যায়। মা গিয়ে হত্যে দেন সিদ্ধেশ্বরীর দুয়ারে। — মা,

তুমি থাকতে সংসার কি, না খেয়ে থাকবে। ছেলেটার মুখের দিকে চাইতে পারি না। ছেলের বাপ নিশ্চিন্তে দাওয়ায় বসে হুঁকো কলকেতে টিকে সাজান যত্ন করে। দা-কাটা তামাক সযতনে সাজিয়ে দেন মাঝখানে। শান্তস্বভাব মানুষটি মনে মনে উচাটন হন, ছেলেটি মেধাসম্পন্ন। কতখানি রাস্তা হেঁটে তবে না পাঁচড়া হাইস্কুল। মাস্টাররা বলেন, একটু দেখ্‌শোন করলেই সে জলপানি পাবে নির্ঘাত। তাই ছেলে ফেরা মাত্র হাতমুখ ধোয়ার পরেই গম্ভীর আদেশ — ধীরে, পড়তে বোস্। পড়তে বসা মানে পিতার সামনে। সে-সব এক-একটি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। মুখে মুখে অঙ্ক কষা। একটি চৌবাচ্চার আটটি নল আছে। তার পাঁচটি নল দিয়ে প্রতি মিনিটে এত গ্যালন জল ঢোকে, বাকি দুটি দিয়ে এতটা, আর বাকি একটি দিয়ে...। প্রশ্ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চাই। তা না হলে, হয় হাত নয় পা চালনা। গৌরবর্ণ সুঠাম যুবাপুরুষের মুখ ফেটে রক্ত ছায়া কেঁপে ওঠে। বালক, মুহূর্তে ছিটকে পড়ে উঠোনের মাঝখানে।

আর একদিন, সাত বছরের বালককে মুখে মুখে ডিকটেশান হচ্ছে চিঠি। ছেলে নত হয়ে পোস্টকার্ডে। দোয়াতে কলম উঠছে নামছে। লেখা শেষ। পত্রখানা চোখের সামনে ধরলেন পিতা। তারপর আর কোনো কথা নয়। বালকের পরনের খেঁটে ধুতিটি টান মেরে খুলে নেওয়া হল। তারপর তার চার হাত-পা একত্র করে বাঁধা হল ওই ধুতি দিয়ে। এবার এক হাতে ঝুলন চৌকি ছেলে ঝুলছে, বাপ চলেছেন গম্ভীর ভূকুটিময়। পথিমধ্যে এক প্রাচীন মহাশয় এই দৃশ্য দেখে চমৎকৃত। — কী হল মুখুজ্যে, কী হল! ছেলেটাকে এমন চ্যাংদোলা অবস্থায় কোথায় নিয়ে চল্লে?

— গোঁড়াপুকুরের পাঁকে পুঁতব।

— কেন, কেন? কী অপরাধ ওর?

— সাত বছরের ছেলের একখানা পত্র লিখতে লাইন বেঁকে যায়! তাকে পাঁকে পুঁতব না তো কি!

গরম গরম ভাত, সঙ্গে সিদ্ধ, মেখে মুখে দিই। তৎক্ষণাৎ এক কামড় লঙ্কা। উসস্— একেবারে অমৃতসিন্ধু। কোথায় লাগে বিরিয়ানি ফ্রায়েড রাইস। জীবনে এমন স্বপাক আর কখনো খেয়েছি কিনা মনেই পড়ে না। বাপ্ কা বেটা তো পুরোদস্তুর আমি। আপাদমস্তক না হোক, থোড়া থোড়া তো বটে। তবে বাবা চলে যাওয়ার পর টানা ক-টা দিন একপ্রকার হবিষ্যান্ন—সেও তো দিব্যি ছিল। মা আমাদের মালসা-টালসায় যেতে দেয়নি। বদলে পেতলের সরায় করে রাঁধা আতপ, সঙ্গে ঘি, কাঁচকলা; মন্দ ছিল না। তবে সব থেকে কটু বস্তু ছিল সকালে-রাত্রে রাজ্যের ফল ভক্ষণ। সাবুমাখা খেয়ে প্রথমদিনই বেদম বমি। ফলে ওটি ত্যাগ। ফলের সঙ্গে আরো এক অত্যাচার তাল তাল সন্দেশ।

প্রপিতামহের কথা মনে হওয়ার সুবাদে আমডালে ডেকে-চলা কাকটির কথা টেনে রাখল আমায়। চাট্টি মাখা-ভাত থালার একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলাম। তিনি অতিথি নারায়ণকে দিতেন অগ্রভাগ। আমার তরফে না হয় তোলা থাক শেষভাগ। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার জেদি ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার কি তুলনা হয়! তা ছাড়া ব্রাহ্মণত্ব তো আমার বাবার মতনই আমায় ভর করে সেই কবে গলা থেকে পইতেগাছাটি — পিঠ চুলকোলে ছিঁড়ে যায় অছিলায় — বিদায় হয়েছে। হায় ঠাকুরদা, তুমি মরলে ম্লেচ্ছ সন্তানের বদলে তোমার এই

নাতি করবে মুখাগ্নি। এই ছিল বাসনা। তোমার এই নাতিটি ছেলেকালে তোমারই প্রভায় গীতা-টিতা পড়ে শোনাত তোমায়। বিশেষ করে একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপদর্শনযোগ — অর্জুনের স্তব বন্দনা। মনে মনে আলগা বৈরাগী-ভাব তুমিই পয়দা করেছিলে। এমনকী তেরো বছর বয়েসে বেশ ঘটাপটা করে তার উপনয়নও দিয়েছিলে নিজে আচার্যগুরু হয়ে। কিন্তু কেউ কী জানে, আমি উপনয়নের রাত্রে যখন সবাই উপহার দিচ্ছে, কেবলই মুখের গেরুয়া ঘোমটা খুলে আমার গলায় গলায় বন্ধু অজিতের সঙ্গে তামাশা-মশকরা করছিলাম। আর আমার এক পিসিমা এসে দারুণ রেগে আমার মুখের উড়ুনিটা টেনে নামিয়ে দিয়ে কানের কাছে গর্জন করে বলেছিলেন — ছিঃ, কি করলি তুই। ও না বাগদি! বাগদি, এই তিন টুকরো কাটা মাংস আমার কানে গর্ত বেয়ে কোথায় যে তলিয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকে আমার অগোচরেই হয়তো আমি একদিক ভাঙনে পড়ে অন্য দিকে নতুন চর খুঁজতে চলে গেছি। সে-চর পলিহীন নিষ্ফলা। কবিতা ও কবিকুলের অনন্ত মিছিলে আমার কোনো হিসেবই হয় না।

উপনয়নের পরের দিনই ঠাকুরদার বিবেচনায় যে-হেতু আমি অপরিমিত চঞ্চল, আমার দণ্ডি ভাসান হয়ে গেল ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গার তীরে। সাক্ষী আমার বাবার পিসিমা বৃদ্ধা যোগমায়া দেব্যা। বাড়ি ফিরে দেখি আগের দিনকার ভুরিভোজের সুগন্ধ ম ম করছে। আমার বড় প্রিয় পোলাও মাংস। সব কিছু ছাপিয়ে সেই উৎসবটুকু আমায় প্রলুব্ধ করে চলে। মাথার চারপাশে একাদশী, একাদশী শোঁ শোঁ করে যায়। আমি একটুও দেরি না করে সিঁড়ির পাশে চোরকুঠরির দিকে, যেখানে আগের রাতের বাড়তি খাবার-দাবার রাখা আছে। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার ঘরে একটা ডিম লাইট জ্বলছে। লোকজন সব ভেতর-বারান্দায়। কেউ দোতলায়। দেরি না করে জামার কোঁচড়ে কয়েক মুঠো পোলাও, মাংস আর খান দুই ভিয়েনসঞ্জাত পানতুয়া তুলে নিই। তারপর টকাটক সিঁড়ি বেয়ে একেবারে চিলের ছাদে। দরজায় শেকল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই এবং খানিক পোলাও, কতক মাংস খুব দ্রুত মুখে পাচার করি। পানতুয়া আর বাদবাকি মাংস পোলাও ছাদ থেকে নীচে ছুঁড়ে দিই। অমনি এক ঝাঁক কাক এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দুপুরবেলা পিতামহের পাশে কম্বলের আসনে বসে মৌনী অবস্থায় পাথরের থালায় ফলের টুকরো, সাবু মাখা, সন্দেশ আর গঙ্গাজল। খাওয়ার পর পাড়ার কেশবজেঠুর বৃদ্ধা মা এসে আমার সামনে এক থালা ফল মিষ্টি আর উপবীত রেখে গলবস্ত্র হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। আমি লজ্জা আর জড়তায় তিড়িংবিড়িং লাফাতে থাকি। বৃদ্ধা আমায় ধমক মারেন — আমি কি তোকে পেন্নাম করছি, তোর ভেতরকার নারায়ণকে করছি। এই বলে তিনি আমার দু-পায়ে মাথা ঠেকান। আমি ঠাণ্ডা শালগ্রাম হয়ে যাই। আমার পেটে গজ গজ করে মাংস-পোলাও।

ঠাকুরদার মৃতদেহ যখন এ-ঘরে শোয়ানো, বাবা তখন কেবলই দোতলায় উঠে উঠে যাচ্ছে। যেহেতু দাদু একজন মানী-জ্ঞানী, এলাকায় তাঁর বহু ছাত্র-টাত্র, তাই সকাল থেকে বাড়ি লোকে লোক। যত বেলা চড়ছে বাবাও তত চড়ছে কিংবা টলছে। কাঁচা রামের গন্ধে দাদুর দেহের ওপর সাজানো অজস্র ফুল সিঁটিয়ে পড়ছে। বাবা অকারণে না হলেও অযথা বেশি আবেগতাড়িত হয়ে যাকে সামনে পাচ্ছে জাপটে ধরছে। কান্না অথবা হাহাকার যাই হোক— বিশ্রী প্রলাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শোকের পরিবেশে অনেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছে। রজনীগন্ধার স্তূপে ছোট্ট ছোট্ট কালো পোকা ঘুরঘুরোচ্ছে। দাদুর মুখটা আস্তে আস্তে হাঁ হয়ে যাচ্ছে।

কাজের দিন, পিতামহের ইচ্ছা না থাকলেও বাবা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলেন। সে-এক মহাকাণ্ড। সকালবেলা আমরা ক-জন বাচ্চা নির্দাগ নিখুঁত ষণ্ড খুঁজতে বেরোলাম। অনেকটা সেই প্রপিতামহের নিশ্চক্র বেলপাতার মতন। কাজ করতে বসে বাবা কেবলই উঠে উঠে যাচ্ছে কি জরুরি কাজে। ফলে বারংবার পুরোহিতমশাইয়ের অনুমতি নিতে হচ্ছে এবং প্রতিবারই ফিরে এসে ওঁ বিষ্ণু—তিনবার। মামার নজরে পড়ছে—এতদিনে সব জেনে বুঝে যাওয়ার কারণে—বাবুজি যত শ্রাদ্ধ গড়াচ্ছে ততই বসে বসে ডান কিংবা বাঁয়ে এলে এলে পড়ছে। আর মন্ত্রপাঠ করতে করতে হাজারবার ঘুরে ফিরে আসা পুণ্ডরীকাক্ষ কথাটা কিছুতেই ভালো করে উচ্চারণ করতে পারছে না। একসময় প্রবীণ পুরোহিত বলছেন — নাও হে, এবার চোখ বুঁজে তোমার বাবার পাদপদ্ম দু-খানি মনে করো। মনে করো এই অর্ঘ্য তুমি তাঁর পায়ে রাখছ। বাবা চোখ বুজে বিড়বিড় করছে। অদূরে বসে আমার মনে হয় বাবা পুণ্ডরীকাক্ষ কথাটা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে।

এ-ঘরে যে-খাটের ওপর আমি শুয়ে আছি, ঠিক তার ওপরেই আমার বাবার শেষনিঃশ্বাস পড়েছে আজ থেকে ঠিক তিনমাস আগে। ...

... এই খাটের নীচে পর পর তিনটি পেরেক পোঁতা। একটি আমার বড়োমা অর্থাৎ বাবার পিতামহীর দরুন আর একটি আমার ঠাকুরদার জন্যে আর তৃতীয়টি সম্প্রতি আমার বাবার কারণে।

আজকের জন্যে আমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাবা আর তস্য ঠাকুরদার কাছাকাছি। আজ আমরা তিনজনেই একাহারী। মাঝখানে একটি মাত্র গ্যাপ। আমার পিতামহ। তাঁর ধারা আড়ার সঙ্গে কোনো মিলই নেই আমাদের দু-জনের। বাবা একবার প্রভূত আমোদ অবস্থায় বলে উঠেছিলেন, আমরা বাপ-বেটা দু-ভাই।

এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজে বাজে। মোটামুটি ঝিমুনি যা এসেছিল কেটে গেল কাকের আর্তনাদে। জানলার বাইরে ভেতর-বাগানের আমডালে বসে অভুক্ত প্রাণী, আমার প্রপিতামহের অতিথি নারায়ণটি ডেকেই চলেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসি। ভুল হয়ে গেছে। মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কে জানে, হয়তো বাবা ঠাকুরদার আগে প্রপিতামহের পেরেকটি এখানে পোঁতা যায়নি বলেই কি? বংশলতিকার অঙ্কে না মেলার গোলমালে হুট করে প্রপিতামহী ঢুকে পড়েছেন বলেই কি? তা হলে কি ওই কাকটিই আমার পূর্বপুরুষ? কিংবা তিনপুরুষের ক্ষুধা তৃষ্ণার তঞ্চক স্বভাব? এ-তো ভারি ভজকটয় পড়া গেল।

জানলার নীচে নামিয়ে রাখা এঁটো থালার একপাশে এখনো ভাত মাখা দলাটি বিদ্যমান। দলা না উচ্ছিষ্ট পিণ্ড কে জানে? তা হলে প্রথম পিণ্ড তো খানিক আগে আমিই খেলাম। তা হলে আমিও কি এখন এই হানাবাড়ি-সদৃশ নির্জন বাড়িতে একজন প্রত্যক্ষ প্রেত? রাগে আমার গা রি রি করে। বাইরের আমডাল থেকে ক্ষুধার্ত পূর্বপুরুষবর্গের খিচুড়ি আমায় ডেকেই চলে। সেই দলে প্রপিতামহের ওপর দিকে সব 'যথা নাম' থেকে ধরে অধস্তনে আমি পর্যন্ত। কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না।

আমতলায় রোদ পড়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই অতি ক্ষীণ স্বরে একজন শিশু ঝিঁঝি আগামী সান্ধ্য আলাপের জন্যে গলা ছেড়েছে। লতাগুল্মে স্যাঁতসেঁতে অপরাহ্ন ছোঁয়াচ ধরিয়ে দিচ্ছে।

ভাঙা গোয়ালের ধ্বংসপুঞ্জে এই বর্ষাঋতুর সুবাদে সর্বদাই কীরকম অলীক ধোঁয়া ধোঁয়া। খিড়কি দুয়ারের বন্ধ-ওপারে পুকুরধারের আকাশে মেঘের ছন্নছাড়ায় লালচে পলেস্তারা। নিবিড় যজ্ঞডুমুরে দিন ফুরোনোর যো লেগেছে। গাঙ্গুলিবাগানের সাবেক ভুতো বোম্বাইয়ের পাতায় পাতায় ঘন সবুজ, কালচের দিকে ঢলে যাচ্ছে।

কাক নেমে আসে আমডাল থেকে। আমার সামনে মাটিতে এমন কৃতাঞ্জলি ভঙ্গিতে বসে যে আমার মনটা ছল ছল করে ওঠে। আহা, যেন কতকাল অন্নজল জোটেনি বেচারির।

আমি হাতে ধরা পিণ্ডটি আস্তে করে নামিয়ে দিই। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে তার সামনে বসে পড়ে। প্রথমবার চঞ্চু বেঁধায় ভুজ্জির মাথায়। তারপর আমার দিকে কেমন কৃতার্থ তাকায়।

অনন্তর... একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শন যোগে মহাবাহো পুণ্ডরীকাক্ষর সামনে গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি অর্জুন বলছেন — আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র। আপনি কশ্যপাদি প্রজাপতিরূপ লোকপিতা এবং পিতামহ ব্রহ্মারও জনক। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আপনাকে পুনরায় নমস্কার করি। আবার আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

বিশ্বায়ন

শচীন দাশ

বাজারে বেরিয়েছিলাম। ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকতেই রিক্তা বলল: তোমাকে একজন খুঁজতে এসেছিল। আবার আসবে বলে গেছে। — কী নাম? জিজ্ঞেস করতেই রিক্তা খিঁচিয়ে উঠল: নাম-টাম কী সবসময় বলে যায় নাকি! হবে দ্যাখো গিয়ে কোনো হবু কবি। কবিতা-টবিতা লেখে বোধহয়।

কবিতার ওপর রিক্তার হেভি রাগ। পারলে যেন ছিঁড়েই ফেলে। সেই ভয়ে আমার তিন-তিনটে কবিতার বই আমি কখনো বাড়িতে রাখি না। অফিসের ড্রয়ারেই পড়ে থাকে। তা ছাড়া লেখালিখির ব্যাপারে যে-ই আসুক, আমি তাদের অফিসেই আসতে বলি। অথচ এই লোকটা যে কী করে বাড়িতে সটকে এল!

ব্যাগটা নামিয়ে বাজার বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম, রিক্তা হঠাৎই চোখ সরু করল: লঙ্কা এনেছ?

এই রে! দু-তিনবার বাজারের ভেতরে ঘোরাঘুরি করেও কী একটা যেন নেওয়া হয়নি ভাবতে ভাবতে ফট করে সেই যে একটা কবিতার লাইন তৈরি হয়ে গেল, ওই তারপর থেকেই যত ভুল। লঙ্কা আনতে পেঁয়াজ কিনছি, আদা নিতে গিয়ে রসুন। রিক্তা ততক্ষণে চিৎকারে বাড়ি মাত করেছে: সংসারে কুটোটাও তো নাড়তে হয় না। এক ওই বাজারটা ছাড়া। তাতেও কত গোঁজামিল। কবিতা আর কবিতা। ওই কবিতাই যত নষ্টের গোড়া। দাঁড়াও, করাচ্ছি কবিতা। ঝেঁটিয়ে যদি বিদায় না করি।

গজগজ করতে করতে মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে রিক্তা একসময় বেরিয়ে গেল। রিক্তার এখন মেনোপজের সময়। সবসময়ই তাই হট হয়ে থাকে। ডাক্তার বলেছে, এ-সময়টা এমনই হয়। একটু মানিয়ে নেবেন। তা মানাবার চেষ্টায় মাঝে মাঝে আমিই বলে ফেলি: ধুর ধুর ভদ্রলোকে লেখে কবিতা। টাকা নেই, সম্মান নেই। আমি ভাবছি ছেড়েই দেবো। রিক্তা হঠাৎ কলকল করে উঠল: এই দ্যাখো, এতক্ষণে তবু সার-বুঝটা বুঝেছ। আরে সবাই কি আর রবীন্দ্রনাথ হয়! তুমি পারবে হতে কোনোদিন?

কী পারব না-পারব, এ-নিয়ে কোনোদিন কিছু ভাবিনি, কেবল নিজের দুঃখ-আনন্দ, হর্ষ ও বিষাদের কথাই ভেবে গেছি আর তাই নিয়েই আমার কবিতা। রিক্তাকে বুঝিয়ে বলব ভাবছিলাম। এই সময়েই বাইরে আমার নাম ধরে কে ডেকে উঠল।

— নীলেশবাবু ... নীলেশবাবু ...

আমার নাম নীলেশ। নীলেশরঞ্জন বসু। কিন্তু কবিতায় ব্যবহার করি নীলেশ বসু। তা এই লোকটা নিশ্চয়ই কবিতার নয়, কেন না কবিরা সাধারণত বাবু-টাবু ব্যবহার করে না। অতএব উঠলাম এবং উঠতে গিয়েই দেখি রিক্তা চোখ পাকাচ্ছে। অথচ আমি নিশ্চিত, এই লোকটা অন্তত কবিতার ব্যাপারে আসেনি আমার কাছে।

— আপনি!

বাইরে বেরিয়েই চমকে উঠলাম। আমাদেরই পাড়ার ভবেশবাবু। চাকরি তেমন একটা না করলেও বাঁ-হাতের পয়সায় বাড়িটা করেছেন জব্বর। আগাগোড়া দোতলা পর্যন্ত মেঝেতে

মার্বেল। বাইরের দেওয়ালে চোখ ধাঁধানো দামি স্লোসেম। এখন রিটায়ারমেন্টের পরে আবার কীসব করছেন।

— আমার ভাগ্না একবার আপনার কাছে আসবে। একটু যদি কথা বলেন।

— আপনার ভাগ্নে! কে বলুন তো?

— আহা চেনেন আপনি। লোকেশ। ওই যে...

আর বোঝাতে হল না। এ-পাড়ায় লোকেশকে আবার কে না চেনে! বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই-ই নির্দিষ্ট একটা বাইকের আওয়াজ পেলেই বোঝে, ওই আসছে লোকেশ। মাথায় টুপি, গলায় ঝোলানো মোবাইল আর শক্ত পেশিবহুল হাতদুটো মুঠো করা বাইকেরই দুই হ্যান্ডেলে।

— তা, কী ব্যাপারে বলুন তো?

— ব্যাপার আর কী। একটু কথা বলতে চায়। আপনি তো আবার কবি মানুষ।

চোখ সরিয়ে হঠাৎই পেছনে তাকিয়ে দেখি, রিক্তা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। চটপট ভবেশবাবুকে বিদায় জানাবার জন্যই বললাম: আচ্ছা ঠিক আছে। আসতে বলবেন।

বললাম তো, কিন্তু ঘরে ঢুকতেই রিক্তা আমার ওপর খেপচুরিয়াস।

— তোমার মতো আহাম্মক আমি আর একজনও দেখিনি।

— কেন!

— কেন কী, লোকটাকে তো ঘরে এনে বসাতে হয়, নাকি! ওই কবিতা করে করে ঘিলুটাই একদম মরে হেজে গেছে।

— বাহ্, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই কবিতার কথাই তো তুলতে যাচ্ছিল।

— ছাই। ছাই তুলতে যাচ্ছিল। তোমার মাথায় যদি ঢুকত...

— তার মানে! মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধই হয়ে উঠলাম। ওই তখনই রিক্তা আবার চোখ তুলল: কেন এসেছিল বলো তো?

— আমাকে কথাটা জানাতে।

— কী কথা বলো তো!

— তার ভাগ্নে আসবে আমার কাছে।

— কেন আসবে বলো তো?

— কী জানি!

— 'কী জানি' বলে কোনো কথা নেই।

— তা হলে!

— কী তা হলে?

— না, কী করব বলছ না তো!

— কী আবার বলব! কথা থাকলে তো বলব...

আমার কথাটি ফুরোলো
নটেগাছটি মুড়োলো।
কেন রে নটে মুড়োলি?

গরু কেন খায়
কেন রে গরু খাস?...

— যাক গে, শোনো। ভবেশবাবুর ভাগ্নে প্রোমোটারি করে জানো তো?

— তা জানি।

— তা হলে! এবারে দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফ্যালো —

আমি চুপ। রিক্তার চোখ জোড়া দেখি আবারও সরু হয়ে উঠছে। কিন্তু কিছু বলে ওঠার আগেই যেন আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল: তার মানে! তুমি কি এ-বাড়ি প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে বলছ?

— না দিয়ে কী করবে শুনি? বাড়িটার চারপাশে তাকিয়ে দেখেছ! এখানে ভাঙা ওখানে ফাটা। বর্ষায় ছাদ চুঁইয়ে জলও তো পড়ে মাঝেমধ্যে।

— তা, এ-বাড়ি কি আজকের! এখানে আমার দাদুর জীবন কেটেছে, বাবার জীবন পার হয়েছে এবং এখন আমি...

রিক্তা মাথা নাড়ল প্রাণপণে, তারপর বলল: সে-জন্যই তো বলছি, এই বাড়ি আর এভাবে রাখা যায় না। তা ছাড়া তোমার আশেপাশে তাকিয়ে দেখেছ! চারদিকে সব ঝাঁ-চকচকে বাড়ি। তিনতলা, চারতলা। না না, তুমি ভবেশবাবুর ভাগ্নের সঙ্গে কথাটা সেরেই ফ্যালো। পরিষ্কার চার কাঠা জমি আছে। দুটো ফ্ল্যাট চাইবে। আর তিন লক্ষ ক্যাশ। পুনাইয়ের বিয়েটা তা হলে ঢাকঢোল পিটিয়ে করা যাবে।

পুনাই আমার একমাত্র মেয়ে। এই ফাল্গুনে এবার সাতে পড়বে। তার মানে খুব কম বয়সে হলেও এখনো আরো বছর পনেরো-ষোলো। তা ততদিনে ওই টাকায় ঢাক-ঢোল পেটানো যাবে তো? বাজারের যা অবস্থা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এর ওপর প্রায়ই শুনছি রিটায়ারমেন্টের বয়স, ৬০ থেকে ৫৮ হচ্ছে। লিভ স্যালারি মাস তিনেক কমছে। আর পেনশন ফক্কা। তা এতসব ধাক্কা সামলে বেঁচে আছি যে এখনো, তা ওই কবিতারই জন্য। আর বেঁচে থাকছি আমাদের বাড়ির পেছনের ওই এক টুকরো জমিতে মায়ের হাতে লাগানো টগরের গাছটা দেখে। গাছটা এখন ঝাঁক বেঁধে ফুল দিচ্ছে। আর সে-ফুলে যখন চাঁদের আলো এসে ঘুমিয়ে পড়ে, ওই তখনই সেখানে পরীরা নামে। নেমে বাগানের আরো অন্যান্য গাছের শাখা-প্রশাখায় ঘোরাফেরা করে।

এক সকালে বেরোচ্ছি, হঠাৎই পাড়া কাঁপিয়ে বাইকের শব্দ। চমকে উঠে দরজা খুলতেই দেখি লোকেশ।

— স্যার, মামা পাঠিয়েছে।

— আসুন।

— এই দ্যাখো, শুরুতেই কিন্তু বিলা করে দিলেন।

আমি থমকে তাকাতেই ছেলেটি হাসল: আরে কত্ত ছোটো বলুন তো আপনার থেকে। তুমি বলুন, তুমি। তা ছাড়া সরস্বতীর বরপুত্র আপনি। হ্যাঁ স্যার, ক-টা বই বেরোল বলুন তো! মামা বলছিল...

ভেতরে এসে বসাতেই টের পেলাম অলক্ষ্যে কোথাও রিক্তার চোখ। শুধোলাম : তা কী ব্যাপার, আমার কাছে?

— সে কী! লোকেশ যেন বিমর্ষই একটু: মামা কিছু বলেনি?

— না তো।

— তা হলে বোধহয় ভুলে গেছে। আসলে...

লোকেশ চোখ তুলেছে ততক্ষণে ওপরের ছাদের দিকে। ছাদ থেকে দেওয়াল। দেওয়াল থেকে মেঝে এবং মেঝে থেকে চারদিকের প্লাস্টারে।

— কত বয়স হল স্যার?

— ওই তো ১৯৫২। যে-বছর প্রথম জেনারেল ইলেকশান হয়।

— তা হলে কত হয় বলুন তো? আমি আমা আবার এ-ব্যাপারটায় ভীষণ কাঁচা।

— কেন, এ তো সোজা হিসেব। প্রায় বাহান্ন।

— বাহান্ন! না স্যার, বাহান্নয় হাল এতটা খারাপ হয় না।

— তবে কতটা খারাপ হলে বাহান্নই ঠিক থাকে?

— তা কী আর এভাবে বলা যায় স্যার।

লোকেশ তার শার্টের পকেট থেকে ফাইভ-ফাইভ-ফাইভের প্যাকেট বের করে।

— নিন স্যার।

— না না। আমি এসব খাই না।

— সে কী স্যার! লোকেশ বিস্মিত। — আপনি না কবিতা লেখেন! বলেই চাপা একটা হাসি ফোটে লোকেশের মুখে। — ও ঠিক আছে স্যার। বুঝেছি। ওটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...

যেন হঠাৎই অসমাপ্ত কিছু মনে পড়ায় আবার সরব হয়ে ওঠে লোকেশ।

— বাহান্ন নয় স্যার। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে বাড়িটা তার চেয়েও পুরোনো।

— বাড়ি!

— হ্যাঁ স্যার। কেন বলুন তো?

— না, আমি ভাবলাম, তুমি আমার বয়স জিজ্ঞেস করছ।

— ছি ছি স্যার, আপনি এ-কথা ভাবলেন? আপনার বয়স কখনো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি! তা যাকগে, এ-বাড়িটা কিন্তু আর চলবে না স্যার। এক কাজ করুন। আপনি আমাকে এ-জমিটা দিয়ে দিন স্যার। আমি প্রোমোটিং করি। আপনি স্যার এর জন্যে টাকা পাবেন। ফ্ল্যাটও পাবেন।

— কিন্তু...

— না না, কিন্তুর কিছু নেই স্যার। কোনো ঝামেলাই আপনাকে নিতে হবে না। যা কিছু করার আমিই করব।

বলতে বলতেই লোকেশ উঠল শরীরের বাড়তি মেদ ঝাঁকিয়ে।

— ওকে স্যার। ক-দিন পরে আবার আসব। আজ উঠি।

— কিন্তু ...

আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তির ভেতরেই বাইরে বাইকের ফটফট। রিক্তা ঢুকল এই সময়েই: আশ্চর্য লোক তুমি। টাকা ও ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা উঠলই যখন, তখন তোমার প্রস্তাবটা তুমি দিতে পারলে না!

রিক্তা গর্জাতেই জানালাম: বাড়ি আমি প্রোমোটারের হাতে দিতে পারব না রিক্তা। রিক্তা প্রথমে চুপ এবং তারপরেই যেন আবার হট হয়ে উঠল: আশ্চর্য তো, কবিতা করে করে বাস্তব বুদ্ধিটাই তোমার গেছে একেবারে। চাকরি যা করো তাতে তো মাসে দু-দিনও মাংস জোটে না ভালো করে। এদিকে দু-দুটো ছেলেমেয়ে। ছেলেটা তবু কমার্সে গেছে। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে কী করে চালাতে শুনি! শোনো, যা বললাম করো। আখেরে, এতে আমাদেরই লাভ হবে।

রিক্তা চেঁচামেচি করতেই আমি বোঝালাম: কিন্তু বাপ-ঠাকুরদার বাড়ি। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে। মায়ের লাগানো টগর, বাবার নিজের হাতে বসানো গোলাপ...

কথা শেষ না হতেই রিক্তা ঠোঁট ওলটাল। বলল: তবে আর কী! ওই নিয়েই থাকো। এদিকে ছেলেমেয়ে দুটো তোমার না খেয়ে মরুক। বলতে না বলতেই রিক্তা ওঠে। পায়ে শব্দ তুলে বেরিয়ে যায়।

দিন কয়েক পর। অফিস থেকে ফিরে সবে ব্যাগটা রেখেছি, বাইরে সেই পাড়া কাঁপানো ফটফট। একটু পরেই দেখি সে। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। ভেতরে ঢুকে, মেঝের একপাশে সেটা রেখে, আমার চোখে চোখ রেখে যেন হাসল একবার: তা হলে কী ডিসিশান নিলেন স্যার! জমিটা দিচ্ছেন তো?

— না না, এটা সম্ভব নয় ভাই।

— নয় কেন?

— না ভাই, আমি পারব না।

— পারবেন না কেন! এতে তো আপনার ভালোই হবে। ফ্ল্যাট পাচ্ছেন, টাকা পাচ্ছেন।

— হলেও ফ্ল্যাটে বাইরের লোক আসবে কতগুলো। আর এ-আমার নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি কখনো ছাড়া যায়!

— যাবে না কেন স্যার। সবই যায়। আসলে আর ক-দিন পর নিজের বাড়ি বলে আর কিছুই থাকবে না। এত লোক এত মানুষ সব যাবে কোথায় বলুন তো? আমি আপনাকে ভালোই ফ্ল্যাট দেবো স্যার। আপনি আর না বলবেন না।

উঠে উত্তর শোনার আর অপেক্ষা না করেই যেন চলে গেল সে।

রাতে শোওয়ার আগে রিক্তাই প্রথম আবিষ্কার করল সেই কাগজের মোড়কটা। আমাকে দেখিয়ে বলল: কী গো এটা! আমি চমকে উঠলাম। এটাই যেন লোকেশের হাতে দেখেছিলাম সন্ধেবেলা। মোড়কটা তুলে হাতে নিয়ে খবরের কাগজটা খুলতেই দেখি একটা ম্যাকডোয়েলের বোতল। কাঁচা সোনার রং নিয়ে নাচছে। — দ্যাখো, দেখেছ, শুরুতেই এই, এরপরে কোথায় গিয়ে থামবে ভাবতে পারো!

— কী এটা?

— হুইস্কি। সোজা বাংলায় যাকে বলে মদ।

— কিন্তু মদ তোমাকে কেন? তুমি কি খাও! প্রশ্নটা করতে করতেই রিক্তা হঠাৎ চোখ নাচাল। ও হরি, কবিদের তো আবার মদ না-হলে চলে না! ছেলেটা নিশ্চয়ই সে-সবেরও খবর রাখে।

দিন যায়। সপ্তাহ কাটে। মাঝেমধ্যে রাস্তাঘাটে ফটফট। বাইক থামিয়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে। হাসে। জমির কথাটা মনে করায়। বারবার মনে করাতে করাতে কখনো বা ওর মুখ শক্ত। শক্ত মুখেই না-বলা কিছু একটা যেন বলতে চায় সে। আমার অস্বস্তি হয়। অস্বস্তি নিয়েই বাড়ি ফিরি। আকাশে জ্যোৎস্না থাকলে অন্যমনস্ক হয়ে কখনো বাগানে দাঁড়াই। বাতাসে গোলাপের গন্ধ পাই। টগরে মায়ের হাতের স্পর্শ অনুভব করি। তখন জ্যোৎস্না যেন আরো দুধসাদা হয়ে আকাশের কড়াই থেকে চলকে পড়েছে। আর তারই ভেতরে যেন এক নারী। তার পিঠে দুই ডানা। ঘুরতে ঘুরতে গোলাপ কুঁড়িগুলো ধরে ধরে শুধু ফুটিয়ে দিয়ে চলেছে। আর তাই দেখে সন্তর্পণে এক যুবক পা টিপে টিপে নামছে বাগানে। তখন ওই দক্ষিণ-প্রবাহিণী গঙ্গায় জোয়ারের টানে চলেছে একটা-দুটো নৌকা। তাতে টালি আর মুলিবাঁশ। তারা এখন অতিক্রম করছে কালীক্ষেত্র। এরপর টালিগঞ্জ। কুঁদঘাট। তারপর বাঁশদ্রোণি। গড়িয়া। যুবক এগিয়ে যায়।

— কে! কে ওখানে?

প্রায় থতমত খেয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আর পড়তেই দেখি খুট করে বাইরের আলোটা জ্বলে উঠেছে। আর সে-আলোর ভেতরেই রিক্তা।

— এ কী, তুমি এখানে! কী দেখছ দাঁড়িয়ে! এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে রিক্তার গলা হঠাৎই গম্ভীর। আবারও কবিতার বাই চেপেছে না! বেশ তো ছিলে ক-দিন।

পিছিয়ে এলাম। দাদুর ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় এ-পর্যন্তই লেখা আছে। তারপরেই সব হাওয়া। বাবার ট্রাঙ্ক থেকে কোথায় যে সব উধাও হয়ে গেল!

ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। পুনাইয়ের বইয়ের তাকে আমার *কালপুরুষের ডানা*। প্রথম কবিতার বই। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন তুলে সত্যনারায়ণ প্রেসে, হরিপদ পাত্র-র কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা এখানে কেন? বাড়িতে তো আমার কবিতার বই থাকে না। হাতে তুলে নিতেই রিক্তা হাসল: ও, ভালো কথা। ছেলেটা এসেছিল। তোমার একটা বই রেখে গেছে। সই করে দিতে হবে।

— সই?

— হ্যাঁ। কোত্থেকে যেন কিনে এনেছে। বলল, দারুণ নাকি লিখেছ। তা হ্যাঁ গো, ওর ব্যাপারে কী করলে! আমি কিন্তু দুটো ফ্ল্যাট আর তিন লক্ষ টাকার কথা বলেছি। ও তাতেই রাজি।

আমার মাথা ঘুরেছে ততক্ষণে। বুকের ভেতরে যেন অন্ধকার। আর সে-অন্ধকারে যেন একটা নৌকা। অন্ধনদীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

কয়েকটা মাস পর।

এক সকালে আমাদের বাড়ির সামনে একটা ম্যাটাডোর এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই তাতে খাট, ড্রেসিং টেবল ও বিছানা। সঙ্গে ছেলেমেয়ে-সহ আমরা চারজন। সেই যে যাওয়া, ফিরে আসা আবার এক বছরের মাথায়। তখন আমাদের পুরোনো বাড়ির জায়গাটায় ঝাঁ-চকচকে এক ফ্ল্যাটবাড়ি। আর ওই বাড়িরই দোতলায় মুখোমুখি দরজার দু-দুটো ফ্ল্যাট। আর দরজা

খুলেই ভেতরে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু তা পুনাইয়ের জন্য নয়। অতঃপর খাট এল। পরদা হল। সোফা বসল। সোফার ওপরে চার ব্লেডের পাখা। আর সে-পাখার তলায় রিক্তা। রিক্তা হাসছে। রিক্তা গাইছে। আশেপাশে কত মানুষ। টিভি চলছে। ফ্রিজ চলছে। এ-ঘরের সঙ্গে ও-ঘরের পরিচয়। এ-ঘরের সঙ্গে ও-ঘরের বউ-বিনিময়। এ-বিছানা ছেড়ে ও-বিছানায় স্বাদ পালটানো। গভীর রাতে টলতে টলতে বাড়ি ফেরা।

এক রাতে, জানলার গ্রিলে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এই সময়েই রিক্তা। ঘুম থেকে কখন উঠে এসেছে। — কী হল, ঘুম আসছে না? মাথা নেড়েই উত্তরটা দিলাম: হ্যাঁ। আসবে না কেন?

— তবে, উঠে এসেছ যে?

— এমনি।

— এমনি বলে কোনো কথা হয়?

— হয়তো হয়। কিংবা হয়ও না।

— এই শোনো, তুমি আবার কবিতাটা শুরু করো।

— কবিতা!

— হ্যাঁ। কেন, সেই যে তোমার *কালপুরুষের ডানা*!

— ও ডানা ভেঙে গেছে...

— যাক। নতুন করে আবার ডানা গজাবে। তুমি লেখো।

আমি চুপ। রিক্তা আমার পিঠে হাত রাখে। — কী হল, বলছ না কিছু?

— কী বলব বলো তো।

— ওই যে বললাম কবিতার কথা।

— কবিতা আমায় ছুটি দিয়েছে।

— কী বলছ সব পাগলের মতো। বসলেই তো কবিতা হয়ে যায়। তুমি তো আর বসলেই না।

হাসলাম। গ্রিলের ওপারে আকাশে এক খণ্ড চাঁদ উঠে এসেছিল। কিন্তু নেমে আসতে পারছিল না কোনো বৃক্ষের অভাবে। যতদূর চোখ যায়, বাড়ি, শুধু উঁচু উঁচু বাড়িই কেবল। কবিতা কোথায়ও নেই।

যন্তর মন্তর

নবকুমার বসু

এই নিয়ে বার তিনেক জহরলালকে আসতে হল বহড়াগোড়া। কন্ট্রাকটরির কাজ, ছুটে বেড়াতেই হয়। দেখাশোনা, দেওয়া-থোওয়া, সামলানো... সব কিছুর জন্য লোক থাকলেও, নিজেকে খেয়াল রাখতে হয় এসব কাজে। নয়তো এখনো পর্যন্ত 'বামুন গেল ঘর, তো লাঙল তুলে ধর' সেই রেওয়াজ দিব্যি চলছে। সেইসঙ্গেই অবশ্য বহড়াগোড়া জায়গা আর বদন কিংবা বদু নামের ছেলেটাকে দিব্যি পছন্দ হয়ে গেছে জহরলালের। মাথায় ছিল বকুলের কথাটাও।

প্রথমবার ভোর ছ-টায় চৌরঙ্গির গুমটি থেকে কেওনঝাড়-এর বাস ধরে এসেছিল। চার, সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে, ছ-নম্বর জাতীয় সড়ক, বাঁয়ে উড়িষ্যার দিকে বেঁকে যাওয়ার আগেই বহড়াগোড়ায় নামিয়ে দিয়েছিল। মদের দোকান আর পেট্রলপাম্প থেকে খবর নিয়ে জহরলাল হাঁটতে শুরু করেছিল উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর। হেমন্তের রোদে তেমন তেজ ছিল না। ইউক্যালিপটাস, শাল আর মাঝে মাঝে কাজুবাদাম গাছের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেশ একটা দোলা লেগে গিয়েছিল মনে। শ্যালক গৌরাঙ্গ বটানি পড়ায় স্থানীয় কলেজে, থাকে ক্যাম্পাস-এর কোয়ার্টার্সে। রাস্তা বানাবার কাজ পাওয়ার দৌলতে জহরের ঠিকানাও আপাতত সেইখানে। বদনকেও, বলা উচিত আবিষ্কার ওই কোয়ার্টার্স ক্যাম্পাসেই। বেশ ছেলে। সহবত জানে। আপনি-আজ্ঞে ছাড়া কথা বলে না। কোনো ধানাই-পানাই নেই। কিন্তু উপযাজক হয়ে রা-টি পর্যন্ত কাড়ে না। বছর বারো বয়েস, মাথায় কদম ছাঁট। গায়ের রংটা মাজার দিকে। সামান্য ট্যারা।

দিন দুয়েক ছিল জহর। কাজ এমন কিছু বড়ো না। হাতিবাড়ি বাংলো থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত দেড়-দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকা করার বরাত পেয়েছিল কাঠখড় পুড়িয়ে। মাঝেমধ্যে বাড়ি ছেড়ে একটু দূরে থাকার জন্যই এসব কাজ ধরতে হয়। তা নয়তো জীবন বড়ো একঘেয়ে, রসকসহীন, থোড়-বড়ি-খাড়া। একটু আমোদ-আহ্লাদ, ফুর্তি-ফার্তা আর যাই হোক কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে বসে হয় না। সতর্ক থাকতে হয় সবসময়। ভদ্রলোক হওয়ার অনেক হ্যাপা।

সেই প্রথমদিন সন্ধেবেলা শ্যালক গৌরাঙ্গর কোয়ার্টার-ক্যাম্পাসের চাতালে আহ্নিক করতে বসে জহরের মনে হয়েছিল কলকাতার এত কাছে এমন মন-মাতানো জায়গাটার খোঁজ পায়নি আগে। সামান্য হিম-হিম ভাব, পরিষ্কার আকাশে তারার বাগান। শুকনো চাতালের দিকটা আলো-আঁধারি, ইউক্যালিপটাসের মৃদু গন্ধ, গাছগাছালি থাকায় নিবিড়। দশ-বারোটা কোয়ার্টার্স, সবই একতলা, পুরোনো, মফস্বলের সরকারি কলেজে যেমন হয়। ক্ষয়া জলের ট্যাঙ্ক ছাদে, হলদেটে দেয়ালের প্লাস্টার চটে গেছে। কিন্তু সব ঘরের সঙ্গেই খানিকটা করে বাগান, দু-চারটে ফুল গাছ আর লাউ-চালকুমড়োর মাচা।

গিন্নিকে ভজিয়ে গৌরাঙ্গ তখনো আসতে পারেনি বাইরে। রামে জল মিশিয়ে চুমুক দিচ্ছিল জহর একা-ই। চাতালের আর এক কোণে উটকো হয়ে বসে দার্শনিক একাগ্রতায় তারা গুনছিল বদন। ফাই-ফরমাশ খাটা আর প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া, সেটাই ওর কাজ। জহর বুঝতে পারছিল, হাবভাবে ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না, এমন মনে হলেও ছোকরার রসবোধটি খারাপ না।

— হ্যাঁরে বদন, তোর পুরো নামটা তো বললি না!

— এজ্ঞে বদনকৃষ্ণ বেরা।

— বাহ্। বাড়িতে কে কে আছে?

— বাবা-মা-দিদি আর লাগডুম-কুত্তা।

— কী করে তোর বাবা?

— এজ্ঞে সাইকেল মেরামতির দোকান আছে বাজারে।

— মা আর দিদি?

— মা ক্যাম্পাস-এর ঝি। দিদি ঘর দ্যাখে। জল তোলে, রাঁধে, কাপড় কাচে।

— তা বেশ। সারাদিন একাই থাকে বাড়িতে?

— বয়েসের মেয়েছেলে। বাইরে গেলেই স্যাঙাতরা লাইন মারে।

— ঠিক, ঠিক। তা তুই করিসটা কী?

— এজ্ঞে কিচ্ছু না। ঘুরে ফিরে বেড়াই। ক্যাম্পাসের বাবুদের, মাসিদের ডাক পড়লে যাই।

— স্কুলে পড়তে যাস না?

— নাহ্।

— কেন রে?

— এজ্ঞে মাস্টার প্যাঁদায়।

— লেখাপড়া করিস না বুঝি?

— ভালো লাগে না। মাথাটা মোটা।

— সেইজন্যেই মাস্টারমশাই মারে?

— খিটকেল লোক। হাতেরও সুখ পায়।

— তুই সেটা বাবাকে বলে দিতে পারিস না?

— তাইলে বাবা আরো গোবেড়েন দেবে। মাস্টার পার্টির নেতা কি না!

— বুঝলাম। তা হলে তোর দিদির একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে দিতে পারলে তো ভালোই হয়। জলের জাগটা ভরে আন দেখি।

একটা কাজের মেয়ের অভাব খুবই মনে হচ্ছে আবার। সন্তোষপুরের ফ্ল্যাটে মানুষ বলতে জহর আর মৃদুলা। বয়েস বসে নেই কারুরই। দুজনেরই কাজ। সরকারি পরিবহণ সংস্থার কর্মচারী মৃদুলা। দশটা-পাঁচটা ডিউটি। দেরি করে গিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসে ঠিকই, তা হলেও সাড়ে এগারোটা থেকে চারটের অনেকখানি সময় জহরলাল একা বাড়িতে। কন্ট্রাক্টর মানুষ। একটু একটু করে উন্নতি হতে হতেই আজ সাড়ে আটশো-র ফ্ল্যাট। লোকজন ফিট হয়ে গেছে। টাকায় টাকা আসার মতন কাজ করতে করতে কাজও আসে। দুপুর পর্যন্ত বেশ খানিকটা কাজ বাড়িতে বসে সেরে, দুটো-আড়াইটে-তিনটেতে বেরুলেও জহরের চলে। খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম, তারপর টো টো করা তো আছেই। হাফ সেঞ্চুরি বয়েসটার কথাও তো ভাবতে হবে। মেয়ে বিয়ে হয়ে চলে গেছে তালান্ডু। ছেলে কাকদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির কেরানি। সারা সপ্তাহ সেখানেই থাকে।

দখ্নের মেয়েটা কাজ করতে এসেছিল সেই সময়ে বছর ছয়েক আগে। বেশ পছন্দ ছিল জহরের মেয়েটাকে। কিন্তু সেই পছন্দই কাল হল। বিদেয় করতে হল উপায়ান্তর না দেখে।

কালোর ওপরে বেশ শাঁসে-জলে দোমালা চেহারা শর্মিলার। কাজকর্মে পটু আর খুবই বুদ্ধিমতী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চোখে কাজল, পায়ে স্যান্ডাল, ফেত্তা দিয়ে শাড়ি পরে। হাঁটাচলার ছন্দে, তাকানোয়, শরীরের আনাচে কানাচে প্রচুর ভাষা ছিল, সেটা জহর পড়তে পারত। পয়সাকড়ি ছাড়া এসব কাজের মেয়ের কিছু বায়নাক্কা থাকবেই। বিকেলে হাওয়া খেতে যাবে, টিভি সিরিয়াল দেখবে, দরকারে টেলিফোন করলে এবং ধরলে আপত্তি করা চলবে না। ইদানীং কিছু মেয়ে অবশ্য মোবাইল ফোনও ব্যবহার করে। বাড়ির গিন্নি চাকুরে হওয়াটাই এদের পছন্দ।

ঘুটিয়ারি শরিফে বাড়ি শর্মিলার। সপ্তায় দু-রাত বাড়িতে কাটাবে, সুতরাং মাস মাইনের ওপর ট্রেন ভাড়াটার কথা পাকা করে নিয়েছিল আগে থাকতে। মৃদুলাকে বশ করে ফেলল দু-সপ্তাহের মধ্যে। কেন না বুদ্ধিমতী বলেই জহরের নজর চিনে নিয়েছিল চটপট। বুঝেছিল, খুচরো রং-তামাশা, একটু দেয়া-নেয়া, লুপঝুপ, টোনা মারার মধ্যে বাড়ির কর্তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও উপরিতে হাত করবে। বেতো আর কেজো বউ নিয়ে জহরলাল যে পাঁশুটে মেরে যাচ্ছে, শর্মিলারা তা দু-দিনেই বুঝে যায়। বাড়াবাড়ি করলে দেখা যাবে। ঝি-এর কাজের অভাব নেই, পার্মানেন্ট বলেও কিছু নেই।

ভালোই চলছিল সব। বোনাস নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের দিনটাতেই সব কেঁচে অম্বল হয়ে গেল। একেবারে বামালশুদ্ধু ধরা পড়া যাকে বলে, জহরলালের সেই অবস্থা হল।

মাথা ধরলে টিপেটুপে দেয় শর্মিলা। কখনো-সখনো জহরও ওর কাঁধ-কোমরের কাছে চুলকে-টুলকে দেয়। এসবই হয় দুপুরের দিকে। সেদিনও সিরিয়াল দেখতে দেখতে একটু ইন্টুমিন্টু দুষ্টুমি হচ্ছিল। বসার ঘরের সোফায় জহর, ঠেস দিয়ে আধশোয়া শর্মিলার পেট কোমরের কাছে। হাত অবাধ্য হচ্ছিল বুকে ওঠার জন্য। ঝি হলেও মেয়েমানুষ তো বটে। ভয়-শরমকে জহরই কি অগ্রাহ্য করতে পারে! একটু চড়েই যাচ্ছিল সেদিন। তার মধ্যেই পৌনে দুটোর সময় নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে মৃদুলা যে বাড়ি ঢুকতে পারে, জহরের স্বপ্নের অতীত ছিল।

ঢুকেই হতভম্ব মৃদুলা। পরমুহূর্তেই ক্ষিপ্ত, চিল-চিৎকার।

— হতচ্ছাড়ি, দামড়ি, ছেঁচড়ি; ভর দুপুরে এই অনাচার আমার বাড়িতে। কী সব্বোনাশ গো...

লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে বেসামাল লুঙ্গি প্রায় চলকে গিয়েছিল জহরের। কোনোমতে গিট মেরে ছুটেছিল দরজা বন্ধ করতে। হাত ধরে টানতে গিয়েছিল মৃদুলাকে। তাতেই ফোঁস করে বিষ ঢেলে দিল।

— নির্লজ্জ, লম্পট। খবরদার ওই পাপের হাতে ছোঁবে না আমায়!

— আহ্-হা, ভেতরে এসে কথাটা শুনবে তো নাকি!

— এরপরেও কথা! দুশ্চরিত্র, ইতর... একেবারে ঝি-এর কোলে মাথা গুঁজে...ছি ছি ছি...

শর্মিলা খুব একটা পাত্তা দেয়নি। আঁচল গুছিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে উঠে গিয়েছিল।

জহর থামাবার চেষ্টা করেছিল মৃদুলাকে। — কী হচ্ছে, কী সব বকছ উলটোপালটা?

— উলটোপালটা? হাড় হাভাতে, নচ্ছার, কামুক... শেষপর্যন্ত ঝি-এর সঙ্গে...

— থামবে তুমি? মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল ব্যথায়...

— আচ্ছা! সেইজন্যই টেপাচ্ছিলে ঝি-কে দিয়ে?

— ছি ছি ছি... কাকে কী বলছ? মাথাটা দপদপ করছিল, শর্মিলাকে দেখিয়ে বললাম...

— চোপরাও, ওই ঝি-এর নাম করবে না আমার সামনে... অমন মাথায় বাজ পড়ে না তোমার!

— তুমিই দ্যাখো না একবার ... ফেটে যাচ্ছে ভেতরটা।

— এখনো ফাটেনি, মুগুর দিয়ে ফাটাব এবার। তার আগে দেখি ওই ঝি মাগির কত বড়ো আস্পদ্দা! গতরখাকি...

মৃদুলা আর কিছু বলার আগেই কোমর বেঁধে দুমদুম পা ফেলে বেরিয়ে এসেছিল শর্মিলা।

— ঝি-ঝি বলে কথা বলবে না কিন্তু...

— ওরে আমার নায়িকা এলেন! একশোবার বলব ঝি, নাম ভাঁড়িয়ে ঢুকেছিস বেজাতের ঝি, আমি জানি না! নাকে ভাত খাই?

— জাত তুলে কথা বলছ যে বড়ো!

— বলব না? দুপুরবেলা পরপুরুষের সঙ্গে র‍্যালা করছিস, তোকে পুলিশে দেবো।

— উঁ-হ্...দাও না দেখি। পাড়ার মস্তান ডেকে হুলিয়া করে দেবো না!

— কী? কী বললি! মস্তান ডাকবি? আমার বাড়িতে আমার সোফার ওপর বসে...

— তোমার বাড়ি তো কী? চুরি করেছি? গয়না ঝেড়েছি?

— আবার উলটো চোপা! জিব খসে যাবে তোর, শুঁয়োপোকা লাগবে গতরে।

— চাপো তো! হাড়ভাঙা খাটুনি সেরে একটু এনজয় লিচ্ছি... তো চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছে। কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে, অ্যাঁ!

— রোস, তোর বিষদাঁত আমি ভাঙছি...

জহর আর দেরি করেনি। জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মৃদুলাকে ঘরের মধ্যে। তারপরেই দরজায় খিল। যা হওয়ার ঘরের মধ্যে হোক। লোক জানাজানিটা তো ঠেকানো যাবে!

কিছুক্ষণ চেঁচাল, জিনিসপত্র ছুঁড়ল মৃদুলা, চড়চাপড় দিল জহরকে। তারমধ্যেই একবার নাটক করার ঢঙে অজ্ঞানের ভান করে কেতরে পড়ল জহর। তারপর সব উত্তেজনার মতন সে-যাত্রা আস্তে আস্তে স্তিমিতও হয়ে গেল।

মালপত্র গুছিয়ে, সন্ধের মধ্যেই ড্যাং ড্যাং করে শর্মিলা কেটে পড়েছিল। টাকাপয়সা নিয়ে চলে যাওয়ার আগে মাজায় দোলা দিয়ে শাসিয়ে গিয়েছিল — বদনাম করলে ঘানি টানাব। জহরকে বলেছিল — দাদাবাবু আসি। ভালো থেকো।

দেড় দু-বছরে স্মৃতিটা ফিকে হয়ে এসেছিল জহরের। একটা সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে ছাড়া মৃদুলারও চলে না। কিন্তু দখ্নের মেয়ে সে কিছুতে বাড়িতে ঢোকাবে না। চেনাজানার মধ্যে দূর-দুরান্তর থেকে আটপৌরে কাউকে একটা আনা যায় কি না, ঠারে ঠোরে আজকাল জহরকেও সে-কথা বলে মৃদুলা। জহর তো চায়-ই। ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে আধবুড়ো-বুড়ির ন্যাড়া জীবনযাপন। শুকিয়ে পাকিয়ে যাওয়া, তার ওপর সরকারি কর্মচারী বউ তো আর মেয়ে নয়!

শাড়ির খসখস, চুড়ির ঠিনঠিন, বারান্দার তারে ছোটো জামা শুকোয় না যে-বাড়িতে সে তো মরুভূমি!

কয়েকবার বহড়াগোড়ায় এসে, বদনের সঙ্গে গল্প করতে করতে বকুলের কথা শুনে, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা উতল হয় জহরলালের। এবারের সময়টাও বড়ো মন মাতানো। উত্তুরে হাওয়া প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গাছে গাছে পাতা আসছে। শাল-মহুয়া-দেবদারু-ইউক্যালিপটাসের কচি পাতা থেকেই মাতলা গন্ধ উড়ে বেড়ায় ক্যাম্পাসের চাতালের উপর দিয়ে। ওদিকে রাস্তা বানাবার কাজটাও শেষ হয়ে আসছে। সুবর্ণরেখার উপর দিয়ে জামশোলা ব্রিজ পার হয়ে গেলেই উড়িষ্যার জমি। আবার হাতিবাড়ি বাংলোটা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কিছু নিয়মকানুন আর কাগজপত্র চালাচালি শেষ হলেই জাতীয় সড়কের সঙ্গে পাকা রাস্তা জুড়ে দেবে জহর।

গৌরাঙ্গ ছাত্র পড়িয়ে এসে বসবে জহরের সঙ্গে। তার আগে যথারীতি বদনই সঙ্গী। চাতালের কোণে ঘাড় কাত করে বসে আছে। আবছায়ার মধ্যে বনজ গন্ধ, রাম-জল, হঠাৎ হঠাৎ দখ্নে হাওয়ায় পাতার শব্দ। দু-চারটে কথা সেরে নেয় জহর বদনের সঙ্গে।

— বদু, তোর বাবা বাড়ি ফেরে কখন?

— রাত হয়।

— দোকান তো বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কী করে?

— এজ্ঞে মাল খায়।

— বাহ্ বাহ্! তা আর কী কী খায়?

— এজ্ঞে চুন্নু তো, ইঁদুরের চাট দিয়েই জমে। পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি-কান-ক্ষুরের ঝাল চচ্চড়িও খায়।

— ইশ-স্, থাক থাক। তারপর... রাতে ফিরে কী করে?

— মাকে পেটায়।

— ছি ছি, কী কাণ্ড! তারপর?

— তারপর ঝগড়া করে, কাঁদে। আবার ভাত খেয়ে ঘুমোয়।

— তুই আর দিদি তখন কী করিস?

— এজ্ঞে কান চাপা দিয়ে ঘুমোই।

— আহা-হা রে! তোদের তো খুবই কষ্ট। দেখি, তোর দিদির যদি একটা গতি করা যায়। বকুল মেয়ে ভালো তো রে?

— এজ্ঞে বলতে পারি না। পোড়খাওয়া মেয়েছেলে তো। মুখরা।

— আচ্ছা কাল একবার যাব। বসে গপ্পো-টপ্পো করে আসা যাবে। তারপর যদি...

লোভে লোভে সন্ধের দিকে একটু ঝুঁকি নিয়েই জহর বেরুলো। কাছে মোক্তারপাড়াতে বদনদের ঘর। শালাজ মিনতি বলল — জামাইবাবু, আজ রকে বসবেন না? বকফুলের বড়া ভাজছি।

— একটু ঘুরে আসি তোমাদের বহড়াগোড়ায়। কাল দুপুরের বাসে ফিরব। আবার কবে আসি...

— বদনাকে নিয়ে যান সঙ্গে। ঝাড়খণ্ডিরা নতুন লোকদের ভালো চোখে দ্যাখে না।

একটু তফাত রেখে আগে আগে হাঁটতে লাগল বদন। উঁচু-নিচু লালচে কাঁকুরে রাস্তা।

তে-ঢ্যাঙ্গা গাছের আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে। মরে আসা, লালচে, শেষ দিনের আলোয় পাখিরা ঘরে ফিরছে। বদনদের বাড়িটা বেশ। রাস্তার ধার থেকেই খানিকটা ঝাঁট দেওয়া উঠোনের পর খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর। নিকোনো দাওয়া। উঠোনের ওপরেই একটা ছোটো ঝুপড়ি আমগাছ। তাতে বোল এসেছে। পাশে একটা তিনমাথা মেটে উনুন। একটা ভাঙা দড়ির খাটিয়া।

বদনকে টাকা দিল জহর। — ফুলুরি, আলুর চপ নিয়ে আয়। দিদি আছে তো রে?

ডাকতে হল না। বদন যেতে-না-যেতেই তেরিয়াগোছের ডাঁটো মেয়েটা ঘরের পিছন থেকে বেরিয়ে এল। পরনে ডুরে শাড়ি, মাথায় ফুল।

— আপনি মাস্টারবাবুর সম্বন্ধী না?

— ঠিকই ধরেছ। তুমিই বকুল তো?

— এজ্ঞে। গাছের ফুল নই। গাঁ-গঞ্জের মেয়ে।

— বা-বা-বা, তুমি তো বেশ কথা বলো দেখছি!

— তা বলি। গন্ধে গন্ধে অনেকে ঢুঁ মারতে আসে তো। আমি সে বকুল নই।

— খুব ভালো। খুব ভালো। ফুল-টুল দিয়ে আর কী হয়!

— এজ্ঞে মেয়েমানুষ খুঁজতেই এয়েচেন বুঝি?

— আরে ছোঃ... তোমাদের কথা-টথা শুনি... বেড়াতে বেড়াতে আলাপ করতে এলাম। বোসো না, বোসো।

— আপনার নজরটি খুব সুবিধের ঠেকচে না। বসার পরে শুতে বলবেন মনে হচ্ছে!

— আ-হা-হা, আগেই ওসব কথা কেন? চেনাজানা হোক... এমনি এমনি তোমাকে কি...কলকাতা যাবে নাকি? সুখে থাকবে।

— আঁশবঁটি চেনেন?

— অ্যাঁ! ও আবার কী কথা!

— এজ্ঞে ছোঁচা লোকের জন্য ওটিই যে মন্তর। কলকাতা, সুখ...আঁশবঁটি ছাড়া ধরে রাখব কী দিয়ে! আমাদের হল গিয়ে ওইটেই মন্তর।

অশান্ত বসন্তের সন্ধেবেলা, উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল জহর। তো-তো করে বলল— তোমার কথাবার্তায় বড়ো ধার বাপু... বদনাকে বলছিলাম... দুঃখকষ্টের সংসার, তোর দিদি যদি রাজি থাকে, কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যাব... কাজকর্ম করবে, থাকবে-খাবে, মোটে দুটো মানুষ আমরা...

— আপনি এবার আসুন। আর এ-মুখো হবেন না। বাপ জানলে কোপাবে।

— বদনটা তো এরকম নয়। বলতে বলতে রাস্তায় বেরিয়ে এল জহরলাল। ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যাচ্ছিল। বকুল একটি জাত সাপ!

বদনও ফিরে এসে চুপচাপ হাঁটতে লাগল আবার। হাতে ঠোঙা।

— তোর দিদিটা বড়ো ডেঞ্জারাস মেয়ে রে বদু।

— এজ্ঞে হারামি দেখলেই চেনে। একা একা থাকে তো!

জহরলাল চমকে তাকাল বদনের দিকে। তাড়াতাড়ি পা বাড়াল কোয়ার্টার্সের দিকে। বহড়াগোড়ার আসল সাপ আর আঁশবঁটিটা যে কে, পুরো ঠাহর করতে পারল না।

বড়োমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (Los funerales de mama grande : 1962)

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্ : অনুবাদ — **অমিতাভ রায়**

বিশ্বের সমস্ত অবিশ্বাসীদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, এটাই হল বড়োমার সত্যিকারের কাহিনী। তিনি ছিলেন মাকোন্দো রাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত রানি। বিরানব্বই বছর বেঁচে থাকার পর গত সেপ্টেম্বর মাসের এক মঙ্গলবারে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন দেশের শীর্ষ যাজক।

বড়োমার মৃত্যুজনিত কারণে উদ্ভূত হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি দেশ এখন কাটিয়ে উঠেছে। সান্ হাসিন্তোর বাঁশি বাজিয়েরা, গোয়াহিরার চোরাচালানকারীরা, সিনুর ধান চাষিরা, কাউকামায়ালের দেহ পসারিনিরা, সিয়েরপের যাদুকররা আর আরাকাতাকার কলা-বাগিচার শ্রমিকেরা, বড়োমার আসন্ন মৃত্যুর জন্যে এতদিন ধরে প্রতীক্ষার পরে ক্লান্ত হয়ে তাঁবু গুটিয়ে বিশ্রাম করতে চলে গেছে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীরা ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা এই ঐতিহাসিক এবং সাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন পারলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী গির্জার প্রতিভূবৃন্দ। এখন সবাই মানসিক শান্তি ফিরে পেয়ে নিজের নিজের কাজে যোগ দিয়েছেন। দেহে ও মনে যাজকের স্বর্গারোহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। সারা রাস্তায় ছড়ানো আছে খালি বোতল, সিগারেটের টুকরো, শুকনো হাড়, টিন, ন্যাকরা ইত্যাদি জঞ্জাল। এ-সবই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে আসা বিশাল জনতার অবদান। ফলে, পথে চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকরা পুঁথির পাতায় এ-সব লিখে ফেলার আগে বড়ো রাস্তার ধারে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে এ-রকম একটা জাতীয় শোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার এটাই সেরা সময়।

বহুদিন ধরেই রাতের দিকে বড়োমার পেট ফাঁপছিল। সরষেবাটার পুলটিশ লাগানোয় কষ্টটা আরো বেড়েই চলছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে প্রায় শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছিলেন। তবু চোদ্দো সপ্তাহ আগে তিনি হুকুম দিলেন, তাঁকে যেন লিয়ানা কাঠের দোল-খাওয়া চেয়ারে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে তাঁর শেষ ইচ্ছা সবাইকে শুনিয়ে যেতে পারেন। মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্যে এইটুকু কাজই বাকি ছিল। এর মধ্যে সেদিন সকালেই তিনি ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের সাহায্যে নিজের আত্মার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। বাকি ছিল, বাক্স-প্যাঁটরায় রাখা তাঁর যাবতীয় পার্থিব সম্পদের বিলিবণ্টন। ন-জন ভাইপো-ভাগ্নের মধ্যে ওগুলো বিলোতে হবে। কারণ ওরাই তাঁর বৈধ ওয়ারিশ। ওরা পালা করে তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকত। নিজের মনে অনবরত কথা বলতে থাকা, প্রায় একশো বছর বয়সী মাকোন্দোর প্রবীণ যাজক বড়োমার ঘরেই প্রায় পাকাপাকিভাবে আস্তানা গেড়েছিলেন। ও-ঘরে তাঁকে পৌঁছে দিতে জনা দশেক লোক লেগেছিল। তখন তিনি ঠিক করেন যে শেষ পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন যাতে বারে বারে নামা-ওঠার হাঙ্গামা না পোয়াতে হয়। সব চেয়ে বড়ো কথা, এতে শেষ মুহূর্তে বড়োমার পাশে থাকাটাও নিশ্চিত করা যাবে।

সব চেয়ে বড়ো ভাইপো নিকানোর আকৃতিতে দৈত্যের মতো আর প্রকৃতিতে বুনো এবং চোয়াড়ে। তার পরনে খাকি পোশাক আর পায়ে কাঁটা লাগানো বুট জুতো। তার জামার নীচে

একটা ০.৩৮ ক্যালিবারের রিভলভার সদাপ্রস্তুত। উকিলের খোঁজ করতে নিকানোরই গিয়েছিল। গুড় আর সুগন্ধি পাতার নির্যাসে সুবাসিত বিরাট দোতলা বাড়িটার খাঁজে খাঁজে বেশ কিছু লুকোনো ঘরে রাখা ছিল বিশাল সব সিন্দুক আর ধুলোর সঙ্গে মিশে যাওয়া চার প্রজন্মের টুকিটাকি জিনিসপত্র। সপ্তাহখানেক আগে থেকেই যেন বাড়িটা এই মুহূর্তের প্রতীক্ষায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাড়ির মাঝখানের বিশাল বসার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে ছাল ছাড়ানো শুয়োর আর রক্ত বের করে নেওয়া হরিণের মৃতদেহ। নুন আর চাষের যন্ত্রপাতি ভরা বস্তার উপর খেতের মুনিশরা গুটিগুটি মেরে শুয়েছিল। আসলে নির্দেশ পাওয়ামাত্রই যাতে ওরা খচ্চরে চেপে খেত-খামারের চতুর্দিকে খবরটা পৌঁছে দিতে পারে তারই জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিল। পরিবারের বাদবাকিরা বসার ঘরে সমবেত। মেয়েরা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মরণাপন্ন মানুষটির মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা আর উত্তরাধিকারের চিন্তা যেন ওদের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। কুলকর্ত্রী হিসেবে বড়োমার দাপটে বিষয়-সম্পদ আর বংশের সুনাম সুরক্ষিত। বড়োমাকে না জানিয়ে, তাঁকে আড়াল করে কাকারা ভাইঝির মেয়েদের, জ্ঞাতি ভাইরা মাসি-পিসিদের আর ভাইরা নিকট আত্মীয়াদের বিয়ে করেছিল। এ-ভাবেই গড়ে উঠেছিল পরিবার তথা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিবাহের এক জট পাকানো জটিল চক্র। বংশবৃদ্ধি পরিণত হয়েছিল এক দুষ্টচক্রে। কেবলমাত্র সবচেয়ে ছোটো ভাইঝি মাগদালেনা এই চক্র থেকে পালাতে পেরেছিল। অলৌকিক এক আতঙ্ক যেন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের সাহায্যে সে নিজেকে অশুভ আত্মার হাত থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। শেষে সংসারের সব সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করে মাথা মুড়িয়ে মাগদালেনা সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়।

বৈধ পরিবারের পাশাপাশি জমিদারির অধিকার খাটিয়ে এ-বাড়ির পুরুষরা গাঁয়ে-গঞ্জে, খেতখামারে, পথে-ঘাটে অসংখ্য জারজ বংশধর ছড়িয়ে দেয়। তাদের পদবির বালাই নেই। বড়োমার ধর্মসন্তান, পুষ্যি, প্রিয়পাত্র, এ-সবই তাদের পরিচিতি।

আসন্ন মৃত্যু ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার অবসান ঘটায়। মৃতপ্রায় মহিলা সকলের বশ্যতা ও স্তুতি পেতে অভ্যস্ত। তাঁর কণ্ঠস্বর অর্গানের মৃদু সুরের চেয়ে উঁচু তানের না হলেও, বাড়ির লাগোয়া খেত-খামারের নির্জন কোনা থেকেও তা শোনা যেত। এই মৃত্যুটা সম্পর্কে কেউ উদাসীন ছিল না। পুরো শতাব্দী জুড়ে বড়োমা ছিলেন মাকোন্দোর মধ্যমণি। আগেকার দিনে যেমন ছিলেন তাঁর ভাই, বাবা বা আরো প্রাচীন সব পূর্বপুরুষেরা। দু-শতাব্দী ধরে পারিবারিক রাজত্ব কায়েম ছিল। তাঁদের গোষ্ঠীকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল জনবসতি। এলাকাটার নামকরণ হয়েছিল তাঁদের পদবি দিয়েই। এদের উৎপত্তি নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায়নি। এ-পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির সঠিক পরিমাণ ও মূল্যের হিসেব-নিকেশও কেউ কখনো করেনি। মানুষের বিশ্বাস, বহতা জলধারা থেকে শুরু করে বদ্ধ জলাধার, পৃথিবীর বুকে নেমে আসা বৃষ্টি, আশপাশের রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফের খুঁটি, ঋতুচক্র, এমনকী সূর্যের তাপ পর্যন্ত সব কিছুই বড়োমার সমতুল্য। তার উপর তিনি আবার উত্তরাধিকার সূত্রে খেত-খামার আর সব মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী। বড়োমা যখন বাড়ির বারান্দায় বসে সন্ধ্যার হাওয়া খেতেন, তাঁর নাড়িভুঁড়ি আর কর্তৃত্বের চাপ লিয়ানা কাঠের দোল-খাওয়া চেয়ারটার ওপর পড়ত। তখন মনে হত বাস্তবিকই তিনি

অপরিসীম সম্পদের অধিকারী ও প্রভূত ক্ষমতাশালী। মনে হত তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাশালী গৃহিণী।

কোনোদিন যে বড়োমার জীবনাবসান হতে পারে, এমন কথা তিনি নিজে আর তাঁর গোষ্ঠীর সদস্যরা ছাড়া আর কেউ ভাবেনি। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল অবিশ্যি ভবিষ্যদ্বাণী মারফত বড়োমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবুও বড়োমার বিশ্বাস ছিল যে নিজের দিদিমার মতো তিনিও একশো বছরের বেশি বাঁচবেন। সেই মহিলা ১৮৮৫-র গৃহযুদ্ধের সময় খেত-খামারের ভেতরে ঘাঁটি গেড়ে বসা কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার এক রক্ষীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবে এ-বছর এপ্রিল মাস নাগাদ বড়োমা বুঝতে পারলেন যে সামনাসামনি লড়াইয়ে বিপ্লবীদের দল 'হেদারালিস্ত মেসন'কে পর্যুদস্ত করার সুযোগ ঈশ্বর তাঁকে দেবেন না।

যন্ত্রণা শুরুর প্রথম সপ্তাহে পারিবারিক ডাক্তার লক্ষ করলেন যে বড়োমা সরষের পুলটিশ লাগিয়ে তার ওপর উলের মোজা পরে রয়েছেন। এই ডাক্তারটিও উত্তরাধিকারসূত্রে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। আদতে তিনি মন্তপোলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। দার্শনিক বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বিজ্ঞানের তথা প্রগতি বিরোধী। বড়োমার হুকুমনামার জোরে তিনি মাকোন্দোয় অন্য কোনো ডাক্তারকে ঢুকতে দিতেন না। ঘোড়ায় চড়ে তিনি পুরো এলাকাটা চষে বেড়ান। সন্ধ্যার অন্ধকারে যন্ত্রণাকাতর রোগীদের দেখতে যাওয়াটা তাঁর বহুদিনের পুরোনো অভ্যাস। প্রকৃতি তাঁকে অজস্র অবৈধ সন্তানের বাবা হওয়ার অধিকার দিয়েছিল। তবে ইদানীং বাতের ব্যথায় অথর্ব হয়ে পড়ায় তিনি নিজের বাড়ির দোলনা ছেড়ে বিশেষ বেরোতে পারেন না। অসুখের লক্ষণের কথা শুনে আর আন্দাজের বশে রোগীদের না দেখেই চিকিৎসা শুরু করেন। বড়োমার নির্দেশে পায়জামা পরে, দুটো লাঠির ওপর ভর দিয়ে কোনো রকমে রোগিণীর ঘরে এসে পাকাপোক্তভাবে ঠাঁই নিলেন। বড়োমার চরম অবস্থার আভাস পাওয়ামাত্র তিনি বাড়ি থেকে একটা সিন্দুক আনানোর বন্দোবস্ত করলেন। সিন্দুকটার মধ্যে ছিল অনেকগুলো ছোটো ছোটো কৌটো। কৌটোগুলোর গায়ে লাতিন ভাষায় নাম লেখা। সপ্তাহ তিনেক ধরে তিনি মুমূর্ষু রোগিণীর সব রকমের স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা করলেন। কড়া ঝাঁজের উত্তেজক আরক দিলেন। প্রয়োগ করলেন সাংঘাতিক কড়া জোলাপ। এত কিছু করার পর প্রচণ্ড চিন্তা-ভাবনায় বিভোর হয়ে তিনি সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিতে দিতে সেই ঘরেই বসে রইলেন। অবশেষে এল সে-দিনের ভোর, যখন ডাক্তারের সামনে মাত্র দুটো রাস্তা, হয় নাপিত ডেকে এনে বড়োমার শরীরের দূষিত রক্ত বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা নয়তো ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলকে ভূত তাড়াবার জন্যে অনুরোধ করা।

নিকানোর যাজককে ডেকে আনার হুকুম দিল। বাছাই করা জনা দশেক লোক তাঁকে বড়োমার ঘরে বয়ে নিয়ে এল। বড়োমা তখন চাঁদোয়া লাগানো উইলো কাঠের দোল-খাওয়া চেয়ারে বসে। মরচে ধরা, ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ শব্দ করা এই দোল-খাওয়া চেয়ারটা সাধারণত উৎসব-অনুষ্ঠানে বাইরে আনা হত। সেপ্টেম্বর মাসের ভোরে, যখন হালকা গরম ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়েছে, ঠিক তখনই গির্জার ছোটো ঘণ্টার আওয়াজ মাকোন্দোর বাসিন্দাদের কাছে খবরটা পৌঁছিয়ে দেয়। সূর্য উঠতে না উঠতেই বড়োমার বাড়ির সামনেকার রাস্তা-ঘাট লোকে লোকারণ্য। মনে হচ্ছিল, কোনো মেলা বসেছে।

এইসব দেখে শুনে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। নিজের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বড়োমা এমন ধূমধাম করে জন্মদিন পালন করেছিলেন, যা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। আনন্দ-উৎসবের যেন বান ডেকেছিল। সারা শহরে মদ বিলোনো হল। শহরের প্রধান প্লাজায় মানে কেন্দ্রীয় চত্বরে, কাটা হয়েছিল প্রচুর গরু-ভেড়া; আর একটা ব্যান্ডপার্টি তিন দিন ধরে একটানা বাজনা বাজায়। ধুলোমাখা যে আলামন্দ গাছটার তলায় এই শতাব্দীর প্রথম সপ্তাহে কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সেনাবাহিনী তাঁবু খাটিয়েছিল, সেখানে হরেকরকম জিনিসপত্র বিক্রির ধূম লেগে যায়। কী না ছিল সেখানে। ধান আর ভুট্টার তৈরি মদ, পাউরুটির রোল, ভুট্টার রোল, পনিরের রোল, শুয়োরের মাংস দিয়ে রান্না করা রকমারি লোভনীয় খাদ্য, গলদা চিংড়ি ভাজা, নানান রকমের কেক-প্যাস্ট্রি, নারকোলের মিঠাই, আখের রস থেকে শুরু করে গয়নাগাঁটি, হাঁড়িকুড়ি পর্যন্ত — এক কথায় সব কিছু। মোরগের লড়াই আর লটারির ব্যবস্থাও ছিল। উত্তেজিত জনতার কোলাহলের মধ্যে বড়োমার ছাপা ছবি, ছবি আঁকা জামাও বিক্রি হচ্ছিল।

জন্মদিনের দু-দিন আগে উৎসবটা শুরু হয়ে জন্মদিনের সন্ধ্যায় কান ফাটানো আতসবাজির ঝলসানিতে শেষ হয়। রাতে বড়োমার বাড়ির সেই বিশাল বসার ঘরটায় এক নাচের আসর বসে। বাছাই করা অতিথি আর পরিবারের বৈধ সদস্যেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। পুরোনো পিয়ানোটায় বাজানো হচ্ছিল আধুনিক সুর। জারজ সন্তানদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে অতিথিরা বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচল। বড়োমা পিঠের তলায় একটা বালিশ রেখে আরামকেদারায় বসে সব কিছুর তত্ত্বাবধান করছিলেন। প্রতিটি আঙুলে আংটি পরা ডান হাত নাড়িয়ে তিনি একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওখানে বসেই তিনি সেরে ফেললেন সেই সব বিয়েগুলোর পাকা কথাবার্তা, যেগুলো পরের বছর হওয়ার কথা। প্রেমিক-প্রেমিকার ইচ্ছানুসারে কয়েকটা বিয়ে তিনি মেনে নিলেও বেশির ভাগ বিয়েই তাঁর মতানুযায়ী স্থির হল। উৎসবের একেবারে শেষ লগ্নে বড়োমা মাথায় মুকুট পরে জাপানি লণ্ঠনের আলোয় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সমবেত জনগণের উদ্দেশে মুঠো মুঠো পয়সাকড়ি ছড়াতে লাগলেন।

মাঝে কিছুদিন এই ঐতিহ্যে বাধা পড়ে। পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আংশিকভাবে এর জন্যে দায়ী। আবার গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক ঘটনাবলীরও এ-বিষয়ে অবদান আছে। নতুন প্রজন্ম এমন জাঁকজমকের গল্পই শুনে এসেছে, কোনোদিন দেখার সুযোগ পায়নি। বড়োমার গির্জায় যাওয়ার দৃশ্য তারা কখনো নিজেদের চোখে দেখেনি। বড়োদের কাছে তারা বরাবরই শুনে এসেছে যে, গির্জায় যাওয়ার সময় জনৈক রাজপুরুষ নাকি বড়োমাকে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে পথ চলত। এমনকী গির্জাও তাঁকে কিছু বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল। প্রার্থনাসভার পবিত্রতম মুহূর্তেও তিনি নতজানু হতেন না, পাছে তাঁর পোশাকের ভাঁজ নষ্ট হয়ে যায়। যৌবনের কল্পনার মতো সেই দিনটার কথা প্রবীণরা আজও মনে করেন, যে-দিন বড়োমার পৈতৃক বাড়ি থেকে গির্জার সর্বোচ্চ বেদি পর্যন্ত দুশো গজ লম্বা মাদুর পাতা হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় মারিয়া দেল রোজারিও কাস্তাখেদাইমন্তেরো তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। মাদুর বিছানো পথ পেরিয়ে মাত্র বাইশ বছর বয়সেই 'বড়োমা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। মধ্যযুগের এমন জীবনদর্শন কেবলমাত্র এই পরিবারের নয়,

জাতীয় ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়। বেশির ভাগ সময়েই বড়োমা একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন এবং নিজেকে কিছুটা প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। ক্বচিৎ তাঁকে গরমকালের সন্ধ্যায় বারান্দায় দেখা যেত। সেরানিয়াম ফুলের ভারে প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থায়ও তাঁকে নিয়ে গড়ে ওঠা গল্পকথার আড়ালেই বড়োমা অদৃশ্য হয়ে থাকতেন। নিকানোর মারফত তাঁর কর্তৃত্ব বাস্তবে কার্যকরী হত। ঐতিহ্যানুযায়ী একটা অঘোষিত প্রতিশ্রুতি ছিল যে বড়োমা যেদিন তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল করবেন সে-দিন তাঁর উত্তরাধিকারীরা জনসাধারণের জন্যে তিন রাত্রিব্যাপী এক উৎসবের ব্যবস্থা করবে। আবার লোকে এটাও জানত যে, বড়োমা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন যে মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি অন্তিম ইচ্ছাপত্র বা উইল রচনা করবেন। তবে বড়োমা যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষেরই মতো মারা যেতে পারেন, এমন কথা কেউ মন থেকে বিশ্বাস করেনি। কেবল সে-দিন ভোরে গির্জার ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর মাকোন্দোর বাসিন্দারা বুঝতে পারল যে বড়োমা অমর নন। এবং তিনি মরণাপন্ন।

তাঁর অন্তিম মুহূর্ত সমাসন্ন। তাঁর কান পর্যন্ত সুগন্ধি ছড়ানো। সুতির চাদর বিছানো বিছানায় ধুলোভরা চাঁদোয়ার তলায় তিনি শায়িত। কুলকর্ত্রী বড়োমার হৃৎস্পন্দনে জীবনের এতটুকু চিহ্নও খুঁজে পাওয়া ভার। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বড়োমা তাঁর প্রেমে উত্তাল হয়ে ওঠা পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রকৃতি তাঁকে যা ক্ষমতা দিয়েছিল, তাতে তিনি একাই একটা গোটা প্রজাতির জন্ম দিতে পারতেন। অথচ, তিনি কুমারী ও নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। শেষ মুহূর্তে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল বুঝতে পারলেন যে মৃত্যু পথযাত্রীর হাতের তালুতে তেল মাখানোর চেষ্টা করা বৃথা; কারণ, মরণযন্ত্রণায় বড়োমা হাত দুটো মুঠো করে রয়েছেন। ভাইঝিদের সমবেত প্রচেষ্টাও কোনো কাজে এল না। এক সপ্তাহের টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে মুমূর্ষু মানুষটি এই প্রথম মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত নিজের বুকে হাত রাখলেন। ভাইঝিদের দিকে তিনি চাউনিবিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন — 'এটা পাবে নবীনা সন্ন্যাসিনী মাগদালেনা'। সম্পত্তির সামান্য কিছু অংশ দিয়ে যাবেন বলে মাগদালেনাকে বড়োমা আগেই চিঠি দিয়েছিলেন। এভাবেই একটা উত্তরাধিকারের অবসান হল। মাগদালেনা উত্তরাধিকার ত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করল।

ভোরবেলায় নিকানোর ছাড়া আর সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে বড়োমা হুকুম জারি করলেন। রীতিমতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাক্কা আধ ঘণ্টা ধরে তিনি বিষয়সম্পত্তির যাবতীয় খবরাখবর নিলেন। তারপর নিজের শেষকৃত্য, অন্ত্যেষ্টি, সমাধি ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তারে অনুপুঙ্খ আলোচনা সেরে বললেন — 'সবসময় চোখ-কান খোলা রাখবে। দামি জিনিসপত্র তালাচাবি দিয়ে সাবধানে রাখবে। জানোই তো, অনেকেই এ-সময় চুরি-চামারির মতলবে হাজির হয়'। এরপর গির্জার পাদ্রির সামনে বিশদাকারে স্বীকারোক্তির সময় বড়োমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে ভাইপো-ভাইঝিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হল বাইবেলের প্রথানুসারী আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তির অনুষ্ঠান। সবশেষে অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশের উদ্দেশে বেতের দোল-খাওয়া চেয়ারটায় বসিয়ে দেওয়ার হুকুম তামিল করার পর বড়োমার কাজ শুরু হল।

গোটা চব্বিশ দলিলে পরিষ্কার হাতের লেখায় নিকানোর বড়োমার যাবতীয় বিষয়-আশয়ের বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করে রেখেছিল। ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল আর ডাক্তারকে সাক্ষী

রেখে, শান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বড়োমা সম্পত্তির তালিকা জোরে জোরে পড়ে গেলেন যাতে সরকারের আইনসংক্রান্ত আধিকারিকের কানে সব কথা ঠিকমতো পৌঁছায়। এটাই তাঁর ক্ষমতা ও মান-মর্যাদার চরম ও একমাত্র উৎস। বাস্তবে দেখা গেল, বড়োমার সম্পত্তি বলতে বোঝাচ্ছে মাত্র গুটি তিনেক জেলার ভূ-সম্পদ। উপনিবেশ শুরুর যুগে সরকারের দেওয়া দখলিস্বত্বের দলিল অনুযায়ী এগুলো তাঁদের হাতে এসেছিল। তারপর কয়েক প্রজন্ম ধরে ধনী পরিবারে বিয়ে-শাদির ফলে সম্পত্তি অনেক ফুলে ফেঁপে, গড়ে ওঠে বড়োমার পরিবারের খাস তালুক। এই স্পষ্ট সীমারেখা ছাড়া আশপাশের পাঁচটা শহরে তাঁর মালিকানাধীন ছড়ানো-ছিটানো এমন অনেক জমি রয়েছে যেখানে কোনোদিনই ফসল ফলানো হয়নি। মালিকের গরজ না থাকলেও তিনশো বাহান্নটা পরিবার এইসব জমিতে ঠিকা-প্রজা হিসেবে বসবাস করে। প্রতিবছর নিজের জন্মদিনের আগের তিন দিন ধরে বড়োমা এদের কাছ থেকে নিয়ম করে খাজনা আদায় করতেন। নিজের কর্তৃত্বের এটাই ছিল একমাত্র পরিচয়। আর এর ফলেই এই সমস্ত জমি, সরকারের হাতে ফিরে যায়নি। বাড়ির ভেতরকার দরদালানে বসে বড়োমা নিজের হাতে জমিজমার ঠিকা-স্বত্বের খাজনা নিতেন। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে তাঁর পূর্বপুরুষেরা একইভাবে ঠিকা-প্রজাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। খাজনা নেওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার দিন তিনেক বাদে দেখা যেত বাড়ির উঠোনটা শুয়োর, মুরগি আর টার্কিতে ভরে গেছে। জমিতে ফলানো ফসল ও ফলমূলের যে-অংশটুকু মালকিনের পাওনা তা উপহার হিসেবে রেখে যাওয়া হত। ঐতিহাসিক কারণেই এই জমিদারির সীমানার মধ্যেই ছিল মাকোন্দো জেলার অধিকাংশ মানুষের বসবাস আর রমরমা। জেলা সদরও এখানেই অবস্থিত। ফলে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ায় যে, যারা ওখানে বসবাস করত তাদেরও জানা ছিল যে, নিজেদের বাড়ির ইট-বালি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর উপরই তাদের মালিকানা নেই। জমির মালিক বড়োমা। এর জন্যে তাঁকে নিয়মিত ভাড়া দেওয়া হয়, ঠিক যেমনভাবে রাস্তাঘাটের জন্যে সরকারকে কর দেওয়া হয়ে থাকে।

জমিদারির চতুর্দিকে অসংখ্য গরু-ঘোড়া চড়ে বেড়াত। ওগুলোকে কেউ গুনত না আর সেগুলোর দেখভাল হত আরো কম। পশুগুলোর পেছন দিকে একটা করে তালার ছবি উলকির মতো এঁকে দেওয়া হত। শুধু মাত্র সংখ্যা নয়, যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ওরা দূর দূর এলাকায় পরিচিত ছিল। গরমের দিনে তেষ্টায় ছটফট করতে থাকা প্রাণীগুলো কোথায় কোথায় না ছড়িয়ে পড়ত! কে জানে কেন, শেষ গৃহযুদ্ধের পর থেকেই বড়োমার বাড়ির গোয়াল আর আস্তাবলগুলো ক্রমশ শূন্য হয়ে পড়েছিল। ইদানীং সেখানে চালু হয়েছে চিনির কল, দুধের ডেয়ারি আর ধানের কল।

এই তালিকাটা ছাড়াও 'অন্তিম ইচ্ছা' প্রকাশের সময় বড়োমা তিন ঘড়া সোনার মোহরের কথা ভুললেন না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ওগুলো যেন বাড়ির কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। পরে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও ওগুলোর আর কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। ঠিকা-স্বত্ব বাবদ খাজনা আদায়ের দায়িত্বের পাশাপাশি ওয়ারিশেরা পেল এই লুকোনো ধনরত্ন উদ্ধার করার একটা পরিকল্পনা। একের পর এক প্রতিটি প্রজন্মের হাতে উত্তরাধিকার সূত্রে তুলে দেওয়ার জন্যেই পরিকল্পনাটি এমন নিখুঁতভাবে রচিত হয়েছিল।

বৈষয়িক কথাবার্তা শেষ করতে বড়োমার ঘণ্টা তিনেক লেগে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসা ঘরের ভেতর মৃত্যুপথযাত্রিণীর কণ্ঠস্বর যেন হিসেব করে প্রতিটি জিনিসকে মর্যাদা দিচ্ছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে বড়োমা যখন 'অন্তিম ইচ্ছাপত্র' অর্থাৎ 'উইল'-এ স্বাক্ষর করলেন আর তার তলায় সাক্ষীদের সই শেষ হল, তখন বাড়ির সামনেকার ধুলোমাখা আলামন্দ গাছের ছায়ায় জড়ো হতে শুরু করা জনসমুদ্রের হৃদয়ে গোপনে বয়ে গেল অদ্ভুত এক শিহরন।

এবার বাকি রইল কেবল অ-পার্থিব সম্পত্তির তালিকা। অনেক কষ্টে বিশাল শরীরটাকে কোনো রকমে সামলিয়ে তিনি উঠে বসলেন। বংশের প্রতাপ-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে তাঁর পূর্বপুরুষেরাও অন্তিমকালে ঠিক এই কাজটি করে এসেছিলেন। স্মৃতির গহনে অবগাহন করে, জোরালো ও আন্তরিক কণ্ঠে বড়োমা উচ্চারণ করলেন তাঁর যাবতীয় অদৃশ্য সম্পদের তালিকা — মাটির তলার সম্পদ, দেশের জল, জাতীয় পতাকার রং, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, প্রচলিত রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, আবেদনের অধিকার, আইনসভার বিতর্ক, সুপারিশের চিঠি, ঐতিহাসিক নথি, স্বচ্ছ নির্বাচন, সৌন্দর্যের রানিরা, আধ্যাত্মিক কথাবার্তা, বিশাল মিছিল, সম্ভ্রান্ত যুবতী নারী, যথার্থ ভদ্রলোক, মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক বাহিনী, রাষ্ট্রের উচ্চগৌরব, সর্বোচ্চ আদালত, যে-সব জিনিসের আমদানি নিষিদ্ধ, উদার মহিলাবৃন্দ, মাংস-সংক্রান্ত সমস্যা, ভাষার পবিত্রতা, দৃষ্টান্তসৃষ্টির যোগ্য উদাহরণ, স্বাধীন অথচ দায়িত্বশীল প্রচারমাধ্যম, দক্ষিণ আমেরিকার এথেন্স, জনমত, গণতন্ত্রের শিক্ষা, খ্রিস্টীয় নীতিবোধ, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার, কমিউনিস্ট বিপদ, রাষ্ট্রের জাহাজ, নিত্য প্রয়োজনীয় ও ভোগ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দাম, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা, রাজনৈতিক সমর্থন জানানো প্রস্তাব।

বড়োমা অবিশ্যি তালিকার শেষপর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না। দীর্ঘ তালিকা আউড়ে যাওয়ার পরিশ্রমে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বিমূর্ত সূত্রের যে-মহাসাগর দুই শতাব্দী ধরে এই পরিবারের ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড়োমা সশব্দে হেঁচকি তুলে মারা গেলেন।

সে-দিন বিকেলে রাজধানীর বিষণ্ণ নাগরিকেরা খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণের প্রথম পাতায় বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ের ছবি দেখে মনে করল, নতুন কোনো সুন্দরী। দরকারমতো তুলি বুলিয়ে ঠিকঠাক করে তোলা, খবরের কাগজের চার কলাম ধরে ছাপানো ছবিটার মধ্যে বড়োমার যৌবন, মুহূর্তের জন্যে ধরা পড়ল। ছবিতে তাঁর আলুলায়িত কেশরাশি হাতির দাঁতের চিরুনি দিয়ে মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। আর তার ওপরে শোভা পাচ্ছে মুকুট। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জনৈক ফোটোগ্রাফার মাকোন্দোর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এই ছবিটা তুলেছিল। বহু বছর ধরে ছবিটি খবরের কাগজের দপ্তরে 'অচেনা মানুষ'-এর ছবি হিসেবে পড়ে থাকার পর এই বিশেষ সংস্করণের দৌলতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। হয়তো এমনই ছিল তাঁর ভাগ্যলিপি। ভাঙাচোরা বাসের মধ্যে, সরকারি দপ্তরের লিফটে, বিবর্ণ ছবি টাঙানো চায়ের দোকানে, সর্বত্র লোকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে বলাবলি করতে থাকল। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত বড়োমার নিজের জেলা মানে সেই গরমে ক্লান্ত, ঘামে সিক্ত ও ম্যালেরিয়া পীড়িত 'মাকোন্দো' ছাড়া বাদবাকি দেশে

তাঁর নামই প্রায় কারো জানা ছিল না। বড়োমার বহু আলোচিত মৃত্যুই মাকোন্দোকে বিখ্যাত করে তোলে। অবিশ্বাস আর কুয়াশাকে পথচারীদের সামনে থেকে আড়াল করেছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। গির্জায় গির্জায় তাঁর স্মৃতিতে ঘণ্টা বাজছিল। সদ্য উত্তীর্ণ হওয়া সামরিক বাহিনীর নবীন সেনাদের অভিবাদন নেওয়ার সময় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির কাছে খবরটা পৌঁছায়। অনুষ্ঠানের শেষে বড়োমার স্মৃতিতে এক মিনিটের নীরবতা পালনের পরামর্শ প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে দিয়ে, রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে বড়োমার জন্যে শোকবার্তা লিখলেন।

এই মৃত্যুর দরুন সমাজব্যবস্থায় একটা চিড় ধরেছিল। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিজে ব্যাপারটা অনুধাবন করেন। শহরের বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছে সবসময়েই একটু পরিশোধিত হয়ে পৌঁছায়। তবে এবার গাড়িতে যেতে যেতে আচমকা কয়েকটা নির্মম দৃশ্যের মাধ্যমে নাগরিকদের একনিষ্ঠ-নীরবতা আন্দাজ করলেন। কেবলমাত্র গুটিকয়েক ছোটো ছোটো কফির দোকান খোলা রয়েছে। আর শহরের প্রধান গির্জাটা ন-দিন ধরে বড়োমার শেষকৃত্য পালনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। দেশের রাজধানীতে, রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনেকার চত্বরে, প্রাচীন গ্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে গড়ে তোলা স্তম্ভ আর তার মধ্যে রাখা প্রয়াত রাষ্ট্রপতিদের মূর্তির ছায়ায় যেখানে ভিখিরিরা খবরের কাগজ মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়, সেখানে আলো ঝলমলিয়ে উঠল। শোকবিহ্বল শহরের হালচাল স্বচক্ষে দেখে, নিজের দপ্তরে ঢোকার সময় রাষ্ট্রপতির নজরে এল যে তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী কালো রঙের শোক-পরিচ্ছদ পরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। অন্য দিনের তুলনায় তাদের মুখ অনেক বেশি বিবর্ণ ও বিষণ্ণ।

সেই রাতের এবং তার পরের ঘটনাবলী পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। শুধুমাত্র সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কদের মনে খ্রিস্টীয় অনুভূতির বান ডেকেছিল, এমন নয়; সমস্তরকম পরস্পরবিরোধী স্বার্থ বা মতাদর্শের ভেদাভেদ যেন মুছে গিয়েছিল। মহীয়সী নারীর মরদেহ সমাধিস্থ করার প্রস্তাবে মতৈক্য হয়েছিল। তিন ট্রাঙ্ক ভরতি নকল নির্বাচনী পরিচয়পত্রর মালিকানাসূত্রে বহু বছর ধরে বড়োমা নিজের এলাকায় সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রেখেছিলেন। বড়োমার চাকর-বাবুর্চিরা, তাঁর আশ্রিত মানুষ ও ঠিকা-প্রজারা, সাবালক বা নাবালক যাই হোক না কেন, তারা যে কেবল নিজেদের ভোট দিত তা নয়, এই শতাব্দীতে যত ভোটার মারা গেছে, তাদের সকলের নামে জাল ভোট দিয়ে আসত। বড়োমা ছিলেন ঐতিহ্যভিত্তিক ক্ষমতার প্রতীক। সরকার তো সাময়িক। ফলে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের ওপর ছড়ি-ঘোরানো অভিজাততন্ত্রের আদর্শ দৃষ্টান্ত। জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটিয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক জ্ঞানের শেষ কথা। শান্তির সময়ে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য, সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদেরও রীতিমতো চিন্তিত রাখত। তবে তিনি নিজের সাথী ও সহযোগীদের ভালো-মন্দ দেখতেন। তার জন্যে ষড়যন্ত্র বা জাল ভোটের পথে যেতে তিনি পিছপা হতেন না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় বড়োমা নিজের দলের লোকেদের গোপনে অস্ত্রশস্ত্র জোগাতেন। আবার এই সব লোকেরা যাদের ওপর হামলা করত, জনসমক্ষে বড়োমা সে-সমস্ত নিগৃহীতদের সাহায্য করতেন। এমন বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের জন্যেই তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিজের দায়িত্বের বোঝা কমানোর জন্যে উপদেষ্টাদের সহায়তা পছন্দ করতেন না। রাষ্ট্রপতি ভবনের যে-হলঘরে বসে তিনি জনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ

করতেন তার অন্য পাশে ছিল একটা শান বাঁধানো উঠোন। ঔপনিবেশিক আমলের লাটসাহেবরা সেটাকে গুদাম বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করতেন। হলঘর আর উঠোনের মধ্যিখানে ছিল সাইপ্রাস গাছে ঘেরা এক ঘরোয়া বাগান। প্রেমঘটিত কারণে ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকে এক পর্তুগিজ সন্ন্যাসী সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বহু পুরস্কারে ভূষিত দেহরক্ষী-বাহিনীর সতর্ক পাহারায় থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি কিন্তু সন্ধ্যার পর এখান দিয়ে যাওয়ার সময় গা ছমছম ভাব এড়াতে পারতেন না। সে-রাতে কিন্তু শিহরন এত গভীর ছিল যে, সেটাকে অশুভ সংকেত বলে মনে না করে উপায় ছিল না। রাষ্ট্রপতি তাঁর ঐতিহাসিক ভবিতব্য সম্পর্কে সচেতন হলেন। নির্দেশ জারি হল — ন-দিন ধরে জাতীয় শোক পালন করা হবে। আর বড়োমাকে ভূষিত করা হবে দেশের জন্যে রণক্ষেত্রে নিহত বীরাঙ্গনার মরণোত্তর সম্মানে। ভোরবেলা রাষ্ট্রপতি রেডিয়ো, টেলিভিশন সহ সমস্ত প্রচারমাধ্যম মারফত তামাম দেশবাসীর কাছে এই নাটকীয় ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে আশা প্রকাশ করলেন যে, বড়োমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সারা পৃথিবীর কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ-হেন প্রস্তাব যে খুব সহজে, বিনা বাধায় কার্যকরী করা সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে বড়োমার পূর্বপুরুষদের তৈরি করা দেশের আইনি কাঠামো যথেষ্ট নয়। আইনজ্ঞ-পণ্ডিতের দল, সংবিধান -বিশেষজ্ঞরা, আইনি তর্কে জড়িয়ে গিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে এমন এক সূত্র অনুসন্ধান শুরু করলেন, যার ফলে বড়োমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি আইনত সিদ্ধ হয়। ক-দিন ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে তুলকালাম চলল। এক শতাব্দীরও পুরোনো, বিমূর্ত আইনের জমিতে শিকড় গজিয়ে যাওয়া আইনসভা-গৃহে জাতীয় নেতা ও গ্রিক চিন্তাবিদ্‌দের আবক্ষ মূর্তির অন্তরালে, বড়োমাকে নিয়ে এমন বিতর্ক শুরু হল যা শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এ-দিকে সেপ্টেম্বরের গরমে মাকোন্দোয় তাঁর মৃতদেহে ততদিনে পচন ধরতে শুরু করেছে। বেতের দোল-খাওয়া চেয়ার, দুপুর দুটোর দিবানিদ্রা বা সর্ষের পুলটিশ ছাড়াই তাঁর সম্বন্ধে এই প্রথম লোকজন কথা বলতে বা ভাবতে শুরু করল। নাম-গোত্রসম্পন্ন মানবী রূপে নয়, বিমূর্ত কিংবদন্তির নায়িকা হিসেবে লোকে তাঁকে দেখল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বকবকানি আর গুলতানি চলল। সারা প্রজাতন্ত্র জুড়ে যেন ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিধ্বনি। অবশেষে সেই বিশুদ্ধ আইন বিশারদদের মধ্যে থেকে এমন একজন মুখ খুললেন যাঁর বাস্তব সম্পর্কে অন্তত কিছুটা জ্ঞানগম্যি আছে। ঐতিহাসিক কচকচানি থামিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে, তাঁদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বড়োমার মরদেহ, ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় পড়ে রয়েছে। লিখিত আইনের তাত্ত্বিক পরিবেশে হঠাৎ যেন সাধারণবোধের বিস্ফোরণ ঘটল। প্রতিবাদ করার সাহস কারো হল না। সুগন্ধিযুক্ত ওষুধ লাগিয়ে মৃতদেহটা তাজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। ওদিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আইনসিদ্ধভাবে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্যে সমাধান-সূত্র সন্ধান, মতপার্থক্য মেটানো, সংবিধান-সংশোধন ইত্যাদির উদ্যোগ নেওয়া হল।

এত কথা হয়েছিল যে, সে-সব আলোচনা দেশের সীমানা পেরিয়ে, মহাসাগর ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মতো কাস্তেল গান্দোল্ফোতে অবস্থিত পোপের প্রাসাদেও পৌঁছে যায়।

অগস্ট মাসের তীব্র গরমের দিনে দিবানিদ্রা সেরে মহামান্য পোপ তখন সবে জানলার কাছে এসে বসেছেন। জানলা দিয়ে তিনি দেখছিলেন যে, ডুবুরিরা পুকুরে ডুব দিয়ে একটি মেয়ের কাটা মাথা খুঁজে চলেছে। মেয়েটিকে মাথা কেটে হত্যা করা হয়েছিল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সান্ধ্য-সংবাদপত্রে এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছাড়া অন্য কোনো বিষয় ছিল না বললেই চলে। নিজের গ্রীষ্ম-আবাসের এত কাছে ঘটে যাওয়া এই রহস্যময় অপরাধ সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণেই মহামান্য পোপ উদাসীন থাকতে পারেননি। তবে সে-দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা গেল, খবরের কাগজগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে বিষয় বদল করেছে। যে-সব নিরুদ্দেশ মেয়েদের একজন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে থাকতে পারে, এত দিন ধরে নিয়ম করে প্রতিদিন তাদেরই ছবি ছাপা হয়ে যাচ্ছিল। তার বদলে একটি বছর বিশেকের তরুণীর ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটির চারপাশে মোটা করে কালো দাগ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে মেয়েটি প্রয়াত। মহামান্য পোপ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বড়োমা'। বহু বছর আগে যখন তিনি সেন্ট পিটারের আসন প্রথম অলংকৃত করেছিলেন, তখন এই অস্পষ্ট ছবিটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ফোটোগ্রাফির প্রথম যুগে যখন রুপোর পাতের উপর ফোটো তোলা হত, সেই পদ্ধতিতে তোলা ছবিটি তিনি দেখামাত্রই চিনতে পারলেন। পোপের সহকারী অন্যান্য যাজকরাও নিজের নিজের বাসস্থানে বসে একইভাবে সমবেত সুরে চিৎকার করলেন, 'বড়োমা'। কুড়ি শতাব্দীর মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার খ্রিস্টান ধর্মের সীমাহীন সাম্রাজ্য ভীত, বিচলিত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অবশেষে মহামান্য পোপ বড়োমার অত্যাশ্চর্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হওয়ার জন্যে তাঁর বিশাল গন্ডোলা জলে ভাসিয়ে সুদূরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

চকচকে পিচফলের বাগিচা পিছনে পড়ে রইল। রোম শহর থেকে আলবান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন রোমান যুগে নির্মিত 'ভিয়া আপিয়া আন্তিকা' নামের ঐতিহাসিক রাস্তার দু-পাশের অভিজাত বাড়িগুলোর ছাদে শুয়ে চলচ্চিত্রাভিনেত্রীরা তখন রৌদ্র-স্নান করে ত্বকের চাকচিক্য বাড়াচ্ছিলেন। গোলমাল নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা কারো খেয়াল ছিল না। রোম শহরের অন্য প্রান্তে টাইবার নদীর তীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে 'কাস্তেল সন্ত আঞ্জেলো'-র ছোটোখাটো অথচ গম্ভীরদর্শন পাহাড়। সন্ধ্যাবেলায় মাকোন্দোর ভাঙা ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সেইন্ট পিটারের গির্জার ঘণ্টাধ্বনি সৃষ্টি করল বিচিত্র সুর-মূর্ছনা। রোমান সাম্রাজ্য আর বড়োমার নিজস্ব এলাকার মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছিল ঘাস-আগাছায় ভরা চোরা জলাভূমি। সেখানে, দমবন্ধ হওয়া তাঁবুর ভিতরে শুয়ে, সারারাত ধরে মহামান্য পোপ শুনতে পেতেন বাঁদরদের কিচিরমিচির। লোকজনের চলাফেরায় ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নৈশ সফরের সময় ইউকা গাছের বস্তা, কাঁদি কাঁদি কাঁচা কলা আর মুরগির ঝাঁকায় তাঁর নৌকো ভরে উঠত। যে-সব নারী-পুরুষ নিজেদের রোজকার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে কিছু কামানোর জন্যে বড়োমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাচ্ছিল, তারা উঠে পড়ে মহামান্য পোপের নৌকোয়। মহামান্য পোপ সে-রাতে জ্বর জ্বর ভাবের জন্যে ঘুমোতে পারলেন না। মশার কামড়ে সারাটা রাত ছটফট করে কাটালেন। তবে মহান বৃদ্ধার এলাকায় অপূর্ব ভোর দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে সুগন্ধী আপেল আর ইগুয়ানা জাতীয় বিশালাকার টিকটিকির জন্মস্থান দেখে বিভোর হয়ে যাওয়ায় মহামান্য পোপের মন থেকে

দীর্ঘ সফরের সব কষ্টের স্মৃতি মুছে গিয়ে মনে হল, এত কষ্টের বিনিময়ে এ-যাত্রায় যা পেয়েছেন তা কিছু কম নয়।

দরজায় তিনটি টোকা শুনে নিকানোরের ঘুম ভেঙেছিল; আসলে সেই তিনটি টোকা-ই মহামান্য পোপের আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল। মৃত্যু যেন বাড়িটার মালিকানা দখল করে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে। রাষ্ট্রপতি বারে বারে বড়োমার মৃত্যু নিয়ে ভাষণ দেওয়ায় বিষয়টির গুরুত্ব ফুটে ওঠে। সংসদ সদস্যরা তো প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে তর্ক করতে করতে গলাই ভেঙে ফেললেন; তারপর ইঙ্গিত-ইশারায় চালিয়ে গেলেন তাঁদের বিতর্ক। এইসব দেখে-শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজারে হাজারে মানুষ নিজেদের কাজকর্ম শিকেয় তুলে বড়োমার বাড়িতে জড়ো হয়। অন্ধকার বারান্দা, জিনিসপত্রে ঠাসা দরদালান, দম বন্ধ করা চিলেকোঠা, সব লোকে লোকারণ্য। যারা দেরিতে পৌঁছাল, তারা বেড়ার ওপর, পাহারাদারের গুমটিতে, কাঠের কাজ করা দেওয়ালে বা ঝোপঝাড় বেয়ে উঠে বেশ আরামেই আস্তানা গড়ে তোলে। বড়ো হলঘরটায়, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় মমিতে পরিণত হওয়া বড়োমার মরদেহ চিরনিদ্রায় শায়িত। তার ওপর জমে ওঠে টেলিগ্রামের পাহাড়। কান্নায় অবশ হয়ে যাওয়া ন-জন ভাইপো গভীর আবেগ ও পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে সারারাত জেগে মৃতদেহের পাশে বসে নজরদারি করে যাচ্ছিল।

তার পরেও বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না। পুরসভা ভবনের একটি ঘরে মহামান্য পোপের থাকার বন্দোবস্ত হল। সেখানে আসবাবপত্র বলতে ছিল গোটা চারেক চামড়ার গদি আঁটা টুল। বিশুদ্ধ পানীয় জলে ভরা একটা মাটির কলসি আর একটা দড়ির দোলনা। ঘেমে নেয়ে, অনিদ্রার যন্ত্রণায় ভুগে পোপ সেখানে দম বন্ধ করা রাত কাটাতেন। দপ্তরের পুরোনো নথি পড়ে তাঁর সময় কাটে। যে-সমস্ত বাচ্চা জানলার বাইরে থেকে তাঁকে দিনের বেলায় দেখতে আসত, তাদের তিনি মুঠো মুঠো ইতালীয় চকোলেট বিলোতেন। আর হিবিস্‌কাস জাতীয় গাছ দিয়ে ছাওয়া ছাউনির তলায় বসে কখনো ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল আবার কখনো বা নিকানোরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। প্রতীক্ষা আর উষ্ণতায় ভরা দিনগুলো যেন বড্ড দীর্ঘ আর প্রলম্বিত মনে হচ্ছিল। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। অবশেষে একদিন ফাদার পাসত্রানা একজন ঢুলিকে সঙ্গে করে শহরের কেন্দ্রীয় চত্বরে দাঁড়িয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত চিৎকার করে পড়তে শুরু করলেন। 'সরকারের তরফ থেকে বলছি' — টাক ডুমা ডুম করে ঢোল বেজে উঠল। ফাদার আবার সুর ধরলেন — 'বিশেষ আইন চালু হওয়ার দরুন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বড়োমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন'। তাঁর বয়ান ভালো মতো শেষ হওয়ার আগেই টাক ডুমা ডুম আওয়াজ করে ঢোল বেজে উঠল।

শেষপর্যন্ত এসে গেল সেই স্মরণীয় দিন। রকমারি জুয়া-লটারি, নানান রকমের ভাজাভুজি, খাবার-দাবারের দোকানপাটে ভরে গেল সব রাস্তাঘাট। জনাকয়েক লোক গলায় সাপ জড়িয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এক ধরনের মলম বিক্রি করতে শুরু করে দিল। ওটা নাকি যে-কোনো সংক্রমণজনিত রোগের অব্যর্থ ওষুধ। এমনকী অমরত্ব লাভের উপায় বলেও দাবি করা হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় চত্বরে লোকজন নানান রঙের তাঁবু টাঙিয়েছিল। মেলা হয়েছিল বিচিত্র সব বিছানার চাদর। সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত তীরন্দাজেরা কর্তাব্যক্তিদের জন্যে পথ পরিষ্কার

করছিল। সান খোর্খ-এর ধোপানিরা, কেপ ভেলা-র মুক্তো-তোলা জেলেদের বাহিনী, সিয়েনাগা-এর মাছের জাল বানানোর কারিগরেরা, তাসাহেরা-র চিংড়িমাছ ধরা জেলেদের দল, মোহাহানা-এর যাদুকরেরা, মানাউব-এর লবণ খনির শ্রমিকবাহিনী, ভাইয়েদুপার-এর বেহালা বাজিয়ের দল, আয়াপেল-এর দক্ষ ঘোড়সওয়ারেরা, সান পেলায়ো-র দরিদ্র সঙ্গীতশিল্পীবৃন্দ, লা কুয়েভা-র মুরগি পালনকারীরা, সাবানাস দে বলিভা-র জাত শিল্পীর দল, রেবোলো-র ফুলবাবুদের দল, মাগদালেনা-র দাঁড়-টানা মাঝিরা, মোনপক্স-এর কলম-পেষা করণিককুল, আর যাদের নাম এই কাহিনীর সূচনায় বলা হয়েছে — সবাই চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় জড়ো হয়েছিল। এমনকী কর্নেল আউরেলানো বুয়েন্দিয়ার পুরোনো সৈন্যেরা বড়োমার ওপর তাদের একশো বছরের পুরোনো রাগ ভুলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এল। তাদের পুরোভাগে ছিলেন বাঘের নখ-দাঁত-ছাল দিয়ে তৈরি পোশাক পরা ডিউক অফ্ মর্লবরো। গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই সৈনিকেরা তাদের প্রাপ্য পেনশনের জন্যে ষাট বছর অপেক্ষা করেছে। এই সুযোগে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে পাওনা পেনশন বরাদ্দ করার অনুরোধ জানানোর উদ্দেশে তারা সমবেত হয়েছিল।

জনতা প্রায় উন্মত্ত। গরমে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। সৈনিকের পোশাকে সুসজ্জিত অভিজাত সেনাবাহিনী কোনো রকমে জনতাকে সামলায়। বেলা এগারোটা নাগাদ জনতা আনন্দে সমস্বরে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। জ্যাকেট আর আনুষ্ঠানিক টুপি পরে গম্ভীর, সৌম্যদর্শন রাষ্ট্রপতি উপস্থিত। সঙ্গে রয়েছে মন্ত্রীমণ্ডলী, মাননীয় সাংসদবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারকমণ্ডলী, সংবিধান-স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রধানেরা, দেশ-বিদেশের পাদ্রিকুল এবং ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য-শিল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আসা এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা টেলিগ্রাফ অফিসের পাশে সমবেত হলেন। বেঁটে, মোটা, বৃদ্ধ, রাষ্ট্রপতির মাথা জোড়া টাক। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি জনগণকে বিস্মিত করে রীতিমতো প্যারেডের ভঙ্গিতে হেঁটে গেলেন। এরাই তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। তবে সামনাসামনি কখনো দেখেনি। এই সুযোগে লোকে তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিন্ত হল। পদমর্যাদার ভারে নুইয়ে যাওয়া পাদ্রি আর প্রশস্ত বুকে তকমা লটকানো সামরিক কর্তাব্যক্তিদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের অধিপতি যেন ক্ষমতার জ্যোতি বিকিরণ করলেন।

এবার দেখা দিল দ্বিতীয় সারি। শোকের পোশাক পরিহিত শান্ত মিছিলে দেশের রানিরা পা মেলাল। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং যা হতে পারে সব কিছুর রানি, তারা জীবনে এই প্রথম কোনো রকম পার্থিব জাঁকজমক ছাড়া এখান দিয়ে হেঁটে গেল। সবার আগে বিশ্ব রানি; তার পিছনে সার দিয়ে সয়াবিন রানি, কলা রানি, টুকরো ফলের রানি, ময়দার মতো ইউকা রানি, পেয়ারা রানি, ডাবের রানি, কালো দানার সয়াবিন রানি, ৪২৬ কিলোমিটার লম্বা ফিতে-ওয়ালা ইগুয়ানার ডিমের রানি, এবং আরও অনেক কিছুর রানি। সব কিছুর নাম এখানে করা সম্ভব নয়। কারণ, তা হলে কাহিনী শেষ করা যাবে না।

বড়োমা এখন লালচে বেগুনি রঙের কাপড়ের পাকে মোড়া কফিনে শায়িত। তামার তৈরি আটটা টার্নবাকল গোছের বোতাম তাঁকে বাস্তব থেকে আলাদা করে রেখেছে। নিয়মমাফিক ভাবেই বড়োমা এখন চিরন্তনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। আর এ-ভাবেই তাঁর মহত্বের মাত্রা

স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যখন গরমে ঘুমোতে না পেরে তিনি বারান্দায় বসে স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর মধ্যে থেকে ফুটে বেরোত এক বিশেষ ধরনের ঔজ্জ্বল্য আর মর্যাদা। এখন তার সঙ্গে মিশে গেছে আটচল্লিশ জন রানি, যারা তাঁর স্মৃতিকে জানিয়েছে মরণোত্তর সম্মান। স্বয়ং পোপ মানসিকভাবে অস্থির অবস্থায় কল্পনা করছিলেন, বড়োমা যেন এক চোখ ঝলসানো গাড়িতে চড়ে ভ্যাটিকানের বাগানের ওপর শূন্যে ঝুলছেন। তবুও গরম অগ্রাহ্য করে, নকশাকাটা তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে নিজের উপস্থিতির মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে জমকালো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে সম্মানিত করলেন।

কে সব চেয়ে পদমর্যাদাসম্পন্ন, কারা কফিন বয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার পাবে, তা নিয়ে বিতর্ক শেষমেশ মিটল। সব চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা কাঁধে করে কফিন, পথে নিয়ে এলেন। ঠিক তখনই আকাশে উড়তে থাকা পায়রাদের ছায়া প্রহরীর মতো কফিনটাকে আগলে রেখেছিল। লোকেরা অবিশ্যি ব্যাপারটা লক্ষ করেনি। ক্ষমতার জৌলুসে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল। মাকোন্দোর মাথা-গরম মানুষেরা যখন শোকমিছিলে চলেছিল, এক পাল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন অশুভ শকুনও যে তাদের অনুসরণ করছিল, তা কেউ নজর করেনি। কর্তাব্যক্তিদের চলার পথে যে-জঞ্জালের স্তূপ সৃষ্টি হচ্ছিল, তা কেউ খেয়াল করেনি। মৃতদেহ বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই বড়োমার ভাইপো, পুষ্যি, আশ্রিত আর কাজের লোকেরা বাড়ির সব দরজা-জানলা বন্ধ করে বাড়ি ভাগের আগ্রহে এখানে-ওখানে সর্বত্র খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেয়; বিষয়টি একেবারেই কারো নজরে এল না। আরো একটা বিষয় কারো চোখে পড়েনি যে, একটানা চোদ্দো-দিনব্যাপী প্রার্থনা, আবেগ, উচ্ছ্বাস শেষ হওয়ার পর দস্তার ডালা দিয়ে বড়োমার সমাধি পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে দেওয়ার পর মুহূর্তেই সমবেত জনতা যে এক বিশাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন কয়েকজন বুঝতে পারে যে তারা এক নতুন যুগের জন্ম দেখছে। এখন মহামান্য পোপ, দেহ ও আত্মা-সহ স্বর্গে আরোহণ করতে পারেন। মর্ত্যলোকে তাঁর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী দেশ শাসন করতে পারেন। রানিরা বিয়ে-শাদি করে সুখী হতে পারে। জন্ম দিতে পারে বহু পুত্রসন্তানের। জনগণ খাঁটি মানুষ হিসেবে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে বড়োমার সীমাহীন জমিদারির যে-কোনো অংশে তাঁবু খাটাতে পারে। কেন না সেই একটি মানুষই তাদের বাধা দেওয়ার হিম্মত রাখতেন। দস্তার ডালার তলায় রাখা তাঁর দেহটা এখন ধুলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কেবল একটা কাজই বাকি। সবার সামনে একটা টুলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে কোনো একজনের এই কাহিনীটা বলে যাওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। দুনিয়ার কোনো অবিশ্বাসী মানুষ বড়োমার ইতিবৃত্ত না জেনে পারবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী এ-সংবাদ প্রবাহিত হবে। এদিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফলে জমে ওঠা যাবতীয় জঞ্জাল কাল সকালে ঝাড়ুদারেরা এসে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেবে।

যাপিত জীবন

কল্যাণ মজুমদার

কখনো এভাবে অপমানিত হবে অভাবনীয় স্বপ্নেও কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। অপমানের সঙ্গে মানসিক নিপীড়ন, যা প্রায় চিত্তবলাৎকারের সমতুল্য। কীভাবে দীর্ঘদিনের চেনামুখ একেবারে আচম্বিতে নখর, দাঁতালো হয়ে ওঠে, তাও জানা ছিল না। অজানা বিষয় অহেতুক জানতে বাধ্য হওয়ার বিস্ময়ে হতবিহ্বল না-হয়ে উপায় ছিল না শমীকের। বুকের মধ্যে তীব্র দহন, কেন না কোনো প্রত্যুত্তর দিতে পারেনি। ও এখন যথার্থই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঘরের বাইরে পা রাখতেই পশ্চাতে পদাঘাতের সামিল কপাটের দামাল শব্দটা মগজের ঘিলুতে ঘূর্ণি তুলছে। দু-দিন ধরে টেলিফোনে না-পেয়ে শমীক জানতে এসেছিল নীতি ফিরেছে কি না। যতবার ফোন করেছে প্রতিবার লাইন কেটে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই ফোন রেখে দেওয়া হচ্ছিল। অথচ শমীকের নিজের আসার তাগিদ ছিল না। বিয়ের আগে অন্তত আর একবার নীতি ওর দেখা পেতে চেয়েছিল। ব্যবসার কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হবে, এই খবরটা নীতিকে জানাতে এসে এই ভীষণ বিড়ম্বনায় পড়া। বার বার মনে প্রশ্ন জাগছে, কেন এমন করল কপিলা দাসী! কেন? কেন? বছর দশেক আগের সেই দরদী কোমল মুখ, কুশলী হিসেবের ছক থাকা সত্ত্বেও, এমন কুটিল কুশ্রী ও নির্মম কী করে হল! কপিলার সামান্য ক-টি কথাই সেদিন ওর জীবন বদলে দিয়েছিল। আজ কী তার অবসান ঘোষণা? অবসান তো মেনেই নিয়েছিল। বিবমিষা জাগানো এই কু-রঙ্গের কোনো দরকার ছিল না। তবে কি কপিলার মনে ভয় ছিল কিছু? এত বছর দেখেও বুঝতে পারল না? তা নয়। কপিলা, শমীক নিশ্চিত, জেনে-বুঝে হিসেব কষেই সব করেছে। ঠিক প্রথম দিনের মতোই।

নার্সিংহোমের পাওনা মিটিয়ে আবার পুতুলের ওয়ার্ডে ফিরে এসেছিল শমীক। পুতুলের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলেছিল, কাল ছেড়ে দিলে বাড়ি চলে যেও। ডাক্তারের কথামতো ক-টা দিন সাবধানে থেকো। আমি চলি।

পুতুল জানতে চেয়েছিল — আবার কবে দেখা হবে?

— দেখি। এখনই বলতে পারছি না। তা ছাড়া তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।

— তুমি এখনো রেগে আছ আমার ওপর। বলেছি তো আমার ভুল হয়েছে।

— ওসব কথা থাক এখন।

কণ্ঠের উষ্মা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও মুখের রেখায় বিস্মিত বিরক্তি ছিল স্পষ্ট। উলটোদিকের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে নির্ভুল পড়েছিল কপিলা। শমীক জানত না; কপিলাকে ও লক্ষও করেনি। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় কখন কপিলা ওর পাশে চলে এসেছিল তাও খেয়াল করেনি শমীক।

— সারাদিন আপনার বড়ো ধকল গেল। একা একা, সেই সকাল থেকে। দেখলাম তো! চকিত শমীক অচেনা মহিলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসু চোখে বলল — আপনি?

— আমি এখানে কাজ করি। চার নম্বরে ছিলাম। আপনার পেশেন্ট তো ছয়ে। অ্যাবরশন হয়েছে। কে? আপনার স্ত্রী?

— না। মানে...

— বুঝেছি। এসব এখন আকছার হয়। তার জন্যে আপনি এত খরচ করলেন!

— ওটুকু করতেই হল। মানুষ হিসেবে তো আমি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না।

— আপনি দরাজ দিলের মানুষ! দেখেই বুঝেছি। তাই করলেন। আর কেউ হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত। কত দেখছি। ফালতু মেয়েটা আপনার কত ধ্বসিয়ে দিল!

ফুটপাত ঘেঁষে রাখা গাড়ির দরজা খুলল শমীক। ঢোকার আগে মহিলার দিকে তাকাতেই কপিলা বলল — আকাশ কী কালো হয়ে এসেছে! আপনি কোনদিকে যাবেন, বাবুসাহেব?

মলিন শাড়ি পরা চল্লিশোত্তর মহিলার শীর্ণ মুখে শঙ্কার ছায়া পড়ে শমীক বলল — নিউ বালিগঞ্জ। আপনি?

— পার্কসার্কাস। আমাকে একটু নামিয়ে দেবেন? বাড়িতে মানুষটার শরীর খারাপ। বৃষ্টি নামলে বাস-টাস কিচ্ছু পাব না।

শমীকের অনেক দুর্বলতার অন্যতম হল, ও কারো মুখের ওপর সহজে না বলতে পারে না। এখনো মানসিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল — ঠিক আছে, চলুন।

গাড়িতে ওঠার মুখেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়। একটু পরেই ঝমঝমিয়ে নামে। কপিলা বলল — আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু যেমন তোড়ে নেমেছে আপনি দয়া না-করলে যে কী করতাম!

শমীক বলল — ছি ছি, দয়ার কথা কেন বলছেন! আমাকে তো ওপথেই যেতে হত।

একটু পরে কপিলা বলল — মাফ করবেন বাবুসাহেব, আপনি কী কাজ করেন?

শমীক প্রমাদ গোনে। এবার মহিলা নিশ্চয় স্বামী বা ছেলের চাকরি চাইবে। তবু বলল — একটা ছোটো ব্যবসা আছে। তার জন্যে প্রচুর ঘোরাঘুরি খাটাখাটনি করতে হয়। আজ কল্যাণী তো কাল কৃষ্ণনগর লেগেই থাকে। তার মধ্যে এই উটকো ঝামেলা। একেবারে জেরবার হয়ে গেলাম।

— তা তো বটেই! মানুষের শরীর বলে কথা। একটু আরাম, একটু সেবা-যত্ন না হলে চলবে কেন!

কী ছিল মহিলার নম্র স্বরে? মমতা, নাকি সান্ত্বনা কিংবা অনুচ্চারিত প্রশ্রয়? শমীক বিগলিত বোধ করে বলল — আমি শমীক কাঞ্জিলাল। আপনি?

— আমাকে সবাই কপিলা দাসী বলে চেনে। আসলে আমরা সাহা। আমার স্বামী যে-মিলে কাজ করত সেটা বন্ধ আজ তিন বছর। গলার কাঁটা তিন মেয়ে নিয়ে যে কীভাবে আছি, সে কেবল ঠাকুরই জানেন।

আবারও শমীক শঙ্কিত বোধ করে। দুঃখ-অভাবের পাঁচালি চলবে এখন। বর বা মেয়েদের জন্যে কাজকর্মের আবদার এড়াবার কৌশল রিহার্সাল দেয় মনে মনে।

— বাবুসাহেব, আপনার ছেলেমেয়ে কী?

— আমি খুব অল্প বয়েসে বিয়ে করেছিলাম। ছেলেমেয়েও হয় তাড়াতাড়ি। দুই ছেলে দুই মেয়ে। মেয়ে দুটোই সংসার দেখে।

— কেন, আপনার স্ত্রী?

— আছেন। পাঁচ বছর ধরে ভুগছেন। থাইরয়েড আর হার্টের পেশেন্ট।

— ওঃ! আপনার তো বড়ো কষ্ট। এখন বুঝতে পারছি, আপনার মতো মানুষ কেন নার্সিংহোমের ঝামেলায় পড়লেন। স্ত্রী অসুস্থ থাকলে পুরুষ মানুষের যে কী কষ্ট; কত তো দেখলাম!

বেকবাগানের গলিতে যখন পৌঁছালো ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে কপিলা অনুনয়ের সুরে বলে — গরিবের ঘরে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে বাবুসাহেব। আমার এত উপকার করলেন, একটু চা খেয়ে যেতেই হবে।

বার কয়েক আপত্তি করেও কপিলার নাছোড় অনুরোধের কাছে হার মানতে বাধ্য হল শমীক। নোংরা গলি পেরিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চিন্তা হয় গাড়িটা সুস্থ থাকবে কি না। একতলার একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে কপিলা। জীর্ণ বাড়ির ভাঙাচোরা দেয়ালে বোধহয় পঞ্চাশ বছরেও রং পড়েনি। শমীকের পরিপাটি অবয়ব, আশেপাশের মানুষের চোখে কৌতূহল তৈরি করছে, বুঝতে ভুল হওয়ার কথা নয়। ঈষৎ অস্বস্তি সত্ত্বেও ও স্বচ্ছন্দ থাকার চেষ্টা করে। মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়, ঘরের মধ্যে লুঙ্গি পরা একজন রুগ্ন পুরুষ, সোঁদা ভ্যাপসা গন্ধ, শীর্ণদেহ তিন বালিকা এবং সব শেষে অপেয় স্বাদগন্ধহীন চা নামক গরম তরল-ভরা ফাটল-ধরা কাপ দেখবে বলে। শমীক প্রথমেই চমকে উঠল দরজা খুলে সামনে দাঁড়ানো তরুণীকে দেখে। প্রসাধনহীন সাধারণ ছাপা শাড়ি পরা মেয়েটির চোখে-মুখে ঝকঝক করছে সতেজ লাবণ্য। অচেনা পুরুষ দেখে দু-পা পিছিয়ে গেলেও অপ্রস্তুত হল না।

কপিলা বলল — আসুন। এ আমার বড়ো মেয়ে গীতি।

মেয়েকে বলল — বাবুসাহেবের জন্যে একটু চা কর। বাবা কোথায়?

গীতি শমীকের প্রতি নমস্কারের ভঙ্গি করে জবাব দেয় — বাবা দুপুরে খেয়েই বেরিয়ে গেছে।

কপিলা মানুষটার শরীর খারাপ বলেছিল না! শমীক কৌতুক বোধ করে।

এক চিলতে বারান্দার মতো বসার জায়গায় একটা বহু পুরোনো সোফা আর তিনটে বেতের চেয়ার। পাখায় ঝুল নেই। টিউবের আলো উজ্জ্বল। প্রাথমিক জরিপে শমীকের মনে হল, দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের রুচিবোধ আছে। এবং কপিলা যতটা সঙ্গতি-হীনতার চিত্র আঁকতে চেয়েছিল, বা, ও যা ভেবেছিল, হয়তো অতটাই করুণ নয়। যদি এটা সাজানো মুখোশ হয় তবে অবশ্য অন্য কথা।

শমীককে বসতে বলে কপিলা ডাকে — বীথি, নীতি, এদিকে আয়।

পলকের মধ্যে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। একজনের পরনে গীতির মতোই ছাপা শাড়ি। কপিলা বলল — এ আমার মেজ মেয়ে বীথি, আগামী বছর উচ্চ-মাধ্যমিক দেবে।

নীল জংলি কাপড়ের ফ্রক পরা মেয়েটি যে ছোটো মেয়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কপিলা পরিচয় দেয় — এ হচ্ছে নীতি। আট ক্লাসে পড়ছে।

মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালোই। বীথির স্বাস্থ্যসম্পদ গীতির চেয়েও বেশি চোখ টানে। নীতির এখন বেড়ে ওঠার সময়। তবে ওর মুখে একটা সপ্রতিভ হাসি কিশোরী চঞ্চলতার আভাস দিচ্ছে।

শমীক নিজেই বলল — আমার নাম শমীক কাঞ্জিলাল। দ্যাখো তো, তোমাদের কী অসুবিধেয় ফেললাম।

— অসুবিধে কীসের, আপনি এলেন বলেই তো আমরা আপনার মতো মানুষের দেখা পেলাম। বীথি বলে।

কপিলা বলল — বাবুসাহেব খুব বড়ো মানুষ। মনটা বিরাট। আমরা দেখতেই পাচ্ছেন অতি সাধারণ। তবু আপনার মতো মানুষ দেখলে এদের উপকার হবে।

গীতি দু-কাপ চা এনে একটা শমীকের হাতে দিয়ে অন্যটা কপিলার দিকে বাড়িয়ে দেয়। শমীক কাপ দেখে আশ্বস্ত হয় যে ভাঁটি-ভাঙা নয় এবং পরিষ্কার। চুমুক দিয়ে বুঝল অতি সস্তার চা পাতা। তবু ভালো, চিনি বেশি দেয়নি। বলল — বাঃ, খুব চমৎকার চা করেছ তো! বলেই গীতির মুখের ওপর চোখ রাখে শমীক। ঝুঁকে কাপ দেবার সময় উপত্যকার আহ্বান লক্ষ করেছিল। আঁচল একটু সরে যাওয়ায় উদ্ধত বুকের আদল সঠিক বুঝতে পারল। পরে জিজ্ঞাসা জেগেছিল আঁচলের স্থানচ্যুতি কী ইচ্ছাকৃত ছিল?

— আপনি চা খান। আমি একটু আসছি। বলে, কপিলা বীথি আর নীতিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

শমীক গীতিকে বলল — দাঁড়িয়ে কেন, বোসো। চা-করা ছাড়া তুমি আর কী করো?

গীতি প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দেয় — শুধু চা কেন, আমি সবই করি। মাকে তো সকালেই বেরিয়ে যেতে হয়।

— পড়াশোনা করো না?

— নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপরই বাবার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। মাকে কাজ ধরতে হল। ভালোই হয়েছে, পড়তে আমার ভালো লাগত না।

— তোমার কী ভালো লাগে?

— সিনেমা দেখতে। বেড়াতে। সিনেমাতে যেসব সুন্দর জায়গা দেখায়, সেখানে বেড়াতে।

— গেছ কোথাও?

— না না। অনেকদিন আগে একবার মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম, মসলন্দপুর।

কথা বলতে বলতে শমীক মেয়েটিকে চোখে ছেঁকে নিচ্ছিল। হঠাৎই খুব টান অনুভব করে। শরীরে কামনার সাপ ফণা তুলতে চায়। বেশ কিছুদিন উপবাসে কেটেছে। একে প্রস্তাব দিলে কি রাজি হবে? রিস্ক হয়ে যাবে না তো? আকর্ষণের তীব্রতা বাড়ে। যে-নারীকে চোখে লাগে, তাকে দখল করার জন্যে শমীক নাছোড় চেষ্টা করতে অভ্যস্ত। কত উচ্চশিক্ষিত তথাকথিত অভিজাত মহিলাকে কবজা করেছে, আর এ তো এক অতি দীন সাধারণ মেয়ে! পরীক্ষা করার উদ্দেশে শমীক হালকা গলায় বলল — আমিও খুব বেড়াই। গাড়িও আছে। যদি চাও তো আমার সঙ্গে যেতে পারো কখনো কখনো। কী, যাবে?

গীতি বলল — মা বললে যাব।

কথাটা গীতি হয়তো কোনো গূঢ় অর্থ ছাড়াই বলেছে। কিন্তু শমীক নিজের মনে অন্য বার্তা পেল। তবে কি ওর অন্য পুরুষের সঙ্গে বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে? প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটাবার জন্যেই ওদের একলা কথা বলার সুযোগ দিয়েছে? কপিলা নিজে প্রথমেই কী করে মেয়েকে বলির জন্যে এগিয়ে দেয়।

শমীক বলল — মাকে ডাকো। আমি এবার যাব।

কপিলা এলে গীতি বলল — মা, ইনি আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলছেন।

— কী ভালো। আমি ঠিক বুঝেছিলাম ওঁর দিল খুব বিরাট। তুই যা এখন। আমি বাবুসাহেবের সঙ্গে দুটো কথা বলি।

গীতি গাঢ় চোখে শমীকের দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে ভেতরে চলে গেলে কপিলা বলে — আমার আর দু-মেয়েরও আপনাকে খুব ভালো লেগেছে। মাঝে মাঝে আসবেন, আমরা যদিও আপনার মতো মানুষের উপযুক্ত খাতিরযত্ন করতে পারব না। তবু বলছি কারণ ওরা তো কোনো বড়ো মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় না। আপনার ক-টা কথা শুনলেও কত লাভ!

শমীক বলল — আমি এলে আপনাদের কোনো অসুবিধে নেই তো?

— না না। অসুবিধে কীসের! নিশ্চয় আসবেন। ইয়ে, গীতি বেড়ানোর কথা কী যেন বলছিল।

এই সুযোগ, এখনই স্পষ্ট কথা বলে নেওয়া উচিত ভেবে শমীক বলল — ও বলছিল, বেড়াতে ওর খুব ভালো লাগে। আমাকে তো প্রায়ই নানা জায়গায় যেতে হয়। তাই বলছিলাম ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

একটু থেমে আবার যোগ করে — ওরা তিন বোন, আপনিও যেতে পারেন।

কপিলা বলে — কাজ ছেড়ে আমার যাওয়ার উপায় নেই। ওদের দু-জনের স্কুল আছে, পড়া আছে। গীতিকে আপনি নিতে পারেন। তবে, দেখতেই পারছেন আমাদের অবস্থা। ওদের বিয়ের যে কী করব ভাবলেই...

শমীক বলল — দেখুন, আমি সরাসরি কথা বলা পছন্দ করি। গীতি আমার সঙ্গে গেলে আপনি কী আশা করবেন? আমি বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে তো জানেনই।

হয়তো এতটা খোলা কথা আশা করেনি কপিলা। ইতস্তত গলায় বলে — আমি আর কী বলব! আপনি মানী মানুষ, যা ভালো বুঝবেন, করবেন। অন্যায্য কিছু চাইব না, আবার বঞ্চিতও যেন না হই।

— হবেন না, আমি কথা দিতে পারি। আর একটা কথা, আমি দীর্ঘ সম্পর্কে বিশ্বাসী। ঘন ঘন ঘর বদল আমার পছন্দ নয়। যদি রাজি থাকেন, ঠকবেন না। আজ চলি।

— একটা কথা, ওর যেন কোনো বিপদ-আপদ না-হয়, মানে বিয়ে তো দিতে হবে।

— ন্যাড়া বেলতলায় আর ক-বার যায়! কথা শুনে চললে কিচ্ছু হবে না।

— কবে যেতে হবে?

— বাইরে যাব কয়েকদিন পর। কাল আসছি। সন্ধেবেলায় একটু বেড়িয়ে আসব। ছ-টা নাগাদ।

— ঠিক আছে। তবে আপনি এখানে আসবেন না। মিঠাইয়ের দোকানের উলটোদিকে দাঁড়াবেন। আমি নিয়ে যাব ওকে।

পরদিন ঠিক সময়ে মা-মেয়ে দুজনকেই তুলে নিয়েছিল শমীক। কপিলা নোনাপুকুরে নেমে বলল — আপনি ওকে নার্সিংহোমে পৌঁছে দেবেন। আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরবে। এর কারণ

সহজবোধ্য। শমীকের না-রাজি হওয়ার কোনো হেতু ছিল না।

গীতিকে নিয়ে ইডেন গার্ডেন, প্রিন্সেপঘাট ঘুরে উড স্ট্রিটে একটা গেস্ট হাউসে এল শমীক। ব্যবসার জন্যে এটা রাখতে হয়েছে। প্রায়ই বাইরে থেকে ইঞ্জিনিয়ার, সাপ্লায়ার, সরকারি-বেসরকারি কর্তাব্যক্তি আসে। হোটেলে রেখে তাদের দেখভালে যা খরচ হত, গেস্ট হাউসের খরচ সে-তুলনায় নগণ্য। এই সাশ্রয়ের টাকার কিছুটা শমীক পুতুলের মতো মেয়েদের জন্যে খরচ করে। সব খরচ অফিসের খাতায় লেখাও হয়। বাজেটের হিসাবে কোনো গরমিল রাখে না।

শমীক বলল — কেমন লাগছে গীতি?

গীতি গেস্ট হাউসের ঘর দেখে স্তম্ভিত। এমন তো শুধু সিনেমায় দেখা যায়। টিভি, ফ্রিজ কী বড়ো বড়ো! ঘর কী ঠাণ্ডা। চকমকে সোফায় বসতে অস্বস্তি হচ্ছিল। ওর শাড়িটা এখানে একদম বেমানান।

— এটা আপনার বাড়ি?

— আমার। তবে বাড়ি নয়। গেস্ট হাউস। অতিথিরা এলে থাকে। আজ তুমি আমার অতিথি। এখন বলো, কী খাবে? তুমি ড্রিঙ্ক করো?

— না না! ওরে বাব্বা। আঁতকে ওঠে গীতি।

হেসে উঠে শমীক বলল—ভয় নেই। আমি কাউকে কোনো কিছুর জন্যেই জোর করি না।

— তার মানে আপনি কাউকে ভালোবাসেন না। ভালো না-বাসলে জোরের হক জন্মায় না।

— বাঃ! তুমি তো দারুণ কথা জানো দেখছি!

বলেই গীতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সশব্দে চুম্বন করে শমীক। এক ঝলক কেঁপে ওঠে গীতির শরীর। শমীকের আশ্লেষ ক্রমে ঘন হয়। গীতি দু-হাতে শমীকের পিঠ আঁকড়ে ধরে। একটু পরেই শমীক বুঝে যায় এ-মেয়ে বহুঘাতা। আম্রপালীর ভাবশিষ্যা। তৃপ্তির শিখরে পৌঁছে শমীক বুঝতে পারে না, কাকে সাধুবাদ দেবে, মেয়েকে না মাকে। দীর্ঘ দিন পর আজ আবার শরীরে কোজাগরীর আড়ম্বর অনুভব করল শমীক।

গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে দামি রেস্টুরেন্টে গীতিকে নিয়ে বসে শমীক। গীতির পছন্দ অনুযায়ী খাবারের অর্ডার দেয়। খেতে খেতে টুকরো টুকরো কথা হয়। আচমকা গীতি বলে — কী ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি আমি। বীথি, নীতিদের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। বাড়িতে তো সেই থোড়-বড়ি-খাড়া।

শমীক বেয়ারা ডেকে চারজনের মতো খাবার প্যাক করে দিতে বলল। নার্সিংহোমের সামনে গীতিকে নামিয়ে, খাবারের প্যাকেটগুলো ওর হাতে দিয়ে একটা খাম বাড়িয়ে নির্দেশ করে, এটা তোমার মাকে দিও। আর আগামী শনিবার আমি দুর্গাপুর যাব। তুমি যাবে আমার সঙ্গে। আজকের মতোই তুলে নেব। সকাল ছ-টায়। সময়ে হাজির থেকো।

দুর্গাপুরের দিনগুলোই শমীকের জীবন বদলে দিয়েছিল। আশাতীতভাবে একটা বহু টাকার কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাওয়ায় ওর মনে হয়, গীতি সৌভাগ্যবাহিকা। চেনা জগতের পরিধির বাইরে গীতি যেমন ছিল বাধাবন্ধনহীন, অফুরান সময়ের বদান্যতায় শমীকের শরীর-তৃষ্ণাও ছিল

দুর্নিবার। কাজকর্মের শেষে বা সামান্য বেড়িয়ে এসেই শমীক ঝাঁপিয়ে পড়েছে গীতির ওপর। গীতি মৃদু হেসে বলেছে — আমি কী পালিয়ে যাচ্ছি!

শমীক বলত — তুমি না-গেলেও সময় যে চলে যাচ্ছে। একদিন তুমিও যাবে।

ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে হোক বা ওর অনুগত নিবেদনের জন্যেই হোক, শমীক এবার প্রকৃত অর্থেই গীতির দু-হাত ভরে দিয়েছিল। ওর মা-বোনেদের জন্যে শাড়ি, বাবার জন্যে শার্ট, গীতির পছন্দমতো প্রসাধনসামগ্রী ইত্যাদি এতই কেনে যে, একটা নতুন সুটকেসও কিনতে হয়। বীথি সব দেখে বলেছিল—দিদি, তুই কি বিয়ের বাজার করে আনলি!

নগদ টাকার অঙ্ক দেখে কপিলা জানতে চেয়েছিল — তোকে আলাদা করে কিছু দেয়নি?

— আমাকে আবার কী দেবে?

— কেন, বিদায়ী! গয়না-টয়না, টাকা, তোর হাতখরচের জন্যে। চাইলে পারতিস। চাইলে ঠিক দিত।

গীতি বলল — মা, এত কিছু দেওয়ার পরও একজন মানুষের কাছে আর কী চাওয়া যায়!

বীথি বলে — মা তোকে কল্পতরু জুটিয়ে দিয়েছে, শুষে নিবি তো! তবে সবটাই নিজে নিস না। আমাদের জন্যও রাখিস ছিঁটেফোঁটা।

শমীকের সময়ের বড়ো সমস্যা। কলকাতার বাইরে গেলেও সব সময় গীতিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। উড স্ট্রিটের গেস্ট হাউস ইচ্ছে হলেই মেলে না। তবু যখনই সুযোগ মেলে ও খবর পাঠায়। খবর দেওয়াও একটা সমস্যা। বাড়িতে যাওয়া বারণ। ফোন করতে হয় নার্সিংহোমে। সেখানেও কপিলাকে সর্বদা পাওয়া যায় না। রোজ ওর কাজও থাকে না। একটা টেলিফোনের ব্যবস্থা করার কথা ভাবছিল শমীক। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কারণ কপিলার খাঁই দিনদিনই বাড়ার দিকে। গীতিকে নানা কিছুর ফিরিস্তি দিয়ে পাঠায়। টেলিফোন হাতে পেলে কতটা বেহিসাবি হবে বলা কঠিন। তবু চিন্তাটা মাথায় আনাগোনা করে। আচমকা একদিন গীতি জানাল, ওরা বাসাবদল করেছে। টালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে ভাড়ার ফ্ল্যাট দেখার জন্য, মার নাম করে যাওয়ার কথা বলল বারবার। সঙ্গে সঙ্গেই যাওয়া হয়নি। ক-দিন পর গিয়ে বেশ অবাক লাগল। আগের তুলনায় খানিকটা বড়ো ফ্ল্যাটের বিবিধ সম্ভার চোখ টানে। গত দু-আড়াই বছরে শমীক যথেষ্ট টাকা দিয়েছে ঠিকই, তবে প্রখর বিষয়বুদ্ধি ছাড়া এতটা নিশ্চয় সম্ভব হত না। বসার ঘরে সোফার পাশে কলাপাতা রঙের টেলিফোনে যেন বুদ্ধের হাসি বিম্বিত।

বিশদ করে কপিলা বলল — ওখানে মানুষজনের বড়ো চোখ টাটাচ্ছিল। গীতির একটা ভালো সম্বন্ধ পেয়েছি এখানে এসেই। ওখানে হাভাতের দঙ্গল ছাড়া কেউ রা কাড়ছিল না। সবই আপনারই আশীর্বাদে। এখন বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে একটু রেহাই পাই।

পাত্র শোনা গেল বজবজের কোনো কারখানায় কাজ করে। মা আর ছেলের ছোটো সংসার। কপিলার খুব পছন্দ হয়েছে। ছেলের চেহারা স্বভাবও বেশ ভালো। তবে দাবি একটু বেশি। দান-সামগ্রীর সঙ্গে নগদও চাইছে। কপিলা বলল — ওদের বাপ কিন্তু কিন্তু করছিল। অত খরচ! আমি কিন্তু বাবুসাহেব আপনার ভরসায় পাকা কথা দিয়ে দিয়েছি।

— বিয়েটা কবে?

কপিলা বলল — এখন তো বর্ষা চলছে। পুজোর পরই দিয়ে দেবো ভাবছি।

শমীক আশ্বস্ত বোধ করে। কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। তবে ঠিক কত টাকা কপিলা আশা করছে আন্দাজ করতে পারল না। সরাসরি জিজ্ঞাসাও করা গেল না। গীতির কাছ থেকে জানতে হবে। তখনই মাথায় প্রশ্ন জাগল, এখন কি গীতি আর সঙ্গ দেবে? গীতি আর ওর দখলে থাকবে না, বিয়ের পর দেখাও নিশ্চিত হবে না। ভাবতেই বুকের মধ্যে বিষাদের শুকনো হাওয়া ঘুলিয়ে উঠল। এসবই অবধারিত ছিল। স্পষ্টতই জানত শমীক। তবু ব্যথা লাগে। ওদের সম্পর্কে আসঙ্গপিপাসা থাকলেও উদাসীনতা তো ছিল না। যে-কোনো সম্পর্ক, ছেঁড়া সত্তার একাংশের ক্ষয়ে যাওয়ার মতোই দাহময়।

চলে আসার আগে কপিলা জানায়, পুজোর পর গীতি আর শমীকের সঙ্গে যাবে না। ওকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিবাহিত জীবনের জন্য প্রস্তুত হবার সময় দিতে হবে। শমীক বলল — আমি কি তবে আর আসব না?

— নিশ্চয় আসবেন বাবুসাহেব। বীথি-নীতি যে আপনাকে কী চোখে দেখে জানেনই।

গলা নামিয়ে আবার বলল — বীথি যাবে, যখন বলবেন। তবে ওর সাজগোজের বহর তো বেশি, তাই... বুঝতেই পারছেন... বয়েসটাও কম তো।

টাকার অঙ্ক বাড়াতে হবে, বুঝতে ভুল হল না শমীকের। উচ্চ-মাধ্যমিকে ফেল করে পড়াশোনা চুকিয়ে দিয়েছে বীথি। ফ্যাশনের ব্যাপারে অতি উৎসাহ। ওর জন্য গীতিকে আলাদা করে কত কি যে কিনে দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গীতি ফিরলেই ওরা কোথায় গেছে, কী খেয়েছে, কী কী করেছে তার বিশদ ধারাবিবরণী দিতে হত। গীতি কতটা কী বলত তা অবশ্য শমীকের জানা নেই। তবে কখনো-সখনো দেখা হলে বীথির মধ্যে নিহিত আগ্রাসনের আভাস পেত। ওর শরীরের বৈভবও গীতির তুলনায় বেশি আকর্ষক। পরে জেনেছিল বীথি অনেক বেশি অকপট।

মহালয়ার আগেই গীতিকে নিয়ে পুজোর বাজার করেছিল, যাকে বিয়ের বাজারও বলা যায়। যেহেতু এবারই শেষ, গীতির ইচ্ছাপূরণে বাধা দেয়নি। মনের আনন্দে কেনাকাটা করেছে গীতি। গীতিকে এখনো সৌভাগ্যসূচক মনে করে শমীক। যেন ওরই জন্য ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, নতুন নতুন কন্ট্রাক্ট পেয়েছে! টাকা আসছে অবাধে।

গীতির বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য তিন বোনই খুব করে বলেছিল। কপিলা নিমন্ত্রণ করলেও শমীক বুঝেছিল, ওটা নেহাত ভদ্রতা। না-বললে অশোভন হয়, তাই। শমীক বলেছিল, কলকাতায় থাকলে নিশ্চয় যাব। তবে ব্যবসার কাজে কোথায় থাকব আগাম বলা কঠিন। গীতি ধরতে পেরে বলেছিল — তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না? আমার কথা একটুও মনে পড়বে না তোমার? কান্নাভেজা গলায় যোগ করে — আমার যদি তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে, তখন দেখা করবে তো?

এই সব আবেগ-উক্তির পরমায়ু অতি ক্ষীণ। বীথি বলেছিল — ন্যাকামি! এততেও শখ মেটেনি!

বীথিকে প্রথমদিন গেস্ট হাউসে নিয়ে এসে শমীক ভাবছিল, কীভাবে এগোবে। কারণ বীথি জানে এখানেই গীতির সঙ্গে সে, কত সময় কাটিয়েছে। দ্বিধা-সংকোচ থাকা অস্বাভাবিক

নয়। ওকে কিছুটা অবাক করে দিয়ে বীথি বলল — তুমি প্রথমে মদ দেবে তো? একটু মদ না-খেলে মেজাজ আসে না আমার। বলতে বলতে নিজেই জামাকাপড় ছেড়ে শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরা অবস্থায় বলল, আমার কপার-টি লাগানো আছে, তোমার আপত্তি নেই তো? সুবিধে তো তোমারই। পকেটে আর প্যাকেট বয়ে বেড়াতে হবে না।

— তার মানে তুমি আরো আগে থাকতেই...

— তুমি কুমারী-পূজা করবে ভেবেছিলে নাকি! দু-বছর হল মা লাইন ধরিয়ে দিয়েছে। তবে এখন থেকে তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে যাব না।

ততক্ষণে দুই গ্লাসে হুইস্কি ঢেলেছে শমীক। চুমুক দিয়ে বীথি বলল — দামি জিনিস মনে হচ্ছে। বাঃ, তুমি খুব রইস আদমি আছ দেখছি।

বীথি যে গীতির চেয়ে একেবারে অন্যরকম এটা বুঝতে বেশি দেরি হয় না শমীকের। গীতি ছিল নরম মনের মমতাময়ী নারী। বীথি অনেক বেশি আগ্রাসী, লোভী এবং হিসেবি। ও স্পষ্টভাবে জানে, ওর কাজ শমীককে শারীরিকভাবে তুষ্ট রেখে যত বেশি সম্ভব দোহন করা। শমীক জেনে বুঝেই এই বিনিময়ের খেলায় নেমেছে। কিন্তু বীথির মনহীন কামাগ্রাসন ও লজ্জাহীন গৃধ্নুতা মানসিক অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছিল। আবার ওর বাধাবন্ধনহীন তৎপরতা ও বৈচিত্র্যসন্ধানী উন্মুখতার আকর্ষণও ছিল তীব্র। সেই তাগিদেই ব্যবসার কাজে রাঁচি যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়েছিল। রাঁচির কাজ সেরে নেতারহাটের ট্যুরিস্ট বাংলোয় চমৎকার কাটিয়েছিল কয়েকটা দিন। ফেরার আগের দিন সূর্যাস্তের আবীর-আভায় বীথিকে হলিউডি ছবির রেড-ইন্ডিয়ান মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। ওকে বুকে টেনে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালে বীথি বলল — সূর্যাস্ত দেখলে, এবার বীথির অস্তও দেখতে হবে।

শমীক তীব্রস্বরে বলল — কী যা-তা বলছ! ঠাট্টা করেও এসব বলতে হয় না।

হেসে উঠে বীথি বলল — যা ভাবছ সে-অর্থে বলিনি। বলছি আমাকে আর বেশি পাবে না। ফিরে গেলেই মা বলবে। আমি শুধু আগাম জানিয়ে দিলাম যাতে দোষ না দিতে পারো।

ঘরে ফিরে হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে শমীক জানতে চায় — তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে নাকি?

— সে তো কবেই ঠিক হয়ে আছে। আমাদের এখনই বিয়ে করার প্ল্যান ছিল না। মা-র চাপে করতে হবে।

— কেন, মা চাপ দিচ্ছেন কেন?

— নীতির জন্যে।

— সে আবার কী করল?

— করেনি। করতে রাজি হয়নি বলেই মা আমাদের বিদেয় করতে চায়।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে শমীক বলে — কী যে বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না। সোজা করে বলো, কী ব্যাপার।

বীথির কথা শুনে চমকে ওঠে শমীক। একেবারে অবিশ্বাস্য বানানো গল্প মনে হয়। নীতির ওর সম্পর্কে এমন অনুভবের কারণ কী হতে পারে? ও তো কখনোই ওর সঙ্গে আলাদা কোনো সম্পর্ক বা বোঝাপড়া তৈরি করার চেষ্টাও করেনি। এত বছরে ক-টা কথাই বা বলেছে?

সবার ছোটো বলে একটু হয়তো স্নেহ-প্রশ্রয় দেখিয়েছে। ওর আবদারে কিনে দিয়েছে চকোলেট বা গানের ক্যাসেট। একবার তিন বোনকে নিয়ে ময়দানের শিল্পমেলায় গিয়েছিল। নীতি সারাক্ষণ ওর গা-ঘেঁষে বা হাত ধরে চলছিল মনে আছে। রেস্টুরেন্টে খাবার সময়, নীতি ওর পাশে বসার জেদ করত। সেসব নেহাত ছেলেমানুষী ছাড়া আর কীই-বা ভাবা যায়! অথচ বীথি বলছে কপিলা ওকে লাইনে নামাবার জন্য মালদার বাবু ধরলেও নীতি যেতে চায়নি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, শমীক ছাড়া আর কারুর সঙ্গে যাবে না। কপিলা নানাভাবে জোর করেও মানাতে পারেনি। বরং হুমকি দিয়েছে, বেশি জোর করলে ও ভয়ংকর কিছু করে ফেলবে। দরকার হলে পুলিশে যাবে। নীতি খুব জেদি, ওর পক্ষে সবই সম্ভব।

ছ-মাসের মধ্যেই অটোরিকশা-চালক বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বীথির। শমীককে বেশ অনেক টাকাই দিতে হল। কপিলার কথায় মানুষজনের কাছে নিজেদের মানসম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য এবং বীথির সুখী জীবনের জন্যও খরচাপাতি, একটু বেশি হলেও, না-করে পারা যায় না। তা ছাড়া কপিলার বড়ো ভরসা বাবুসাহেবের মর্যাদার কথাও মাথায় রাখতে হয়। ওঁর মতো মানী মানুষ বীথি-নীতির অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছেন একী কম গর্বের কথা!

বীথির বিয়েতে দেখা হলে গীতি বলল — কী নিষ্ঠুর! আমাকে একবারও আর মনে পড়ে না?

শমীক বলে — তোমারও কি আমাকে মনে পড়ে?

কাতর কণ্ঠে গীতি বলে — অনেকবার। খুবই মনে পড়ে।

— কই, কখনো তো ডাকোনি, খবরও দাওনি!

— আমি কী করে খবর দেবো! ও তো আমাকে মা-র কাছেও আসতে দেয় না।

— ভালোই তো। তোমাকে খুব ভালোবাসে বোঝা যাচ্ছে। আর কী চাই বলো!

চলে আসার আগে কপিলা বলল — বাবুসাহেব, আপনি যা করলেন, আমার বলার কোনো ভাষা নেই।

শমীক বলল — এসব কী বলছেন! সাধ্যমতো যেটুকু পেরেছি সে তো আমার কর্তব্য।

কপিলা জানতে চায় — আবার কবে আসবেন?

— আমার কী আর আসার দরকার হবে?

— এ-কথা কেন বলছেন বাবুসাহেব! নিশ্চয় আসবেন। আমরা তো আপনার ভরসাতেই আছি।

— আমি ক-দিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এসে যোগাযোগ করব।

— আপনি একাই যাবেন? কোথায়?

— ভাইজাগে একটা কাজ আছে। কেন বলুন তো?

— না, মানে নীতিটা একা হয়ে পড়ল, বাইরে কোথাও যায়ওনি, তাই ভাবছিলাম আপনি সঙ্গে নিলে ঘোরাও হত, মনটাও ভালো থাকত।

উত্তর সম্যক জানা থাকা সত্ত্বেও শমীক জিজ্ঞেস করে — ও কি রাজি হবে?

কপিলা সংহত উচ্ছ্বাসে বলে — আপনার সঙ্গে যাওয়ার সৌভাগ্য পেয়েও যাবে না!

শমীক মৃদু হেসে বলল — ঠিক আছে। যাওয়ার ব্যবস্থা হলে আমি জানাব।

ভাইজাগ যাওয়ার ব্যবস্থার কথা জানাতে এলে কপিলা বলল — আপনি এক কথায় নীতিকে নিতে রাজি হবেন আমি ভাবতেই পারিনি। তবে আপনাকে একটা কথা বলার আছে বাবুসাহেব। নীতি কিন্তু ওর দিদিদের মতো নয়।

— তার মানে? ও কী আমার সঙ্গে যেতে চাইছে না?

— না না। তা নয়। ও তো উল্লাসে নাচছে। কিন্তু আমার বড়ো লোকসান হয়ে যাচ্ছে। ও আমার কথা শুনল না। এখন আপনি যা বিবেচনা করেন!

— আমি কিছু বুঝলাম না।

— বলছিলাম কি, নীতি কুমারী মেয়ে, তাই, জানেনই তো প্রথমবারের জন্যে একটা আলাদা... আর এই তো আমার শেষ সম্বল। তাও ওরই ভবিষ্যতরে সংস্থানের জন্য রাখতে হবে।

বুঝতে অসুবিধে হল না শমীকের, নীতির কৌমার্যের মূল্য দাবি করছে কপিলা। কুমারীত্ব ওর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় কিছু না-হলেও একজন তরুণীকে রমণীতে রূপান্তরিত করার শ্লাঘাও কম উপাদেয় নয়। তার জন্য অর্থ গুনতে আপত্তি করবে কেন! শুধু জানা দরকার কপিলার খাঁই কতখানি?

কপিলা দ্বিধাহীন বলে — অন্য কেউ হলে কুড়ি-পঁচিশ বলতাম। আপনি এত বছর ধরে এত করেছেন আমাদের জন্য, আপনাকে আর কী বলব, হাজার দশেক দেবেন। তবে ওটা আমি আগাম নেব।

শমীক মৃদু আপত্তি করে। মৃদু, কেন না একটা মেয়ের কৌমার্যের মূল্য কীভাবে কতয় নির্ধারিত হওয়া সঠিক সে-বিষয়ে ওর কোনো বুৎপত্তি নেই। এবং এই বিষয় নিয়ে সেই মেয়ের মা-র সঙ্গে দরদাম করার রুচিহীনতাও মানসিক পীড়াদায়ক। কপিলার নিজের চাওয়া সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না বলে সে তার দাবিতে অনড় থাকে। শমীককে কথা দিতে হয় যাওয়ার আগে এসে টাকা দিয়ে যাবে।

ভাইজাগে প্রথম তিনটে দিন শমীকের প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন অফিসে ছোটাছুটি, কর্মকর্তাদের সঙ্গে খানাপিনা, দর-কষাকষি। নীতিকে বলেছিল, নিজের ইচ্ছেমতো খাও, ঘোরাঘুরি করো, শপিংয়ে যাও। আর বোরিং লাগলে সমুদ্রের কাছে চলে যাবে।

সমুদ্র-সান্নিধ্য যে এমন মাদকতাময় নীতি ভাবতেও পারেনি। সকাল-বিকেল এমনকী রাতেও সমুদ্র দেখে দেখে ক্লান্তি আসে না। ঘুম পেলেও ইচ্ছে করে না উঠে যেতে। হোটেলের ঘরে টিভিতে সিনেমা দেখার চেয়েও সমুদ্র দেখতে বেশি ভালো লাগছে। এত রকম খাবার চাইলেই পাওয়া যাবে কল্পনাতেও ছিল না। ঝাঁ-চকচকে দোকানে ঢুকে থরে থরে সাজানো বর্ণবাহারী জিনিস দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল সবই কিনে নেয়। কিন্তু শমীক কী মনে করবে, রাগ করবে কি না ভেবে কিছুই না-কিনে ফিরে আসে। শুধু দেখার লোভেই বারবার যায়। দিনগুলো নীতির কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। যেন নিজেই একটা সিনেমার কল্পজগতে বাস করছে। যার অবাধ ভালোলাগায় ভেসে যাচ্ছে সে। শমীক প্রতিদিন ওর কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না জানতে ভুল না-করলেও, ওর মধ্যে দিদিদের বা অন্য বান্ধবীদের কাছে শোনা

পুরুষ-উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। শমীকের এই অনাগ্রহ ওকে ভাবায়। যদিও দেখছে, মানুষটা সকালে বেরিয়ে অনেক রাতে ক্লান্ত হয়ে পানভোজন সেরে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ছে, তবু নিজেকে উপেক্ষিতা লাগে। সংশয় জাগে মনে। ওকে কী পছন্দ হচ্ছে না শমীকের!

শমীক ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছিল। চাইছিল নীতি ওর উপস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠুক। ওর ভিতরেও আসঙ্গ-পিপাসা ধূমায়িত হোক। সকালে বেরোবার সময় অল্প চুম্বন, গালে পিঠে স্নেহমাখা আদরের রেশ ছড়িয়ে দিচ্ছিল, যাতে ওর কোমল মনে আবেগের চোরাস্রোত প্রবাহিত হয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ফিরে শমীক বলল — চলো, বেড়িয়ে আসি।

সোৎসাহে নীতি জানতে চায় — কোথায় যাব?

শমীক বলে — তোমার সঙ্গে সমুদ্র দেখব। তুমি তো এই ক-দিন অনেক দেখলে সমুদ্র, চেনা হয়েছে?

— চেনার আর কী আছে! খালি ঢেউয়ের পর ঢেউ। হঠাৎ হঠাৎ রং বদলে যায়। তখন দারুণ লাগে।

সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে শমীক বলল — তোমার কখনো সমুদ্র হতে ইচ্ছে করে না?

— ধ্যাৎ, আমি কী করে সমুদ্র হব! সমুদ্র কী প্রকাণ্ড! কী গর্জন! প্রথম দিন স্নান করতে কী ভয় যে লেগেছিল! মনে হচ্ছিল আমাকে যেন কেউ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভয় লাগলেও বারবার নেমে পড়েছি। ঢেউয়ের ধাক্কায় গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

— সে কী! বলোনি তো! বললে ভালো করে ম্যাসাজ করে দিতাম।

— কখন বলতাম! ফিরে এসেই তো ভোঁস ভোঁস। আর ভোর হতেই ছুট।

— স্যরি। কোনো উপায় ছিল না। তবে অল ওভার। এখন শুধু তুমি আর সমুদ্র।

প্রথম অভিজ্ঞতার শারীরিক কষ্ট নীতি নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করায় শমীক অনুভব করে, এ-মেয়ে মানসিকভাবে তার জন্য কতটা প্রস্তুত ছিল। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে শমীককে সুখের শিখরে পৌঁছে দেবার জন্যও ওর উদ্যমের অভাব ছিল না। শমীক প্রাকৃত নিয়মেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। শয্যাঝড়ের অবসানে নীতি প্রশ্ন করে, একেই সমুদ্র হওয়া বলে বুঝি?

— ভয় লেগেছে? ব্যথা পেয়েছে?

উত্তর না-দিয়ে নীতি শমীকের লোমশ বুকে মুখ ঘষে প্রায় ফিসফিস করে বলে — আমি পেরেছি ভালো লাগাতে?

এমন জিজ্ঞাসা নীতির বাতিক হয়ে যায়। প্রতিবারই সব শেষে জানতে চায়, শমীককে যথাযথ আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে পারছে কি না। শমীক উচ্ছ্বসিত ভাষায় আশ্বস্ত করলেও নীতি প্রশ্নটা না-করে পারে না। শমীক বলে — আর কখনো এমন বলবে না। তুমি খুব ভালো, অ্যান্ড য়্যু আর ভেরি বিউটিফুল।

আচমকা নীতি বলে ওঠে — দিদিদের চাইতেও ভালো?

বলেই শমীকের কঠিন হয়ে-ওঠা মুখ দেখে বুঝতে পারে কথাটা বলা সমীচীন হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে — না, মানে, বলছিলাম আমার তো অভিজ্ঞতা ছিল না।

শমীক ওকে বুকের আদরে জড়িয়ে দীর্ঘ চুমু খেয়ে বলল — ভবিষ্যতে আর কোনোদিনও এই কথা উচ্চারণ করবে না। প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। ইউনিক। তোমার সঙ্গে কারো তুলনা হয়

না। অন্যদেরও তোমার সঙ্গে তুলনা চলে না। কোনো সংশয় রেখো না মনে। তুমি আমার কাছে অতুলনীয়া হয়েই থাকবে।

সাতদিনে যথাসম্ভব শুষে নিয়েছিল শমীক। অনেকদিন পর এমন বাধাবন্ধনহীন শরীরবিহার এবং সমান উৎসুক টাটকা টগবগে তরুণী শরীরের তৎপর লাস্য ওকে উপহার দিয়েছিল অনিঃশেষ এক সুখের খনি। ব্রেকফাস্ট সেরেই সমুদ্রে ছুটেছে। তারপর দোকান ঘুরে ঘুরে উচ্ছল নীতির স্বপ্ন-পূরণ-করা কেনাকাটি। লাঞ্চের পর হোটেলে ফিরে ফের দাপাদাপি। বিকেলে আবার সমুদ্র। আবার শপিংয়ে উন্মুখ যাওয়া-আসা। রাতের পর সকাল হলে টের পায়, আরো একটা রাত প্রায় নিদ্রাহীন কেটে গেল শুধু সুখোল্লাসের ঢেউয়ে দুলতে দুলতে।

কলকাতায় ফিরে নীতিকে নামিয়ে দেওয়ার আগে ওর হাতে একটা খাম দিয়ে শমীক বলল — এটা রাখো। তোমার মা চাইবেন।

নীতি বলল — কী এটা?

মুখে হাসি উজিয়ে শমীক বলল — বিদায়ী।

শঙ্কিত স্বরে নীতি বলল — তুমি আর আসবে না?

— নিশ্চয় আসব। ক-দিন পরেই খবর দেবো। আসবে তো?

শমীকের বাহু ধরে নীতি বলল — আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি তোমার কাছে থাকব।

— আমার কাছেই তো আছ। কিন্তু এখন বাড়ি যেতে হবে। তোমার মা অপেক্ষা করে আছেন।

তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীতিকে নেমে যেতেই হয়। ওর আনা জিনিসপত্র দেখে কপিলার খুশি উপচে পড়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় নীতিকে কতটা যত্নে রেখেছিল, কী কী খাইয়েছে, কত ঘুরেছে এবং সব শেষে ওকে বিশেষ কোনো উপহার দিয়েছে কিনা।

নীতি অবাক হয়ে বলে — মা, এত সবের পরও আবার আলাদা করে কী দেবে!

কপিলা বলল — আহা মানুষটা এত দরাজদিল, তোর মতো একটা কচি মেয়েকে সোনার কিছু দেওয়া উচিত ছিল। তুইও তো চাইতে পারতিস প্রথম রাতের পর। ওসময় চাইলে পুরুষ মানুষ না দিয়ে পারে না। ঠিক আছে, এরপর কখন কী চাইতে হবে আমি বলে দেবো। খালি হোটেল-রেস্টুরেন্টে ফুর্তি করলেই চলবে! বিয়ে করতে হবে না? এখনই আদায় করতে না-পারলে বিয়ের খরচটা আসবে কোত্থেকে?

নীতি মাকে স্পষ্টই বলে — আমি বিয়ে করব না। ওঁর কাছে থাকব।

কপিলা ধমকে ওঠে — ওর কাছে থাকবি মানে? জানিস লোকটার বউ আছে, ধাড়ি ধাড়ি ছেলেমেয়ে আছে।

— থাকুক, তাকে আমার কী! আমি কি ওদের সঙ্গে ঘর করতে যাব? ওরা ওদের মতো থাকবে, আমি আমার মতো।

— আর বাবুসাহেব কোথায় থাকবে?

— আমার কাছে। মাঝে মাঝে ওদের দেখে আসবে।

— উনি এসব বলেছেন তোকে?

— তুমি যে কী বলো মা! উনি কেন বলবেন! আমি তোমাকে আমার কথা বললাম।

— তুই বললেই হবে? উনি রাজি কি না জানতে হবে না?

— রাজি না-হলেও আমি শুনব না। আমি ওঁর কাছেই থাকব।

— ছেলেমানুষী করিস না। উনি তোকে কোনোদিনই বিয়ে করবেন না। সারাজীবন তুই কি রক্ষিতা হয়ে থাকবি? লোকজন কী বলবে ভেবেছিস? তোর দিদিরা? তারাও কী মানবে?

— না মানুক। আমি ওদের মতো মানুষটাকে ঠকাতে পারব না।

মা-র সঙ্গে এমন তর্ক-বিতর্ক নিয়মিত হতে লাগল নীতির। বিদায়ী আদায় কীভাবে বাড়ানো যায়, কীভাবে আরো বেশি বেশি টাকা শমীকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, সে-প্রসঙ্গে কথা উঠলে এবং স্বাভাবিকভাবেই ওর বিয়ের বিষয়ে আলোচনা হলেই নীতি, বিরুদ্ধতা করেছে। সে শমীককেও বলে, ওকে যেন উড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে বা অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। শমীক জানে তা সম্ভব নয়। খুব বেশি হলে এক, দু-বছর আর, তারপর নীতিকে বিয়ে করে জীবনে থিতু হতেই হবে। ভাবনাটা সুখকর নয়, তবু বাস্তবকে অস্বীকারও করা যায় না। সেও নীতিকে বোঝাবার চেষ্টা করে — তোমার মা তোমার ভালোর জন্যই বলছেন। এভাবে তো জীবন কাটানো যায় না নীতি।

নীতি বলে — তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাও, দিদিদের মতো?

শমীক জানায় — ভুল বলছ তুমি। আমি কারোকে ত্যাগ করিনি। তোমার মা-ই ওদের সরিয়ে নিয়েছেন। তোমার মাকে আমি কিছুই লুকোইনি। প্রথমেই সব বলে দিয়েছিলাম।

নীতি জানতে চায় — তোমার বাড়ির কেউ কিচ্ছু জানে না আমাদের সম্পর্কে?

শমীক জবাব দেয় — জানবে কেন! আমার স্ত্রী কিছু অনুমান করে নিশ্চয়। নিজের অপারগতার জন্যই সম্ভবত কোনো অশান্তি করে না। তোমার দুই দিদির মতো আমার দুই মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। এক ছেলে এখন মুম্বইতে কাজ করছে। ছোটোটাকে ম্যানেজমেন্ট পড়াচ্ছি যাতে আমার পর ব্যবসার দায়িত্ব নিতে পারে।

নীতি কিছুতেই শমীককে ছেড়ে থাকতে চায় না। সেকারণে ও বারে বারে বাইরে যাওয়ার বায়না করে। দুর্গাপুর, ভুবনেশ্বর বা রাঁচি যেখানেই হোক কাজের সময়ের বাইরে সবটা সময় শমীকের সঙ্গে কাটাতে চায়। সারা জীবনই সে এভাবে কাটাতে ইচ্ছুক। কলকাতায় ফিরতে হলেই ওর মন খারাপ হয়ে যায়। বছর দুয়েকের নিবিড় সঙ্গের পর শমীকেরও মাঝে মাঝে মনে হয় নীতিকে নিজের কাছে রেখে দিলে মন্দ হয় না। মেয়েটা ওকে সত্যি খুব ভালোবাসে। যতক্ষণ থাকে মনপ্রাণ দিয়ে ওর সেবা-যত্ন করে। তীক্ষ্ণ নজর রাখে ওর প্রতিটি প্রয়োজনের ওপর। এসব বিষয়ে শমীক, স্ত্রী কল্পনার সঙ্গে নীতির অনেক মিল খুঁজে পায়। নীতির সমর্পণের মধ্যে নিবেদনের মিনতি মিশে থাকে, যা সব পুরুষের ঈপ্সিত। নীতির রতি-তৃপ্ত মুখের বিস্মিত শিল্পসুষমা শমীকের অনুভবে মদির শিহরন ছড়ায়।

ওদের রসায়ন অবাঞ্ছিত খাতে বয়ে যেতে পারে, এমন কি মনে হয়েছিল কপিলার? অথবা বুঝতে পেরেছিল, মেয়ে তার নির্দেশ পালনে অনীহ হয়ে উঠছে। প্রায়ই বিদায়ীর অঙ্কটা আশানুরূপ থাকছে না। জিজ্ঞেস করলে কখনো ব্যাজার মুখে, কখনো ঝাঁঝিয়েও, নীতি বলে — একটা মানুষের কাছে আর কত চাইব! কত মিথ্যা বলে ভিক্ষা করব তোমার জন্যে?

হাত পেতে বিদায়ীর টাকা নিতে যে কী লজ্জা হয় তা কপিলা কখনো বুঝবে না। নিজের মধ্যেই প্রতিবার নিঃশব্দে বিদীর্ণ হয় নীতি।

কপিলা বলে — আমার জন্য মানে? আমি কী আমার জন্যে চাইছি! সবই তোর জন্যে। খালি হাতে বিয়ে হয় না, এ-টুকু না-বোঝার মতো কচি খুকি তুমি আর নও।

নীতি জবাব দেয় — কতবার বলব আমি বিয়ে করব না। আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

কপিলা গর্জায় — নইলে আর কীভাবে আমাদের মুখ পোড়াবে! ওই মানুষ কী তোকে চিরকাল রাখবে, খাওয়াবে, পরাবে বলেছে? দু-দিন বাদে যখন ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে তখন যাবি কোথায়? এইসব পুরুষদের কতটা চিনিস তুই? মাংস গিলে হাড়-ছুঁড়ে-ফেলা হারামি সব।

কপিলার মসলন্দপুরের বোন ভবানী, তার মেয়ের ননদের দেওরের সঙ্গে নীতির বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ছেলেটি রেলে কাজ করে। বাড়ি-ঘর আছে। আর যা প্রধান বিবেচ্য, খাঁই তেমন কিছু নেই। মেয়ে পছন্দ হলে অল্প খরচেই সব সারা যাবে। কপিলা নিজে মসলন্দপুর গিয়ে কথাবার্তা বলে আসে। স্থিরই করে, এখানেই মেয়ের বিয়ে দেবে।

আবার ভাইজাগ যাবার কথা ছিল। কপিলা শমীককে জানায়, নীতি যেতে পারবে না। ও আর কখনোই যাবে না। শমীক জানতে চায়—ওর কি বিয়ে ঠিক হয়েছে?

— ধরুন তাই।

— ওর সঙ্গে একবার কথা বলা যাবে?

— এখন তো হবে না। ও এখানে নেই। মসলন্দপুর গেছে।

— কবে ফিরবে?

— তা দিয়ে আপনার দরকার কী! বললাম তো ও আর যাবে না। আপনিও আর আসবেন না।

বিস্মিত শমীক, কপিলার আচমকা এই পরিবর্তনের কোনো কারণ খুঁজে পেল না। নীতির বিয়েতে ও কখনো বাধা দিত না। জানাই ছিল এই সম্পর্ক ফুরাবার সময় ঘনিয়ে আসছে।

নীতিও অবাক হয়, যখন কপিলা প্রায় জোর করেই মেয়েকে মসলন্দপুর নিয়ে পাত্রপক্ষর সামনে হাজির করে। পাত্রপক্ষর আত্মীয়স্বজন, সকলেরই পাত্রীকে দেখার ইচ্ছাপূরণ করার জন্য নীতিকে মসলন্দপুরে রেখেই ফিরে আসে কপিলা। নীতি বারবার বলে — মা, আমি কী করে থাকব এখানে! ওঁকে কিছু বলা হয়নি। উনি তো খোঁজ করবেন। আবার বাইরে যাবার কথা বলেছিলেন আমাকে।

কপিলা বলে — ওসব তোকে ভাবতে হবে না। যা বলার আমি বলব। এখানে একটু রয়ে সয়ে থেকো। আবোল-তাবোল কিছু বললে বা করলে ঝেঁটিয়ে সিধে করে দেবো। এমন সুপাত্র আর মাথা খুঁড়লেও জুটবে না। মনে রেখো।

অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে-পড়া নীতির দিকে ফিরেও তাকাল না কপিলা দাসী।

অনেকবারই ফোন করেছিল শমীক। কপিলা হয় ফোন রেখে দিয়েছে অথবা বলেছে নীতি বাড়িতে নেই। কণ্ঠস্বরের কর্কশতা অনুভব করে শমীক নিজে আর খবর নিয়ে যায়নি। নীতিই একদিন ফোনে অন্তত একবার দেখা করার জন্যে অনুরোধ করে। শমীক বলে — তোমাদের বাড়িতে আমি আর যাব না। তুমি ইচ্ছে করলে উড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে বা অন্য কোথাও আসতে পারো। কবে আসবে জানিয়ো। দু-বার বলেও আসতে পারেনি নীতি। কপিলার টহলদারি নজর এড়ানো সম্ভব হয়নি। তবুও নীতির আর্ত অনুরোধের মর্যাদা দিতে গিয়ে যে-অভিজ্ঞতা হল, সারাজীবনেও ভুলতে পারবে না শমীক। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র এলেও উপস্থিত হওয়ার কথা বিবেচনাও করেনি। বিয়ের পরদিন দুপুরে হঠাৎ গীতির ফোন পেয়ে অবাক হয় শমীক। কাতর অনুনয়ে গীতি বলে — আপনি দয়া করে একবার আসুন। আপনি না-এলে নীতি কিছুতেই বরের সঙ্গে যাবে না। ওর গোঁ তো আপনি জানেন।

শমীক বলে — গীতি, তোমাদের মা চান না আমি যাই। শুধু শুধু অশান্তি করে লাভ কী!

গীতি বলে — আমি সব শুনেছি। তবু আপনাকে নীতির জন্যে একবার আসতেই হবে। আপনার আশীর্বাদ ছাড়া ও যায় কী করে, সেটা একবার ভাবুন। আপনি তো আমাকে বা বীথিকে বঞ্চিত করেননি! ওকে কেন করবেন?

শমীক বলল — বীথি কোথায়? ও কী বলছে?

গীতির হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বীথি বলল — আমিও একই কথা বলছি। আপনি একবার আসুন। না-এলে নীতি যে কী কেলেঙ্কারি করবে ভাবতেও পারছি না।

দুই বোনেরই ওকে আপনি বলার বদল দেখে কৌতুক বোধ করে শমীক। এও কি কিছুর ইঙ্গিতবাহী!

শমীক হাজির হতেই গীতি, বীথি, ওকে নিয়ে গেল ভেতরের একটা ঘরে। সেখানে বিছানায় উপুড় হয়ে অবিরল কেঁদে যাচ্ছে নীতি। নতুন শাড়ি গহনায় সজ্জিত ভাসান-প্রতিমা যেন। ঘরে আরো কিছু মেয়ে ও মহিলা থাকলেও কপিলাকে দেখা গেল না। বীথি অন্যদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে ডাকে — ছুটকি, দ্যাখ কে এসেছে! শমীকদা।

নীতি হুড়মুড়িয়ে উঠে বসে বিহ্বল চোখে শমীকের দিকে তাকায়। বুঝে নিতে চায় ও কী সত্যিই এসেছে! কোনো দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে না তো? তারপরই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল — তুমি এতদিন আসোনি কেন! দেখছ, এরা জোর করে আমাকে কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি যাব না। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

শমীক নিজেকে আলগা করে নীতির মাথায় হাত রেখে বলে — এসব এখন বলে না নীতি। তুমি কত ভালো মেয়ে, সুন্দর বিয়ে হয়েছে। এখন শুধু আনন্দ করবে। নতুন করে জীবনের হীরে-মানিক খোঁজা শুরু করবে।

নীতি বলল—আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

শমীক নীতির চোখে চোখ রেখে বলল — এসব আর কখনো বলবে না। মেয়েদের পিছনের জীবনের সব কিছু ফেলে, সব কিছু ভুলে, নতুন জীবনের দিকে পা বাড়াতে হয়। আর আমি তো থাকছিই। কোথাও যাচ্ছি না।

আচমকা গীতি বীথি দু-জনেই একসঙ্গে বলে ওঠে — আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

বীথি শমীকের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে আবার বলল — আমি আর মেনিমুখোটার কাছে যাব না। তোমার কাছে থাকব।

গীতি বলল — আমি যে কত কষ্ট সহ্য করে কাটিয়েছি এতদিন, তা ধারণার বাইরে। সেবারেই তোমাকে বলেছিলাম। আমাকেও নিয়ে চলো তুমি।

পালাক্রমে তিন বোনের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় শমীক বলল — তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে। গীতি, তুমি তো সবার বড়ো, তুমি ওদের না বুঝিয়ে পাগলামিতে সায় দিচ্ছ? বীথি, তুমি তো খুব প্র্যাকটিকাল, তুমি এমন অসম্ভব কথা বলছ কেন?

গীতি বলল — তুমি যাকে পাগলামি বলছ, সেটা আসলে আমার বাঁচার তাগিদ। যার হদিশ তুমিই আমাকে দিয়েছিলে।

বীথি বলল — প্র্যাকটিকাল বলেই বুঝেছি, কী ভুল জীবনে বাঁধা আছি। তখন যদি বুঝতাম, তা হলে কখনো ওই হতচ্ছাড়াটাকে বিয়ে করতাম না। আমি কিছুতেই আর ফিরে যাব না।

শমীক হাতের শেষ তাস ছোঁড়ার মতো করে বলল — তোমাদের তিনজনকেই আমি নেব কী করে?

ত্বরিত জবাব দেয় বীথি — দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী ছিল, আমরা তো শুধু তিন জন। আগে তো পুরুষদের ডজন ডজন বউ থাকত।

নীতি শমীকের গলা জড়িয়ে ধরে বলল — আমার দিদিদের সঙ্গে থাকতে কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি আমাদের নিয়ে চলো। আমাদের মানুষের মতো বাঁচতে দাও।

পলকের জন্য শমীকের মনে হয় তিন বোন যেন সম্মিলিত সুরে কথা বলছে। কঠিন গলায় বলল — অনেক ছেলেমানুষী হয়েছে। যা হয় না, যা অসম্ভব, তা নিয়ে অহেতুক বায়না কোরো না। দেশের আইন-কানুন, সমাজের রীতি-নীতির কথা ভুলে গেলে চলবে?

তখনই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে কপিলা। শমীককে দেখে রূঢ়স্বরে বলে — এ কী, আপনি! আপনি কেন এসেছেন! আপনাকে না আমি বারণ করেছিলাম।

শমীক ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে — গীতি আর বীথি ফোন করে বলল। তাই... আমি এখনই যাচ্ছি।

চলে আসার উদ্যোগ করতেই নীতি, শমীকের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে — আমাকে ছেড়ে যাবে না তুমি।

কপিলা কিছু বলতে পারার আগেই বাহু ধরে নীতিকে দাঁড় করিয়ে পকেটে হাত দেয় শমীক। এক মুঠো টাকা নীতির হাতে দিয়ে বলে — আমি কিছু নিয়ে আসতে পারিনি, তোমার পছন্দমতো কিছু কিনে নিও আমার উপহার হিসেবে।

ঝাঁকিয়ে বৃষ্টি নামার মতো ঝরঝর করে আর্তকান্নায় ভেঙে পড়ে নীতি। হাত থেকে খসে পড়ে টাকা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে নীতি অস্ফুট উচ্চারণ করে — আজও তুমি আমাকে বিদায়ী দিয়ে যাচ্ছ!

নীতির অন্তস্থল থেকে ঠিকরে আসে শব্দগুলো। শব্দ নয়, যেন তীক্ষ্ণ তীরের ফলা। শমীক বিস্ফারিত চোখে বোবা দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে ওঠে মিহি বেদনার সুর।

গীতি আর বীথিও ছোটোবোনকে জড়িয়ে জোরে ফুঁপিয়ে ওঠে। বলে — তুমি এভাবে আমাদের ফেলে যেতে পারো না!

কর্কশ স্বরে কপিলা বলে — আহা হা, কলিকালের রাসলীলে হচ্ছে!

কপিলার চোখের আগুনের ভাষা বুঝতে ভুল হয় না শমীকের। ও রোরুদ্যমানা তিন বোনের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

দরজা পেরিয়ে যাবার আগে শমীক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, তিন বোনের সম্মিলিত ত্রিমূর্তি যেন তার যাপিত জীবনের জ্বলন্ত স্মৃতিফলক, যার দহন থেকে এ-জীবনে তার মুক্তি নেই।

ফুটপাতে বসা পরিচিত নুলো ভিখারিটা শমীকের মুখের দিকে চেয়ে তার ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের থালাটা আজ আর বাড়িয়ে ধরার সাহস পেল না।

মাননীয় সম্পাদক

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু,

বিগত ৩০ শ্রাবণ ১৪১১ (ইং, ১৫ অগস্ট ২০০৪) রবিবার, 'বার্তা গেল, হয়ে গেছে স্যার' শিরনামায় একটি সংবাদ আপনার *আনন্দবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বার্তাটি হল ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সংবাদটির একটি দ্বিতীয় শিরনামাও রয়েছে, যা হল 'আমাকে মাফ করে দেবেন, বললেন নাটা।' এই নাটা হচ্ছেন নাটা মল্লিক, যিনি ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দেন। লিভারে টান দেবার আগে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি মাফ চান কয়েদির কাছে। সংবাদপত্র থেকে আমি ওই অংশটি তুলে দিচ্ছি যাতে বিষয়টি আপনার মনে পড়ে :

> ...তিন সঙ্গীকে নিয়ে ধনঞ্জয়ের মুখ-ঢাকা কালো কাপড়ের উপর ম্যানিলা দড়ি পরাতে পরাতে নাটা বলতে থাকেন, 'আমায় মাফ করবেন। সরকারি নির্দেশে এই কাজ করতে হচ্ছে। কী সব কাজ যে করতে হয় আমাদের! হে মা কালী!'...

ঘটনাটি দিন পনেরো আগের, চিঠি লিখতে আমার কিঞ্চিৎ দেরি হল। এর সঙ্গে অবশ্য ধান রোয়ার কোনো যোগ নাই কারণ ৭ ভাদ্র রোয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তাই ভাত-মুড়ি মাঠে বয়ে নিয়ে যাবার কাজটিও শেষ। এখন আমার কাজ বলতে শণের দড়ি পাকানো। তবে এখন তো প্রায় সবই নাইলনের দড়ি। গরু-বাঁধা দড়ি থেকে কুয়োর জল-তোলা দড়া সবই দোকান থেকে কেনা। শুধু গরুর গলার টুকু শণের। নাইলনের দড়িতে লাগবে বলে গলানিটি এখনো হাতে তৈরি। আগে প্রতি সন্ধেয় জমি থেকে ফিরে হাটচালায় গিয়ে কাঁচা শণ ঝুলিয়ে দিতুম কাটা পাঁঠার মতো। সুতো টেনে কাঠের ঘেরাতে পাক দিতুম। তাতে দড়ি তৈরি হত। সেই দড়ির যদি মাপ নিতেন তবে এখান থেকে দিল্লি চলে যেত। কিন্তু যত দড়ি তত দড়া না। দশ-পনেরো-বিশ খি দড়ি জুড়ে তবে দড়া। সেই দড়াতে বেল থেকে বহু রকমের আঠা লাগানোর ব্যবস্থা। তাতে জিনিসটি পোক্ত হবে। তবে এখন আর এসবের তেমন কদর নাই। ট্রাক্টর চালু হওয়ার পর লোকের ঘরে হালের চাষ কমে আসে। ওই একজোড়া বলদ রাখতে হয় বলে রাখা। তারপর গাই-গরুও তেমন রাখার দরকার হচ্ছে না। আজকাল বউমাদের একটি-দুটি ছেলে, ফলে দুধের তেমন চাহিদা নাই। গরু কমে গেলে দড়ি কমে গেল, আবার গলানি ছাড়া বাকি দড়িটি নাইলনের। ফলে ছেলে-ছোকরাদের আর ঘেরা ঘুরোতে দেখবেন না। তার বদলে সন্ধেবেলা হাটচালায় তাস খেলছে। আমরা বুড়োগুলি যতদিন আছি ততদিন গরুর শণের গলানি কিংবা মানুষের ম্যানিলা দড়ি পাবেন। আমি কিংবা নাটাবাবু চলে গেলে দেখবেন হয় দড়ির কারবার উঠে গেল, নয় পুরোটাই নাইলন চলছে।

আমার চিঠি লিখতে দেরি হওয়ার কারণটি ভিন্ন। কিছুদিন ধরেই আমাদের এই জেলার মানুষজন বড়ো বেশি মারা পড়ছে। প্রথমে বেশ কিছুদিন খুনোখুনি হল বেলপাহাড়িতে। পরে আমলাশোলের শবরদের ঘরে মড়াকান্না শোনা গেল। তারপর কুলুডিহার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি হল কলকাতায়। পাহাড়, বন কি কলকাতার কথাই বলুন — লোকজনের শ্বাস বেরিয়ে

যাচ্ছে। মরণের হাত থেকে পালানোর রাস্তা নাই। বোড়া সাপটির মতো সুড়সুড় করে পেছনে হাঁটছে, কিছু বোঝার আগেই চেটে দিচ্ছে টুক করে। বলবেন মরণের ধাত আলাদা। হতে পারে কিন্তু জাতটি আলাদা কি? প্রশ্ন করেছিল বিশ্বনাথ কুইতি। গাঁয়ের রথের সময় পরপর তিন বছর এক ছটাকও চাল দেয়নি সে। 'অভিমন্যু বধ', 'সিরাজউদ্দৌলা' এমনকী 'একবুক কান্না' কোনোটিই তার মনে ধরেনি। মৃত্যু দিয়ে পালা শেষ হলে তার কাছ থেকে চাল-মুড়ি, আলু-পটল কিছুই মিলবে না। যাত্রার সময়, পুকুর থেকে যে সের পাঁচ-ছয় মাছ দিত তাও বন্ধ। তার কাছে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক আর সামাজিক মৃত্যুর ধাতটি আলাদা কিন্তু জাতটি এক। বলত, গোটা রাত যাত্রা করিয়ে ভোরবেলাতেও যে মিল ঘটাতে পারে না সে কেমন পালাকার? নব্বই বছর বেঁচেছিল বিশ্বনাথ খুড়ো। শেষে মিল না থাকলে সে, যাত্রার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আর আমি গরমিলে চুরাশি বছর পর্যন্ত পড়ে আছি। আমার প্রাণের বান্ধব প্রভাকর বেজ-ও চলে গেছে। তার কাছ থেকেই আমার এই খবর-কাগজ পড়ার নেশা। তার ইচ্ছেতেই চিঠি লেখালেখি। প্রেসিডেন্সি কলেজের আই.এ. প্রভাকর গাঁয়ের লাইব্রেরিয়ান ছিল। সে পড়ত ইংরেজি অমৃতবাজার পত্রিকা, চিঠিও লিখত। মাসে একটি করে চিঠি ছাপা হত। ওর চিঠিতে কলম ছোঁয়ানোর লোক ছিল না কলকাতায়। সেই প্রভাকর দেহ রাখল, কাগজটিও উঠে গেল। পড়ে আছি আমি। আমার বিদ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। বাংলা কাগজ পড়ি। কাগজ পড়তে গিয়েই যত বিপত্তি। কাগজ খুললেই খুনোখুনি রক্তারক্তির খবর। এতে অবশ্য আপনাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। শবদেহ দাহ করতে নিয়ে যাবার সময় লোকে হরিধ্বনি দেয়। হরির নামটি কাজের বলেই লোকে নামটি নেয়। কিন্তু 'হরিবোল' আর শবদেহ এ-দুটি এমনই ল্যাজা-মুড়োতে জুড়ে গেছে যে ধ্বনিটি শুনলেই লোকে মড়া দেখতে ঘাড় তোলে। আপনাদের খবরের কাগজের অবস্থাটিও এখন তেমনই। খুলতে গিয়ে তিনবার ভাবতে হয়, চিন্তা হয় কে কাকে মারল কে জানে!

যাই হোক, এ-বিষয়টি নিয়ে আজ বিশদ আলোচনার সুযোগ নাই। আজ একটি ভিন্ন বিষয়ে আপনার ওপর একটি গুরুদায়িত্ব চাপাব। অবশ্য এর আগেও আমি বাজপেয়ি মশাই, লালকৃষ্ণবাবু, কুমারী জয়ললিতা, শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধি, শ্রীমান সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ, লালুবাবু প্রমুখদের লেখা পত্রগুলি আপনার মাধ্যমেই পাঠিয়েছি। সংবাদপত্র হচ্ছে গণতন্ত্রের একটি থাম। সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকাদের মতামতগুলি নানাভাবে যথাযথ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি একটি গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছেন। আজকে যে-পত্রখানি আপনাকে পাঠাচ্ছি সেটি শ্রীযুক্ত নাটা মল্লিকের কাছে পাঠাতে হবে। তাঁর ঠিকানা আমার কাছে নাই, তবে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীর সঙ্গে একই মঞ্চে সভা, সংবাদপত্রে ফাঁস-সমেত ছবি, আসামির সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে বাক্যালাপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি আজ পশ্চিমবঙ্গে খুবই বিখ্যাত মানুষ। কাজেই আশা করি পত্রখানি তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। তবে দুপুরবেলাটি ছেড়ে যাওয়া ভালো। চুরাশি বছর বয়সে রাতের ঘুম কতখানি আছে বলতে পারি না। আমার নিজের তো নাই। শরতের মেঘের মতন ছেঁড়াছেঁড়া। বরং দুপুরে খানিক ভাতঘুম আসে। এক ঘণ্টা ঘুমোলেও ভালো। তখন ঘুমটি ভারী। রাতের ঘুমে হাজার চিন্তা — বনপুকুরের বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, নাকি

পুকুরে জাল ফেলল। খামারে আ-ঝাড়া ধান কিংবা উঠোনে চালের বস্তা থাকলে আর এক ভাবনা। তা ছাড়া কুকুরগুলির হাঁকডাক আছে। ইঁদুরেরও ছোটাছুটি লাফালাফি। নিঝুম দুপুরবেলা ওসব নাই। ভেজা চুলে মাথাটিও ঠাণ্ডা। চোখ বুঁজলেই অতলে। তখন দরজার শিকল নাড়লে কার ভালো লাগে? ওই যে ঘুমটি ভেঙে গেল জোড়ার উপায় নাই। নাটাবাবুরও আমার সমান বয়েস, কাজেই তাঁরও নিশ্চয় ঘুম নিয়ে টানাটানি আছে। আমার, চাল চুরির চিন্তা থাকলে, তাঁর নাতির চাকরির চিন্তা। তাই দুপুরটি ছেড়ে পাঠানো ভালো।

সপরিবারে সুস্থ থাকুন।

ভবদীয়

নঙ্গরচন্দ্র মেদ্যা

গ্রাম ও ডাকঘর : গেলিয়া
জেলা : বাঁকুড়া
পিন: ৭২২১৫৪
১৫ ভাদ্র ১৪১১ (ইং, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

প্রীতিভাজনেষু নাটাবাবু,

ক-দিন ধরে খবরের কাগজে আপনার ছবি ছাপা হচ্ছিল। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির ব্যাপারে আপনার নানা দাবিও পড়ছিলুম। পরে ফাঁসির মঞ্চে ধনঞ্জয়ের প্রতি আপনার কথাগুলিও পড়েছি। ফাঁসি দিয়ে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সে-খবরও জেনেছি। আশা করি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আপনাকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। বছর দেড়েক আগে নির্বাচন কমিশনার লিংডোবাবু অশীতিপরদের ওপর দৃষ্টি রাখার নির্দেশ জারি করেছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, বৃদ্ধরা মরে গেলে, মরা লোকের নামে মিথ্যে ভোট পড়ে যাবে। ভোটের কথা মাথায় থাকুক, নির্দেশটি শুনে ঘুমোতেও ভয় পেতুম। ভাবতুম এই বুঝি লোকে চোখ রাখছে ঘুমোচ্ছি নাকি মরে গেছি। নির্দেশের দেড় বছরের মধ্যে ভাগ্যের পরিহাসটি একবার দেখুন। যে-বয়সের মানুষজনকে চোখ রাখতে বলা, তাদের একটি চলে গেল এক অশীতিপরের ফাঁসে।

আপনার আর আমার বয়স একই — চুরাশি। আপনার ছেলেপুলে নাতি-নাতনি নিয়ে সংসার, আমারও তাই। তবে সব ক-টিকে চাষে রাখতে পারিনি। নাতিটি পড়াশোনা করে বাইরে। আকাশ দেখাদেখির কাজ। কাজটি মন্দ না। আমারও তো আকাশ দেখেই বড়ো হয়েছি। দিনরাতের হিসেব, আকাশের চাঁদ-তারা-সূর্যতে। আকাশের ওপরেই জল-হাওয়ার মতি। এখন খানিক ক্যানেল-শ্যালো চলছে কিন্তু সে ওই ঠেকা দিতে। আপনার নাতিটি সরকারি চাকরি পাচ্ছে শুনেছি। কাজটি ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলেই মঙ্গল। বেতন দু-পাঁচশো কম হলেও কিছু এসে যায় না যদি চাকরিটি কলকাতাতেই হয়। সে-ক্ষেত্রে আলাদা ঘরভাড়ার চিন্তা নাই, এক অন্নেও হয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে আলাদা সংসার পাতলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে। তা ছাড়া কাছে থাকলে রোজ দেখতে পাচ্ছেন। দূরে গেলে ওই ফোনটির বাজনা শুনে শান্তি পাওয়া। নাতি না হয় আকাশ দেখে মজে আছে কিন্তু আপনার শান্তি তো নাতির মুখ দেখে।

অন্য একটি বিষয়েও আপনার সঙ্গে আমার বেশ মিল। শণের দড়ি পাকানোতে আমার হাতটি মন্দ না। কত কুটুম-বাটুমের দড়ি-গলানি যে করে দিয়েছি তার শেষ নাই। শিক্ষাও দিয়েছি দু-চারজনকে। কিন্তু যেমনটি চেয়েছি তেমন সর্বদা পাইনি। দড়িটি হয়তো পেরেছে কিন্তু গলানিতে আটকে গেছে। ওটিই হচ্ছে সত্যিকারের কঠিন কাজ। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে গিরেটি ঢুকবে ফুস করে বুড়ো আঙুলের আয়েশি চাপে কিন্তু বেয়াড়া গরুর হ্যাঁচকা টানেও খুলবে না। আপনার কাজটির সঙ্গে অবশ্য তুলনা হয় না। আপনার মানুষ নিয়ে কারবার, আমার গরু। আপনার কাজটির সঙ্গে কোর্ট-কাছারি, থানা-পুলিশ, মন্ত্রী-ম্যাজিস্ট্রেট জুড়ে আছে। আমারটি আমি বুঝি আর বোঝে চার-পেয়ে প্রাণীটি। আপনার বেলায় মানুষটি হিসেবের বাইরে বেঁচে গেলে লোকনিন্দা, আমার বেলা মরে গেলে। গরু গলায় গলানি আটকে মরে গেলে তখন আর ছাড় নাই। গলানিটি গলায় ঝুলিয়ে পাঁচ গাঁ ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। সেই ভিক্ষের চাল আর পয়সায় গোয়ালে শ্রাদ্ধ করাতে হবে। নিজের গলায় ফাঁস পরানোর কোনো বাঁধা নিয়ম নাই, কিন্তু অন্যকে ঝোলানোর অনেক দায়দায়িত্ব।

আপনার সঙ্গে আমার পা ফেলতে মিল। আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে আমাকে নিয়েও সরকার আর খবরের কাগজ খুব মাতামাতি করেছিল। সেবার আশ্বিনের ধান ভালো হয়নি কিন্তু শীতের ফসল মাঠ ঝাঁপিয়ে এল। শরতের রোদ-বৃষ্টির, ফি-দিন আসা-যাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল মাটির খিদে জাগবে ভালোই। হলও তাই। জমি খুব সার খেল। তারপর বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলো, টমেটো, মটরশুঁটি, পালংশাক — যে-আনাজটির দিকে তাকাই দেখি রং যেন টিয়েপাখির ডানা। বেগুন গাছের পাতার সে কি বাড়!

দেখতে দেখতে গাছে ফুল এল। ফুল থেকে ফল। সে-ফল মাটি ছুঁই ছুঁই। গাঁয়ের কংগ্রেস নেতা সত্যসাধন দত্ত একটা থলেতে খান পাঁচেক বেগুন ভরে বাঁকুড়া শহরে গেল। সেখানে থাকেন কংগ্রেসের নেতা পূরবী মুখুজ্যে। কিন্তু পাঁচটি বেগুনের তিনটি ভাজা-পোড়া হল, দুটি চলে গেল কলকাতায়। সেখান থেকে আড়াই আড়াই পাঁচ সেরের দুটি বেগুন কৃষি প্রদর্শনীতে জায়গা পেল। এমন দেখন-শোভা বেগুন যে, প্রদর্শনীতে জায়গা পাবার মতো। কিন্তু বেগুন দুটি যে প্রথম পুরস্কার পাবে ভাবিনি। আমার নামডাক হল। সে-বছরের সেরা চাষি হয়ে গেলুম গোটা রাজ্যে। কৃষিমন্ত্রী এলেন, তাঁর সঙ্গে ছবি উঠল। বেগুন দুটিরও ছবি থাকল। কিন্তু ইতিমধ্যে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর গত হয়েছে। ছবিগুলি এখন ফ্যাকাশে। কোনটি মন্ত্রী, কোনটি আমি আর কোন দুটি বেগুন বোঝা দায়। তবে এখনো মনে আছে কলকাতায় বক্তৃতা দিয়েছিলুম, সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ হয়েছিল ট্রেনিং নিতে আমেরিকা যাওয়ার কিন্তু আমার বড়ো মেয়েটি তখন মায়ের পেটে। পত্নীর তখন ন-মাস চলছিল। তাই 'না' করে দিয়েছিলুম।

আপনার সঙ্গে মিলের অনেক কথা হল। এক গাঁয়ে জন্মালে আমরা বান্ধব হয়ে থাকতুম। সুখদুঃখের নানা কথা হত। যাই হোক, যে-কারণে আপনাকে পত্র লেখা তা হল, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধনঞ্জয়ের মুখ-ঢাকা কালো কাপড়ের ওপর ম্যানিলা দড়ি পরাতে পরাতে আপনার চারটি মূল্যবান বাক্য: 'আমায় মাফ করবেন। সরকারি নির্দেশে এই কাজ করতে হচ্ছে। কী সব কাজ যে করতে হয় আমাদের। হে মা কালী।' যার গলায় ফাঁস পড়াচ্ছেন সে একজন

আসামী আর যার কাছে ক্ষমা চাইছেন সে একজন মানুষ। একটির ভিতরে দু-খানি। একটির মধ্যেই আলো-অন্ধকার, পাপ-পুণ্য, শয়তান-ভগবান। রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করছে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। ঘর-সংসারের মানুষগুলিকে ভালোবাসে বলেই তার লাঠির কারবার। সেই রত্নাকর সাধু হয়ে গেল, কেউ তার পাপের ভাগ নেবে না শুনে। আসলে রত্নাকরের ভেতরেই সাধুটি ছিল, বেরিয়ে এল আর এক সাধুর কথায়। এখন কেউ বলতে পারে, সাধুর বদলে যদি রাজা আসত ওই পথ ধরে তা হলে কী হত? রাজা যদি রত্নাকরের ফাঁসির হুকুম দিত, তা হলে ঋষি বাল্মীকির দেখা মিলত না। কী হলে কী হত সে জটিল কূট তর্ক। মূল কথা হল, রত্নাকর সাধু হয়ে যাবার পর তার বুড়ো বাবা-মা, অগ্নিসাক্ষী রাখা বউ তার ছেলে-পুলেগুলির অন্নের কী ব্যবস্থা হল? দস্যুবৃত্তি করলে আত্মীয়-স্বজনগুলি খেতে পাচ্ছে, সাধু হলে তারা উপোসে আছে — এও এক বেয়াড়া অবস্থা। একদিকে খেতে না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, অন্যদিকে সাধুর প্রাণায়ামের পুণ্য। এই দুটিকে মেলানো যাচ্ছে না। যে-লোকটি ফাঁসিকাঠের কপিকলে তেল দিচ্ছে, সে-লোকটিই আসামির জন্যে পোস্ত বড়াগুলি যত্নে সেঁকছে — ভাবা যায়? ভাবা যাচ্ছে না কিন্তু কত কিছু সত্যিই ঘটছে। আপনি যার গলায় ফাঁসির দড়ি পড়াচ্ছেন, সে বলছে 'ভগবান আপনাদের সকলের ভালো করুন।' আবার ফাঁসির আগের দিন ধনঞ্জয় গানের পর গান শুনছে। এর ভেতর আবার একটি গান দু-বার — 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'।

এই গানটি গাঁয়ে আমদানি করেছিল আমার নাতি বেলুড়ের মিশনে পড়তে গিয়ে। শহর থেকে ফিরে বলল, 'বিয়েতে মাইক বাজবে না।' তা কি আর গাঁয়ের লোক শোনে? দুর্গা পালের চাষের জমি মোটে বারো বিঘে, তাই মাইক বাজানোর ব্যবসা। সে বলল, ছোটোকত্তার বিয়েতে সে মাইক বাজাবেই, নিজের খরচেই বাজাবে। তখন ঠিক হল চল্লিশ টাকার ভিতর কুড়ি টাকা হাতে পাবে দুর্গা আর কুড়ি টাকায় গানের কালো চাকতি এনে দেবে আমার নাতি। সেই চাকতিতেই এই গানটি ছিল। বাজল, ভালোই বাজল, লোকে শুনল। কিন্তু আর কোনো বিয়ে-পইতে বাড়িতে গানটি বাজাতে দেয়নি। দুর্গার সে কি দুঃখ! বাজারে-দোকানে সবখানে বলে বেড়ায় নঙ্গর মেদ্যার নাতি তাকে বসিয়ে দিয়েছে। মরার আগের দিন পর্যন্ত দুঃখ করে গেছে। বিনা পয়সায় এক বস্তা আলু দিয়েও মুখ বন্ধ করতে পারিনি। কুলুডিহার ধনঞ্জয় চাটুয্যে সে-গান ফাঁসির আগের রাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনেছে? নাটাবাবু, এটা কি সুস্থ মাথার কথা? যদি কুলুডিহার ধনঞ্জয়, পনেরো বছর আগে কলকাতায় গিয়ে সত্যিই এমনটি হয়ে থাকে বুঝব তখনই খেপে গেসল। বাকি সব পাগলের অপকর্ম। আর আগের কর্মটি বুঝে করলে বুঝব, ফাঁসির খবরে ওর মাথা বিগড়ে গেছে। নাটাবাবু, আমরা দুজনেই কম বাঁচা-মরা তো দেখিনি, গান গাইতে গাইতে, পদ্য বলতে বলতে, যাত্রার রোল করতে করতে, কোনো শালা মরে? জেলকে বলে শোধনাগার, এ-কেমন শোধন হল? দাগ তুলতে গিয়ে কাপড়টি পাথরে এমন আছাড় দিলেন যে পাছা বরাবর ফেটে গেল?

সরকারি নির্দেশে আপনি ফাঁসি দিচ্ছেন — এটি একটি অকপট সত্যি কথা বলেছেন। সরকার বললেই তবে ফাঁসি দেওয়া। না-বললে কি আপনি ফাঁসি দিতেন? সেই সময়ে বাজারে মৌরলা মাছ কিনতেন কিংবা নাতি-নাতনির সঙ্গে স্বাধীনতাদিবসের পতাকা বানাতেন। কিন্তু

সরকারের হুকুম হলে না বলার উপায় নাই। আর সরকারের অসুবিধে হচ্ছে, যে-কাজে লোকের দরকার সেখানে লোকের অভাব, আর যেখানে লোকের দরকার নাই সেখানে বেশি লোক। যতগুলি লোক ফাঁসির জন্যে চিৎকার-চেঁচামেচি করল, তাদের একটিকেও কাজের সময় মিলল না। কারো ঘরে কিংবা খড় পালুইয়ে আগুন লাগলে দেখবেন যতগুলি লোক জড়ো হয়েছে তার চার আনা লোকের হাতে কলসি-বালতি নাই। তারা হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে আগুন নেবায়। পাঁঠা খাওয়ার লোক প্রচুর পাবেন। কারো দাবনাটি ভালো লাগে, কারো মেটে, কারো আবার পাঁজরা। ছাগল আর রামদাখানি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলুন—পয়সা লাগবেনি, কেটে খাও, নাটাবাবু, শ-য়ে একটি লোকও পাবেন না। তাই চুরাশি বছর বয়সেও আপনাকেই সরকারি নির্দেশ পালন করতে হবে। এ-বয়সের একটা মানুষকে এ-কাজটি করানো উচিত কি না সেটি ভাবার ফুরসত মিলল না। অন্যের গলায় দড়ি ঝুলোনো যে নিজের গলায় ঝুলোনোর চেয়ে কঠিন, এই কথাটা কারো মনে হয়নি? শেষপর্যন্ত দুটি কালীভক্তকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে যে যার মতো চলে গেল নাটাবাবু? দুর্গা পাল যতই রাগ করুক গানটি কিন্তু মন্দ ছিল না। ভাবুন তো, বাড়ির উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে গান শুনছেন — 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু।' তবে একটি কথা আপনাকে গোপনে বলে রাখি — সরকারের সব কথা কানে তুলতে নাই। একবার বেতারে ভারী বৃষ্টির কথা হলে দিবাকর চাটুয্যে দু-বিঘে জমির বীজধান তুলে রেখেছিল। ভারী দূরের কথা, এক ছটাকও বৃষ্টি হয়নি সাতদিন। একবার সরকারি বুদ্ধিতে পনেরো সের দুধের গরু কিনে খুব ঠকেছিলুম। সে যা খেত, তার দাম দুধের দামের থেকে দু-টাকা চাপা।

যাই হোক, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মা কালীকে যে স্মরণ করেছেন সেটি ভালো করেছেন। আপদে-বিপদে সর্বদা মা পাশে থাকেন। নন্দ চক্রবর্তীর বউয়ের হার্টের অসুখ ধরা পড়ল। কাটা-ছেঁড়া করতে গেলে লাখ টাকা খরচ। নন্দের রোজগার বলতে ঠাকুরের নিত্যসেবা। লাখ দূরের কথা, হাজারেই হাঁপিয়ে যায়। মায়ের আশীর্বাদটি পাচ্ছে বলেই বউটি টিকে আছে। মায়ের চরণের একটি লাল জবা নিত্যদিন একবার করে বুকে ঠেকায়। অমন বল আর কিছুতে নাই।

আজ এই থাক। একবার যখন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হল, পরে আবার পত্রালাপ হবে। আমার বান্ধব প্রভাকর বেজ গত হওয়ার পর বড়ো একা হয়ে গেছি। মনের কথা বলার সঙ্গী নাই। প্রভাকরের সঙ্গেই 'তুই' বলার শেষ লোকটি চলে গেছে। এ-বড়ো দুঃখ।

সপরিবারে সুস্থ থাকুন।

ভবদীয়
নঙ্গরচন্দ্র মেদ্যা

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. গলানি : গরুর গলাবন্ধনী
২. খি : সুতোর গুলি থেকে প্রয়োজনমতো সুতো কেটে নিলে, যে অবশিষ্ট অংশটুকু পরিত্যক্ত হয়ে গুলিতে রয়ে যায়।
৩. পালুই : মরাই। খড়ের গাদা।

শুধু মালতীর জন্য

অলোককুমার বসু

এই দিনটা শুধুই মালতীর জন্য, খুব ভোরে আউটরাম ঘাটের পরিচিত নিমগাছটার নীচে গিয়ে বসবে ওরা। সুবিমল আর মালতী। খুব শান্তভাবে বয়ে যাবে গঙ্গা। তখনো রোদ নেই। খুব নরম একটা আলো, আধো ঘুমে তন্দ্রার মতো ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। নিমগাছটায় ফল হওয়ার সময় শেষ। তবুও নিমফল পড়ে আছে কয়েকটা এদিক-ওদিক। এখনো জনমানব নেই এখানে। সুবিমল হয়তো ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নেবে। মালতীর আঙুল আর তার হাতের ছোঁয়া খুব নরম। কেমন একটা লাল লাল আভা। ঠিক লাল নয়, গোলাপি বোধহয়। রংটা যেন বাইরে নেই, ভিতরে লুকিয়ে আছে অথচ লুকিয়ে নেই। এই শিশিরস্নাত পাপড়ির মতো ভিজে ভিজে অথচ উষ্ণ আঙুলগুলোর ছোঁয়ায় অনেক ভালোবাসা আছে। সুবিমলের জন্য ভালোবাসা। মালতীর গানের গলা খুব সুন্দর। সে কিন্তু কোনো স্কুলে এটা শেখেনি, শুনে শুনে শিখেছে। সুবিমল চাইলে এইখানে বসে মালতী একটা গান করবে, রবীন্দ্রসংগীত। আসলে এটা সুবিমলের গান, ও গাইতে পারে না তাই মালতীকে বলে। প্রথম শোনার পর থেকে এই গানটা শুধুই মালতীর গলায় শুনতে চায় সুবিমল। ওর কাছে যখনই চায় তখনই শুনতে পায়। এই এখন যেমন শুনতে পাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে গাইছে মালতী। ঝাউয়ের বনে ঝিরঝির হাওয়ার মতো। যেন নৈঃশব্দ্যের শব্দ। মালতীর ঠোঁট কাঁপছে, শব্দরাও এসে যেন থেমে থাকতে চায় ওখানে। ছাড়তে চায় না এমন মায়াময় আশ্রয়।

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম/...মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন/তুমি ভরিবে গৌরবে, নিশীথিনী-সম॥' রবীন্দ্রনাথ সবার কথা বলে গেছেন, ওদের কথাও। সব বাঙালির জন্য ভাষা, শব্দ আর গান দিয়ে গেছেন তিনি।

ওরা এখানে যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিন ছিল সরস্বতীপুজো। ফেব্রুয়ারি মাসের ভোর। মালতী তখন কলেজে প্রথম বছরের ছাত্রী। পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাবে বলে ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ওর বাড়ির লোকজন খুব পুরোনো ধরনের। কী ভয়ে ভয়ে আসত মালতী। আঁচলের আড়ালে যেন কোনো শ্বেত-পারাবত থর থর করে কাঁপত ওর বুকে। বড়ো বড়ো চোখে কেবলই আশঙ্কা। যদি কেউ দেখে ফেলে? মুখটা ওর কাছে নিয়ে গিয়ে, ওর চোখের মধ্যে তাকিয়ে নিজেকে খুঁজত সুবিমল। কাছে গিয়ে বলত — 'দেখি, ওখানে আমি আছি কিনা?' মালতী বলত — 'ধেত, সবাই দেখছে না?' সুবিমল বলত — 'দেখছে তো কি হয়েছে?' মালতী বলত — 'ওরকম করলে আমি আর আসব না।' 'না, না, তবে দরকার নেই। আচ্ছা বেশ, এই আমি সভ্য হয়ে রইলাম' — বলে পিছিয়ে আসত সুবিমল। পিছিয়ে আসত, আর তাকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখত মালতী। কি দেখত কে জানে! ভালোবাসার জন, এমন কাছে এলে, মানুষের বুকের মধ্যে যে কেমন করে তা খুব বুঝেছে সুবিমল। মালতী একেবারে রানি ভিক্টোরিয়ার যুগের মেয়ে। 'মু'খানি তুলিয়ে চাও সখী, একটি চুমন দাও' — রবি ঠাকুর এটা কবে কাকে আসলে প্রথম বলেছিলেন কে জানে, কিন্তু সুবিমলকে এই কথাটা বলার জন্য পাক্কা একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেই যে, যেবার সুবিমলের বন্ধু

তাপসের বোনের বিয়েতে মালতীও এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে। তাপসদের বেহালায় অনেক বড়ো পুরোনো দিনের বাড়ি। বনেদি জমিদারবাড়ি। বাড়ির সঙ্গে মস্ত বড়ো বাগান। বাগানের সামনের দিকে অনেক আলো ছিল। সেইখানে গেট আর অতিথিদের আসবার পথ। সামনে বড়ো লন। পিছনের দিকটায় অনেক গাছপালা, সেখানে অত আলো ছিল না। ওরা ওই দিকটায় চলে গিয়েছিল অর্ধেক দ্বিধা আর অর্ধেক কৌতূহলে। তখন সবে বর্ষা শেষ। কামিনী আর হানুহানার ঝোপে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির আলো আর ঝিঁঝি পোকার শব্দ। প্রাগৈতিহাসিক যেন। আলো অন্ধকারে ওর মুখটা হাতের মধ্যে ধরেছিল সুবিমল। মালতী চোখ বুজেছিল আর খুব শিউরে উঠেছিল। সরে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। তারপর বিয়েবাড়িতে সারাক্ষণ তার গাল ক্ষণে ক্ষণে লাল। যতবার সুবিমলের সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে ততবারই লাল। তাকে যখনই বন্ধুরা কেউ বলছে, 'মালতী, তোকে আজ আরো সুন্দর লাগছে রে', তখনো লাল। পরে সে সুবিমলকে বলেছিল এরকমটা না করাই ভালো, কারণ আসলে এটা খুব লজ্জার ব্যাপার এবং তার শরীরে কী যেন একটা হয়। তারপরে জিজ্ঞাসা করেছিল সুবিমলকে — 'এমন কেন হয়?'

সুবিমলই কী জানত কেন এমন হয়?

আর একবার, যখন মালতীর বি.এ. পাশের খবর বেরোলো, তার পরের দিন সকালে ওরা গিয়েছিল ডায়মন্ডহারবার। বাসের সিটে দু-জনে পাশাপাশি। মালতী পাশে থাকলে সব কিছুই কেমন অন্যরকম লাগে সুবিমলের। তখন রাজপথের সব শব্দ, এমনকী ঘর্ঘর ট্রামের আওয়াজও যেন বিঠোফেন, মোৎসার্ট আর রবিশঙ্করের বাজনা বলে মনে হয়।

তখন বর্ষা হয়ে গেছে। বেহালার পর থেকেই রাস্তার দু-দিকে খুব সবুজ। চোখ জুড়িয়ে যায়। রাস্তার দু-দিকে অনেক কড়ুই গাছ। মস্ত বড়ো ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে অশ্বত্থ আর বটের পাতার ফাঁকে আলো-ছায়ার ঝিলমিল। গৃহস্থের উঠান, আর কলা বাগান। অনেকরকম সবুজ। ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে ওরা একটা নৌকা ভাড়া করেছিল। নৌকার ছইয়ের নীচে তবু একটু নিরিবিলিভাব আছে। মাঝিরা এমন যুগল প্রণয়ী দেখে অভ্যস্ত। তারা বেশি কৌতূহলী নয়। ভাড়া পেলেই সন্তুষ্ট। সুবিমলের বুকের মধ্যে তার আঙুল দিয়ে ছোটো একটি যোগচিহ্ন এঁকে মালতী বলেছিল, 'এই জায়গাটা শুধুই আমার, আর কারো নয়।' সুবিমল বলল, 'আর কার হবে। আর কারো হবে না কখনো। ''এ জন্মের মতো আর, হয়ে গেছে যা হবার''।' মালতী বলেছিল 'ঠিক বলছ তো?' সুবিমল বলেছিল 'হ্যাঁ'।

ডায়মন্ডহারবারে নদী এসে সাগরে মিলেছে। মিলন মানুষকে বিশাল করে, নদীকেও। তখন এপার-ওপার কিছু দেখা যায় না। মানুষের চোখ শুধু দিগন্ত অবধি দেখতে পায়। ওরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল ওপারে ঝাপসা হয়ে আসা তটরেখা। মাঝেমধ্যে গাঙচিলের উড়ে যাওয়া। এইসব নদী আর সাগরের পাখিরা বোধহয় বাসা বাঁধে না। এমনই নদীর ধারে বসে দেখে ভাঙা আর গড়া। আর ভাসতে থাকে ঢেউয়ের ওপর। তারপরে হারিয়ে যায়। তবে আসলে বোধহয় হারায় না। এই পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে মিশে থাকে শুধু। হয়তো মিশে থাকে নতুন জীবনে কিংবা মাটিতে কিংবা হয়তো কেবল হাওয়াতেই। ডায়মন্ডহারবার থেকে ওপারে কুঁকড়াহাটা অবধি স্টিমার যায়। ওদের নৌকার পাশ দিয়ে একটা স্টিমার গেলে ঢেউ

উঠল খুব। নৌকাটা দুলতে থাকে দোলনার মতো। মালতী সুবিমলের হাত ধরে। সুবিমল বলে, 'ধরে থেকো শক্ত করে, ছেড়ো না কখনো।' মালতী হাসে আর ঘাড় নাড়ে। না, সে কখনো হাত ছাড়বে না।

মালতী কথা রেখেছে। কখনো ছাড়েনি সুবিমলের হাত।

সে আজও হালকা আকাশি রঙের একটা শাড়ি পরে আছে। সুবিমল ওকে প্রথমবার কলেজের লাইব্রেরিতে যেমন দেখেছিল তেমনই। কপালে একটা চন্দনের টিপ। আছে কি নেই বোঝা যায় না! বেচারা চন্দন, একে তো চারপাশের আলোর মাঝখানে ম্লান, তার নীচেই দু-দিকে দুই ছলছল বিস্ময়। শান্ত, গভীর, হৃদয়ের আয়না, দু-পাশে ভুরুর মায়াবী রেখা। মাঝে চন্দনের পূর্ণচন্দ্র ঘন কুয়াশাবৃত। তাকে আর কে দেখবে!

মালতী যেখানে থাকে, সেখানে দিনে হোক রাতে হোক, চাঁদের আলো থাকে। এখনো আছে সুবিমলের পাশে, এই নিমগাছের নীচে।

সামনের ঘাটে দুটো নৌকা বাঁধা আছে। মাঝি নেই, ঢেউ-এর দোলায় দুলছে। অনেক দূরেও কেউ নেই। সুবিমলের কাঁধে আস্তে মাথাটা রাখবে মালতী। খোলা চুল, কেমন একটা মৃদুগন্ধ, যেন অনেক দূর থেকে আসছে। চুল তো নয়, মেঘ। সুবিমল একটু একটু ওর মাথাটা ছোঁবে, কিন্তু ঘাড়ের ঠিক মাঝখানে যেখানে দু-দিকের চাঁপা-রঙ এসে মিলেছে একটু গভীর আশ্রয়ে কিংবা কানের লতিতে, যেখানে দুটো সোনার দুল চারিদিকের শোভার মাঝখানে খুব কুণ্ঠিত হয়েই ঝিলমিল করছে, সেখানে ছোঁয়া লাগানো চলবে না। সেখানে হাত লাগলেই, আস্তে করে সুবিমলের কাঁধ থেকে মাথাটা সরিয়ে নেয় মালতী আর সুবিমলের দুই চোখে তাকায়, তখন সুবিমলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে। একবার নির্জনে যখন ওরা শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের ঝিলের মতো পুকুরটার ধারে গিয়ে বসেছিল তখন এমন হয়েছিল। ওখানে অনেক পদ্মফুল ফুটে থাকে। পদ্মপাতায় জল টলটল করে। লোকে বলে মুক্তোর মতো। কথাটা ঠিক নয়, মুক্তোর একটা ছোটো হার তো সবসময় মালতীর গলায় থাকে। মালতী যখন ওটাতে আলতো করে আঙুল রেখে নাড়াচাড়া করে তখন বুঝতে হবে সে দ্বিধায় পড়েছে। বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুবিমলকে না বলতে পারছে না। যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু যেতে হবে। পদ্মপাতায় জল মুক্তোর মতো হয় না, হীরের মতো হয় বলা যায়, হয়তো আরো বেশি মহামূল্য, জীবনের মতো। দু-হাত দিয়ে পাতাটা ধরেও স্থির রাখা যায় না। খুব ঝিলিক দেয় এদিক-ওদিক, আর কাঁপতে থাকে থর থর করে। ঘাটের কাছে একটা ছোটো পাতা নিয়ে কখনো কখনো খেলা করত মালতী। দুটো জলবিন্দু; মালতী বলত, একটা সুবিমলের মন আর একটা মালতীর। আলাদা আলাদা, থর থর করে কাঁপছে। তারপরে আস্তে আস্তে দুই করতলে পাতাটার দুই পাশ সামান্য তুলে ধরত মালতী, দুটো বিন্দু এক হয়ে মিলে যেত। মালতী হাসত তখন, হ্যাঁ, তখন বরং এক সারি মুক্তো দেখা যেত বলা যায়। ঝিলিক দেওয়া, কিংবা কবি জয়দেবের লেখা শব্দের মতো — 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী'। কিন্তু সুবিমলকে কখনো 'দেহি পদপল্লবমুদারম' বলতে হয়নি। মাধবীলতা যেমন জড়িয়ে থাকে নবীন ছায়াতরুকে, তেমনই সুবিমলকে জড়িয়ে আছে মালতী। ওরা কখনো আলাদা হয়নি। এমনিতেই পূর্ণ, পূর্ণ প্রতিদিন।

অসীমের সঙ্গে প্রতিদিন অসীম যোগ করা। দিন যায়, বছর যায়, যাক না। সময়ের সীমারেখাকে খুব কৌতুকের সঙ্গে দেখে সুবিমল। ভাঁটার টানে সমুদ্রের সরে যাওয়া সীমারেখার মতো। যেমন দিঘার সমুদ্রের বেলাভূমিতে দেখা যায়। জল সরে যায় ধীরে ধীরে, আর তার সঙ্গে অনেক দূরে চলে যায় সুবিমল। দূরে সরে যাওয়া সমুদ্র, পিছনে মাটি আর বালির বুকে স্থির রেখে যায় ছোটো ছোটো ঢেউ। নানা রঙের ঝিনুক। মানুষ আর মানুষীর স্মৃতির মতন।

বেলা বাড়লে অনেক মানুষ এসে পড়বে আউটরাম ঘাটে। তখন সুবিমল আর মালতীর এখানে থাকতে ভালো লাগবে না। তখন ওরা চলে যাবে গঙ্গার ওপারে বোটানিকাল গার্ডেনে। অনেক লম্বা লম্বা রাস্তা আর দু-দিকে কবেকার সব গাছ। অনেক দিনের সাক্ষী। অনেক বছরের। হাত-পা বাড়ানো চারদিকে। গাছের মূল থাকে মাটিতে কিন্তু সে আকাশকে ছুঁতে চায়। আর সূর্যকে ভালোবাসে। আলোকে ভালোবাসে। সে কোথাও যেতে পারে না, তাই অনেক দূর থেকে আসা হাওয়ার সঙ্গে খেলা করে। বহুদূরের সমুদ্রের হাওয়া। নদীর বুকের জলকণার স্পর্শ লেগে আছে তাতে। আর সব প্রাচীন ও নবীন অরণ্যের স্মৃতি, হাওয়ার কোনো বয়স নেই। এ-মাঠ থেকে ও-মাঠ, কবে থেকেই ঘুরছে। হয়তো প্রাচীন শ্রাবস্তী থেকে বুদ্ধের নিঃশ্বাস এখন এল এইখানে, কোন বহুদূর পথ ঘুরে কে জানে! কিংবা হয়তো নীলনদের বুক থেকে ক্লিওপেট্রার উষ্ণ স্পর্শ নিয়ে এল কোনো দমকা হাওয়া অথবা আরবসাগর পার হয়ে লায়লার জন্য মজনুর তপ্ত নিঃশ্বাস, হাঁটতে হাঁটতে এমন সব কথা বলত মালতী। বলত — 'এই যে এখন একটা ঝোড়ো হাওয়া এসে লাগল আমার আঁচলে, এটা পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং জুলিয়াস সীজার। তখন তাঁর মস্ত বড়ো নৌকা ভাসছে ভূমধ্যসাগরে। তার মুখ মিশরের দিকে ফেরানো।' সুবিমল হেসে বলত — 'তিনি এটা ভুল ঠিকানায় পাঠিয়েছেন। এখানে তার প্রাপক কেউ নেই, তুমি ওটা ফেরত পাঠিয়ে দাও রোমের দিকে।'

এখন আর মালতী এসব বলে না, শুধু শোনে। সুবিমল বলে। আজকের এই দিনটাতে, এই শ্রাবণ আর ভাদ্রের বর্ষণের শেষে যখন শরৎ এসে মাঝে মাঝে উঁকি দেয়, তখন নীল আকাশে হালকা শাদা মেঘে ভাসে সপ্তডিঙা মধুকর। শ্রাবণের ঘন নীল ময়ূরপঙ্খী নয়, বরং ফ্লেমিংগো সারসের ডানার মতো শ্বেতশুভ্র।

আর বর্ষণস্নাত সবুজের মাঝে কখনো কখনো হঠাৎ একমুঠো বৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে। তখন পাতায় পাতায় ঝলমল করে সূর্যকণা।

এই দিনটা শুধু মালতীর। সুবিমল এইদিন তাদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গাগুলোতে যাবে মালতীকে নিয়ে। একটু বেলা হলে আর সূর্য মাথার উপরে উঠলে ওরা বেরিয়ে আসবে, বোটানিকাল গার্ডেনের বাইরে। ওখানে কাফেটারিয়াতে এক কাপ চা খেয়ে তারপরে এসপ্ল্যানেডের মিনি ধরে ফিরে আসবে অনেক মানুষের ভিড়ে। এখানে ও সুবিমলের হাত ধরবে না, জানে সুবিমল, একটু পেছনে থাকবে, কখনো একটু সামনে। গ্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডের সামনে দেখবে দোকানগুলোর প্রদর্শনী। হাতির দাঁতের সুন্দর একটা নৌকা দেখিয়ে বলবে — 'কী সুন্দর তাই না'। না, ওরা কিছু কিনবে না। সব কিছু সুন্দর জিনিস কি কিনতে হয় না ছুঁতে হয়? চাঁদনি রাত কি কেউ কেনে, কিংবা কেউ কি কোনোদিন কিনতে চেয়েছে, অথবা সুধীন দত্তের সেই সব বিখ্যাত লাইন :

... একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা,
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে ॥...

এসব লাইন কি কখনো কেনা যায়? শুধু জানলেই হয়। মনের মধ্যে লেখা থাকে। যেমন থাকে অন্য সব স্মৃতি। এমনই তো সব কিছু। মনের মধ্যে, গভীরে, ছায়া ছায়া,. সব ধরা যায় না। যদিও এখন নেই তবু চিরতরে আছে। যেমন আছে আজকের এই দিন, এই বারোই সেপ্টেম্বর। এই দিন প্রতি বছর সানাই না বেজেও বাজে। আর এমনই সব চেনা জায়গায়, অনেক স্মৃতি-জড়ানো জায়গায়, মালতীর সঙ্গে চলে যায় সুবিমল। এসপ্ল্যানেড থেকে মিউজিয়ামের অনেক দিনের প্রাচীন বাড়িটায়। বিম্বিসার অশোকের ধূসর যুগে। প্রথমে ঢুকেই ডান হাতের ঘরটায় সুদূর মৌর্যযুগের ভাস্কর্যের সব প্যানেল।

কবেকার কালো পাথর। হাত দেওয়া বারণ, তবু এক-একটা ছুঁয়ে দেখত আর শিউরে উঠত মালতী। হঠাৎ করে হাতটা সরিয়ে নিত সে, আর বড়ো বড়ো চোখ মেলে বলত — 'বাইশশো বছর, না সুবিমল? ভেবে দ্যাখো, বাইশশো বছর আগে একজন শিল্পী ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে পাথর কাটছে আর বানাচ্ছে এই প্যানেল।'

বাইশ শত বছর আগেকার সেই সব দিন তাদের ভাস্করকে ভুলে গেছে। কিন্তু আজকের এই দিনটা, এই বারোই সেপ্টেম্বর, মালতী আর সুবিমলকে ভুলে যায়নি।

ওরা যখন খবরটা দিল, তখন সূর্য ডুবে গেছে তবু তার আলো রয়েছে আকাশে। সুবিমল ছাদে ছিল বন্ধুদের সঙ্গে। একটু পরে ওদের বেরোনোর কথা। লগ্ন সন্ধ্যা আটটার পর, আজ বিয়ে, একদিন পরেই ফুলশয্যা। ওদের বাড়িতে উৎসবের খাওয়া দাওয়ার জন্য ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। দূরে পশ্চিমের আকাশে সিঁদুর ছড়ানো। ঘন অন্ধকার ছবি নারকেল গাছের। আকাশের গায়ে অনেক লাল, আর সবুজ পাতারা কালো হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, তখনো বরের গাড়ি সাজানো শেষ হয়নি। অনেক অনেক ফুল এসেছে। ...খবরটা আসার পর আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল সবাই খুব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ও-বাড়িতে গেল শুধু সুবিমল আর তার দুই বন্ধু। খুব গভীর ঘুমে ঘুমোচ্ছিল মালতী। ছেঁড়া তারটা বাইরের লাইন থেকে জানলা গলে ঢুকেছিল মালতীরই বেডরুম দিয়ে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। কোনো বিউটি পার্লার থেকে ওকে সাজিয়ে এনেছিল। তার ঘরে একটু একলা থাকতে চেয়েছিল মালতী। জানলার গ্রিলটা কেন ধরতে গেল ও? বোধহয় পরদার ফাঁক দিয়ে সেই রাস্তাটা দেখতে চেয়েছিল, যেখান দিয়ে সুবিমল আসবে। ছেঁড়া তারটা সরাসরি ধরেছিল সে, দুশো কুড়ি ভোল্ট। লাইনে আর্থিং করা ছিল না, ভালো ফিউজও ছিল না। মালতীর হার্টও নাকি দুর্বল ছিল, সব বাজে কথা। ডাক্তার কিছু জানে না। মালতীর হৃদয়ের কথা ডাক্তার কী জানে, এই

সবই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। আজকের তারিখটার জন্য। সুবিমল ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিল, মালতী লাল বেনারসি, চন্দনের ফোঁটাও ছিল ওদের কপালে। ...তারপরে মালতীর শরীরটা ওরা নিয়ে গেল। কিন্তু মালতী কোথাও যায়নি। ও সুবিমলের সঙ্গেই চলে এসেছে। এখনো তেমনই সুন্দর আছে ও, আজ বাইশ বছর পরেও। সুবিমলের বেডরুমে ওর ছবিটায় আজ মালা পরানো হয়েছে। প্রতি বছরই দেয় সুবিমল। আজ বাইশ বছর ধরে প্রত্যেক বছর, প্রতিদিন, যখনই অফিস থেকে ফিরে নিজের বেডরুমে আসে সুবিমল, মালতী তার পাশে পাশে থাকে, সর্বদাই, আর কেউ জানে না, শুধু সুবিমল জানে। সেই সব দিনকে প্রতিদিন অসীম, অসীম করে ফিরিয়ে দেয় মালতী, আসলে সে ওই ছবিটায় থাকে না, থাকে সুবিমলের বুকের পাশে অনেক ভিতরে। নিজের বুকে হাত দিলে সুবিমল শুনতে পায় এক অস্ফুট কণ্ঠস্বর — 'আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি।'

কায়া

কিন্নর রায়

পুট, পুট, পুট — যা-যা, ছয়। যাঃ, হল না। এবারও হল না — বলেই লাড্ডু চাঁদ-ডোবা রাতে গড়িয়ে যাওয়া লুডোর ছক্কার দিকে তাকিয়ে রইল। রাত বেড়ে গেলে ফটফটে জ্যোৎস্নায় ঢেলে দেওয়া ছক্কার পাশাপাশি তার চৌকো ছায়াও ছুটতে থাকে। সেই ছুটন্ত ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে আষাঢ় মাসের মেঘহীন ঘাটশিলার আকাশ, অনেকটা দূরে সুবর্ণরেখা নদী, হিন্দুস্থান কপার-এর আলো—সব কেমন ছায়া ছায়া, ভৌতিক। আর দাহিগোড়ায়, অপুর পথের পাশে এই যে বড়োসড়ো ময়দান, যেখানে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর তাঁবু পড়েছে, তার গায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে চাঁদের আলো। এই যে পড়ে ছরকুটে, ছড়িয়ে একদম যাকে বলে ছত্রখান হয়ে যাওয়া জ্যোৎস্না, তার মধ্যে এসে দাঁড়ালে বড়ো স্পষ্ট আর কালো হয়ে নজরে পড়ে নিজের ছায়াটি। সেই গভীর, কালো, স্পষ্ট ছায়াছাপের দিকে হঠাৎ তাকালে বুকের মধ্যে এক টাকা দামের 'পেপসি' আইসক্রিম কেউ যেন গড়িয়ে দেয়। আর সেই গড়াতে গড়াতে নামা ঠাণ্ডা মনে করিয়ে দিতে পারে, এই যে আশ্চর্য ছায়া, তার দু-ধারে দুটি ডানা যে কোনো সময়ে উঠবে জেগে।

এই ভূত ভূত জ্যোৎস্নার ভেতর লুডো পেতে খেলে চারজন। তাদের বেঁটে বেঁটে ছায়ারা তাদের পাশেই ঘুমিয়ে থাকে। একদম চুপচাপ। স্থির।

ছয়, ছয়, ছয়—পোয়া। পড় পড়, পুট পড়। এবার পুট পড়বে—বলতে বলতে নিজের বাঁ হাতে ঢাকনা ছাড়া, নস্যি-ডিবে চেহারার ছক্কা নাড়ার কৌটো নাড়তে নাড়তে টুপির মনে হল এবার পুট না পড়লে ঘুঁটি বেরোবে না। খুবই ছোট্টখাট্ট চেহারা। হাত-পা আরো বেঁটে বেঁটে। দু-হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল খুবই খুদে খুদে। তার মধ্যে বুড়ো আঙুল দুটি বেশ খুদি, তার মাথাটা থ্যাবড়া।

টুপি প্রাণপণে বাঁ হাত দিয়ে লুডোর ছক্কা ফেলার কৌটো নাচায়। — দেখিস, বোর্ডের বাইরে যেন না পড়ে, এটুকু মুখে বলে সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে গুন্ডি দিতে থাকে লাড্ডু। গুন্ডি দিলে নির্ঘাত পুট পড়বে না। এ-এক আশ্চর্য তুক। মনে মনে আউড়ে যায় লাড্ডু —

গুন্ডির মা গুন্ডি
তালতলায় পিন্ডি...

এইভাবে একবার নয়, পর পর তিনবার। নিজের মনে মনে বলে যাওয়া। অবশ্য নিয়ম মতো ভালো করে গুন্ডি দিতে গেলে ডান হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে, গোল করে ঘোরাতে হয় তার দিকে, যাকে গুন্ডি দেওয়া হচ্ছে। তা আর এখানে হল কই! গুন্ডির মা গুন্ডি/তালতলায় পিন্ডি... মনে মনে আবারও বলল লাড্ডু।

কে জানে কেন, এবারও পুট পড়ল না টুপির। পরের দান কাতু-র। খুব জোরে হাতের ডিবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ফেলল কাতু। এবারও হল না। পাঁচ, পাঁচ পড়েছে। যাঃ! নিজের ভেতরে এটুকু বলে কাতু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—থুক্কি। থুড়ি, আব্‌বুলিশ।

কেন থুক্কি কেন! একটু যেন তেরিয়া গলাতেই বলল টুপি।

থুক্কি নয়তো কি! বোডের বাইরে গড়িয়ে, বেরিয়ে গেছে ছক্কা। তাই দান লস। আবার চান্স দিতে হবে।

না, না—তা হবে না। আবার দান! মামদোবাজি নাকি!

কেন হবে না। ছক্কা বাইরে বেরিয়ে গেলে আবার চান্স পাওয়া যাবে।

ও-ও-ও — মামাবাড়ির আবদার! চলবে না। নতুন করে দান হবে না। লাড্ডু তুই চাল। তারপর কুতু।

একটু পুরোনো হয়ে যাওয়া লুডোর ছক মাটিতে চিৎপাত শুয়ে। রাত এখন কত কে জানে! শুধু আকাশে দিব্যি থানা গেড়ে বসে থাকা চাঁদ ফিকফিক করে মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে ওদের কথা শুনে। তার আলো কখনো পড়ছে হাঁ করা সব ভীষণ ভীষণ সাপের মুখে। তাদের হিলহিলে ল্যাজে। আবার সেই একই চন্দ্রবাহার মইয়ের আগা-মাথা, গোড়ায়, গায়ে একই ভাবে লেপটে যাচ্ছে।

চার বামনের সে-সব দিকে তেমন কোনো খেয়াল নেই। তারা নিজেদের ভেতর সাপলুডো খেলায় কার পুট পড়ল কি পড়ল না—তা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত।

তা হলে আমি কী করব! হাল ছাড়া গলায় জানতে চাইল কাতু।

কী আবার করবি! তোর দান শেষ। এবার লাড্ডুকে দে।

এটা কিন্তু চোট্টামি হল। তোরা খুব চোট্টামি করিস। বেশ আস্তে আস্তে বলল কাতু। তার কথার খানিকটা খানিকটা ভাঙা গুঁড়ো পৌঁছে গেল টুপির কানে। লাড্ডুরও। কুতু অবশ্য শুনতে পেয়েও কিছু বলল না। যমজ ভাইকে কী আর বলা যায়!

কি বললি হারামি! চোট্টা আমি। চোট্টা আমরা! চোট্টা তোর বাবা। চোট্টা তোর মা, তোর দাদু।

কি, বাপ তুললি আমার! মা তুললি! তোর দাদু চোট্টা। সাত গুষ্টি চোট্টা।

না, বাপ তুলবে না! উনি চোট্টামি করবেন আর ওনাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করবে। বেশ করেছি বাপ তুলেছি। তুই চোট্টা, তোর বাপ চোট্টা, মা চোট্টা, তোর সাত গুষ্টি, চোদ্দো গুষ্টি চোট্টা। তেঁতুলে গুষ্টি চোট্টা।

টুপি, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না।

কি ভালো হচ্ছে না? কি করবি তুই?

এভাবে বাপ তুলে গালাগালি দেওয়া ঠিক নয়।

এর মধ্যে আবার ঠিক-বেঠিকের কি হল? তুই কি ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করছিলি? তুই গাল দিসনি!

তখন হাসতে হাসতে টুপি হঠাৎ বলে উঠল—

বাপ তুললি বেশ করলি
আমার নাম জগা
সাত কলসি মুতে দেব
খাবে তোর বাবা!

এটা তুই কাকে বললি টুপি?

ধরে নে যাকে হোক।

ধরে নে যাকে হোক মানে, তোকে বলতে হবে তুই কাকে বললি এটা।

হ্যাঁ বলতেই হবে তোকে। কাকে বললি এ-কথা? লাড্ডুর সঙ্গে গলা মেলাল কাতু।

ও শালা, খুব যে দরদ দেখছি এখন। শুনে শুনে কথা কয়/গুয়ের পোক বেছে খায়।

তুই সবাইকে যা-তা বলছিস টুপি। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না একেবারে। বড্ড তেল হয়েছে তোর। তেল ভাঙব তোর এবার। বেশি চর্বি হয়েছে ...

তখনই খুব জোরে বাতকম্ম করল টুপি। একবার, দু-বার। পরপর। প্রথমটি বেশ জোরে। তারপর একটু আস্তে।

নাকে হাত চাপা দিল সঙ্গে সঙ্গে তিন বামন। লাড্ডু, কাতু, কুতু।

ডান হাতের দু-আঙুলে জোরে নাক টিপে ধরে খোনা গলায় বলে উঠল লাড্ডু—ওফ, মা রে, কি গ্যাস রে বাবা! শালা, পচা গরু খেয়েছে। পচা গরু।

ধ্যুর, পচা মোষ। পচা মোষ খেয়ে ঢোস ঢোস করে ঝাড়ছে। উফ, কি গন্ধ রে বাবা!

দাঁত বার করে সামান্য শব্দ ছড়িয়ে হাসল টুপি। তারপর বলল, আয় না ওইটা করি— উবুদশের মতো —

— আদলি পাদলি টাঁই টুঁই
নিলে কটকট পাদলি তুই
যে আগে কথা বলে
সে আগে পেদে থাকে...

ভ্যাট। এই সব আদলি-পাদলি টাঁই টুঁই — ছোটোবেলার মতো ...

কুঁই পেদেছিস, তুই পেদেছিস, কুঁই পেদেছিস গো — বলে আনন্দে হাততালি দিতে দিতে দাঁড়িয়ে ওঠে টুপি। তারপর হালকা হালকা নাচের ভঙ্গিতে বলে — কেমন ধরে ফেললাম। তার দুলুনি, ধীরে ধীরে গা নাচিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে তার গভীর কালো ছায়াটিও নড়তে চড়তে থাকে।

নাক থেকে আঙুল নামিয়ে এবার লাড্ডু বলে, তুই এই ছড়াটা জানিস টুপি?

কোন ছড়া?

পাদেন ভর্গ রাজা
তস্য মন্ত্রী টুনটুনি
ঠুস পাদে মলয় গন্ধ
ব্যোমপাদ তথৈবচ
মধ্যাহ্ন পাদে গন্ধ নাদে
নিঃশব্দ প্রাণঘাতিকা।

বাঃ! দারুণ তো। বেশ বলেছিস। কিন্তু খুব শক্ত শক্ত কথা, বানান। ও সব মনে রাখা যায় না। বড্ড খটোমটো রে লাড্ডু। তার চেয়ে বরং অনেক ছোটোবেলায় মায়ের কাছে একটা কথা শুনেছিলাম, সেটা কিন্তু মন্দ নয়।

কী... কী কথা?

সেটা হল গিয়ে — পাদ নেই যার / পোড়া কপাল তার।

টুপির এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কেমন হেসে ওঠে হা হা হো হো হি হি করে। তাদের অনর্গল হাসির শব্দে আকাশে হঠাৎ হঠাৎ জমে ওঠা মেঘের গায়েও বুঝি ফাটল ধরে যায়। আর সেই ফাঁকফোকর দিয়ে চাঁদের আলো অনেক অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর গায়ে। মুখে।

নে, নে, অনেক হল, চাল এবার। এটুকু বলে সাপলুডো খেলার মধ্যে ফিরে আসতে চাইল টুপি। যতক্ষণ খেলায় ঢুকে ডুবে থাকা যায়, ততক্ষণই তো মজা। নইলে সেই তো রোজ একই জিনিস। স্টেজে উঠে শো-এর সময় পাবলিক হাসানো। যে করে হোক, হাসাতে হবে টিকিট কেটে তামাশা দেখতে আসা লোকজনকে। লাড্ডু, টুপি, কাতু, কুতু — 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর চারজন জোকার এই আষাঢ় মাসের মেঘ ভাঙা চাঁদের আলোয় নিজেদের ভেতর সাপলুডো খেলতে খেলতে এইসব খুচরো ঝগড়া, তর্কাতর্কি, মান অভিমানে জড়িয়ে যায় প্রায়ই।

তা হলে এবার কে চালবে? জানতে চাইল কাতু।

কেন, কুতুকে দিবি। এবার কুতুর চাল। বলেই একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেল টুপি। আর কাতু তাড়াতাড়ি ছক্কা চালার কালো প্লাস্টিকের ডিবেটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগল— পো-পো — পুট-পুট — এই পুট পড়ছে এবার। বলে চাল দিতে চাইল কাতু। মনে মনে আবারও গুন্ডি দিল লাড্ডু। — গুন্ডির মা গুন্ডি...। তার দান ছিল এবার কিন্তু ইচ্ছে করে নিল না লাড্ডু। ব্যাপারটা যখন ছড়িয়ে গেছে যাক। আর কারো পুট পড়ছে না।

সাবধানে লুডোর কোটে ছক্কা নামাল কুতু। যাতে না গড়িয়ে চলে যেতে পারে বোর্ডের বাইরে।

ছোট্ট করে হাই উঠল লাড্ডুর। খুব চেষ্টা করল সেই হাই চেপে রাখতে। কিন্তু হল কই। পারা গেল না কিছুতেই। রাত বাড়লে ঘুম আসে। তার আগে ঢুলুনি। সেই ঢুল-ঢুলুনি চলে যায় লুডোর উত্তেজনায়। এমনি যে চার রঙের ঘুঁটি সাজিয়ে দু-জন, তিনজন বা চারজনের লুডো খেলা, তাতে সময় বেশি লাগে। আর তেমন টিব-টিবানিও নেই। চার চারটে ঘুঁটি বেরোবে। কাটবে। আবার ছক্কা পড়লে বেরোবে, সে বেশ এলাহি ব্যাপার। এই তো সেদিন খেলতে গিয়ে নিজের লাল জোড়া ঘুঁটি দিয়ে সবুজ ঘুঁটির টুপিকে আটকাতে গিয়ে বেশ বিপদেই পড়া গেল। জোড়া জোড়া করে এগোতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত টুপির হাতেই কচুকাটা। প্রায় পাকা ঘুঁটি। শেষ পর্যন্ত ওই দু-ঘুঁটিই ঘর পচা।

এক-একদিন হাত খুলে যায়। তখন যা চাই, তাই পড়ে। যখন যেমন বলছি, সেটাই গড়িয়ে নামছে ডিবে থেকে। ছক্কা তো ছক্কা, দুই তো দুই, তিন তো তিন, পুট তো পুট। এক-একসময় এরকমই হয়। আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুম খেয়ে গড়িয়ে দিয়ে হয় ছক্কা। ব্যস ...

সেদিন লাড্ডুও খচড়ামি কিছু কম করেনি। নিজের পাকা ঘুঁটি দু-দুবার কাঁচিয়ে এনে কেটে কুটে একদম ফিনিশ করে দিল আমায়। বলার কিছু নেই। ওর পাকা ঘুঁটি ও কাঁচিয়ে এনে

কাটতেই পারে। কিন্তু আমি যে হেরে গেলাম। ভাবলেই কেমন যেন কান্না কান্না পায় টুপির। লুডোর ছক, চার-চারটে ঘর আর তাদের রং নিয়ে সামনে দিয়ে একবার যায় আর একবার আসে। আবার যায়, ফিরে আসে। যেন কোনো নরম, উড়ন্ত গামছা। লুডোর ছককে আর আদৌ ছক মনে হয় না তখন। সেটা তো উড়তেই থাকে। সাপ লুডোর সাপেরা দিব্যি কিলবিলে হয়ে গিয়ে শুরু করে দেয় নড়াচড়া। একটা দুটো তিনটে মই একসঙ্গে চলাফেরা করতে থাকে। তারা কখন কোন দেওয়ালে মাচা অথবা ঘরের ছাদ পাবে, তা দিয়ে শুরু করে দেয় নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ। গায়ে অনেকগুলো কালচে ফুটকি নিয়ে শাদা চৌকো ছক্কা গড়াগড়ি খেতে থাকে। হাসে। গড়িয়ে গড়িয়ে বারবার বলে, আমি গড়া, তুই গড়ি। দুইয়ে মিলে গড়াগড়ি। গড়াগড়ি।

নিজের পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে এনে তাকে দু-দু-বার কাটার পর কথা বন্ধ করে দিয়েছিল লাড্ডুর সঙ্গে টুপি। খালি ওই শো-এর সময় যতটুকু না বললে নয়, ততটুকুই। তারপর আবার যে-কে সেই। লাড্ডুই বরং সেদে সেদে কথা কয়েছে। একদম পাক্কা সেদো।

এরকম সেদোপনা করলে কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়! কোনো না কোনো সময় তো দিতেই হয় জবাব। ব্যস, আড়ি ভেঙে গেল। তাই দেখে লাড্ডুটার কি হাসি।

'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর মালিক এস. আয়েঙ্গার এই কথা বন্ধ করার কেসটা তেমন করে টের পায়নি। হলে মজা বুঝিয়ে দিত। মারধোর, পানিশমেন্ট। খাওয়া বন্ধ। কি না হতে পারত। কিন্তু তাকে আর জানায় কে।

পুট, পুট, পুট পড়েছে। হই হই করে চেঁচিয়ে উঠল কুতু। আষাঢ় মাসের অনেকটা রাত পার করা আকাশের তলায় পাতা লুডোর বোর্ডের ওপর জ্যোৎস্নার ঝিরিঝিরি। চাঁদ চাঁদ আলোয় কুতুর চালা ছক্কা দিব্যি যেন মাদারি কা খেল দেখানো ম্যাজিকঅলার হাতের পুরোনো খুলি। লুডোর কোট একটা ভাঙা বাড়ির উঠোন হয়ে পড়ে আছে। তার মধ্যেই ফাটা ফাটা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে কুতু — পড়েছে। ছয় পড়েছে।

কই, কই, দেখি বলে সবাই ঝুঁকে পড়ল মাটির দিকে। আর তখনই খাঁচার ভেতর কি কারণে, হয়তো অকারণেই যেন ডেকে উঠল বাঘ — হা-উ-উ-ম, হা-উ-উ-ম। বেশ গম্ভীর, রক্ত জল করা আওয়াজ। পাশে লেপার্ডের খাঁচায় সঙ্গে সঙ্গে তড়বড় তড়বড় করে পায়চারি শুরু করে দিল জোড়া লেপার্ড।

হা-আ-আ-উ-উ-ম — অনেকটা দীর্ঘ হল বাঘের ডাক। সেই জমাট, ভরাট কণ্ঠ, ফাঁকা মাঠের ওপর থেকে ভাসতে ভাসতে উঠে এসে হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে গেল যেন আরো দূরে কোথাও।

নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে জ্যোৎস্নায় গভীর কালো ছায়াছাপ আঁকতে আঁকতে বাঘের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ালো আরতি। আট-ন বছরের ছেলে। কিন্তু ভালো করে হাঁটতে পারে না। পায়ে জোর নেই। সব সময় নাল ভাঙে মুখ থেকে।

ছেলে প্রায় রাতেই ঘুম ভেঙে গেলে বাঘ দেখার বায়না করে। আয়েঙ্গার তখন ঘুমে অচেতন। কিংবা যদি ঘুমিয়ে নাও থাকে আরতিকেই ধাড়ি ছেলেকে ঘাড়ে নিয়ে আসতে হয় বাঘ আর লেপার্ডের খাঁচার সামনে। বুড়ো মতো একটা সিংহও আছে এস আয়েঙ্গারের 'দ্য

গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর সঙ্গে। সেটা বসে বসে ঝিমোয় খালি। বয়েস হয়ে গেলে যা হয় আর কি! কেবল মাঝে মাঝে আয়েঙ্গারের ব্যাটারির চাবুক তাকে সজাগ আর সতর্ক করে দেয় খেলা দেখানোর জন্য। সিকান্দার তখন বাধ্য হয় খেলা দেখাতে উঁচু টেবিলে উঠে বসতে। হাঁ করে রিং মাস্টার বলা মাত্র। মুখের মধ্যে জেগে ওঠে হলুদ হলুদ দাঁত। হালকা সবুজাভ জিভ। মুখের কাছে যাওয়া যায় না — এতই ইঁদুর পচা দুর্গন্ধ সেখানে। ভারতমাতা সাজা আরতিকে মাঝে মাঝেই ভয়, কী এক আচমকা অজানা আতঙ্ক ক্রমাগত ঠেলা মারতে থাকে। বলা তো যায় না। কীসের থেকে কি হয়! যদি হঠাৎই মেজাজ চড়ে যায় সিকান্দারের। বহুদিনই খাঁচায় একা একা থাকে এক গলা কেশরঅলা পশুরাজ। সিংহীটা মরেছে আরো পাঁচ-সাত বছর আগে। নতুন করে আর কেনা হয়নি। একে তো টাকা নেই, কে দেবে অত টাকা? তার ওপর বুনো জানোয়ার কেনা-বেচার আইনি মারপ্যাঁচ ক্রমশ বাড়ছে। আয়েঙ্গার তো বলে, এবার একটু একটু করে বন্ধ করে দেবে সার্কাস। জীবজন্তু, পাখিই যদি না রাখা যায়, তা হলে শুধু জোকার, ট্রাপিজ আর মরণঝাঁপ দিয়ে কি এত বড়ো সার্কাস-পার্টি টেকানো যাবে? সিকান্দারকে বাদ দিয়ে জমবে কি আদৌ বিশ্বশান্তির জন্য, ভারতমাতা সাজা আরতির খেলা? কে দেখবে? সিকান্দারের পিঠে পা দিয়েই তো প্রতি শোয়ে দাঁড়ায় আরতি।

ও বা, ও বা, আ বা— আ-বা। মুখ দিয়ে কি এক অদ্ভুত শব্দ করছে ছেলে। আরতি জানে এই যে আওয়াজ, তা খুশি হওয়ার জন্য।

চাঁদের আলোয় বাঘের খাঁচার ছায়াটি বড়ো নির্জন। পাশে জোড়া লেপার্ডের খাঁচা। তার ভেতর হাঁটাহাঁটি করা লেপার্ডরা। অন্ধকারে তাদের চোখ কাচের সবুজ সবুজ গুলি হয়ে জ্বলে ঝকঝক করে।

হা-আ-আ-উ-উ-ম — ডেকে ওঠে বাঘ।

আরতির কোলে রাখা ডাব্বু আ বা, ও বা, আ বা, আ বা বলে জ্যোৎস্না-ছোঁয়া বাঘ দেখে মহা আনন্দ পায়। ডাব্বু — ছেলেটা যে এমন হবে কে জানত? হওয়ার পর অনেকে বলছে, বেশি বয়সের পুরুষমানুষকে বিয়ে করলে এমনটিই হবে।

ন্যালব্যাল করতে করতে ডাব্বু উঠতে চাইল নিজের পায়ে ভর দিয়ে। তারপর যেমন লতা জড়িয়ে ধরতে চায় শক্ত গাছকে আকর্ষ বাড়িয়ে, সেভাবেই নিজের অপুষ্ট হাত বাড়িয়ে ধরে নিল আরতির গলা।

আ আ বা আ বা ...

হ্যাঁ বাবা। বাঘ। বেশ তো, দেখা হল। চলো, এবার শুয়ে পড়ি। রাত অনেক হয়েছে। কাল খেলা আছে বাবা।

ডাব্বু রাতে বিছানা ভেজালে ঘুম ভাঙে আরতির। প্রথমে গরম গরম। মন্দ লাগে না। তারপর তো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বিচ্ছিরি। কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে মতো। এখনো তোশকের নীচে নিয়মিত বড়ো প্লাস্টিক পাতে আরতি। যাতে না পেচ্ছাপে ভিজে যায় তোশক। রোদে বালিশ, তোশক দেওয়া বড্ড ঝামেলার।

বুড়ো ছেলের মুতের গন্ধ আর সহ্য হয় না। মনে মনে গজ গজ করে আরতি। পেচ্ছাপের শুকনো মতো দুর্গন্ধে রীতিমতো গা গুলিয়ে ওঠে। শুকনো খবরের কাগজ চেপে চেপে রাতের মতো বিছানার ভিজে ভিজে ভাব কাটাতে হয়।

লেপার্ড আর বাঘের খাঁচার সামনে চিড়িয়াখানার গন্ধ। সেই বোটকা মতো দুর্গন্ধ নাকে গেলে এখন আর গা গুলোয় না আরতির। অভ্যাস হয়ে গেছে রীতিমতো। আর না হয়েই বা উপায় কি! খেলা দেখাতে হয় না ওদের নিয়ে। ওদের মধ্যেই থাকতে হয়। না থেকেই বা উপায় কি?

ডাব্বু সমানে আ-আ-বা-আ-বা বলে কি যেন একটা চেষ্টা করতে থাকে বলার। আরতি বুঝতে পারে তার খোকাটি খুশি হয়েছে বাঘ আর লেপার্ড দেখে। দূরে একলা থাকা সিকান্দার ঘাপটি মেরে আছে। আরতি জানে, তার খাঁচার কাছাকাছি যেতে না যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে বনের রাজা। যেমন ভাবা, সেভাবেই এক'দু-পা জ্যোৎস্না ভেঙে এগোতে না এগোতেই খাড়া হয়ে উঠে পড়ল অনেক দিন আগের গির অরণ্যের বাসিন্দা।

চার বামন — টুপি, লাড্ডু, কাতু আর কুতু, তারা এতক্ষণ ছক্কা, পুট, পাঞ্জা, দুই কিংবা তিগগি—এসব একেবারেই না বলে নিজেদের খেলা থামিয়ে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে তাদের মালকিনকে। 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর প্রোপ্রাইটার কাম মেইন রিং মাস্টার এস. আয়েঙ্গারের খেলা দেখানো সেক্সি বউ হাবা ছেলে কোলে নিয়ে বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আর কিছু করা যায় না কি! লাড্ডুর হাই-ফাই ওঠা কোথায় পালিয়েছে। সারা শরীর টান টান। যেন এখনই শুরু হবে শো!

ভিতর হয়ে গেল মাইরি আমাদের লুডো খেলা। ফিস ফিস করে বলল কুতু।

হ্যাঁ, মায়ের ভোগে। তার থেকেও চাপা গলায় বলল কাতু।

শালা, ছয়টা পড়ল সবে আর তখনই — এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যেন হায় হায় করে উঠল কুতু।

ওতে কী হল! সাপ লুডোয় পুট না পড়লে... ছাড় ওসব, এখন বল তো মা ছেলেতে কেন এখানে?

এত রাতে বাঘ দেখার শখ। তাও বুঝলি না। ওসব ওদের হয়। লাড্ডুর কথার জবাব এভাবেই দিল টুপি। এমনভাবে বলল, যাতে আর কেউ কিছু চট করে শুনতে না পায়।

আকাশে চাঁদ একটু একটু করে পেকে উঠছে। তার আলো সার্কাসের চারপাশে, মাথায় টাঙানো সামিয়ানার ছাঁকনির ভেতর দিয়ে টুপটুপিয়ে পৌঁছে যাবে ন্যাড়ামুড়ো মাটির উঠোনে। মাঠের ঘাস মুড়িয়ে কেটে পরিষ্কার করে, দুরমুশ দিয়ে সামান্য পিটিয়ে পাটিয়ে তৈরি হয়েছে এই উঠোন। খানিকটা দূরে পায়ে মোটা মোটা লোহার শেকল বাঁধা সুন্দরী আর কামিনী। আরো খানিক দূরে পার্বতী আর বাদশা।

ল্যাজ নেড়ে নেড়ে, কখনো কখনো গা, পায়ের চামড়া নাচিয়ে নাচিয়ে ডাঁশ, মশা, পোকা তাড়ায় হাতিরা। কিন্তু ডাঁশ, মশারা শুনলে তো! মহা আনন্দে রক্ত খায় তারা। হুল ফোটায়। বেশি নাড়ানাড়ি হলে তখন তারা উড়ে বা নিজেরা নড়ে একটু দূরে গিয়ে বসে।

আর হবে না লুডো। শুয়ে পড়তে হবে। নইলে তাড়া দেবে আরতি। মালকিনের কথা ফেলা যায় না। তার ওপর এই যে সার্কাসের মালিক, এত অসম্ভব রাগী যে কিছু বলার নয়। গ্যাঁক গ্যাঁক করে চেঁচাবে তো বটেই। খুব পিটবে তারপর। এতেও সাজা শেষ হয় না। এর পরে একটা খালি খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে তালা এঁটে দেবে। তখন নো ফুড, নো ওয়াটার। চ্যাঁচামেচি

করলে আরো বিপদ। দ্বিগুণ ঝাড় পড়বে তখন। তাই মানে মানে কিছু বলার আগে কেটে পড়া ভালো, এটুকু মনে ভেবে নিয়ে টুপি বলল, চল শুতে যাই আমরা।

এখনই শুবি! আর এক হাত হলে হত না! মিন মিন করে বলল কুতু।

এক হাত হবে মানে! হাত আবার শেষ হয়েছে নাকি! লুডো খেলা হল কোথায়? দানই বা পুরো করতে পারলাম কই! সবে তো পুট পড়েছে, পুট পড়েছে বলে চিৎকার করে উঠল কুতু।

এমনি এমনি চ্যাঁচালুম শুধু শুধু! সত্যি সত্যি তো পোয়া পড়ল গড়িয়ে গড়িয়ে।

সে সব আর হবে টবে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আবার নতুন করে কোট পাততে গেলে ঘুঁটি সাজাতে হবে নতুন করে।

তা কেন হবে? টুপির কথায় মিনমিনে থেকে আর একটু গলা তুলে বলল কুতু।

আগের খেলা মায়ের ভোগে। ভণ্ডুল হয়ে গেছে সব। সাপ লুডো খেলতে হলে নতুন করে খেলা চালু করতে হবে।

আ-আ-আ-বা-আ — ডাব্বু নিজের মনের খুশিতে চেঁচিয়ে উঠছে। তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে খাঁচায় পোরা 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর বাঘ, সাহেব — হা-উ-উ-ম। হা-উ-উ-উ-ম।

একবার, দু-বার, তিনবার। বাঘ ডাকছে।

খাঁচার মধ্যে মাঝরাতের হাঁটাহাঁটি সেরে নিচ্ছে জোড়া লেপার্ড। তাদের টলগুলি টলগুলি সবুজ সবুজ চোখ ঝকঝক করছে অন্ধকারে। সিকান্দার লোহার গরাদের ঘেরাটোপে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। তার চোখেও সবুজ আগুন।

আকাশের চাঁদ আপন খেয়ালে আলোর ঝরনা পাঠিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর গায়ে মুখে। সেই আলোয় মাখামাখি হয়ে আছে সুবর্ণরেখা নদী, তার গায়ে, বুকে জমে থাকা শাদা বালি আর কালচে পাথরে। নদীর জল চাঁদ ভাসাতে ভাসাতে রুপো হয়ে ওঠে। সেই রুপোয় কখনো আকাশ, কখনো বা মেঘের কলঙ্ক ছাপ পড়ে যায়। তারপর বয়ে যাওয়া স্রোতে সেই কালচেটুকু কখনো কখনো মুছে গিয়েই জেগে ওঠে।

ও-বা-আ-বা-আ-বা — এরকম শব্দ বলতে বলতে মুখের কষের দু-পাশ দিয়ে সরু হয়ে নাল গড়ায়। একটু যেন ভারী মতো। ঘন। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না ছেলেটাকে নিয়ে। ডাক্তার, বদ্যি, হেকিম, ঠাকুর দেবতার মালা, ফুল কিছুই বাদ রাখা হয়নি। ফুঁকফাঁক, দৈব তাবিজ-কবচ, জলপড়া, তেলপড়া, মাটি মাখানো — কোনোটাই বাদ নেই। কত পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী ধরা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল কি! সবাই তো কেমন বাঁধা গত বলে যায় নিজের নিজের লাইনে—জন্মের দোষ। জিনের গোলমাল আছে। পাপ, পাপ মা পাপ। প্রারব্ধ। তোমাদেরও, ওরও। গতজন্মের পাপে এমনটি হয়েছে। শুক্রবার শুক্রবার কালো গরুকে রুটি, গুড়, ছোলা—এই সব খাওয়াতে হবে।

আরো অনেক রকম বুদ্ধি-পরামর্শ রয়েছে।

মস্তাজবাবার মাজারে একশোটা মোমবাত্তি আর পঞ্চাশটা আগরবাত্তি জ্বালতে হবে প্রতি বিষ্যুদবার নিয়ম করে।

কালীমন্দিরে প্রত্যেক শনি আর মঙ্গলবার পাঁচটা লাল জবা ফুল দিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হবে। সঙ্গে জ্বালতে হবে পাঁচটা করে প্রদীপ।

কাককে প্রতিদিন সকালে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াতে হবে।

পায়রাদের দানা খাওয়ানো দরকার।

কালো কুকুরকে প্রতি শনিবার কিছু না কিছু খেতে দিতে হবে।

কিন্তু এসব আর কত দিন ধরে করবে আরতি! করতে করতে সে তো রীতিমতো যাকে বলে থকে গেছে। মন খারাপ থাকে প্রায় সবসময়। কান্না পায়। নিজের একমাত্র সন্তান এরকম হয়ে গেলে কেমন করে সুস্থ থাকা যায়? না কি আদৌ থাকা সম্ভব?

আয়েঙ্গার ডাব্বুকে তার কোলে বসিয়ে একটা নতুন খেলা ছকেছিল। পাবলিক নিয়েও ছিল বেশ সেই শো। আরতি গণেশজননী। কোলে ডাব্বু, গণেশ। দু-পাশে সার্কাস কোম্পানির দুই হাতি কামিনী আর সুন্দরীকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিত আয়েঙ্গার। দারুণ কমপোজিশান। খুব হাততালি দিত পাবলিক। কিন্তু ডাব্বু যত বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, ততই তার মাথায় চাপতে লাগল নানা বাই। মুখ দিয়ে নাল ভাঙার পরিমাণ গেল বেড়ে। তখন তো বলতে গেলে সব সবসময়ই নাল পড়ে। আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অবোধ্য, অস্ফুট শব্দ।

ছোটোবেলায় তবু ওকে ম্যানেজ করা যেত। এখন আর প্রায় পারা যায় না। অসম্ভব রাগ আর জেদ, তার ওপর যাকে বলে রীতিমতো মতলবি। যখন যে বাই ধরবে, সেটা তখনই চাই। বায়নাক্কা পূরণ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। নইলে বাবু সবই লণ্ডভণ্ড করে ছাড়বেন। তখন যত দায় আরতির। আয়েঙ্গার কেমন যেন নির্বিকার এসব ব্যাপারে। আগে কিন্তু এতটা নির্লিপ্ত ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন বেড়ে যাচ্ছে এই ভাবটা। সার্কাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে — যদি বাঘ, সিংহ, হাতি, ভাল্লুক, লেপার্ডের খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয় — এমন একটা দুশ্চিন্তা ভর করেছে আয়েঙ্গারকে। কেমন যেন গুম মেরে বসে থাকে মানুষটা। তার এই গুমসুম ভাব দেখে ভয়ও লাগে। চিন্তাও হয়। সত্যিই তো, কি হবে জানোয়ারদের খেলা, পাখির কেরদানি দেখানো বন্ধ করে দিলে? শুধু ট্রাপিজ, অসম্ভব জোরে মোটর সাইকেল গ্লোবের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আটকানো যাবে দর্শক? আর এই এতদিন খাঁচায় থাকা, পালপোষ হওয়া বাঘ, সিংহ, হাতিরা যাবে কোথায়? কোন জঙ্গল তাদের মেনে নেবে? এরা তো না খেয়ে মরবে। শিকার ধরতে পারবে না। জঙ্গলে ফাঁকা জায়গায় থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে, গরম লাগবে। অসুখ হবে। বে-মওত মারা যাবে সবাই। কাদের মাথায় যে এসব বুদ্ধি ঢোকে? এরা একটা দিক ভাবে। অন্য দিকটা কোনোভাবেই ভাবে না। ভাবতে চায়ও না। কী হবে ওদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলে! স্রেফ না খেয়ে মারা যাবে। আরো খারাপ অবস্থা হবে বুড়ো আধবুড়ো জানোয়ারদের। এসব কথা মাঝে মাঝেই মনের ভেতর জং-ধরা ছুঁচ হয়ে বিঁধতে থাকে আরতির। আগে তবু আয়েঙ্গার বেশ কথা বলত। এখন — কয়েক বছর হল কেমন যেন চুপচাপ মেরে গেছে। আর কথায় কথায় রাগ। একটুতেই রেগে ওঠে চট করে। তারপর সেই রাগ আর যেন কমতে চায় না কিছুতেই। সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিলে বুঝি কমবে সেই মাথা গরম ভাব। যত রাগ বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মদ। আগে তবু মাপজোক থাকত। এখন কোনো মাপজোকের বালাই পর্যন্ত নেই। শো শেষে বোতল

গেলাস জল সাজিয়ে বসে। যতক্ষণ না খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে যায়, ততক্ষণ চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। এসব দেখে-টেখে মাঝে মাঝেই বড়ো ভয় হয় আরতির। কী জানি শরীর যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হলে তো কিছুই করতে পারবে না। মরে গেলে তো গেলই। কিন্তু যদি পঙ্গু হয়ে থাকে! তখন? ভাবলেই ভেতরে ভেতরে ভয়ের বরফ-পাথর গড়াতে থাকে আরতির। ছেলেটা এরকম হাবাগোবা, ন্যালবেলে। সে তো বলতে গেলে সারা জীবনের বোঝাই রয়ে গেল। তার ওপর যদি আয়েঙ্গারও জড়ভরত হতে থাকে একটু একটু করে, তখন কী হবে?

জ্যোৎস্না লাগা খাঁচার ভেতর থেকে বন্দি বাঘ আবারও চিৎকার করে উঠল — হা-আ-উ-উম। হা-আ-উ-উ-ম। তার সঙ্গে গলা মিলিয়েই যেন বা খুশির শব্দ করে উঠল ডাব্বু। — ও-বা, ও-বা, আ বা — আ-বা। তাদের সেই আওয়াজে আকাশের চাঁদও বুঝি কেঁপে উঠল থর থর থর থর করে। চার বামন সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আর সাজাবে কিনা নতুন করে ঘুঁটি, সেটা ভাবতে ভাবতেই তারা দেখল আকাশের চাঁদ কেমন যেন ফ্যাকাশে মেরে যাচ্ছে।

এখনই কী মালকিন বলবে, এখনো রাত জেগে লুডো খেলছ তোমরা! খালি বাজে গজালি আর আড্ডা। রাত ক-টা হল, সেদিকে খেয়াল আছে! রাত তেরোটা পর্যন্ত লুডো ঘিষবে, না হলে তাস। নয় তো নিজেদের মধ্যে বাজে গপপো আর তার সঙ্গে ক্রমাগত হা-হা-হি-হি। স্যার একবার যদি জানতে পারে না ...

এই 'স্যার' শব্দটা কেমন যেন মন্ত্রের মতো কাজ করে টুপি, লাড্ডু, কাতু আর কুতুদের মধ্যে। স্যার মানে আয়েঙ্গার। রেগে গেলে ভয়ঙ্কর। ইদানীং সেই রাগ যেন আরো বেড়েছে। কথায় কথায় জিনিস ছোড়াছুড়ি, ভাঙাভাঙি। হাতও চালিয়ে দেয় যখন তখন। কেন যে এরকম হচ্ছে?

আরতি অবশ্য ডাব্বুকে কোলে নিয়ে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে চলে যায় নিজের তাঁবুর দিকে। সেখানে বাকি রাতটুকু কাটাতে হবে একা একাই — এটুকু ভেবে নিলেই কষ্টে বুক ভেঙে যায় আরতির। দুঃসহ চাপা বেদনা ঘাই মারে বুকের ভেতর।

তাঁবুর মধ্যেও সামিয়ানার ছাঁকনি পার হয়ে, এদিক ওদিকের ফুটোফাটা, জোড়াতাপ্পির ভেতর দিয়ে কোত্থেকে কোত্থেকে যেন এসে পড়েছে চোরাই জ্যোৎস্না। সেই কাঁচাপাকা আলোয় আয়েঙ্গারের চশমা খুলে রাখা বোঁজা দু-চোখ, ভাঙা গাল, গালের ওপর হালকা হালকা পাকা দাড়ির রোঁয়া, চোখের নীচে জমাট ক্লান্তি—সব যেন আরো অনেক বেশি মন খারাপ করে দেয় আরতির। বুকের সব লোম কবেই পেকে গেছে। চাঁদের আবছা মতো আলোয় সেই রোমরাজিতে কাশফুলের মায়া।

এই মানুষকেই আমি ভালোবেসেছি। দিনের পর দিন উত্তপ্ত হয়েছি তার স্পর্শে। উত্তেজিত করে তুলতে পেরেছি তাকেও। আনন্দে ভেসে গেছি দু-জনে। বয়সের ফারাক অনেকটাই। তবু তো ভালো লেগেছে আয়েঙ্গারকে। তার চাউনি, মাপা রসিকতা, অসম্ভব পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে। কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে একটা লোক, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কিছুতেই।

চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা আয়েঙ্গারের পাকা চুল মোড়া বুকে জ্যোৎস্নার হাঁটি হাঁটি পা পা। এই চওড়া বুকে কত দিন, কত কত সময় শুয়ে থেকেছি চুপচাপ। মাথা ঠেকিয়ে, গাল

লাগিয়ে নিভৃতে একা একা। কত না সব মুহূর্ত যে পেরিয়ে এসেছি, তার হিসেব রাখিনি। গায়ে খুব জোর তখন সেই মানুষটার। অসম্ভব সাহস মনে মনে। আমাকে পুরোপুরি পাওয়ার পর যেন নতুন করে বাঁচতে শিখল লোকটা। বাঁচার মতো বাঁচা যাকে বলে। কাজে — যে-কোনো কাজ বলা হোক না কেন, তখন তার কি বিপুল উৎসাহ। এখনকার ঠিক উলটো ছবি, যাকে বলে। এই যে সব ব্যাপারে বিরক্তি, চুপচাপ একা একা বসে থাকা। হঠাৎ হঠাৎ বিড় বিড় করে কথা বলা নিজের সঙ্গে — সবটাই কেমন পরপর ধরে নিল ওকে এই ক-বছরে। তারপর আরো বেশি বেশি করে জাপটালো। এখন শো-এর সময় ছাড়া প্রায়ই একা একা বসে থাকে। কথা বলে হাওয়ার সঙ্গে। সেই কথায় কোনো শব্দ নেই। কালচে, পুরু ঠোঁট দুটো নড়ে শুধু। রোজ দাড়ি কামাতে হয় বলে কামায়, সেই শো-এর আগে। তাতেও বিরক্তি। একরাশ ব্যাজার ভাব। কি যে হয়েছে মানুষটার কিছুই বুঝি না। এসব ভাবনার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বড়ো করে শ্বাস চাপল আরতি।

বাঘ দেখে আসার পর মাথার খেয়াল নেমে যেতে ডাব্বু ঘুমিয়ে পড়েছে। এক কাত হয়ে শুয়েছে ছেলেটা। আস্তে আস্তে নাল ভাঙছে ঠোঁটের কষে। বুকে লালাপোষ দেওয়া আছে একটা। এখন বিব না কি একটা যেন বলে। তাইতে হয়তো বা সামলে দেওয়া যায় খানিকটা।

আয়েঙ্গারের ক্লান্ত, বিষাদছাপ মুখের কাছে নিজের মুখ আনতে গিয়ে ঝাঁঝালো দিশি মদের গন্ধ পেল আরতি। ইস, বিশ্রী দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। কীসের জন্য, কোন আনন্দে না দুঃখে খায় কে জানে! কেন খায়? আগে আগে মাঝে মাঝেই অনুরোধ করত আরতিকে। — এসো না, একসঙ্গে বসি। খাই। আনন্দ করি।

প্রথম প্রথম কেমন অস্বস্তি হত আরতির। তখনো বিয়ে-থা কিছুই হয়নি। কিন্তু অত বড়ো একটা লোক। তার ওপর 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর মালিক কাম রিং মাস্টার, তার অনুরোধ তো কোনোভাবেই এড়ানো যায় না। আরতি নন্দী সেখানে একজন সামান্য শো করা ট্রাপিজ গার্ল। তার মতামতের কী-ই বা দাম আছে! ভালোলাগা না লাগার দামই বা তেমন করে কে দেবে।

প্রথম প্রথম নাক টিপে খাওয়া। বিচ্ছিরি গন্ধ। গলা বুক জ্বালা করে। খেতে গিয়ে গা বমি বমি দেয়। কিন্তু একটু খাওয়ার পর পরই কেমন যেন মজা মজা ভাব। বেশ মস্তি যাকে বলে।

গেলাস হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে সিপ করতে করতে বলে উঠত আয়েঙ্গার, স্লো, স্লো বেবি। গো স্লো প্লিজ। অত জোরে কোঁত কোঁত করে মারলে কিক হবে তাড়াতাড়ি। আউট হয়ে যাবে।

প্রথম প্রথম খেয়ে মুখ ভ্যাচকাতাম। অসম্ভব খারাপ লাগত। ঝাঁঝ ঝাঁঝ, তেতো তেতো, নাকি কষা — ঠিক বুঝতে পারতাম না। তারপর আস্তে আস্তে সব কেমন ঠিক হয়ে গেল। একটু যেন অভ্যাসও। ব্যাপারটা প্রায় মিশে গেল রোজ দিনকার রুটিনের সঙ্গে। কিন্তু যতই রিকোয়েস্ট করুক আয়েঙ্গার আমি কিন্তু ডেইলি খেতাম না। নিয়ম করে গ্লাস নিয়ে বসতাম ওর সঙ্গে। বুঝি একজন নিঃসঙ্গ, বাঘ সিংহ হাতি চরানো মাঝবয়েসী পুরুষ কীভাবে শো-এর পর সময় কাটাবে! তার তো কিছু না কিছু শখ-আহ্লাদ দরকার। নইলে শুধু টিকিট ঘরে কত বিক্রি হল তার হিসেব, বাঘ সিংহ হাতি তাড়িয়ে পাবলিকের কাছ থেকে পাওয়া হাততালি

আর সারা বছর দল নিয়ে সারা দেশ চষে বেড়ানো, এই করে — শুধু এটুকু করেই জীবন কাটে নাকি!

বেশ কয়েক বছর ওর সঙ্গে আর সামনাসামনি নিয়মিত বসা হয় না গ্লাস নিয়ে। অবরে সবরে হয়ত এক-আধ দিন, তেমন জেদ ধরে যদি আয়েঙ্গার, তখন। ভয় হয় যদি রেগে গিয়ে চরম অশান্তি করে, তখন কী হবে! বড্ড সীন করে আজকাল। যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। একদম যেন ডাব্বু। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। এসব ভেবে খুব আলতো করে হাতের আঙুল আয়েঙ্গারের বুকে জেগে থাকা পাকা রোমে ছোঁয়ালো আরতি। একটু অপেক্ষা করল। নাহ্, কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই আয়েঙ্গারের। অথচ আগে তো একেবারেই উলটো ছিল ব্যাপারটা। গায়ে সামান্য ছোঁয়া লাগল কি লাগল না, জেগে উঠল আয়েঙ্গার। তারপর আর কিছু বলার নেই। কোনো বাধাই মানবে না। প্রবল হুটোপুটি। আর এখন — অনেক কষ্ট করেও তাকে জাগানো যায় না। বয়েস হলে কি এভাবেই আস্তে আস্তে মরে যায় সব কিছু? সমস্তই ফুরিয়ে যায়? নিভে যেতে থাকে একটু একটু করে।

তাঁবুর এখানে-ওখানে চাঁদের আলোর ছিটে। সেই খাপচা খাপচা আলো-আঁধারির ভেতর আয়েঙ্গারের বসে যাওয়া বোঁজা দু-চোখ, কাঁচাপাকা ভুরু, মাথার শাদা-কালো চুল — সব মিলিয়ে একটা বুড়ো লোক। তাকে দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা অচেনা কান্না গলার কাছে ঠেলে আসতে লাগল আরতি নন্দীর।

এমন তো ছিলে না তুমি — কান্নার চাপা দমক আটকাতে আটকাতে নিজের মনেই বলে উঠল আরতি। তারপর হাত রাখল আয়েঙ্গারের বুকে।

কোনো সাড়া নেই।

তরঙ্গও না।

শরীর তার কোনো ভাষা ফুটিয়ে তুলল না।

হাতের আঙুলে নতুন করে আয়েঙ্গারের পেকে ওঠা বড়ো বড়ো বুকের লোমে নাড়াচাড়া করতে লাগল আরতি। এ-ধরনের কুড়কুড়ি খুবই পছন্দ করে আয়েঙ্গার। তবে এখনো করে কি? বোঝার কোনো উপায় নেই।

আগে ছোঁয়ামাত্র শরীর কথা বলত।

না ছুঁলেও বলত। আয়েঙ্গার যেন তৈরিই থাকত সব সময়। কত বার একটু বিরক্ত হয়েই বলেছে আরতি, বাব্বাঃ, যখন তখন, এমন করে হয় না কি! হাঁস-মুরগি কি আমরা?

ইদানীং মন খারাপ নিয়ে থাকা আয়েঙ্গার মাঝে মাঝেই একটু যেন হা-হুতোশ করেই বলে, আমার বুকের সব রোঁয়াগুলো পেকে গেল সার্কাস সার্কাস করতে করতে। কোথা দিয়ে যে সমস্ত দিনরাত্রি কেটে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আবার যদি নতুন করে শুরু করা যেত। একদম গোড়া থেকে। বেশ হত তা হলে। অনেকগুলো ভুল শুধরে নেওয়া যেত জীবনের। সবটা অন্যরকম ভাবে করতে করতে যদি বদলে দেওয়া যেত জীবনের ধারা। তা আর হয় না বোধহয়। কোনোভাবেই হয় না।

ঘুমের মধ্যে ডাব্বু পাশ ফিরল। এতক্ষণ শুয়ে ছিল চাঁদের দিকে মুখ করে। এবার ফিরে শুতেই পিঠ চলে গেল চাঁদের আলোর পড়ে থাকা গুঁড়োর মধ্যে। ঘুমিয়ে একেবারে ন্যাতা

হয়ে গেছে ছেলে। ওকে নিয়েও কথা বলে মাঝে মাঝে। বলে, বুড়ো বয়েসের ছেলে। ভেবেছিলাম বয়েস হচ্ছে। এবার পাশে দাঁড়াবে ছেলে। কোথা থেকে কি হল! হাবাগোবা ছেলে নিয়ে এখন সারাজীবন কাটাতে হবে। যত বড়ো হচ্ছে, তত সমস্যা বাড়ছে। আমরা দু-জন বেঁচে থাকতে থাকতে আমাদের সামনেই যদি চলে যায়, তা হলে ভালো হয় বড়ো। না হলে কষ্ট পাবে অনর্থক। কে দেখবে? কে খাওয়াবে, পরাবে, ওষুধ দেবে? চান করাবে?

মানুষটার এরকম কথা শুনে জোর করে হাত চাপা দি মুখে। কী বলে রে বাবা! বাঘ-সিংহর সঙ্গে থেকে থেকে মায়া দয়া কি সব চলে গেল নাকি? বাবা বাঘ, বাবা সিংহরা যেমন নিজেদের বাচ্চা দিয়ে জলখাবার সারে, এ যে দেখছি তেমনই কথাবার্তা। এভাবে বললে বুক কেঁপে ওঠে না!

একদিন তো খুব করে নেশা-টেশা করে ডাব্বুকে অনেক আদর-টাদর করতে করতে হঠাৎ একেবারে অন্য লোক। চেনাই যায় না। ঝাপসা কাচে মোড়া দু-চোখের মণি কেমন যেন ঠাণ্ডা আর স্থির। আচমকা ডাব্বুকে মাটি থেকে তুলে ধরল আদর করতে করতে। তারপর বলল, ফেলে দি! এবার ফেলে দি! এই তো বছর দুই আগে। সত্যি সত্যি অনেকটা ওপর থেকে আছাড় দিতে চাইছিল ইচ্ছে করে। ছেলে তো প্রথমে খুব হাসছে। তারপর বাবার মুখ-চোখ দেখে কী যে কী বুঝল কে জানে! হঠাৎ ভ্যাঁ করে মহাকান্না জুড়ে দিল। তারপর কেঁদেকেটে সারা। তখন তাকে চাপড়ে চাপড়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। হাঁ মুখের ভেতর জোরে ফুঁ দেওয়া। সে বড়ো কঠিন কাজ। এই করে করে কান্না থামানো। ছেলে তো কেঁদে ককিয়ে নীল একেবারে। কীসে যে ভয় পেয়ে গেল ছেলে! বোধহয় বুঝতে পারল বাপের মতিগতি। ভাগ্যিস কাছে ছিলাম, তাই তো সামলানো গেল কোনোরকমে। কাছে না থাকলেই হয়েছিল চিত্তির।

যত বড়ো হচ্ছে ডাব্বু, তাকে নিয়ে তত চিন্তা বাড়ছে আমাদের। সত্যিই তো আমরা যে-দিন থাকব না পৃথিবীতে, সেদিন কি হবে ছেলের! কে দেখবে তাকে?

ছেলেবেলা থেকেই খুব একটু কেমন যেন। সব বাচ্চা যেমন চনমনে, ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, তেমন নয় একেবারেই। বরং খানিকটা চুপচাপ, কেমন যেন ম্যাদামারা যাকে বলে। আর বায়না চাপলে তো আর কথা নেই। তখন পৃথিবী এক দিকে আর ও এক দিকে। যা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে চাই। একটা ব্যাপার অবশ্য আছে। এরই মধ্যে গান শুনলে ছেলে একদম চুপ। সুর শুনলেই হল। যে-কোনো সুর। শুনতে শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। এই একটা সুবিধে। তবু খানিকটা আটকে রাখা যায় ইচ্ছেমতো।

চাঁদের আলো আয়েঙ্গারের শাদা লোম বোঝাই বুকে আটকে আছে। বড়ো মমতায় সেখানে হাতের আঙুল আলতো করে ছুঁইয়ে দিল আরতি। তবু ভাঙল না আয়েঙ্গারের ঘুম। আরতির খুব ইচ্ছে করল আয়েঙ্গারের বুকে তার মাথাটা রেখে দেয়। কিন্তু সেই প্রবল ইচ্ছেকে একরকম জোর করেই আটকালো আরতি। হয়ত ঘুম ভেঙে যাবে মানুষটার। আহা, ঘুমোক। মনে মনে এটুকু বলে পাশ ফিরে ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল আরতি। তারপর ডাব্বুর মাথাটাকে বেশ জোরে নিজের কাছাকাছি টেনে এনে গভীরভাবে চুমু দিল তার চুলে। ঠিক তখনই নিজেদের তাঁবুতে স্টিলের কালো ভারী ট্রাঙ্কের ভেতর রাখা বড়ো আয়না নামিয়ে নিজেদের মুখ দেখতে দেখতে কাতু আর কুতুর মনে হলো বয়স বড়ো তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে

রাখা খুবই কঠিন। বিন্দুতেই আটকে রাখা যায় না। সে কেবলই এগিয়ে যায় পিছলে পিছলে। তার সঙ্গে ছুটে পারা শক্ত।

বড়ো আয়নার কাচ ঝকঝক করে ওঠে জ্যোৎস্নায়।

কেউ যেন আগাগোড়া লেপে দিয়ে গেছে চাঁদের আলো। সেদিকে তাকিয়ে নিজেদের জোড়া মুখ দেখতে পায় কাতু আর কুতু। আজ রাতে লুডো খেলা চৌপাট করে দিল মালিকের হাবা ছেলেটা। বাঘ, বাঘ দেখতে শালা। শা-আ-লা, কত শখ। পোঁদে নেই ইন্দি/ভজরে গোবিন্দি। দিয়ে গেল বরবাদ করে আমাদের গোটা খেলাটা, মনে মনে ভাবল কুতু। পড়ল একটা পুট কত্ত কষ্ট করে। ছক্কার পর পুট ফেললাম। সেটা তো গোলেমালে হারিয়ে তখনই শুরু হয়ে গেল তর্কাতর্কি, আদৌ এই পুট পড়ায় ঘুঁটি বেরোবে কি না ঘর থেকে, তা নিয়ে। হয়তো একটা ডিসিশন কিছু হয়েই যেত। শুরু হত খেলা। তার মধ্যেই ওই মাগি। শালির মাঝরাতে শখ উঠল ছেলেকে নিয়ে বাঘ দেখাবে। তাও যদি বুঝতুম ছেলের মতো ছেলে, রাজপুত্তুর। তা কোথায়? এ-তো রাজার ব্যাটা কেরোসিন তেলঅলা। ছেলে না পিলে! গোঁ গোঁ গাঁ গাঁ—আ-আ করে কী বলে বোঝে কার বাপের সাধ্যি! গোঙা কোথাকার! তাকে নিয়ে আদিখ্যেতা কত। তো সে যা হোক, বাঘ দেখাবি, সিংহ দেখাবি — যা খুশি দেখা গিয়ে। কিন্তু আমাদের রাতের খেলাটা তো চৌপাট হয়ে গেল একেবারে। যাকে বলে একদম সর্বনাশের ওপর সাড়ে সব্বোনাশ। পুরো চটকে গেল খেলাটা।

আয়নায় ফুটে ওঠা নিজেদের জোড়া মুখ পাশাপাশি দেখতে দেখতে মনে হল কুতুর, একই ডাইসে ফেলে তৈরি করা হয়েছে দু-জনকে। হবে নাই বা কেন, যমজ হলে যা হয়, যেরকম হয়, তেমনই হয়েছে।

আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে দেখতে তার পাশেই কুতু দেখতে পেল আলকাতরা মাখানো ডালডার টিন আর বাঁশ দিয়ে বেড়া-দেওয়া পুকুরের ধারে মাটির রাস্তা। একটু জল পড়লেই একদম কাদায় কাদা। সেই পুকুরের ধারে ধারে টিন আর বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঁকড়া, গেঁড়ি-গুগলি। কুচে মাছ, কাঁকড়ার বাচ্চা। কত কত তো চোখা মাছ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ভেতর। ল্যাজে কালো ফুটকি দেওয়া পুঁটি মাছ। কী চকচকে রুপোলি তাদের সারা গা। তাদের কোনো কোনোটা আবার সামান্য লালচে।

আমরা দু-ভাই খুব গেঁড়ি তুলতাম। বাড়িতে অভাব। বাবা ভিক্ষে করত। এক সময় আমাদের যমজ দু-ভাই এক দিদি, দু-বোনকে ফেলে কোথায়, কোন নিরুদ্দেশে চলে গেল। তার আর কোনো খবর নেই। মা বাবু-বাড়ি খাটে। ক্ষারে ভেজানো কাপড় কাচে, ধান ঝাড়ে, ধান সেদ্ধ করে, গোয়াল সাফাই করে। ছাগলদের, গরুদের খেতে দেয়। আমাদের একটা ছোটো বোন মায়ের আঁচলের তলায় তলায় ঘোরে। আমাদের বাড়ির ছাগল নিয়ে গিয়ে মাঠে বেঁধে বসে থাকে। আমরাও ছাগল চরাতে যাই বোনের সঙ্গে।

বর্ষায় পুকুরপাড় থেকে কাঁকড়া ধরি, গেঁড়ি তুলি। তখন আমাদের দু-জনের নাম বাচ্চু আর বাবু। আমি বাবু। কাতু বাচ্চু।

বাবু, দুপুরবেলা পুকুরধারে ঘোরাঘুরি করছিস কেন রে? কেউ একজন জানতে চাইল, গ্রামেরই লোক। ভালো করে দেখি বামুনপাড়ার নরেশকাকা। নরেশ আচায্যি।

ও কিছু না কাকা!

কিছু না মানে! দুপুরবেলা কেউ ঘোরে পুকুর ধারে! আবার একই সঙ্গে দুই বেঁটেতেই আছ। মানে দুই ভাই। একা রামে রক্ষা নাই / সুগ্রীব দোসর। মাছ চুরির মতলব নাকি?

না, কাকা।

তা হলে দুপুরবেলা ঘোরাঘুরি করছিস কেন?

এমনি।

এমনি এমনি কেউ ঘোরে — ফাঁকা এই পুকুর-ধারে? বল কী মতলব!

কিছু না কাকা।

বেঁটের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। বল, বলতেই হবে কেন ঘুরছিস?

নরেশ আচায্যির ধমক শুনে ভেতরে ভেতরে খুব রাগ হয় কুতুর। বর্ষায় টিন মোড়া বাঁশের গায়ে অনেক অনেক কাঁকড়ার বাচ্চা, গেঁড়ি, গুগলি। কুঁচে মাছ। গুগলি তুলে নিয়ে গেলে খোলা ফাটিয়ে ভেতরের নরম শাঁসটা বার করে এনে পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা দিয়ে চমৎকার রান্না করে দেয় মা। তা দিয়ে অনেকটা ভাত খাওয়া যায়। কিন্তু সকলের সামনে গেঁড়ি তুলতে লজ্জা করে। দেখলেই সবাই বলবে, ভিখিরির বাচ্চা ভিখিরি, গেঁড়ি তুলছে, রান্না করে খাবে বলে। তখন ভারি লজ্জা করে। কান্না পায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় অপমানে। মুখে তবু অন্যরকম ভাব ফুটিয়ে তুলে বলি, মা কালীর দিব্যি। আমরা গেঁড়ি খাই না। ও আমাদের হাঁসে খাবে। সত্যি সত্যি গেঁড়ি ভেঙে দিলে হাঁসে খায়। আর গেঁড়ির ঝোল এমনিতেই নাকি খুব উপকারী। চোখের পক্ষে ভালো, সবাই বলে। পেটের রোগেও নাকি গেঁড়ি গুগলি খেতে বলে কেউ কেউ। এমনকী যাদের চোখ খুব খারাপ, প্রায় কানা হয়ে গেছে, তারাও কখনো কখনো গেঁড়ির পেটের ভেতর যে জল থাকে, সেই জল দিয়ে চোখ ধোয়। তাতে নাকি চোখ খুব ভালো থাকে। তো সে সব যাকগে। কিন্তু নরেশ আচায্যি কেন যে আমার পেছনে পড়ে গেল! কুতু কিছুতেই গোছাতে পারছে না নিজেকে।

কী ব্যাপার, বললি না তো কেন ঘুর ঘুর করছিস এখানে? আমাদের সাত শরিকের এই পুকুর এখন জমা নিয়েছে কানাই জেলে। সেই জমার পুকুরে মাছ ধরা বন্ধ জানিস না?

মাছ ধরছি না কাকা?

তা হলে কী করছিস?

গেঁড়ি তুলব।

কেন?

হাঁসে খাবে।

শালা, আবার মিথ্যে কথা। নাটা আদমি খুদা কা দুশমন। গেঁড়ি তো খাবি তোরা। ভিখিরির ব্যাটা ভিখিরি।

না, কাকা। সত্যি সত্যি হাঁসে খাবে। মা কালীর দিব্যি।

আবার মা কালীর দিব্যি দিচ্ছিস, মিথ্যে বলে! যা বাড়ি যা।

দূরে দাঁড়িয়ে বাচ্চু। যার এখনকার নাম কাতু। হঠাৎই বেশ রেগেমেগে বলে উঠল, বুড়ো ভামটার সঙ্গে এত কীসের কথা। শালা হারামি, ছুঁড়ব শালা একটা থানকা। মাথা চেপে পড়ে থাকবে রাস্তায়।

তবে রে! নরেশ আচায্যি হাতের বড়ো ডান্ডাওয়ালা ছাতা উঁচু করে ভয় দেখায়।

মারব শালা ইটের বাড়ি। বলেই হাতে একটা থানকা তুলে নেয় বাচ্চু।

সামনের গোটা আয়না ভেঙে চৌচির। তার ওপর চোখ ধাঁধানো চাঁদের আলো। সবটা মিলিয়ে কেমন যেন ছেতরে যাওয়া জ্যোৎস্না।

গ্রামের বাড়ি থেকে কেমন করে যেন হাত বদলে হয়ে গেলাম সার্কাসের। সার্কাসের জোকার। বাবু থেকে কুতু। বাচ্চু থেকে কাতু। কত টাকায় মা বিক্রি করেছিল আমাদের দু-ভাইকে। নাকি ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে নিয়ে এল ছেলে-ধরা, মুখে ক্লোরোফর্ম মাখা রুমাল চাপা দিয়ে। তা-ই বা কী করে হয়? ছেলেধরা ধরে নিয়ে এলে আগাগোড়া ভিক্ষে করাত আমাদের। এমন যে আমুদে, রগড় করা জোকার হয়ে উঠলুম যমজ দুই ভাই মিলে, তা কেমন করে হত!

পয়সা নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে মা! না হলে আমাদের দু-ভাইকে একসঙ্গে দিয়ে দিল কেন! নাকি দুটো পেট কমে গেল, তাতে সুবিধে হল খানিকটা। ভাত জোগাতে হবে না অন্তত দুটো মুখে, চার বেলা। সেটাই বা কম কি মায়ের কাছে।

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসছে আয়না।

সেই কুয়াশামাখা আয়নার ভেতর থেকেই কাতু বলল, চল কুতু, এবার শুয়ে পড়ি। লাড্ডু, টুপি ওরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল সকালে আবার বাজার যাওয়া আছে। তারপর প্র্যাকটিস।

নিজের গালে ব্রণ হয়েছে কয়েকটা। আয়নার কাচে তাদের বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কুতু। ব্রণগুলোর কোনো-কোনোটার মাথা, মুখ বেশ পেকে গিয়ে টুস টুস করছে। আঙুলের নখ দিয়ে টিপে ওর ভেতরের মালটা বের করে ফেলতে পারলে শান্তি। এই ভেবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর নখে নিজের গালের ব্রণ টিপতে লাগল কুতু।

আয়নার কাচে পাশাপাশি দুই ভাই। একই রকম মুখ। এক ধরনের ভাঁজ, রেখা। শুধু কাতুর মুখে ব্রণ নেই, কুতুর মুখে আছে।

চাঁদের আলোয় জল ন্যাকড়ায় মোছা শাদা স্লেট হয়ে ঝকঝক করছে আয়না। তাতে দুই ভাইয়ের হাসি হাসি, কান্না কান্না নিরুপায় মুখ। নজর করে দেখলে চোখে পড়বে গালে পেকে ওঠা দাড়ির সাদা সাদা ফুটকি। সেই সব ফুটকির গোড়ায় চাঁদের মিহি গুঁড়ো। বয়স তো অনেকটাই বেড়ে গেল দেখতে দেখতে। সত্যি সত্যি যদি উঠে যায় সার্কাস, মানে তুলে দিতে বা বন্ধ করতে বাধ্য হয় এস. আয়েঙ্গার, তখন আমরা যাব কোথায়? কোনখানে গিয়ে দাঁড়াব। খাব কী! এ-সবটাই তো ধাঁধাবিশেষ হয়ে সামনে আসে বারে বারে। এই আষাঢ়ে ঘাটশিলায় অপুর পথের পাশে, দাহিগোড়ার ফাঁকা মাঠে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে বসে বসে কুতুর মনে হল এখান থেকে আমরা চলে যাব ওড়িশায়। কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী। তার আগে হয়তো জামশেদপুর যাওয়া হবে। টাটানগরে শুনছি বুকিং হয়ে গেছে।

কে যেন বলছিল সেদিন। এবার যদি বুকিং না-ও হয়, বরাবরই কিন্তু এই যে রাস্তা, তাই ধরে এগোতে থাকে সার্কাস। শীতে কলকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দান। তারপর গরম আর বর্ষায় বিহারের ঘাটশিলা, গালুডি, টাটানগর হয়ে ওড়িশায়। সেখান থেকে অসম। এভাবেই

চলা। তারপর আবার নেমে আসা শীতের আগে, কলকাতার দিকে। ঘন শীত পড়তে না পড়তেই তাঁবু খাটিয়ে কলকাতায়। খবরের কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, দেওয়ালে দেওয়ালে রঙিন বড়ো পোস্টার। সেখানে ট্রাপিজের খেলা দেখানো জাঙিয়া আর বডিজ পরা মেয়েদের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছবি।

বাঘের খাঁচা থেকে খুব জোরে হা-আ-আ-উ-উ-ম, হা-আ-আ-উ-উ-ম ডাক ভেসে আসছে। দিনে সাত-আট কিলো মাংস লাগে বাঘটার। সিকান্দারের আর একটু কম। বুড়ো হয়েছে তো। হজম করতে পারে না। লেপার্ড দুটোর এক-একটা সাবড়ে দেয় তিন-সাড়ে তিন কিলো। সব বড়ো খাসির মাংস। আগে সস্তা ছিল। এখন চল্লিশ টাকার ওপর কিলো।

আজ আর বোধহয় ঘুম হবে না। টুপি আর লাড্ডু কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। বেশ শব্দ করেই নাক ডাকাচ্ছে ওরা দু-জন। ফু-রু-র ফোঁত, ফু-রু-র ফোঁত, ফু-রু-র ফোঁত। তালে তাল মিলিয়ে নাক ডেকে উঠছে দুজনের। কী শান্তি, কী আনন্দ, কেমন মজা। আর কী আশ্চর্য, কিছুতেই ঘুম এল না আমাদের দু-চোখে এখনো। সেই লুডো খেলাটাও মাটি হয়ে গেল। তাসেও বসা গেল না এক দু-হাত। ভাবতে ভাবতে বড়ো করে হাই উঠল কাতুর। সঙ্গে সঙ্গে কুতুরও।

হাই বড়ো হিংসার জিনিস, মা বলত। একজনের উঠলেই দেখাদেখি আর একজনেরও উঠবে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাঙাল কাতু।

নিজেকে নিজে ভেঙচে বেশ লাগল। তাই আবারও ভ্যাঙচাল। আরো একবার।

নিজের যমজ ভাইয়ের এই ছেলেমানুষি দেখে বেশ কষ্ট করে হাসি চাপতে গিয়েও হেসে ফেলল কুতু। প্রথমে একবার মুখ মচকে। তারপর বেশ জোরে। দিব্যি হাঃ, হাঃ, হোঃ, হোঃ।

চল, এবার শুতে যাই—বড়ো করে হাই তুলতে তুলতে বলল কাতু।

রাত তো কাবার হয়ে এল প্রায়।

না, না এখনো অনেকটাই বাকি আছে।

শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে পড়ব।

তা কি কখনো হয়। শুলেই ঘুম আসে।

এতটা রাত জেগে কেমন যেন চোঁয়া চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। বলেই ঢেউ ঢেউ করে দু-বার ঢেকুর তুলল কুতু।

চল, রেডিয়ো শুনবি!

কেন, এত রাতে রেডিয়ো কেন? কাতুর কথার পিঠে কথা ফেলে জানতে চাইল কুতু।

না, এমনি বলছিলাম। এফ. এম.-এ সারা রাত খুব ভালো ভালো গান দেয়।

এখানে এফ. এম. পাবি কোথায়? এটা তো বিহার।

ও মা তাও তো বটে।

তবে এখনো বিহার আছে, আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড হয়ে যাবে হয়তো।

সেটা আবার কি?

এমন বোকার মতো কথা বলিস না। সেটা হল গিয়ে একটা নতুন রাজ্য।

ওমা, তাই! কথাটা বলে গালে আঙুল ঠেকিয়ে আয়নার দিকে তাকাল কাতু। সঙ্গে সঙ্গে আয়না তাকে মুখ ভেংচে উঠল।

অন্ধকারে চুপচাপ বসে সিকান্দার। খাঁচার ভেতর রাতে খুব একা লাগে। কতদিন হল সুনয়না নেই। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কত কি ইচ্ছে চলে যায়। ক্রমশ একটু একটু করে মারা যেতে থাকে ইচ্ছেরা। তারপর এক সময় সবটাই কেমন পাথর পাথর। অভ্যাসে বেঁচে থাকা।

তোর মনে আছে কুতু, আমাদের বাড়ি খুব সবুজ আর ঝাড়ালো একটা কাগজিলেবুর গাছ ছিল। বাবা নাকি লাগিয়েছিল হাতে করে। সেই বাবা তো কোথায় না কোথায় চলে গেল। তারপর সেই লেবুচারার দেখভাল করত মা। একটু একটু করে বড়ো হল সেই গাছ। কলমের নয় তো। তাই লম্বা হতে বেশ দেরি লাগছিল। মনে আছে তোর?

কাতুর কথা শুনে ঘাড় নাড়ল কুতু। হ্যাঁ কি না — তা থেকে বোঝা গেল না অন্ধকারে। বড়ো আয়নায় সেই ঝাপসা মতো ছায়া হঠাৎ দুলে উঠেই মিলিয়ে গেল।

লেবুগাছের গোড়ায় মা বাবু-বাড়ি থেকে আনা মাছের আঁশ, পটকা এই সব দিত। দিতে দিতে বলত, রক্ত, মাংসের সার পেলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। হাড়ের গুঁড়োও সার হিসেবে খুব ভালো। সে-সব নাকি দেয় গোলাপ বাগানে। এমনকী মাছ ধোয়া জলও যদি গোড়ায় ঢালা যায় তা হলে ফনফনিয়ে ওঠে গাছ। আমাদের বাড়ি আর আঁশজল কোথায়! তবে চাল ধোয়া জল ঢালতে দেখেছি মাকে লেবুগাছের শেকড়ে। তরকারি ধোয়া জলও। তো সেই গাছ তো খুব ফনফনিয়ে বেড়ে উঠল। তার ডালে ডালে সবুজ পাতা, ছোটো ছোটো কাঁটা। কাঁটার আশেপাশে লেবু ঝুলছে। নিজেদের গাছে, নিজের জমিতে নিজের হাতে লাগানো গাছে ফল ধরলে কি যে আনন্দ। সে যাদের হয়, তারাই জানে। লেবুপাতার গন্ধ কি সুন্দর! আমরা ভাতে ডলে খেতাম। কাগজি লেবুর খোসা কত পাতলা। আর কি রস তাতে, একদম টইটম্বুর।

কামিনী আর সুন্দরী ঘুমোতে ঘুমোতে ল্যাজের ঝাপটায় বড়ো বড়ো মশা, ডাঁশ তাড়াতে তাড়াতে কত কী ভাবছে মনে মনে। তাদের লম্বা শুঁড়ের ওপরও মশারা বসে গেছে লাইন দিয়ে নেমন্তন্ন খেতে। পাশে পার্বতী আর বাদশারও একই দশা।

সুন্দরীর মাঝে মাঝেই মনে পড়ে সেই বিশাল মেলার কথা। সেখানে কাছেই বড়োসড়ো এক নদী। হেমন্তের শুরুতে নদী তেমন চওড়া নয়। মানে জল কমে গেছে। শাদা বালিতে বালিতে ছয়লাপ নদীর চর। সেখানে দূর দূর থেকে আসা শীতের পাখি, বালিহাঁস এসেছে। খুব ভোরে আর সন্ধের মুখে মুখে নদীর চরা বালিহাঁসের কলধ্বনিতে একেবারেই অন্যরকম হয়ে যায়।

অনেক অনেক হাতি এসেছে মেলায়, বিক্রির জন্য। সঙ্গে ঘোড়া, উট, মোষ, গরু বলদ। আরও সব জীবজন্তু, পাখি রয়েছে। সুন্দরীর মনে পড়ে নদীর ধারে ধূ ধূ করে জেগে থাকা অনন্ত বালিরাশি।

সন্ধের মুখে সূর্যের আলোয় আস্ত সেই নদী, বালির পাড় একদম অন্য রকম হয়ে যাওয়ার আগে বন্দুকের একটা-দুটো শব্দে একসঙ্গে যে উড়তে থাকে কত কত পাখি। তাদের কালচে ছায়ামাখা ডানায়, ঠোঁটে, সরু সরু পায়ে ক্রমশ লালচে হয়ে আসা সূর্য ঢেকে যেতে থাকে একটু একটু করে। কী এক ভয়-ছোঁয়া করুণ সুরে ডাকাডাকি করতে থাকে সেই সব পাখিরা।

আর তখনই সূর্যাস্ত তার নিজস্ব রং মেলার গায়ে মাখিয়ে দিয়ে গেলে কমলা বিবি, জোহরা বিবি, আঙ্গুরি বিবি — এদের বড়ো বড়ো মুখের ছবি লাগানো তাঁবুর বাইরে নওটঙ্কির মজা নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। হ্যাজাক, কার্বাইড-বাতি, হ্যারিকেন, ভটভট করে চলা জেনারেটরের বিজলি — সব মিলিয়ে আলোয় আলোয় মেলা আবার অন্যরকমভাবে জেগে ওঠার জন্য গা ঝাড়া দেয়।

ক-দিন আগেই কার্তিক পূর্ণিমা গেছে। তার আলোর রেশ এখনো ছুঁয়ে আছে আকাশের মুখ। টুপ টুপ করে নেমে আসা হেমন্তের হিমে ভিজে যাচ্ছে সুন্দরীদের পিঠ, শুঁড়, শাদা দাঁত, পা। লোহার মোটা শেকলে আটকে থাকা পা নাড়ালে শেকলের শব্দ ওঠে — ঠন ঠন ঠন, ঠনা ঠন। নদীর বুক থেকে উঠে আসা বাতাস সবার গায়ে মাখিয়ে দিতে থাকে শিরশিরানি। আর তখনই নওটঙ্কির তাঁবুতে বেজে ওঠে সারেঙ্গি, তবলার বোল। ঘুঙুরের আওয়াজ মাত করে দিতে চায় সব কিছু। সেই সারেঙ্গি, তবলা আর ঘুঙুরের বোল দেখতে আসা লোকজনের বুকে ছুরি ঘুসিয়ে দেয় একদম।

'লেকে পহেলা পহেলা পেয়ার...'

হাওয়ায় গান ভাসে, তাঁবুর ভেতর। নওটঙ্কি দেখতে আসা মাথায় ভারী পাগড়ি, হট্টাকাট্টা লোকজন দু-চোখে ঝুমতি হুয়ি নেশা নিয়ে লাল লাল বড়ো বড়ো আঁখ, ফেড়ে ফেড়ে জওয়ানি দেখে।

'ঝুমকা গিরা রে, বরেলি কি বাজার মে...'

বুকে সাজানো গুলির বেল্ট। কাঁধে দোনলা বন্দুক, নয়তো রাইফেল। পায়ে কাঁচা চামড়ার ওজনদার নাগরা। সেই জুতির নীচে কমলালেবু কোয়া চেহারার লোহার নাল।

'পান খায়ো সাঁইয়া হামারো...'

ঘন ঘন চাড়া পড়ছে কেয়ারি করা, বাহারি গোঁফে।

বাইরে সুন্দরী, কামিনী — এমন আরো অনেকে দাঁড়িয়ে চেন বাঁধা পা নিয়ে।

বিছানায় শুয়ে বার বার এপাশ-ওপাশ করেও দু-চোখে ঘুম আসতে চায় না আরতির। একবার যদি পালায় ঘুম, তা হলে আর দেখতে হয় না। কিছুতেই যেন জোড়া দেওয়া যায় না। আগে এমন ছিল না। আজকাল কীরকম যেন বদলাবদলি হয়ে যাচ্ছে সব।

ডাব্বু এখন চিৎ হয়ে শুয়েছে। চাঁদের ভাঙা আলো তার মুখে। গালের একপাশে। সমানে নাল গড়াচ্ছে ছেলের। এ তো বোধহয় আর কমবে না কোনোদিন — যতদিন বাঁচবে, এমনটি মনে হতেই লম্বা শ্বাসে বুক ভাঙল আরতির। অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছে আয়েঙ্গারও। একদম চিৎ হয়ে। বুকের ওপর দু-হাত জড়ো করা। অল্প অল্প লালা বেরিয়ে আসছে তারও কষ বেয়ে বেয়ে। এসব দেখতে দেখতে ঘোলা ঘোলা চাঁদের আলোর মধ্যে কেমন যেন মায়া লাগল মানুষটার ওপর। মাথার কাছে রাখা ছোটো হাত-তোয়ালেতে প্রথমে ডাব্বুর মুখ, পরে আয়েঙ্গারের মুখ খুব যত্ন করে আলতো হাতে মুছিয়ে দিল আরতি। বেশি গড়ালে বালিশ ভিজোবে।

চাঁদ এখন প্রায় গড়িয়ে গেছে পুব আকাশে। তার আলোয় কি এক আশ্চর্য, বিধুর মায়া। সেদিকে না তাকিয়েও মনটা নতুন করে খারাপ হয়ে গেল আরতির। কি হবে, যদি সব জীবজন্তু

ছেড়ে দিতে হয়। খেলা দেখাব কাদের নিয়ে? কে আসবে, কারা টিকিট কাটবে? কেনই বা ভিড় জমবে সার্কাসের তাঁবুর পাশে?

তার ওপর দিনকালও তো সব কেমন বদলে বদলে যাচ্ছে। এই ঘাটশিলাতে এখন রাস্তায় প্রায়ই মিছিল — ধামসা মাদল বাজিয়ে। সঙ্গে অনেক অনেক মানুষ। তাদের হাতে টাঙি, গাঁড়াসা, ভালা, লাঠি। 'হুল ঝাড়খণ্ড' — এই স্লোগান দিচ্ছে তারা। আলাদা রাজ্য চাই এখানকার আদি বাসিন্দাদের জন্য। বিহার থেকে, বাংলা থেকে, ওড়িশা থেকে খানিকটা খানিকটা কেটে নতুন রাজ্য, ঝাড়খণ্ড চাই। এমনই দাবি তাদের।

দিনের বেলা এইসব মানুষদের মিছিল প্রায়ই ঘুরে বেড়ায় এ-রাস্তা ও-রাস্তা। সঙ্গে থাকে ধামসা-মাদলের বাজনা। ডি-ডি-ম ডি-ম... ডি-ডি-ম ডি-ম। ধামসা বাজছে। বাজছে মাদল, রামশিঙা, নাকাড়া। ঘুম ভেঙে যায় কখনো কখনো। ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানার ওপর। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে জল খায়। তারপর মুখ মোছে। ঘাড় মোছে। গলায় তোয়ালে বোলায়। সারা শরীর ঘামে ঘাম।

বিছানায় আবার টান টান হয়ে আরতি ভাবে নতুন রাজ্য যদি হয়, তা হলে কি সেখানে পাওয়া যাবে সার্কাস দেখানোর অনুমতি। নাকি আরো নতুন নতুন নিষেধ, আইনি ফাঁস চাপবে সার্কাসের কাঁধে! বলা তো যায় না কিছুই। যা দিনকাল পড়েছে। যত মরণ গরিবের। আগেও তাই ছিল, এখনো তাই।

আয়েঙ্গার এ-সব নিয়ে ভাবে টাবেই না বোধহয়। কেমন যেন হাল ছাড়া অবস্থা হয়েছে মানুষটার। কোনো কিছুতেই আর বোধহয় তেমন আসক্তি নেই। যা চলছে, যা হচ্ছে — তেমনই চলুক, হতে থাক। এরকম একটা ভাব — সব সময়। তার ওপর আছে যখন তখন কারণে অকারণে রেগে যাওয়া। কী যে হবে। ভাবলে মাথা পাগল পাগল করে।

বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবার নতুন একটা হাই তুলল কুতু। পাশে দাঁড়ানো কাতুও হাই তুলল। তাদের দু-জনের ভিরকুটি মুখের ছায়া পড়ল আয়নায়।

চল, বাইরে যাই। হঠাৎই বলে উঠল কাতু।

কোথায়?

সুবর্ণরেখার পাড়ে।

কেন?

নদীর জলে শেষ রাতের চাঁদ কেমন ভেসে আসে দেখব। একদম চিনির পাতলা রসে রসগোল্লা যেন।

তোর সবেতে খাওয়ার কথা। বড্ড পেটুক তুই।

ও শুধু আমি! তুই নোস!

এবার চুপ করে রইল কুতু।

যাবি কি?

গেটে পাহারা আছে না! ভুলে গেলি! যাব কেমন করে?

তা হলে চল বাইরে বেরোই। ভেতরটা বড্ড গুমোট। গরম লাগছে।

চল।

জ্যোৎস্নায় চারপাশ বুঁদ হয়ে আছে তখন। একটু দূরেই সুন্দরী আর কামিনী। পায়ে মোটা মোটা লোহার জঞ্জির। ওদের কষ্ট হয় না পায়ে শেকল নিয়ে? আপন মনেই বলল কুতু।

অভ্যাস হয়ে গেছে।

চ্যাটালো, বড়ো একটা প্লাস্টিকের গামলায় ভরতি আছে জল। তেষ্টা পেলে খাবে সুন্দরী আর কামিনী। গামলার ওপর কাঠের ঢাকনা।

কি রে সুন্দরী, কামিনী, কেমন আছিস তোরা? জানতে চাইল কাতু।

এই কথার জবাবেই কিনা বোঝা গেল না, নিজেদের বড়ো বড়ো কান নাড়ল সুন্দরী। তারপর কামিনী। অল্প অল্প দোলালো শুঁড়ও।

কাঠের ঢাকনা ঠেলতে শুরু করল কুতু হঠাৎই। বেশ ভারী।

কি করছিস কি? কেউ দেখলে মার খাবি নির্ঘাত।

বেশ মজা হবে। দেখই না কি করি! হাঁ করে দেখছিস কি! হাত লাগা। হাত লাগা। দেখবি বেশ মজা হবে।

কি করছিস কি কুতু!

হাত লাগা না। দেখতে পাবি।

ঢাকনা সরে গেলে দেখা যায় গোল একখানা চাঁদ সেই গামলার জলে। সে-দিকে তাকিয়ে চকচক করে উঠল কাতুর চোখ। তারপর বলল, আমরা বেঁটে বক্কেশ্বর, চাঁদ ছুঁতে চাওয়া নাকি আমাদের বাড়াবাড়ি। কি, তাই না?

এমনই তো বলে সবাই।

কি যেন বলে কথাটা, কি যেন বলে! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। তা দ্যাখ, এবার কেমন হাত দি চাঁদে। বলে কাতু, সুন্দরী, কামিনীদের খাবার জন্য গামলায় রাখা জল ঘাঁটতে লাগল। প্রথমে আস্তে আস্তে। তারপর বেশ জোরে জোরে। জল আঁজলা করে তুলে ছেটাতে লাগল কুতুর গায়ে।

ভিজে যাব, ভিজে যাব বাবু।

ভিজবি না রে বাচ্চু। মজা হবে।

না রে না, ঠাণ্ডা লাগবে। জ্বর হবে। শো করতে না পারলে আয়েঙ্গার খিস্তি দেবে। প্যাঁদাবে।

অত সোজা। আজ কি আনন্দ দ্যাখ না, কি আনন্দ।

কেন, আনন্দ কেন?

ওমা, তাও ভেঙে বলতে হবে! কি বোকা রে তুই! বামন হয়ে, বেঁটে বক্কেশ্বর হয়ে, নাটা আদমি খুদা কা দুশমন হয়ে, দিব্যি চাঁদে হাত দিয়েছি। কেমন, তাই না! আনন্দ তো হবেই।

ও তো জলে ভাসা ছায়া।

ছায়া! তা হোক! চাঁদ তো — বলেই গলার কাছে উঠে আসা কান্না আটকে ফেলল কাতু।

বাবু, আমার শীত করছে রে! যদি জ্বর আসে!

আসবে না রে বাচ্চু। আসবে না। আমরা যে চাঁদ ছুঁলাম। নে, তুইও একবার ছুঁয়ে নে ভালো করে। ছোঁ।

কামিনী আর সুন্দরী অবাক হয়ে, খুদে খুদে চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগল তাদের খুব চেনা দু-জন বেঁটে বেঁটে মানুষ চাঁদের পলকা আলোয় অসম্ভব এক আনন্দে মেতে উঠেছে।

আমাদের জরুরি দিনগুলি

উপন্যাস

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশে জরুরি অবস্থা জারির ঠিক সাত মাস দশদিন পর একদিন শীত-উত্তীর্ণ ভোরে ব্রহ্মদার সঙ্গে চেপে বসলাম এসপ্লানেড থেকে এক দূরপাল্লার বাসে। গন্তব্য আন্ডারগ্রাউন্ড। তখন ব্রহ্মদার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ও তিনি গত তিন মাস ধরে প্রায়শ বদলে ফেলছেন ঠিকানা। কলকাতায় তাঁকে মাঝেমধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু সে-দেখা প্রায় অরণ্যদেবের মতো, আজ ধর্মতলায় দেখা যায় তো কাল শ্যামবাজারে, পরশু নিউ আলিপুর — যাতে পুলিশ কোনওক্রমেই তাঁর সুলুকসন্ধান না পায়। আমি ব্রহ্মদার নানা অতিমানবীয় কর্মকাণ্ড দেখছি আজ ক-বছর ধরে। তবে এবারের কর্মকাণ্ডটি অতিমানবীয় না বলে অতিদানবীয় বলাই সঙ্গত। দানবের সাহস না থাকলে এ-কাজ করা যায় না যা ব্রহ্মদা করেছেন। তারপরেই তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ।

সেই পুলিশের চোখের আড়াল হওয়ার জন্য আরও একবার এই দূরপাল্লা। এরকম প্রায়ই যান কখনও দশ বা পনেরো দিনের জন্য, কখনও দু-তিন মাসের জন্যও। আমি তাঁর এবারের যাত্রায় লেজুড়। কোনও কারণ ছাড়াই আমার অভিযান। কিংবা বলা যায় আন্ডারগ্রাউন্ড বস্তুটি ঠিক কীরকম তা চাক্ষুষ করাই আমার লক্ষ্য। অথবা নেহাতই এক ওয়ারেন্টির সঙ্গে পালিয়ে থাকার যে-রোমাঞ্চ আমার অভীষ্ট তাই।

বাসটা গাঁক গাঁক করে বোম্বে হাইওয়ে পেরোনোর মুহূর্তে আমার শরীরে ভর করছিল এক অতিজাগতিক শিহরন। কোলাঘাটে বাস থামতেই শরীরে ভরে নিয়েছি কিছু চা-চপ। তারপর আবার যাত্রা শুরু। বাসটা এগোচ্ছিল বাংলা বিহার ও ওড়িশার নবাব হওয়ার নৈমিত্তিক লক্ষ্যে।

আরও কিছুক্ষণ পর, নীল-সবুজে মেশা দূরপাল্লার বাসটা কী যেন একটা গূঢ় প্রয়োজনে সাময়িক যাত্রাবিরতি দিতেই ব্রহ্মদা বললেন, চলো, এখানে একটু চা খাওয়া যাক। বিহারের ধাবার চায়ে একটা আলাদা স্বাদ। ওরা ভঁইসের দুধে চা বানায় কিনা।

আরও অন্য অনেকের মতো আমরা দুজন পায়ে-পায়ে নীচে নেমে সেঁধিয়ে যাই ধাবাটার প্রশস্ত পরিসরে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রচুর দড়ির খাটিয়া। সকাল দশটা। টানা প্রায় চার ঘন্টার মতো বাসটা ছুটেছে একনাগাড়ে। বাংলা পেরিয়ে বিহারের মুখোমুখি। সামনেই চিচিরা নামের একটা জায়গা যা আসলে বাংলা আর বিহারের সীমা। কিন্তু এ-পথে বিহারের স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ নয়। মানচিত্রে যা দেখে এসেছি তাতে বাংলা আর ওড়িশার মধ্যে একফালি বিহার এখানে ঢুকে এসেছে ফলুই মাছের লেজের মতো। বাসটা আর একটু এগোলেই ঝামাপোল, সেই জায়গাটা বিহার আর ওড়িশার সীমান্ত।

দু-দুটো ভরভরন্ত চায়ের গেলাস নিয়ে বেশ মৌজ করে চুমুক দিয়েছি কি দিইনি, হঠাৎ ব্রহ্মদা ভুরুতে ডবল কোঁচ ফেলে নাকের লতিতে কী যেন ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করলেন, বেশ জোরে নিশ্বাস টানার শব্দ পাই, মনে হয়েছিল চায়ের গন্ধই নিচ্ছেন, কেন না ধাবার চায়ে

সত্যিই একটা অদ্ভুত গন্ধ। সেটা লবঙ্গ আর আদায় মেশামিশি না অন্য কিছু এমন ভাবার মধ্যে ব্রহ্মদা বললেন, বিল্ব, গন্ধটা ভালো ঠেকছে না!

অবাক হয়ে বলি, কীসের গন্ধ? চায়ের?

— না। বাতাসে বারুদের গন্ধ।

— বারুদ! এখানে বারুদ আসবে কোত্থেকে?

— নির্ঘাত বারুদ। চলো, বাসের মধ্যে গা ঢাকা দিই। বলতে বলতে ব্রহ্মদা আধ-খাওয়া চায়ের গেলাস খাটিয়ার কিনারে নামিয়ে রেখে উঠে পড়লেন খাটিয়ার আরাম ছেড়ে। আমিও তদ্রূপ। ধাবার পয়সা মিটিয়ে সোজা বাসের গেটের কাছে গিয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাতেই নজর বিদ্ধ হয় দু-জন রাইফেলধারীর দিকে। কাঁধে ঝুলন্ত রাইফেলদুটো না দেখেই, শুধু তার কার্তুজের গন্ধ, বাতাস ভর করেই কি এসে পৌঁছোল ব্রহ্মদার নাকে! নইলে কীভাবেই বা ব্রহ্মদা অনুমান করলেন গন্ধটা!

একগলা আশ্চর্যে ওতপ্রোত হয়ে দুজনেই ততক্ষণে বাসের সিটে অন্তরিন। বাংলা আর বিহারের বর্ডারে কিছু পুলিশ যে থাকবে এ-কথা অবাক করার মতো নয়। কিন্তু দূরপাল্লার বাসে ওঠার পর থেকেই ভারী নিশ্চিন্তে ছিলেন ব্রহ্মদা। পুলিশভর্তি কলকাতা শহরের বাইরে বেরিয়ে হয়তো বা এক মুহূর্ত তাঁর মনে হতেই পারে, যাক, এ-যাত্রা রেহাই পাওয়া গেল। যে-ব্যক্তির নামে একটা জলজ্যান্ত ওয়ারেন্ট ঝুলছে তাঁর তো এরকম মনে হওয়ার কথাই। কিন্তু টানা চার ঘন্টা জার্নির পর এখনও যে বাংলা পেরিয়ে যেতে পারিনি তা বোধহয় স্মরণে ছিল না।

ওয়ারেন্ট জারি হওয়ার পর থেকেই ব্রহ্মদা আন্ডারগ্রাউন্ডে আছেন তা বেশ কয়েক মাস হল। কোথায় সেই আন্ডারগ্রাউন্ড সে-সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা আরও কৌতূহলী করে তুলছিল আমাকে। সে কি মাটির তলায় কোনও অন্ধকার ঘর যেখানে সূর্যালোকের প্রবেশাধিকার নেই!

সেই আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার একটা চোরাটান ছিলই, হঠাৎ ব্রহ্মদার সঙ্গে টালিগঞ্জের এক রাস্তায় প্রায় নাটকীয়ভাবে দেখা আমার। মাত্র কয়েকদিনের জন্য খুব গোপনে কলকাতা থাকতে এসেছেন, আসলে এসেছেন তাঁর পত্রিকার জন্য মালমশলা খুঁজতে। আবার তার পরদিনই চলে যাবেন আন্ডারগ্রাউন্ডের ডেরায়। তো আমিও কিছু অনিবার্য কাজে কর্মস্থান ছেড়ে এসেছি কলকাতায়, সেই সঙ্গে কয়েকদিনের ছুটিও নিয়ে এসেছি, ছুটি শেষ হলেই ফিরে যাব আমার কর্মস্থলে। হঠাৎ দু-জনে দু-জনের মুখোমুখি হয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠি। বেশ অনেকদিন পরে দেখা, হয়তো এক কি দেড় বছর পরে; ব্রহ্মদা পরদিনই আন্ডারগ্রাউন্ডে যাচ্ছেন শুনে আমি প্রায় বায়না ধরি, আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে?

— সেখানে তুমি গিয়ে কী করবে! সেটা কি থাকার মতো একটা জায়গা! তোমাকে বোর করবে, বিল্ব। শহরের মানুষ সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। তোমরা যে-বিলাসের জীবনে অভ্যস্ত, সেই বিলাসের কোনও আয়োজনই তো সেখানে নেই।

— বিলাসে কী প্রয়োজন আমার! বেশ ভারিক্কি গলায় বলি।

— নেহাত নাছোড়বান্দা হলে চলো। কিন্তু একদিন থেকেই পালাই-পালাই করতে পারবে না তা বলে দিচ্ছি।

ব্রহ্মদার এমন সতর্কবাণী সত্ত্বেও আমি পরদিন, মানে আজ ভোরে ব্রহ্মদার সঙ্গে চেপে বসেছি কেওনঝাড়-গামী এই দূরপাল্লাটিতে। আমাদের গন্তব্য বাংরিপোসির কাছেই একটি সুনসান গাঁ। এটুকুই জানা আছে আমার। বাকি সব জানেন ব্রহ্মদা। ব্রহ্মদার সঙ্গে আমার আলাপ খুব বেশিদিন তা নয়। মাত্র কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে মিশে তাঁর সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান আয়ত্ত হয়েছে তা এক কথায় অদ্ভুত। জীবনকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে তাঁর চোখের পাতা নড়ে না।

এরকম অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না বেঁচে থাকার যে-কলাকৌশল কিংবা প্রক্রিয়া আমরা জানি তা ছাড়াও আরও অন্যভাবে বেঁচে থাকতে পারে মানুষ। ব্রহ্মদাই আমাকে শিখিয়েছে মানুষ কী অকারণে জটিল করে ফেলে তার জীবনযাপন। অথচ ইচ্ছে করলেই জীবনকে খুব সহজভাবে ব্যবহার করতে পারে মনুর পুত্ররা। এরকমই মনে হত ব্রহ্মদাকে। কিন্তু আপাতত ব্রহ্মদা এমন একটা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছেন যা তাঁর সহজ জীবনকে করে তুলেছে অপর্যাপ্ত জটিলতাময়।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই জটিলতাও কিন্তু স্পর্শ করতে পারেনি মানুষটাকে। বরং জীবনকে আরও দ্বিগুণ জটিলতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে ব্রহ্মদা চলেছেন তাঁর আন্ডারগ্রাউন্ডে বসবাস করার দিনগুলিতে। তাঁর কাঁধে একটা বড়ো আকারের ঝোলা, তাতে কাগজপত্র ঠাসা। আছে একটি প্লাস্টিকের থলে যাতে কয়েকটা জামাপ্যান্ট আর টুকিটাকি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস। ব্যস, এটুকুই তাঁর আন্ডারগ্রাউন্ডের সংসার।

ব্রহ্মদার সঙ্গে ছোট্ট লাগেজ, অথচ আমার সঙ্গে কিটব্যাগ ছাড়াও একটা ঢাউস ব্যাগ। আমি থাকব তো মাত্র কয়েকদিন, অথচ তাতেই যেন সারা বছরের থাকার আয়োজন।

ব্রহ্মদার সঙ্গে আর আছে খবরের কাগজে জড়ানো একটি সাইনবোর্ড। হঠাৎ সেখানে সাইনবোর্ড কী কাজে লাগবে তা জিজ্ঞাসা করায় প্রতিবারই বলছেন, চলোই না ওখানে, তবে তো দেখবে রগড়টা।

ব্রহ্মদার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি যখন কিছু রগড় তো দেখতেই হবে সে-বিষয়ে নিশ্চিত থাকি। জীবনটা একটা বড়ো রগড় এই যার জীবনযাপনের অন্যতম শর্ত, তার সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাটাও অনিবার্যভাবে হবে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আর সে-কারণেই চলেছি সেই আঁধারপাহু গাঁয়ে।

পৌঁছোনোর আগে আরও একবার জিজ্ঞাসা করি, কীরকম জায়গায় ডেরা আপনার? একদম র?

ব্রহ্মদা শুনে হেসে উঠে বললেন, না বিল্ব, সেটা এক রূপকথার দেশ। চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক অপরূপ জায়গা। তুমি গিয়ে হয়তো আবিষ্কার করবে কোনও রাজকন্যা।

রূপকথা শুনে কৌতূহল তুঙ্গে।

২

টানা ছ-ঘন্টা পড়ি-কি-মরি জার্নির পর একটা বড়ো রাস্তার বাঁকের মুখে যখন দূরপাল্লার স্টেট বাসটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল, এক অদ্ভুত দৃষ্টি চোখে মাখিয়ে তাকিয়ে থাকি

ব্রহ্মদার দিকে। এতক্ষণ দূরপাল্লার বাসের সিটে বসে থাকার ফলে মনে হচ্ছিল তবু কলকাতার সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে। দূরপাল্লাটা চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোর শূন্যতাবোধ।

পেশার সূত্রে আমি কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে থাকি, তবে এতটা দূরে নয়।

ব্রহ্মদা বলল, ঘাবড়াচ্ছ কেন, এরকম সুন্দর জায়গা তুমি ভূ-ভারতে দুটো পাবে না। বাংরিপোসি পেরোলেই আঁধারপাহু। সেই গাঁ-টা একেবারে সিমলিপাল রেঞ্জের তলায়। চারদিক পাহাড়ে পাহাড়ে ছয়লাপ। বলতে পারো এরকম গাঁ-কেই বলে পাহাড়তলি।

লঙ জার্নির স্টেট বাস ততক্ষণে আমাদের ছেড়ে দিয়ে অনেকটা দূর পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে এরপর আস্তে আস্তে খাড়াই হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের গায়ে। দিকচক্রবাল উঁচু হতে হতে প্রায় ঠেকে গেছে আকাশের গাঢ় নীলে। এর ঠিক পরের স্টপেজে বিশয়ী নামে একটা জায়গা, যা আসলে এই পাহাড়টার মগডালে গড়ে ওঠা একটা আধা-শহর। স্টেট বাসটা কিছুক্ষণের জন্য ওখানে হল্টেজ দেয়, যাত্রীরা নেমে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয়। সঙ্গে ড্রাইভার-কন্ডাক্টররাও। কেওনঝাড় পৌঁছোতে প্রায় বিকেল।

পিঠের কিটব্যাগটা সামলে নিয়ে ব্রহ্মদার পাশাপাশি হাঁটতে থাকি বড়ো রাস্তা ধরে। একটু এগোতেই রাস্তার দু-পাশে ক-টা দোকানপাট। চেহারা হিসেবে জীর্ণই বলতে হবে। মুদিখানা, টেলারিং শপ, খাবারের দোকান এইসব। একটা দোকানে মস্ত তাওয়ায় বড়ো আকারের রুটি ভাজা হচ্ছিল ঝড়ের গতিতে। ভিতরে কিছু খদ্দের ভাতের থালা নিয়ে ব্যস্ত। রুটিও নিয়েছে কেউ কেউ। তার সামনে এসে ব্রহ্মদা একগাল হেসে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে হাঁক পাড়েন, কই অছি?

ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বেঁটেখাটো স্বাস্থ্যবান চেহারার একটি তরুণ, বছর বাইশ-চব্বিশের। মোটা গোঁফ, চোখদুটোয় সারল্যের ফোঁটা।

ব্রহ্মদা হেসে ভাঙা ওড়িয়াতে বললেন, দ্যাখো, তোমার জন্যে কী নিয়ে এসেছি।

বলে এতক্ষণে অতি যত্ন করে বয়ে আনা, হাতের কাগজে মোড়া, তিন বাই দুই সাইজের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরলেন।

প্যাকেটটা সম্পর্কে আমারও এতক্ষণের কৌতূহল ছিল। ব্রহ্মদা এই ছ-ঘন্টার জার্নিতে এক মুহূর্তের জন্যও ভাঙেননি ব্যাপারটা। এখন তরুণটি তাড়াহুড়ো করে প্যাকেটটা খোলার পর খোলসা হল রহস্য। সাইনবোর্ডটিতে হলদে গ্রাউন্ডের উপরে নেভি ব্লু কালারে বড়ো বড়ো করে লেখা নেপাল ভিউ হোটেল। ইংরেজি হরফে।

নেপাল শব্দটির উপর চোখ রেখে আমার কিছুটা বিস্ময়। কাছেই একটা পাহাড়ের মেলা। দূরেও একটা কালচে-নীল রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তা কোনওক্রমেই নেপাল নয়। হঠাৎ ওড়িশার এই গণ্ডগ্রামে নেপাল কোত্থেকে এল তা মগজের অভিধান ঘেঁটে ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি করি। এদিকে তো সিমলিপাল রেঞ্জ আছে শুনলাম, নেপাল কোথায়! ওড়িশা থেকে নেপালের ভিউ দেখা যাবে এরকম সম্ভাবনা আছে বলে তো শুনিনি কখনও।

ওদিকে সাইনবোর্ড হাতে পেয়ে তরুণটির চোখ দুটো আনন্দে থই থই। ব্রহ্মদা আবার হেসে বললেন, কি নেপাল, বলো গ্র্যান্ড হয়েছে কিনা?

বিষয়টা এবার আরও খোলসা হয়, তা হলে এই ছেলেটিই নেপাল, আর এই তা হলে ওর হোটেল! এই সাইনবোর্ডটা ব্রহ্মদা কলকাতা থেকে বয়ে এনেছে নেপালের জন্যেই! এখানে বাকি যে-ক-টা দোকান আছে তাদের কারও সাইনবোর্ড নেই। নেপালের ক্ষুদ্র হোটেলে সাইনবোর্ড লাগালে তার ব্যবসায়ের লেনদেন অনেকটাই বাড়বে তাই এই মেহনত। উফ, ব্রহ্মদা পারেনও বটে।

নেপাল থাকে বাংরিপোসি পেরিয়ে আঁধারপাহু গাঁয়ে। যে-গাঁ আমাদের গন্তব্য। বাংরিপোসি থেকে দু-কিলোমিটারের মতো।

ততক্ষণে নেপাল মহা উৎসাহে তার টালির চালার উপরে ফিট করতে লেগে গেল সাইনবোর্ডটা। এখানে সাইনবোর্ড এই প্রথম, ফলে ভিড় জমে যায় এক মুহূর্তে। ভিড়ের মধ্য থেকে 'আর্টিস্ট, আর্টিস্ট' শব্দটা বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল। ব্রহ্মদা বোধহয় এই আন্ডারগ্রাউন্ডের জীবনে আর্টিস্ট হিসেবেই পরিচিত। তার উপর এমন চমৎকার পাহাড়ের ছবি আঁকা একটা সাইনবোর্ড, তাঁর চিত্রশিল্পী পরিচয়টা গাঢ় করল আরও। সাইনবোর্ডটা খুবই সাড়া জাগিয়েছে ছোট্ট গঞ্জটিতে। যদিও গঞ্জ শব্দটি এই চালাঘর সমন্বিত দোকানপাটের পক্ষে একটু হাই ডোজের।

আরেকটা রোগা ঢ্যাঙা মতন যুবক এসে বিড়বিড় করে ব্রহ্মদাকে কী একটা বলল। ভাষা-ভঙ্গি অনেকটা অনুরোধের মতন। ব্রহ্মদা তাকেও হেসে বলল, ঠিক আছে মহেন্দ্র, এর পরের বার যখন আসব, তখন তোমার টেলারিং শপের জন্যও একটা সাইনবোর্ড আনব।

মহেন্দ্রর মুখেও ফোটা শালুকফুলের মতো হাসি। তার দর্জির দোকান। পুঁজি বেশি নেই বলে ছিট-কাপড়ের পরিমাণ কম। খদ্দেরও কম। সাইনবোর্ড লাগালে যদি খদ্দের জোটে।

ব্রহ্মদা বললেন, নেপাল ভিউ হোটেল হল আমার আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালীন খাওয়ার জায়গা। এই হোটেল থেকেই আমার দু-বেলার ভাত তরকারি যায়। সাইনবোর্ড লাগানোর ফলে হোটেলটির মর্যাদা যেমন বাড়ল, নিশ্চয় ভাত তরকারির টেস্টও বাড়বে।

বলেই আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত হাসি হাসলেন। বললেন, মোড়কের উপর আমাদের খুব লোভ। যা কিছু চকচকে তাই-ই আমাদের নজর কাড়ে। সমীহ জাগায়। সাইনবোর্ড থাকলে ভাতের দাম বেশি নিলেও আমাদের গায়ে লাগে না। ঠিক আছে, চলো বিশু, এবার ঘরের দিকে যাই।

পিচ-পথ থেকে লম্বভাবে যে মেটে পথটা রওনা দিয়েছে পাহাড়ের শ্রেণির দিকে সেদিকেই আমাদের গন্তব্য। পর পর আরও কয়েকটা চালাঘর। সবই ছোটোখাটো দোকানের মতো। ব্রহ্মদাকে দেখে আরও দু-তিনটে লোক দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল হাসি হাসি মুখে। নমস্কার করল হাতজোড় করে। হেসে বলল, আবার এলেন তা হলে?

ঠিক বাংলা নয়, ওড়িয়া মেশানো। বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি বলে এরা ওড়িয়া মেশানো বাংলা বলতে পারে। একটু কষ্ট করে বুঝে নিতে হয়। শুনতে অদ্ভুত লাগছিল আমার অনভ্যস্ত কানে। একঘেয়ে ভঙ্গিমার বাংলা ছেড়ে এসে ভাষার টেস্টটা একটু পাল্টে নেওয়া যায়। অনেকদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার ফলে সবাই ব্রহ্মদাকে চেনে। ব্রহ্মদাও বেশ হই হই করে সবার সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। পাবলিক রিলেশনস-এ ব্রহ্মদা বরাবর বেশ দক্ষ।

পিছন থেকে নেপাল ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা করে, কী খাবেন দুপুরে?

ব্রহ্মদা মুখে রামকৃষ্ণের ভঙ্গি করে বললেন, যা হোক কিছু পাঠিয়ে দিও।

পরক্ষণেই বোধহয় মনে পড়ল এবার তিনি একা নন, সঙ্গে আমি আছি, তাই বললেন, কলকাতা থেকে আমার একজন অতিথি এসেছে। দুপুরে পৃথ্বীরাজের মাকে দিয়ে কিছু বানিয়ে নিই। তুমি রাতের খাবার পাঠিয়ো। দ্যাখো, ডাল-তরকারির সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাজিটাজি দিতে পারো কি না!

— খাবার কি শালপাতায় মুড়ে পাঠিয়ে দেবো ?

— দিয়ো।

আবার পথ চলতে শুরু করি পাহাড় লক্ষ্য করে। ব্রহ্মদা বললেন, ওই যে পাহাড়ের সারি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক ওর কোলেই আমার আন্ডারগ্রাউন্ড।

যে-ডেরা সম্পর্কে আমার কৌতূহল টায়টায়, সেই ডেরার একটা অবস্থান চাক্ষুষ হয় এতক্ষণে। খুব রোমান্টিক দেখাচ্ছিল ল্যান্ডস্কেপটি। একসার পাহাড় নীল আকাশের নীচে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে। সামনে দু-পাশে ধু ধু মাঠ। আমরা তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া মাটির সরুপথ ধরি। একবার তাকিয়ে দেখি পিছনদিকের ল্যান্ডস্কেপে। পিচ-পথ তার সরীসৃপ শরীর নিয়ে শুয়ে আছে একঢালা রোদ্দুরে। তারই শরীরের মাঝে একরত্তি বাজারটা।

বাজার পিছনে ফেলে আমরা এগোচ্ছি পিচ-পথের সঙ্গে লম্বভাবে। বাজার পিছনে চলে যেতেই গোটা মেটে পথ সুনসান। শুধু এক-একটুকরো দমকা হাওয়ায় দু-পাশের শিয়ালকাঁটা, ভেন্ডাগাছ, নিশিন্দেপাতারা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত।

আরও কিছু হেঁটে যাই দিক্‌চক্রবাল বরাবর। দিক আছে, কিন্তু দিগন্ত নেই। দিগন্তে চোখ ছোঁয়ার আগেই পাহাড়ের পর পাহাড়। পাহাড়ের সবুজ রঙে নীল ছোপ ছোপ। দূর থেকে দেখলে সেই সবুজ আর নীলের মধ্যে একটা ধোঁয়া ধোঁয়া রং। সেই রঙের রহস্য ছুঁতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পাহাড়ের কোলের কাছে। পথের দু-পাশে কখনও শালগাছের সারি। সেখানটায় কিছু রহস্য ছড়ানো। তারপর আবার দু-পাশে মাঠ। তখন পথের পাশে ঝুপসি গাছ ও আগাছা। বাতাসে বুনো গন্ধ।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট একরত্তি বসতি। ছোটোখাটো একটা গাঁ বললেও গাঁয়েরই লজ্জা। বেশিরভাগ মাটির বাড়ি। একখানা বড়ো দালানও। বাঁয়ে দালান রেখে গাঁয়ের ভিতর সেঁধিয়ে গেছে সরুপথ। ঠিক বাংলাদেশের মতো বসতি নয় এটি। অন্যরকম। অন্য রাজ্যের গন্ধ মাখা। আমি লক্ষ করে দেখেছি পশ্চিমবাংলার এক-এক জেলার বসতিও এক-একরকম। গাছপালা, মাটির রং, বাড়ি তৈরির গড়ন সবই ভিন্ন ধরনের। এক জেলার সঙ্গে আর এক জেলার ভাষা পর্যন্ত মেলে না। কোথাও না কোথাও একটা তফাত। আর ভিনরাজ্যে এসে, এখানকার বসতি যে অন্যরকম হবে তা তো নিশ্চিতই।

এই গাঁয়ে তা হলে আমাদের এবারকার বাস! চারদিকে ভালো করে তাকাই। প্যান্টশার্ট পরা ভিনদেশি লোক দেখে ঘরের মেয়ে-বউরা পর্যন্ত জানলা খুলে দেখছে, তবে ব্রহ্মদা তো অচেনা নয়। এই গাঁয়ে আছেন বেশ কয়েক মাস, তবে টানা নয়, বিশদিন এখানে থাকেন তো দশদিন কলকাতায়। কলকাতায় তাঁর নামে ওয়ারেন্ট। তাই একই ঠিকানায় কখনও পর পর দু-রাত থাকেন না। পুলিশে জানতে পারলেই সোজা হাজত। তারপর জেলবাস।

অর্থাৎ বেশ ভয়ংকরভাবে বেঁচে থাকা। এই বিপজ্জনক জীবন কিন্তু ব্রহ্মদা বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছায়। দেশে কয়েক মাস আগে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা। প্রেক্ষাপট অত্যন্ত জটিল। ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করে রাজনারায়ণের মামলার শুনানির সময় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দাঁড়াতে হয়েছিল কাঠগড়ায়। গত বছরের, অর্থাৎ উনিশশো পঁচাত্তরের বারোই জুন এলাহাবাদ কোর্ট বাতিল করে দেন ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন। তাতে বলা হয় আগামী ছ-বছর তিনি সংসদ বা বিধানসভার কোনও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। তবে সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেছে চূড়ান্ত রায় না বেরোনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদের উভয় সভায় বক্তৃতা করা বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করা (ভোটাধিকার ছাড়া) ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেতনগ্রহণ করার অধিকার থাকবে। চব্বিশে জুন এই রায় ঘোষিত হওয়ার আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা চেয়ে ধর্না চলছিল রাজধানীতে। আবেদন জানানো হচ্ছিল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার জন্য। সুপ্রিম কোর্ট-এর রায় চব্বিশে জুন প্রকাশ পাওয়ার ঠিক দু-দিন পরে জারি করা হয় জরুরি অবস্থা। তখনও ঠিক বোঝা যায়নি জরুরি অবস্থার মাহাত্ম্য। রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে জানানো হয় আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য রাষ্ট্রের ঐক্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সেই দিন মধ্যরাত থেকেই শুরু হয়েছিল গ্রেফতারি। বিপক্ষের যাবতীয় নেতাদের ধরে পুরে দেওয়া হয়েছে জেলে। মিসা নামে আইনটি চতুর্থবার সংশোধন করে চালু করা হল নতুন উদ্যমে। এই সংশোধনে বলা হল কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে প্রদত্ত আটক আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ বা ওই আদেশ কোনওভাবে বাতিল হলে সেই ব্যক্তিকে এই মিসা আইনে নতুন করে আটক করা যাবে।

সপ্তাহ তিনেক বাদে জারি করা হল আরও দুটি অর্ডিন্যান্স। প্রথমটিতে সমাজের নৈতিক ও বৌদ্ধিক হানি হয় অথবা জনজীবনের মান অবনত হয়, এমন সব রচনা বন্ধ করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্সে ভেঙে দেওয়া হল প্রেস কাউন্সিল। বলা হল কোনও সংবাদপত্রই এমন কোনও খবর ছাপতে পারবে না, যা নির্দিষ্ট সরকারি অফিসাররা দেখে ইয়েস না করেন।

তার পরদিন থেকে দেশে কী ঘটছে না ঘটছে তা জানার আর কোনও উপায় রইল না। কেন না বিরোধীরা কে কী ভাবছে, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কোথায় কে কী আন্দোলন করছে তা জানার কোনও সুযোগ নেই। দিল্লি শহরের চেহারা বদলে গিয়েছে রাতারাতি। মাইলের পর মাইল জুড়ে রাস্তার দু-ধারে শোভা পাচ্ছে ইন্দিরার ভ্রূকুটিকুটিল মুখের পোস্টার। তার তলায় লেখা : ইন্দিরা, অরাজকতা রোধ করে শৃঙ্খলা এনেছেন দেশে।

কিছু ভালো কাজের কথাও বলা হল ফলাও করে। শুরু হল বিশ দফা কর্মসূচি। প্রচুর টাকাও বরাদ্দ হল দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে। কিন্তু ভবি তাতে ভুলল না। মানুষ হঠাৎই উপলব্ধি করল তাদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়েছে আইন করে। অধিকাংশ সংবাদই ছাপা হচ্ছে না সেন্সরশিপের আওতায় পড়ে। শুধু সেই সব সংবাদ ছাপা হচ্ছে যা দেশের প্রধানমন্ত্রীর সপক্ষে।

সংবাদপত্রের এই সেন্সরশিপ না মানায় বহু পত্রপত্রিকা ছাপা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। গ্রেফতার হলেন বহু সম্পাদক, সাংবাদিক ও লেখক, যারা কলম ধরে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন

তাঁদের লেখায়। ঠিক এরকম একটা দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ব্রহ্মদা, যিনি নিত্য নতুন অভিনব কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত, তিনি তাঁর মাসিক পত্রিকা 'শহর'- এর একটি সংখ্যা প্রকাশ করলেন জরুরি অবস্থার ফতোয়া না মেনে। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর পত্রিকায় এমন কিছু লেখা প্রকাশ করলেন যা জরুরি অবস্থার এই সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে। বিষয়টা রাজ্যের শাসকশ্রেণিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সঙ্গে সঙ্গে।

'শহর'- এর সেই সংখ্যায় যারাই লিখেছিলেন প্রায় সবারই বিরুদ্ধে জারি করা হল গ্রেফতারি পরোয়ানা। গ্রেফতার হলেন বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক নিতাইকিশোর ঘোষ। আর এক সাংবাদিক তরুণ সেনগুপ্তকেও জেলে ভরা হয়েছে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোয়।

আমি কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে থাকি বলে এত সব খবরের অনেকটাই জানা ছিল না। স্টেট বাসে আসার সময় ঘটনাগুলো প্রায় ফিসফিসিয়ে বলেছেন ব্রহ্মদা। তাঁর মতো আরও কয়েকজন গা ঢাকা দিয়ে গ্রেফতারি এড়িয়েছেন। কতদিন জারি থাকবে এই জরুরি অবস্থা তা কেউ জানে না। ব্রহ্মদাও জানেন না কী তাঁর পরিণাম! যারা গ্রেফতার হয়েছেন, জেলে তাঁদের অবস্থা শুনে আতঙ্কিত অনেকেই। নিতাইকিশোর ঘোষ জানিয়েছেন সারা দিন তাঁর ঠিক চোখের উপর একটা পাঁচশো পাওয়ারের লাইট জ্বলে। রাতেও লাইটটা কেউ নেভাবার নেই। নেভাবার হুকুম নেই। সাংবাদিক তরুণ সেনগুপ্তের অবস্থাও একই।

ব্রহ্মদা এমন একটা কাণ্ড করায় হইচই পড়ে গেছে সারা কলকাতায়। দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করার মতো সাহস আর ক-জনের থাকে! 'শহর'- এর সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখন পুলিশ সাংঘাতিকভাবে ব্রহ্মদাকে খুঁজছে। কিন্তু কীভাবে যেন তিনি বেপাত্তা। এই শোনা যাচ্ছে তিনি কফি হাউসে বসে আরামে কফি খাচ্ছেন। পুলিশ ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখে কোথায় তিনি! উধাও হয়ে গেছেন মেঘে ঢাকা চাঁদ হয়ে। শোনা গেল তাঁকে খালি পায়ে হাঁটতে দেখা গেছে যাদবপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে। কাঁধে সেই বিখ্যাত সবুজ ঝোলাটি। কিন্তু পুলিশ যাওয়ার আগেই বেপাত্তা। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে ভারী বেকায়দায় কলকাতার পুলিশ।

লেখক ও সাংবাদিকদের বেশিরভাগই জেলে। অনেকেরই বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট। গ্রেফতার এড়াতে ব্রহ্মদা তাঁর নতুন ডেরা নিয়েছেন এই পাণ্ডববর্জিত পাহাড়তলিতে। এরকম কিছু সুখে থাকা মানুষকে ভূত এসে মধ্যরাতে বেদম কিলোয়। সেই কিল খেয়ে এখন কলকাতার এক লেখক-কাম সাংবাদিক আঁধারপাহু নামের গ্রামটিতে অতিবাহিত করছেন জরুরি-ক্লান্ত দিনগুলি।

চড় চড় করছে ভরদুপুরের রোদ্দুর। গেরস্তবাড়িতে খাওয়া দাওয়ার সময় এটা। রাস্তায় লোকজন কম। আরও দু-একজন দাওয়ায় এসে নমস্কার জানাল ব্রহ্মদাকে। জানতে চাইল কুশল। ব্রহ্মদার একটা ভুবন ভোলানো হাসি আছে যা দিয়ে সব মানুষকে মুহূর্তে আপন করে ফেলতে পারেন। বেশ কয়েক মাস থাকার সূত্রে ব্রহ্মদা সবারই এখন আত্মীয়।

হাঁটতে হাঁটতে প্রায় গাঁয়ের শেষ মাথায় একটা মেটেবাড়ি। চোদ্দো বাই দশ আকারের। সামনে একফালি দাওয়া। মাথায় খড়ের চাল। এরকমই একটা ঘরের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। এতক্ষণে ব্রহ্মদার মুখে দেদার হাসি। অভিব্যক্তি বলছে, দ্যাখো, তোমাকে কোথায় এনে ফেললাম!

আমিও দেদার অবাক। ও, এই তা হলে ব্রহ্মদার সেই কিংবদন্তিপ্রতিম আন্ডারগ্রাউন্ড! এখানে রূপকথা কোথায়!

তবে জায়গাটা ছিমছাম, বেশ নিরিবিলি। টুকরো দাওয়ার সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। কয়েকটা শালগাছ তাদের ছায়া বিতরণ করছে কারও প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। উঠোনের এককোণে একগুচ্ছ বনতুলসীর ঝাড়, ঝাড়ে নানারকম রঙের ফুল। টুনি বাল্বের মতো জ্বলছে রোদ্দুরে। রোদ্দুর নিভে এলে নিশ্চয়ই আরও রমরম করে উঠবে জায়গাটা।

— বুঝলে, তোমার অজ্ঞাতবাসটা খারাপ কাটবে না। আগে পৃথ্বীরাজের মা-কে ডাকি।

আমি তখনও শ্বাস টানছি জোরে। অনেকখানি হেঁটে একটু ক্লান্তও। কে পৃথ্বীরাজের মা কে জানে!

ব্রহ্মদা এবার শিকল-তোলা ঘরের কাছাকাছি গিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে ভাঙা ওড়িয়াতে চিৎকার শুরু করলেন, দিদি, দিদি, আমরা এসে পড়েছি।

ব্রহ্মদার দিদি ডাক ভারি সুন্দর। মনে হল সত্যিই ওঁর নিজের দিদি।

মেটেবাড়িটার আশেপাশে আরও ক-টা মেটে বাড়ি, তারই একটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন মধ্যবয়স্ক এক মহিলা। পরনের সাদা কাপড় জানান দিচ্ছে তাঁর বৈধব্য। একগাল হেসে সেই অদ্ভুত ওড়িয়া-মেশানো টানে বললেন, আবার এসেছ?

চমৎকার তাঁর হাসিটাও। তিনি এসে মেটে ঘরটার শিকল খুলে দিতেই তকতকে নিকোনো মেঝে ও দেওয়াল। কিন্তু ভিতরটা ডাহা ফাঁকা। শুধু এক কোণে একটা ক্যানভাস টাঙানো, আধখানা ছবি সহ। তাতে একটা পাহাড়ের রেঞ্জের কিছুটা দৃশ্যমান। নিশ্চয় ব্রহ্মদার আঁকা। ব্রহ্মদার এখানে পরিচয় তো আর্টিস্ট। এখান থেকে যাওয়ার আগে আধখানা এঁকে চলে গিয়েছিলেন, হয়তো এবার এসে আঁকবেন বাকি আধখানা। পাহাড়টা প্রায় স্বপ্নের রং দিয়ে আঁকা। নীল আকাশের নীচে আরও নীল পাহাড়ের শ্রেণি। তার ছায়া পড়েছে একটা বহুকোণী জলায়। সেখানেও শুধু নীল আর নীলের উমসুম ভেসে থাকা।

আমাদের দু-জনকে দেখে সুনসান ঘর সহসা হইচই করে ওঠে। যেন কতকালের চেনা। পৃথ্বীরাজের মা-কে ব্রহ্মদা বললেন, আমি কিন্তু একা নই। আমার সঙ্গে এবার বিশ্ব এসেছে। আমার মতো যাযাবর নয়। শহরের বাবু। নেপালের হোটেল থেকে রাতে ভাত আসবে। এ-বেলা দুটো খাওয়াতে পারবে?

— কেন পারব না!

আমি তখন ঘরটাকে মাপছি। ঘরে খাট বা চৌকি কিছুই নেই। মেঝে যদিও নিকোনো, কিন্তু হা হা ঘর যেন বিধবা মহিলার সিঁথির মতো শূন্য। বিছানাপত্তর কিছু নেই কেন!

— ঘরটা চমৎকার, কী বলো?

একটু আমতা আমতা করতেই হয়। ঘাড় নাড়ি বাধ্য ছাত্রের মতো, তা বটে।

— 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।' এমন একেকটি ফাঁকা ঘর কতকাল ধরে আমাদের চাওয়ার! ভারতের কত মানুষ আছে এটুকুও পায় না!

অস্বীকার করতে পারি না ব্রহ্মদার যুক্তি। কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার রোমান্টিকতা এই মুহূর্তে উধাও। একটা বাথরুম থাকবে না ঘরে!

— ভাবছ, শোবে কোথায়?

এ-প্রশ্নটাও উথল দিয়ে উঠছিল তখন থেকে। ব্রহ্মদা কী করে যেন জেনে ফেলেছেন।

— এই দ্যাখো, দু-দুটো বিছানা তৈরি ঘরে।

বলে দুটো প্রমাণ আকারের মাদুর বিছিয়ে ফেললেন চোখের পলক না ফেলতে। একেবারে নতুন। মাদুরের মাঝখানে নীল-লাল ফুলকাটা।

— বুঝলে বিল্ব, এরকম একটা করে ঘর যদি পৃথিবীর সব মানুষেরই থাকত!

ব্রহ্মদার স্বস্তিবাক্যে সাহস ভরতে থাকি বুকে।

— বুঝলে বিল্ব, জীবনের স্বাদ মাঝে মাঝে বদলে নেওয়া দরকার। কলকাতা বড়ো একঘেয়ে, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে পড়েছে।

— বুঝলে বিল্ব, ধরো আমার সঙ্গে এসেছ একটা অন্য ভারত দেখবে বলে। কলকাতায় বসে বই পড়ে ভারত চেনা যায় না। এরকম কত যে লোকালয় সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে, তাদের কথা ভাবতে গেলেই পার হয়ে যাবে আধখানা জীবন। এদের কাউকে আমরা চিনি না, জানি না। কত অচেনা লোক, কত ধরনের জীবনযাপন। কত সামাজিক রীতিনীতি। এখানেই কোন উপজাতিদের মধ্যে বিয়ের আগে পাত্রকে মজুর খাটতে হয় পাত্রীর বাড়িতে। মহেন্দ্র বলছিল সেদিন। ভুটান না কোথায় যেন স্ত্রীর প্রথম স্বামী বেড়াতে এলে দ্বিতীয় স্বামী, স্ত্রীকে একরাত্রির জন্য প্রথম স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে স্পেয়ার করে।

মেঝেয় কিটব্যাগ নামিয়ে রেখে হাঁপ ছাড়ি। সেই সাতসকালে পাড়ি শুরু, এখন একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ঘরে বসার কিছু নেই। আমাকে টেনশনমুক্ত করার জন্যই বোধহয় ব্রহ্মদা টি-শার্ট, প্যান্ট-সহ ধুপ করে মেঝেতে বসে পড়লেন পা ছড়িয়ে। সহজ সমাধান। দেখাদেখি আমিও। কতকাল মেঝেয় বসিনি তা মনে করার চেষ্টা করি।

পৃথ্বীরাজের মা ব্রহ্মদার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে চলে গেছে চাল ও কিছু আনাজপত্তর কিনে আনতো রান্না হতে দেরি হবে। একপেট খিদে জ্বালিয়ে মারছে তখন থেকে। আর দেরি না করে কিটব্যাগটা খুলে ফেলি একটানে। ভিতর থেকে বার করলাম স্লাইসড রুটি, মাখন ও জেলি। আসার পথে কোলাঘাট থেকে কেনা সন্দেশ।

ব্রহ্মদা আমার খাওয়ার বহর দেখে চোখ তুলে দিলেন চড়কগাছে। — কী কাণ্ড বাধিয়েছ, বিল্ব?

ব্রহ্মদার ফিলজফি অবশ্য আলাদা। ব্রহ্মদা ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বার করলেন একটা ছোটো স্টোভ। নাড়িয়ে দেখলেন তখনও কেরোসিন ভরা। তাঁর ঝোলায় ছিল চা-পাতা, লেবু। মুহূর্তে র, লেমন-টি বানিয়ে ফেললেন। যেমন গন্ধ, তেমন রং, তেমনি স্বাদ।

— তুমি একেবারে জাত ট্যুরিস্ট, ব্রহ্মদা।

— র-টিতে কিন্তু হাঙ্গামা কম, বিল্ব। আর দুধ-চা-র চাইতে অনেক বেশি টেস্টফুল।

চায়ে চুমুক দিতে এতক্ষণের ক্লান্তির অবসান। চা নাকি কোনও একসময় সাহেবরা বিনা পয়সায় খাওয়াত আমাদের। উদ্দেশ্য নেশা ধরে গেলে তখন লোকে কিনে খাবে। স্বদেশিরা তখন চা-কে কুলির রক্ত বলে চেঁচাত। এখন দিনকাল পাল্টে গেছে। এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে, খোড়ো ঘরের নিরিবিলির ভেতর র-টিতে চুমুক দিতে দিতে শরীর চনমন করে উঠছে। এরকম

নির্বান্ধব জায়গায় প্রিয় নারীটি সঙ্গে থাকলে বেশ হত। ব্রহ্মদার জীবন অবশ্য আলাদা খাতে বয়। তাঁর স্ত্রী বিয়ের কুড়ি বছর পরেও এখনও সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু তাঁকে ছাড়াই ঘুরে বেড়ান যত্রতত্র। ব্রহ্মদা এত বেশি ও বিচিত্র ধরনের কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন যে, নারীসঙ্গের কথা হয়তো মাথাতেই আসে না বেশিরভাগ সময়।

বন বন করে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরেন ব্রহ্মদা, এক-একবার এক-এক উদ্দেশ্যে। বড়ো কাগজে সিরিয়াস প্রবন্ধ লেখেন, কখনও হালকা ফিচার। মাঝেমধ্যে নিজের পত্রিকায় গল্পও। লেকে বাইচ খেলেন, বাড়িতে নিজের হাতে ভালো খাবার বানিয়ে খান ও খাওয়ান। হঠাৎ সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েন নৌকো নিয়ে। মাঝে মাঝে মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবে গিয়ে খোঁজ নেন কোথাও সস্তায় পাহাড় পাওয়া যায় কি না। পাহাড়ের উপর ঝুপড়ি বানিয়ে বাস করবেন। বেপরোয়া ড্রাইভ করে কখনও ষাট সত্তর মাইল পাড়ি দেন স্রেফ আনন্দ পেতে।

ব্রহ্মদার এরকম হাজারো ব্যাপারস্যাপার। এবার হঠাৎ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রকাশ করে, সম্পাদকীয়তে আগুন ঢেলে, লিফলেটে প্রতিবাদপত্র লিখে ফেলে দিয়েছেন তুমুল হইচই। অনেকদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে। ব্রহ্মদার ফিলজফি হল জীবনটা থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় করে লাভ কি! বৈচিত্র্য আনো, জীবনটাকে নানারকম সাজে সাজাও। প্রত্যেকটা দিন নতুনভাবে শুরু করো। এমনভাবে চলো, যেন আগের দিনের পুনরাবৃত্তি না হয়। জীবনের প্রত্যেকটা দিন যেন আলাদা-আলাদাভাবে মনে থাকে। এ এক কঠিন ব্যায়াম। এই, এরকম নতুন করে প্রত্যেকটা দিন সাজাতে শেখা।

ব্রহ্মদার সঙ্গে যত মিশি তত অবাক লাগে আমার।

বেলা একটায় ব্রেকফাস্ট শেষ করার পর একটু স্বস্তি আসে শরীরে। এর আগে অবশ্য কোলাঘাটে খুড়িতে চা ও কাগজের ঠোঙায় চপ ও পেঁয়াজি, চিচিরায় আধ গেলাস ভঁইসা দুধের চা। তবু এই লঙ জার্নিতে পেটে একেবারে নেকড়ে বাঘ।

— আসল জিনিসটা তোমাকে এখনও দেখানো হয়নি কিন্তু, বিল্ব।

ভাবলাম, হয়তো ওল্ড মঙ্কের বোতল-টোতল বেরোবে। ব্রহ্মদা এই জিনিসটার খুব ভক্ত। আর আমি ধরেই নিয়েছি এরকম আউটিং-এ এসে ক-দিন খুব এলোমেলো থাকবেন নিশ্চিত। ব্রহ্মদা বলেন, এই বৃদ্ধ সাধুটি তাঁর অনেক সৃষ্টিকর্মের প্রেরণাদাতা। এঁর আশীর্বাদে তাঁর মাথায় প্রচুর নতুন প্রজেক্টের আমদানি হয়েছে। একটা অভিনব ট্যুরিস্ট স্পটের ভাবনাও এভাবে এসেছে তাঁর মাথায়। অনেকগুলো দোতলা বাংলো থাকবে সেখানে। টালির শেড দিয়ে একটা লম্বা ডর্মিটরি। কলকাতা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, কোনও চমৎকার নদীর পাড়ে।

প্রতিটি ঘরের সামনে থাকবে বিস্তৃত মিহি সবুজ ঘাসের লন। কাছাকাছি মাটির উঁচু ঢিবি তৈরি করবেন পাহাড়ের চিত্রকল্প আনতে। কিছু পাথরকুচি ছড়ানো থাকবে সরু পথে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা যে খুশি তিন-চার দিনের জন্য এসে ঘরে থাকতে পারে। এক বা একাধিক বন্ধুবান্ধব বা বান্ধবীসহ। সবসময়ই জমজমাট থাকবে ঘরগুলো। থাকবে সাহিত্যের আলাদা ঘর, ছবি আঁকার আলাদা ঘর, গানবাজনার আলাদা ঘর, এ-রকম নানাবিধ। সারাদিন শুধু সৃষ্টি, সৃষ্টি আর সৃষ্টি। সে এক হইহই কারবার। পাশাপাশি শিমুল, পলাশ, ইউক্যালিপটাস,

আর কৃষ্ণচূড়ার গাছপালা। সব রঙিন ব্যাপার-স্যাপার। থাকার জন্য সামান্য খরচ। শুধু বেকার কবিদের জন্য কোনও পয়সা লাগবে না।

এরকম নানান আইডিয়া ব্রহ্মদার মাথায়। এগুলো সবসময়ে যে বাস্তবায়িত হয় তা নয়। তবে ব্রহ্মদা যখন বলেন, তখন এত সিরিয়াসলি বলেন যে, খুব চমৎকার শোনায় আইডিয়াগুলো।

যাই হোক, এবার যে-জিনিসটা ব্রহ্মদা আমাকে দেখালেন তা দেখে বিস্ময়ে, উল্লাসে, টগবগিয়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠার মতো। ঘরটার পিছনদিকে আর একটা দরজা ছিল, সেটা খুলতেই একটা চমৎকার বারান্দা, যত্নে নিকোনো। দুটো মোড়া। বারান্দায় বেরোতেই সামনে উধাও হওয়ার মতো মাঠ, তাতে সদ্য কেটে নেওয়া হলুদ ধানের গোড়া। সেই ধান-কাটা মাঠ পেরোলে কাছেই উঁচু উঁচু পাহাড় অর্ধবৃত্তের মতো ঘিরে রেখেছে আমাদের ঘরটার তিন দিক। সেই পাহাড়ের গায়ে কেউ যেন রাশি রাশি আবির ছড়িয়ে রেখেছে। নিশ্চয় পলাশ বা শিমুল। তখনই মনে পড়ে এটা বসন্তকাল। কখন ফাল্গুন এসে পৃথিবীর গায়ে টোকা দিয়েছে আমার খেয়াল হয়নি, কিন্তু পলাশ-শিমুলরা জেনে গেছে ঠিক।

আমাকে বোবা চাউনি দিয়ে দেখতে দেখে ব্রহ্মদা আমার আড় ভাঙতে বললেন, এই হল সিমলিপাল রেঞ্জ। তোমাকে বলছিলাম না, এখানে রূপকথা আছে।

বাসে বসেই দেখেছিলাম সিমলিপাল রেঞ্জের ছায়া-ছায়া ছবি। এখন তা হাতার মধ্যে। প্রায় ছোঁয়া যায় এমন দূরত্বে। এই রোদ্দুরেও নীল ধোঁয়া-ধোঁয়া রঙ। শৃঙ্গগুলো এত তীক্ষ্ণ ও ঋজু যে অনায়াসে নীল ব্লাউজে ঢাকা সপ্তদশী কি অষ্টাদশীর স্তন বলে মনে করা সম্ভব। সেই মুহূর্তে মনে হল, ধানখেতের আল-বরাবর হেঁটে পৌঁছে যাই ওই পাহাড়শ্রেণির দিকে। ছুঁয়ে আসি পাহাড়ের চূড়া। ঠিকই বলেছেন ব্রহ্মদা। এখানে রূপকথা বাস করে।

কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ-এর অভিজ্ঞতা থেকে সহসা মনে হল পাহাড়গুলো এত কাছে বোধহয় নয়। হয়তো দু-এক বেলার পথ। কিন্তু শাদা চোখে মনে হচ্ছে খুব কাছেই। ওই তো দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে গাছের পাতার হাত-নাড়া। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল সবুজ পাতার ঝাঁকে একটা দুধসাদা বক।

দৃশ্যটা বহুক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে দেখতে চাইছিলাম, সে-সময় ব্রহ্মদা একটা কাণ্ড ঘটালেন। অনেকটা টারজানের কায়দায় দুটো হাত মুখের কাছে চোঙার মতো ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, আ—আ— আ...

পরক্ষণে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল সেই আ—আ—আ ধ্বনি। অবিকল যেভাবে রওনা দিয়েছিল শব্দটা, সেভাবেই।

মুখ থেকে হাত নামিয়ে ব্রহ্মদা হাসলেন এক ঝলক, বললেন, ফ্রিডম।

— ফ্রিডম? আমি যেন পুরোপুরি বুঝতে পারি না ব্রহ্মদাকে।

— হ্যাঁ। ফ্রিডম অফ স্পিচ। এখানে আমি যা খুশি বলতে পারি। কেউ আমাকে নিষেধ করার নেই। কেউ আমাকে রোধ করার নেই। আই অ্যাম দি মনার্ক অফ অল আই সি।

বলে ব্রহ্মদা হো হো করে হাসলেন কিছুক্ষণ। একেবারে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন হাসির লহর। সেই লহর ফিরে এল একটু পরেই।

এতক্ষণে ব্রহ্মদার এই অহেতুক কর্মকাণ্ডের অর্থ বোঝা গেল। দেশে জরুরি অবস্থা জারির ফলে মানুষের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, তারই বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর 'শহর' পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি। তার ফলে গ্রেফতারি পরোয়ানা। এখানে সেই পরোয়ানার কালো হাত নেই। এখানে পরিপূর্ণ, প্রস্ফুটিত বাক্‌স্বাধীনতা।

আমার ভাবনার ফাঁকেই ব্রহ্মদা বললেন, আর কয়েকটা দিন আগে এলে একটা চমৎকার দৃশ্য তোমাকে দেখাতে পারতাম।

— কী দৃশ্য, ব্রহ্মদা?

— ধান পেকে উঠলে বুনো হাতির দল ওই পাহাড় থেকে নেমে আসে। পাকা ধান ওদের খুব প্রিয়।

— হাতি আছে নাকি এই পাহাড়ে?

ব্রহ্মদা অম্লানবদনে বললেন, তা আছে বইকি। তা ছাড়া ওই পাহাড়ে প্রচুর চিতাবাঘও আছে। এইসব বসতিতে মাঝেমাঝে তাদের আনাগোনাও হয়। তবে তা কদাচিৎ।

একই সঙ্গে হাতি আর চিতার আগমনে পরিবেশ ভারী হওয়ার কথা। পাহাড়ের ঠিক নীচেই আমাদের এই ডেরা। হাতি বা চিতা যেই আসুক, আগে আমাদের এই ডেরায় হানা দিয়ে তবে তার গন্তব্য অন্য কোনও বাড়ি। ব্যাপারটা যতখানি ভয়ংকর, ব্রহ্মদার কথায় তার ছিটেফোঁটাও নেই।

বরং ব্রহ্মদা পরক্ষণে বললেন, এই পাহাড়ে মাউন্টেনিয়ারিং এক্সপিডিশন করবার ইচ্ছে আমার খুব। বিল্ব, তুমি কি আমার এই ক্লাবের একজন সভ্য হতে ইচ্ছে করো?

হাতি-চিতাদের দেশে অভিযান করাটা খুব সহজ কাজ নয় তা বুঝেও বলে ফেলি, নিশ্চয়ই।

খুব জোর দিয়ে কথাটা বললাম, যদিও বন-চিতার দৃশ্যকল্প মগজে আনাগোনা করছিল।

— আমি এর আগে একদিন চেষ্টা করে দেখেছি। খুব স্টিপ, কিন্তু বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস। এত রকমের গাছগাছালি আর পাথর দেখতে পাবে যে, মাঝে মাঝে এক্সপিডিশন ভুলে শুধু সেই সব দেখতে ইচ্ছে করবে।

বললাম, রাজি।

— কিন্তু একটা শর্ত। আমাদের অভিযান হবে উইদাউট আর্মস।

ব্রহ্মদা এই রকমই। ভীষণ দুঃসাহসী। কিংবা হঠকারী! ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেলেও মুখে হঠাৎ মশকরা করতে ইচ্ছে হয়। বলি, তা হলে সঙ্গে কিছু সুন্দরী মেয়ে রাখবেন। বুনো চিতাগুলো যতক্ষণে মেয়েগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, তার মধ্যে আমরা বেশ কিছুটা উপরে চলে যাব — ওদের নাগালের বাইরে।

— তোমার বালখিল্যতা আর গেল না। ব্রহ্মদা বোধহয় হাল ছেড়ে দিলেন আমার সম্পর্কে।

কথায় কথায় প্রায় শেষ দুপুর। পাহাড়ের ঢাল লক্ষ করে সূর্যদেবের যাত্রাপথ। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজের মা নিয়ে এল ভাত-ডাল-তরকারি। লাল মোটা ভাত, অড়হর ডাল, সঙ্গে পাতালকোঁড়ের ডালনা। কানা ভাঙা সানকির থালায়। অরহড়ের ডালের গন্ধে সারা ঘর ম ম। কিন্তু খাবার মুখে তুলতেই আমার মুখটা বাংলার পাঁচ। পৃথ্বীরাজের মা রান্নায় তেমন দড় নয়, যতটা আতিথ্যে। এখানে পাতালকোঁড় বেশ প্রিয় খাবার। আসলে গরিবের খাবার।

ভালো তরিতরকারি সব চালান হয়ে যায় শহরে। নতুন ধরনের খাবার হবে মনে করে পাতালকোঁড় চালান করে দিই আমার মুখে। কিন্তু সেঁধানো গেল না, রান্নাটা ঠিক জুতসই হয়নি। বাংলাদেশের অন্নপূর্ণার রান্না না হলে আমাদের মুখে রোচে না। আমাদের অভ্যেসের ইতিহাস খারাপ হয়ে গেছে। অথচ তাকিয়ে দেখি পাঁড় প্রলেতারিয়েতের ভঙ্গিতে ভাঙা সানকি থেকে ব্রহ্মদা অমৃতের মতো সাফ করে ফেললেন পাতালকোঁড়ের বাটি। ধন্য পাতালকোঁড়, ধন্য লাল ভাত। তোমরা জানো না এই ব্রহ্মদা কলকাতায় দামি ঝকমকে সানমাইকার টেবিলে লালা ঝরানো লাঞ্চ খায়।

ব্রহ্মদার মুখে এখন কী অসীম তৃপ্তি। বলা যায় অপরিসীম তৃপ্তি। একটা মস্ত ঢেকুর তুলে বললেন, কি বিশ্ব, পাতে ভাত পড়ে রইল কেন?

বললাম, একটু আগেই যা ভরপেট খেয়েছি। একদম খিদে নেই।

নেপাল বিকেলের দিকে গঞ্জ থেকে ফিরে আমাদের ডেরায় এসে খবর নিয়ে গেল আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে কি না! ব্রহ্মদা জানালেন, চমৎকার লাঞ্চ খাইয়েছে আজ পৃথ্বীরাজের মা। কিন্তু রাতের খাওয়াটা তোমার হোটেল থেকে আসবে। নইলে এই মেদিনীপুরের বাবুর পেটে নেকড়ে ঢুকবে রাতে।

চিতার চেয়ে নেকড়ে ভালো এই মুহূর্তে, আন্ডারগ্রাউন্ডের দিনগুলিতে।

নেপাল তার সাইনবোর্ড পাওয়ার সুবাদে, হোটেল থেকে আজ রাতে চিকেন-রোস্ট খাইয়ে যাবে জানাল। একদম ফ্রি। সাইনবোর্ড টাঙানোর পর থেকে তার দোকানে খদ্দের নাকি বেড়ে গেছে একবেলার মধ্যে।

সন্ধের পর আমরা রাস্তায় বেরোলাম। একাদশীর চাঁদ জ্যোৎস্নার গুঁড়ো ছড়াচ্ছে রাস্তায়। মেটে রাস্তা পেরিয়ে অনেকখানি হেঁটে বোম্বে হাইওয়ের উপর উঠে আসি। এটা শর্টকাট। দু-পাশে ধানখেত। পিচ রাস্তার দু-পাশে বড়ো বড়ো কেঁদ ও শিরীষ গাছ। কখনও ডালে আগুন জ্বালিয়ে পলাশ। একদম নির্জন। তবে ভারী ট্রাকগুলো ঝাঁক বেঁধে যাতায়াত করছে কখনও। কিছুক্ষণ আলোয় আলো। তারপর আবার কেরোসিনবিহীন গেরস্তের ঘরের ঘোর অন্ধকার।

একটু দূরেই অন্ধকারে ভূতের ঠাকুরদা সেজে সেই সিমলিপাল রেঞ্জ। আকাশের গায়ে মেঘের মতো ঝুলে আছে পাহাড়গুলো। ইচ্ছে করছিল অনেক রাত পর্যন্ত এরকম হেঁটে হেঁটে পৌঁছে যাই পাহাড়ের কাছাকাছি। ব্রহ্মদাকে বললে নিশ্চয় এক্ষুনি রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু উইদাউট আর্মস শোনার পর থেকে আমি মনে মনে মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্যপদ ত্যাগ করেছি। রাস্তায় দু-একজন পথচারী যাচ্ছে-আসছে। আমাদের দিকে তাকালোও কেউ কেউ। কেউ বা উদাসীন। কেউ ভিনদেশি ভিনদেশি গন্ধ পেল বোধহয়, তাই একবারের জায়গায় দু-বার তাকাল। একজন আবার জিজ্ঞাসা করে, কুনঠে ঘর?

ব্রহ্মদা বললেন, মেদিনীপুর।

লোকটা যেমন চলছিল, তেমনই চলতে লাগল উত্তর শুনে। কোনও হেলদোল হল না। হয়তো মেদিনীপুরের নাম শোনেওনি। কিন্তু ব্রহ্মদার পক্ষে সত্যি কথা বলা এখন ঝুঁকির। কলকাতা নামটা কোনওক্রমেই বলা চলবে না। এই বারিপদা জেলার ছোট্ট লোকালয় আঁধারপাছু গাঁয়ের নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে মেদিনীপুরবাসী মনে করে খুশি খুশি লাগছিল বেশ।

এদিকে এখনও শীতের রেশ বর্তমান। আমি একটা হাফ-সোয়েটারে মুড়েছি নিজেকে, ব্রহ্মদার তাও লাগে না। ব্রহ্মদা নাকি প্রবল শীতের ভোরে চৌবাচ্চার কনকনে জলে স্নান করে আরাম বোধ করেন। ব্রহ্মদাই গল্পটা করেছিলেন একদিন। এখন এই হাফ-শীতের সন্ধেয় আমি একটু কুঁকড়ে-মুকড়ে থাকলেও ব্রহ্মদার শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে ঝিরঝিরে হাওয়ায়। ব্রহ্মদা বলছিলেন, দ্যাখো, এইসব গাঁয়ের মানুষ কত সরল। শহরের মানুষের মতো এদের ভিতরে কোনও প্যাঁচ নেই। তুমি যে-কথাই বলবে, তাই সহজ মনে বিশ্বাস করবে। ঝড় বা বন্যা ছাড়া এদের জীবনে কোনও ঘটনার ঘনঘটা নেই।

ফিরলাম অনেকটা রাতে। রাতের খাবারটা অবশ্য শেষ-দুপুরের চেয়ে অনেক সরেস। পরোটার সঙ্গে চিকেন রোস্ট। খেয়ে বেশ জম্পেশ করে ঢেকুর তুললাম। মেঝেতে মাদুরের উপর একটা বেডশিট পাতা, মাথায় কিটব্যাগ। চমৎকার ডানলোপিলোর মতো বিছানা। দরজায় খিল লাগাতে যাচ্ছিলাম, বারণ করলেন ব্রহ্মদা, খোলা থাক না, বেশ হাওয়া আসবে।

— এই বিভুঁয়ে, রিস্কি হবে না?

ব্রহ্মদা হাসে, কী আর নেবে আমাদের?

— তবু বন-চিতা আছে না?

হা হা করে হাসতে থাকেন ব্রহ্মদা, তবু খোলাই থাক। দেখাই যাক না, বন-চিতারা কীভাবে মানুষের ঘরে ঢোকে। নিলে তো আগে আমাকেই নেবে। আমি দরজার কাছে শুচ্ছি। তুমি ভিতরে। তবে কাল থেকে আমাদের কাজ শুরু হবে।

দরজা হাট করে খুলে রেখে শুয়ে পড়ি। ডানলোপিলোর গদি ভীষণ ফুটছে পিঠময়। কী কাজ শুরু হবে তা এখনও আমার কাছ ভাঙেননি ব্রহ্মদা। ব্যাগ বোঝাই কাগজপত্র এনেছেন। নতুন কোনও অভিনব আইডিয়া মাথায় ঘুরছে নিশ্চয়। ব্রহ্মদা যেটা করেন সেটাই বরাবর অভিনব। ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি, কী কাজ?

তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মদার নাসিকাগর্জন কানে এল।

৩

খুব ভোরে বেরিয়েছিলাম, লাল কাঁকরের পথে, উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানো। এখানে বাথরুম বা ল্যাট্রিনের কথা বলতে ব্রহ্মদা হেসে উঠে বললেন, এটা আন্ডারগ্রাউন্ড। তোমার কলকাতার জীবনের কিছুই মিলবে না। গাঁয়ের মানুষ যেভাবে বাঁচে সেভাবেই তোমারও জীবনযাপন এখানে।

একটু একটু করে রূপকথা ভাঙছিল আমার ভিতরে।

ব্রহ্মদা অতঃপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন ধু ধু পথ পেরিয়ে একটা ঝোপজঙ্গলের কাছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ঝোপ। এটাই এখানকার কমন ল্যাট্রিন। ব্রহ্মদা তার মধ্যে একটা সরু পথ দেখিয়ে বললেন, তুমি এ-পথে যাও। আমি ওই সরু পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকছি। হয়তো দেখাও হয়ে যেতে পারে তোমার সঙ্গে, তাতে ঘাবড়িও না। তবে ভিতরে আরও কেউ কেউ থাকবে। এ-গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ সবারই কমন ল্যাট্রিন এই ঝোপটা। কারও সঙ্গে দেখা হলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। একটু দূরে সরে গিয়ে বসবে। মেয়েদের দেখেও

লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ওরাও পাবে না। কারণ ওরা জানে প্রাতঃকৃত্যও বেঁচে থাকার একটা অঙ্গ। খাওয়া-শোওয়া-ঘুমও যেরকম। তারপর শৌচকার্য হবে বুড়াবালং-এর জলে। ঠিক আছে, বলে ব্রহ্মদা প্রায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন ভিতরে, যাও সবুজ জনারণ্যে প্রবেশ করো। গায়ে বনতুলসী, এড়াঞ্চি আর আতছট্টির ছোঁয়া লাগবে। ভারী আরামের। তোমার হয়ে গেলে বাইরে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

আমি কিছুক্ষণ থম হয়ে বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াস করি। একটা খাটা-মাটাও তো থাকতে পারত। নাকি খাটা-র প্রয়োজনও উপলব্ধি করে না কেউ। একেবারে আদিম জীবনযাপন এখানে। সভ্যতা থেকে কত মাইল দূরে এসেছি তা ভাবার চেষ্টা করি। ব্রহ্মদা বললেন, কী হে, তুমি যে স্ট্যাচু হয়ে গেলে, বিম্ব। ভারতের কোটি কোটি লোক এভাবেই প্রাতঃকৃত্য সারে এখনও, এই বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে পৌঁছেও। বুড়াবালং-এর তীরেও একটা খোলা ল্যাট্রিন আছে। কিন্তু তার চেয়ে এটাই ভালো। এখানে তবু চারপাশে সবুজ ঝোপের একটা আড়াল পাবে, সেখানে তাও নেই। পাহাড়ি নদীর বিচ যেমন হয় আর কি। নুড়ি পাথর আর বালিতে ভর্তি।

জীবনের এরকম কত অভিজ্ঞতাই আছে যা বাকি ছিল।

কিছুক্ষণ এই দোদুল্যমানতায় কাটানোর পর বুড়াবালং-এর তীরে যুদ্ধ শেষ।

ব্রহ্মদা বললেন, চলো, এবার জায়গাটার ভূগোল তোমাকে চেনাই।

কী আশ্চর্য আর মনেই হচ্ছে না এটা আন্ডারগ্রাউন্ড। যেন একটা নতুন দেশ আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি। ব্রহ্মদা আমাকে কলম্বাসের মতো নিয়ে চললেন মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে।

ভিতরে অনেকখানি গাঁ। এই ভোরেও লোকজন উঠে গেছে। অনেকেই ব্রহ্মদাকে চেনে। আগেরবার বেশ ক-দিন এখানে থেকে ব্রহ্মদা ভালো এক্সটেনশন ওয়ার্ক করে গেছেন। জায়গাটার তিন পাশ জুড়ে পাহাড়, বাংরিপোসিকে ঘেরাও করে রাখার মতন। আমাদের আস্তানার বারান্দা থেকে সিমলিপাল রেঞ্জের যেদিকটা দেখা যায়, সেখানে কাল নেপালের কাছ থেকেমাত্র একটা পাহাড়ের নাম জেনেছি। রাতে নেপাল যখন শালপাতায় মুড়ে পরোটা, চিকেন রোস্ট এনেছিল, তখন আমার প্রশ্ন শুনে থমকেছিল। যেন, পাহাড় তো পাহাড়ই, তাদের আবার আলাদা করে নাম জানার কী প্রয়োজন! পরে বলল, ওই একটা পাহাড়ের নামই সবাই জানে। নেদাম পাহাড়। ওটাই সবচেয়ে উঁচু, আর বেশ দূরে। এখানকার এভারেস্ট। সেই পাহাড়ের রেঞ্জ লক্ষ্য করে হাঁটতে হাঁটতে আরও ক-টি স্তনচূড়া। তার মাঝখানে পাহাড়ি নদী বুড়াবালং। আমরা ছোটোবেলা থেকে যাকে বইতে বুড়িবালাম বলে জেনে এসেছি। তীব্র খরস্রোতা নদী, এখন কেউটের মতো সরু, সারা শরীরে উপচানো রাগ, বর্ষায় খুব ভয়ংকর হয়ে ওঠে। অজগর হিংস্র হলে যে-রকমটা হবে। ওই নদী পেরোলে পাহাড়, তার ওপাশে কুসুমপুর গ্রাম।

— বিম্ব, একদিন ওই গ্রামটায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে, পাহাড়ের ওপরটা নাকি চমৎকার। গ্রামটা আরও।

পাহাড়ে আরোহণের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই। ওই পাহাড়ে আর কে উঠেছে কি ওঠেনি তা আমার ভাবনার বিষয় নয়। আমার কাছে তো প্রথম। ওই পাহাড় আমার কাছে ভার্জিন।

পাহাড়ি বা পাহাড়তলির গ্রামের উপর আমার বরাবরের আকর্ষণ। কেমন একটা রহস্য মাখানো থাকে, আমার এরকমই ধারণা। যেমন আমাদের আঁধারপাহু।

এ-রাস্তায় সাইকেলের খুব চলাচল। কেউ কেউ পাহাড় পেরিয়ে তার ওপাশের সানুদেশ থেকে, বুড়াবালং পেরিয়ে আসছে।

যাওয়ার পথে একটা পকৌড়ার মিনি দোকান দেখে খিদেটা চাগিয়ে ওঠে ভিতরে। শুধু পকৌড়া দিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট। কড়া তিতকুটে চায়ের গেলাস আধ-খাওয়া করে রেখে এগিয়ে যাই পরবর্তী গন্তব্যে। পকৌড়াটা বড় ভালো ছিল।

দু-পাশের ধানখেতের গোড়া এখনও জানান দিচ্ছে, গ্রামের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছু ভালো থাকে এ-সময়। কেউ কেউ বলছিলেন এবার ধানের ফলন ভালো। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা মিনি পাহাড়ের কাছে এসে পড়লাম। ঝোপজঙ্গল নেই। নেড়া পাথরফাটা পাহাড়, তরতর করে এবং হাঁচোড়-পাঁচোড় করে যথাক্রমে ব্রহ্মদা ও আমি উপরে উঠে পড়লাম। পথ একটা থাকেই এ-সব পাহাড়ে ওঠার। এবার পাশের পাহাড়ের উপরে গাঁওটা অনেকটা একসঙ্গে চোখে পড়ল। যত উপরে ওঠা যায়, দিগন্তের পরিধি বাড়ে। একসঙ্গে অনেকটা পৃথিবী হাতের মুঠোয় আসে। শাল, কেঁদ ও শিরীষগাছের ছায়ায় ঢাকা গাঁও উঠছে ক্রমশ, আড়মোড়া খাচ্ছে। অন্যদিকে এক চাষবাসহীন ঘাসে ঢাকা মাঠ এক বিশাল দেবদারু জঙ্গলের কোলে শুয়ে আছে। যেমন মাঠটা চমৎকার, তেমনি দেবদারু। ব্রহ্মদার রুচিবোধ আছে, এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করেছে। এর আগেও ব্রহ্মদার সঙ্গে যত জায়গা ঘুরেছি, সবই এমন অপরিচিত, অথচ সব জায়গাগুলোই এমন অসম্ভব সুন্দর।

— এই পাহাড়টা কিনে নেওয়া যায় না বিম্ব? বিঘেখানেক মতো জায়গা হবে বোধহয় উপরটায় তাই না?

আমি হাঁ করে ব্রহ্মদার দিকে তাকিয়ে থাকি। একটা পুরো পাহাড়ের মালিক হব এমন একটা আনন্দ আর অবিশ্বাস একঝাঁক বালিহাঁস হয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে দেবদারু জঙ্গলের গভীরে অন্তরিন হল।

— খুব বেশি একটা দাম নয় এখানকার জমির, দেড়-দুহাজার টাকা বিঘে। আগেরবার খবর নিয়েছিলাম। তবে পাহাড় নিশ্চয়ই সরকারের জমি। ভেস্টেড পাহাড় পেলে ভালো একটা বাংলো বানানো যায়, তাই না? ব্রহ্মদা আবার বললেন ।

আইডিয়াটা দারুণ। উইক এন্ডে জমিয়ে সুখ অনুভব করা যায়। খেজুর রসের ভাঁড়ে পাটকাঠির নল ডুবিয়ে চোঁ চোঁ করে টানার মতন একটা অনুভূতি হল ভিতরে। এখানে কোথাও খেজুরগাছ নেই। তবে মহুয়া আছে, ব্রহ্মদা বলছিলেন আসার পথে বাসের সিটে হেলান দিয়ে বসে। কলকাতার বাইরে একটা নিজস্ব রেস্টশেড থাকবে এরকম একটা বড়োলোকি ইচ্ছে আমার ভিতরেও বহুদিন।

আমরা কিছুক্ষণ পাহাড় কিনে তার উপর বাংলোটা কেমন হবে তা নিয়ে এক কাল্পনিক আবহাওয়ায় লালিত হতে থাকি। বুকের গভীরে এক আশ্চর্য অনুভব খেলা করে। পাহাড়ের উপর থেকে অনেকটা দিগন্ত দেখা যায়। তাতে অনেকখানি পৃথিবীর মালিক হওয়া যাবে।

ঠিক সে-সময় ব্রহ্মদা হঠাৎ আবার টারজানের মতো হাত দুটো চোঙা করে মুখের সামনে ধরে চেঁচালেন, আ—আ—আ...

এবার সেই স্বরের প্রতিধ্বনি নয়। শব্দটা বিস্ফারিত হয়ে, একশো গুণ হয়ে ছড়িয়ে গেল দিক্‌দিগন্তরে। কত দূরে সেই শব্দ প্রসারিত হল তা হিসেবে কুলোয় না। ব্রহ্মদা হেসে বললেন, ফ্রিডম অফ স্পিচ। কী বুঝলে?

লাল কাঁকরের পথ মাড়িয়ে ঘরের দিকে ফিরতে থাকি এলোমেলো পায়ে। এমন কর্মহীন সময় আমার কাটে না। কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততা, আরও বহু পারিপার্শ্বিকতার চাপে সময় ভারী হয়ে চেপে থাকে ঘাড়ে। এখন দু-পাশে বুনোফুলের ঝোপ। তার পিছনে ডাঁটো চেহারার শালবন। তাদের লম্বা লম্বা ঠ্যাং সার সার দাঁড়িয়ে আছে যত দূর চোখ যায়। সেই সারি ভেদ করে দূরের রোদ্দুর দেখতে চেষ্টা করি। নীচে শুকনো শালপাতার ছড়াছড়ি। তার কিছু কাঁকুরে রাস্তায়। এমন পবিত্র শালপাতার উৎসব মাড়াতে মাড়াতে বুনোফুলের গন্ধ পাই। সব ফুলের নামও জানি না। একটা সবুজ ঝোপের পরিচয় জানি বনতুলসী। ট্রেন চলতে শুরু করলে কীভাবে যেন রেল লাইনের পাশে পাশে চলতে শুরু করে। তার সবুজ শরীরে অজস্র টুনি বাল্‌বের মতো ফুল। বেগুনি, লাল, হলুদ, শাদা, আরও কত রং। ফেরার পথে পর পর বনতুলসীর ঝোপ আর তার টেকনিকালার ফুলের সঙ্গে চেনাশোনা হয়। কিছু তুলে হাতে নিই। বুনো গন্ধের ঝাঁজ নাকে ঠোনা দেয়।

ব্রহ্মদা বললেন, চলো, তোমাকে একটা অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে যাই।

সরু ঝোপজঙ্গলওলা রাস্তার মধ্যে সেঁধোতে থাকি, আর বুনোফুলের গন্ধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। জঙ্গল পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, তার মধ্যে মঠের মতো চেহারার একটা ছোটোখাটো বাড়ি। বাড়ির পাশে একটা মস্ত ছাউনির মধ্যে দেবীমূর্তি। বারান্দায় অজস্র মানুষের ভিড়।

— এটা একজন তান্ত্রিকের বাড়ি। খুব ইন্টারেস্টিং লোক। মড়ার খুলি-টুলি নিয়ে নানান কেরামতি করে এখানে বসে। আবার একজন ভৈরবীও আছে।

কালীমূর্তি নিয়ে তন্ত্রসাধনা পশ্চিমবাংলার আনাচে-কানাচে। এই বারিপদা জেলায় কি শাক্তসাধনার ইতিহাস আছে?

ব্রহ্মদা শুনে বললেন, আমারও তাই মনে হয়। লোকটা বাইরে থেকে এখানে এসে স্বামী কৈবল্যানন্দ নাম নিয়ে আস্তানা গেড়েছে। কথাবার্তায় হিন্দি-বাংলা-ওড়িয়া সব খিচুড়ির মতো মেশানো। ঠিক কোথাকার লোক অনুমান করা মুশকিল।

ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য। ব্রহ্মদা যে-ভৈরবীর কথা বলছিলেন সেই রমণী শুয়ে আছে উপুড় হয়ে, মুখটা একপাশে ফেরানো, চোখ বোঁজা, গাঁজলা উঠছে মুখ থেকে, আর বুম বুম শব্দ করছে এক-একবার। ভাবলাম, মৃগী। কিন্তু একটু পরেই রহস্য আরও ঘনায়। শুনলাম ভর হয়েছে। শিবের ভর। রমণীর গা খালি, আঁচল বুকে-পিঠে অর্ধেক আছে অর্ধেক নেই। শরীরের চাপে বিশাল স্তনের একাংশ ঠেলে বেরিয়ে আছে। মৃগী-লাগা রোগীর মতো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে শরীরটা। ভিড়ের বেশির ভাগ মেয়েলোক। কিছু পুরুষও আছে অবশ্য। একজন মহিলা সেই ভৈরবীর মাথার কাছে বসে জিজ্ঞাসা করছে কিছু। ভরের মধ্যে থেকে ভৈরবী অদ্ভুত শব্দ করে তার উত্তর দিচ্ছেন। মুখ বাড়িয়ে দেখি ঘরের মধ্যে পদ্মাসনে বসে আছেন সেই তান্ত্রিক। ভীষণদর্শন, রক্তাম্বর বেশ পরিহিত, জটাজুটধারী, গলায়

রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা। তান্ত্রিকরা যে-রকম দেখতে হয় আর কি। বেশ ভয় পাওয়ার মতো চেহারা।

ভৈরবীকে প্রশ্ন করার আগে দু-টাকা প্রণামী রাখতে হয় সামনের সরায়, তারপর হাতে জবাফুল নিয়ে বলতে হয়, বাবা, তোমার কাছে এসেছি।

সবাই নানা-বিপদে পড়ে এখানে তার মুক্তির উপায় জানতে এসেছে। ভৈরবী ভরের মধ্যে বুম বুম শব্দ করার পর দু-একটা কথা বলে উত্তর দিচ্ছে। সেসব প্রশ্নের অধিকাংশ শব্দই অস্পষ্ট। গাঁয়ের লোকদের সব ভাষাও বোধগম্য হচ্ছে না আমার। একটা ডায়লগ এরকমভাবে বাংলায় অনুবাদ করা যায়।

— বাবা, তোমার কাছে এসেছি।

— হুম।

— বাবা, তুমি তো জানো, কেন তোমার কাছে এসেছি।

— হুম, জানি, বল্‌। বলে ফ্যাল।

— আমার ছেলেটা কত দিন ধরে রোগে ভুগছে, তুমি একটা কিছু উপায় করে দাও, বাবা।

— তোর ছেলের রোগ দুরারোগ্য। বড়ো কঠিন কাজ।

— তুমি সব পারো বাবা। মহিলা এক ধরনের শোক-পাঞ্চ করা গলায় বললেন।

এরপর ভৈরবী কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মৃগীর মতো সারা শরীর কাঁপতে লাগল তার। একটু থেমে বলল, ঠিক আছে, আপাতত মাদুলি ধারণ কর একটা। একুশ টাকার। তাতে না হলে শব-অর্চনা করতে হবে।

— শব-অর্চনা কী বাবা।

— অমাবস্যার দিন, শনি বা মঙ্গলবারে তন্ত্রসাধনা করতে হবে। শবের উপর উপবেশন করে মন্ত্রবলে প্রাণসঞ্চার করলে তোর ছেলের রোগ সারবে। বড়ো কঠিন রোগ। ওতে খরচ বেশি। এখন মাদুলিটা নে।

— কিন্তু বাবা, মাদুলির দামটা যে বড়ো বেশি।

কিছুক্ষণ নড়েবড়ে ভৈরবী জবাব দিলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোকে ওটা তেরোয় করে দিলাম।

আমি ব্রহ্মদার সঙ্গে চোখাচোখি করি। ধর্ম নিয়ে ব্যাভিচারের ইতিহাস কতদিনের। কবে এককালে রোম নগরীতে গির্জা থেকে পাপক্ষয়-পত্র বিক্রি হত। পাপক্ষয়-পত্র যে যত কিনতে পারত তার তত পাপক্ষালন। আমাদের পুরোহিতরা সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতে দেখাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার জন্ম দিয়েছে। ধর্ম নিয়ে এখনও আমাদের দেশে কম্যুনাল রায়ট হয়, খুনখারাপি হয়। ধর্মের জিগির তুলে আমাদের এখানে ভোট ভাগাভাগি করা হয়। ইমামকে দিয়ে স্টেটমেন্ট দেওয়ানো হয়। প্রধানমন্ত্রী মন্দিরে ঘটা করে পুজো দিতে যান। ওড়িশা জেলার এই বাংরিপোসিতে ধর্মের ইন্ডাস্ট্রি বেশ কায়েম হয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করে তান্ত্রিক তাকাচ্ছেন ভর হওয়া রমণীর দিকে।

পরপর আরও দু-জন মহিলা কথা বললেন ভৈরবী ওরফে বাবার সঙ্গে। প্রচণ্ড গাঁজলা

উঠছে ভৈরবীর মুখ থেকে। আর একজন রমণী চোখেমুখে বারবার ঝাপটা দিচ্ছে জলের। গাঁজলা ওঠা একটু থামে তাতে।

ডাক্তারের বিকল্প হিসেবে এই অদৃশ্য বাবাটি ছেলের অসুখ, স্বামীর অসুখ, জমিজমার গোলমাল, ধানের ফলন, এর সব কিছুরই দাওয়াই প্রেসক্রাইব করছেন। পশ্চিমবাংলা থেকে এই এত দূরে এক পাহাড়তলির গাঁয়ে এসে এমন একটি দৃশ্য অভাবনীয়, কিন্তু বোধহয় বিরল নয়। ধর্ম আমাদের সমস্ত জাতিটাকে স্বর্ণলতার কোঁকড়ানো চুলের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে শোষণ করছে রস। একসময় আসল গাছটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভিড়ের মানুষজন চলে গেলে ব্রহ্মদা হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লেন ভৈরবীর মাথার কাছে। নজরে পড়ল তান্ত্রিকের চোখ দুটো এই ভিনদেশি সভ্য-ভব্য মানুষ দেখে পুরো খুলে যাচ্ছে। কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। তার আগেই ব্রহ্মদা জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমি তোমার কাছে এসেছি।

কথায় উড়িয়া টান আনবার চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রহ্মদার প্রশ্ন তেমন মনঃপূত হল না ভৈরবীর, কিন্তু উত্তর এল একটু দেরিতে। হুম, আমি জানি কেন এসেছিস।

— বাবা, সারা দেশে এত অভাব কেন!

ভৈরবীর মুখের গাঁজলা কমে আসছে। মুখে শুধু বলল, হুম।

— বাবা, ইরাক ইরান যদি এভাবে যুদ্ধ করতে করতে নিজেদের তেলের ঘাঁটিগুলো বোমা মেরে নিজেরা উড়িয়ে দেয় তা হলে পৃথিবীর দশা কি হবে?

ভৈরবীর শরীরটা নড়েচড়ে উঠছে, পিটপিট করছে চোখ। বুঝতে পারছি ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে তার। ওদিকে তান্ত্রিক চোখ দুটো একবার কটমট করে তাকিয়েই বন্ধ করে ফেলল। আগেকার দিন হলে এতক্ষণে ভস্ম হয়ে যেতেন ব্রহ্মদা।

— বাবা, জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ফলে দেবী ইন্দিরা আমাদের জিবগুলো কেটে নিয়েছেন, তার কী উপায়?

ভৈরবীর চোখ দুটো এবার প্রায় খুলে যাচ্ছে। দেখছে তার সামনে যে বসে আছে সেই লোকটি আসলে কে! মুখের হুম হুম শব্দটাও থেমে গেছে সহসা। বোধহয় কী করবে তা ভেবে দিশেহারা। আশেপাশে যারা ছিল তারা চোখ তালুতে তুলে দেখছে ব্যাপারটা।

ব্রহ্মদা গম্ভীর হয়ে ভৈরবীকে তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করে হঠাৎ দুম করে বলে বসলেন, তোমার পেটের কাছে একটা আরশুলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাবা।

বলামাত্র ভৈরবী সন্ত্রস্ত চোখে মেঝের দিকে তাকায়, চকিতে তার খসে পড়া আঁচল সামলে উঠে বসে, পরক্ষণে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, কই, কোথায়?

এমন বিস্ফারিত তার দুই চোখ যে শিরশির করতে থাকে আমার ভিতর-শরীর। তান্ত্রিক-ফান্ত্রিক নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি না করাই ভালো। আরশুলার ঘটনাটা যে বানানো তা উপলব্ধি করে ব্রহ্মদার দিকে ভস্ম করে দেওয়ার চোখে তাকায়। কিন্তু ততক্ষণে তার জারিজুরি কিছুটা ধরা পড়ে যাওয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে অন্তরিন হয় পাশের ঘরটিতে।

আর ভৈরবীর দোসর, টকটকে লাল সিঁদুরের তিলক কাটা তান্ত্রিক রাগে গনগনে হয়ে দুটো উনুন বসাল দুই চোখে। কিন্তু কিছু না করতে পেরে মুখে ব্যোম ব্যোম শব্দ করে শুরু

করল কিছু অস্পষ্ট মন্ত্র।

আমি ব্রহ্মদাকে বলি, চলুন, এবারে কেটে পড়ি।

৪

রাস্তায় বেরিয়ে নরম রোদ্দুর, তবুও বুঝলাম সকালের ক-টা পকৌড়া পেটের মধ্যে কোথায় সেঁধিয়ে গেছে তার টেরটি পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় এখানকার জলের গুণ। আমাদের পোড়া বাংলায় দুটো সিঙাড়া সকালে খেয়ে নিয়ে এক গেলাস জল খেলে সারাদিন আর খিদের বালাই থাকবে না।

ঘরে ফেরার আগেই একপেট খিদে। ঘরে ফিরে দরজা খুলতে না খুলতেই পৃথ্বীরাজের মা হাজির। প্রায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো। তার দু-হাতে দুটো প্লেট। তাতে পোড়া পোড়া ডবল ডিমের ওমলেট। সঙ্গে মর্তমান কলা। আরও জানাল আজ সকালে বেশ ভালো সাইজের কয়েকটা তপসে মাছ জোগাড় করেছে। নেপালের হোটেলের সামনে বসেছিল মাছওলা। আর পাহাড়ের নীচে উৎপন্ন ফুলকপি। ফুলকপির দিন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। বাবুরা স্নান সেরে এলেই ভাত দিয়ে যাবে ঘরে।

বলে উঠি, কিন্তু কাল নেপাল বলেছিল দুপুরে ভাত তরকারি পাঠাবে। তার কী হবে?

কিন্তু পৃথ্বীরাজের মা নাছোড়। সে-ই খাওয়াবে আজ দুপুরে। বলল, আমি নেপালকে বলে এসেছি ফুলকপির ডালনা আর তপসে মাছের ঝোল খাওয়াব বাবুদের। তোকে পাঠাতে হবে না।

পৃথ্বীরাজের মায়ের প্রস্তাবে আমি আঁতকে উঠি। ডিমের ওমলেট যে এমন স্বাদহীন, নুনপোড়া করে বানানো যায় তা পৃথ্বীরাজের মা ছাড়া পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনও কুক জানে না। কাল দুপুরে, মুখে-দেওয়া-যায়-না এমন লাঞ্চ খাইয়ে বরবাদ করেছিল আমার আঁধারপান্থ আসাটা। বরং নেপালের হোটেলের খাওয়া ভালো। কিন্তু ব্রহ্মদা গলা নামিয়ে বললেন, বুঝতেই তো পারছ, যে আমাদের কাছ থেকে খাওয়ার অর্ডার পাবে তারই কিছু লাভ। নেপাল তো তার হোটেলে অনেক ফ্রাইং খরিদ্দার পায়। তার রুজিরোজগারের একটা উপায় আছে। পৃথ্বীরাজের মায়ের তো কোনও রোজগার নেই। সে আমাদের রান্না করতে পারলে ওই সঙ্গে তার সংসারের খাওয়াটা হয়ে যায়।

বলি, তা হলে পৃথ্বীরাজের মাকে তপসে ফ্রাই করতে বলি। ভাত দিয়ে তপসের ফ্রাই ভালো জমবে। ফ্রাইটা নিশ্চয় ততটা খারাপ করে বানাতে পারবে না।

— আশা করি ডিমের ওমলেটের চেয়ে ভালো পারবে। একটু নুন কম দিতে বলতে হবে। তার আগে স্নানটা করে নেওয়া দরকার।

নিশ্চয় কোথাও টিউবওয়েল আছে। তোয়ালে কাঁধে নিয়ে টিউবওয়েলের খোঁজ করতে ব্রহ্মদা হেসে ওঠেন, এর পরের বার যখন তোমাকে আনব, তার আগে এখানে একটা বাথরুম, তার সঙ্গে একটা টিউবওয়েল আর ল্যাট্রিন বানাতে হবে।

সকালে প্রাতঃকৃত্য করতে বেশ কয়েক কিলোমিটার। এখন স্নানের প্রসঙ্গ উঠতে ব্রহ্মদা সেই একই ভঙ্গিমায় বললেন, চলো, নদীতে স্নান সেরে আসি, ফিরে এসে তপসে মাছের ফ্রাইয়ের টেস্ট নেওয়া যাবে।

— বুড়াবালং! সে তো অনেক দূর!

— এখানে কাছে একটা পুকুর আছে। আঁধারপাছু গাঁয়ের সবাই পুকুরেই স্নান করে। কিন্তু সে-পুকুর দেখলে তুমি আর স্নান করতে চাইবে না। তার চেয়ে বুড়াবালং-এ রানিং ওয়াটার।

আবার হাঁটতে হাঁটতে ক-ত দূর। সেই লাল কাঁকরের পথ পেরিয়ে এক বিশাল ঘাসওলা মাঠ, কোথাও চড়াই-উতড়াই। মিনি পাহাড়ের মতো একটা। বুঝতে পারছি ক্রমশ একরাশ পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি, নেদাম পাহাড়ের ঠিক উল্টোদিকে অন্তত মাইল তিনেক হেঁটে ফেলেছি বোধহয়। সকালে ল্যাট্রিনের খোঁজে এক মাইল, এখন স্নানের জন্য এত পথ। ব্রহ্মদার সঙ্গে এলে এ-এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। নেহাত পথঘাট নিসর্গদৃশ্যে টইটম্বুর বলে হাঁটতে কখনোই ক্লান্তি আসে না।

হাঁটার মধ্যেই কানে ঠোনা দেয় এক অদ্ভুত শব্দ। একনাগাড়ে বাজছে কোনও সংগীতের সুর। কিছুটা এগোতে বুঝতে পারি সংগীত আসলে স্রোতের গর্জন। পাহাড়-ধোয়া গেরুয়ারঙের জল, পাথরে-বোলডারে ঠুল খেতে খেতে নেমে আসছে হুড়তাড় করে। জলের মুখে উপচে পড়ছে সাদা ফেনা। তীব্র স্রোত, ফেনায় মাখামাখি হয়ে ছুটে যাচ্ছে ক্রমশ উতরাই-এর দিকে। পাহাড়-ধোয়া জল বলে রং এমন গেরুয়াবর্ণ, বড়োজোর সত্তর-আশি ফুট হয়ত চওড়ায়, কিন্তু স্রোতের গতিময়তা দেখতে গা কাঁপে। প্রবল উচ্ছ্বাসে তার একটানা নেমে আসা, অবিশ্রান্ত গতিতে, দেখতে দেখতে সেই একদঙ্গল লাস্যময়ী যুবতীর উপমা মনে পড়ায়। যুবতীরা খিলখিল শব্দে হাসতে হাসতে গড়াতে গড়াতে ওলটপালট খেয়ে দৌড়োচ্ছে কেবলই। চারদিকে বড়ো বড়ো পাথরের নুড়ি, স্রোতের ঘর্ষণে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গোলাকার এখন, তীব্র জলধারা অসংখ্য বোলডারে আছড়ে পড়ায় আরো সুন্দর দেখাচ্ছে জলকে ।

সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম কয়েক পলক। সাড় ভাঙিয়ে ব্রহ্মদা বললেন, কী হল, স্নানে নামার আগেই বুড়াবালং-এর জলে ডুবে গেছ! নামলে কি হবে? আত্মহত্যা করবে নাকি!

—কথাটা খারাপ বলেননি ব্রহ্মদা, এই জলে স্নান করতে নামা তো সুইসাইডের সামিল।

ব্রহ্মদা হেসে ওঠেন। জলে নেমে বোলডারগুলো ধরে রাখতে হয়। তা হলে আর ভেসে যাওয়ার ভয় থাকে না। আর এমন জলে ডুবে মরাও তো এক ধরনের রোমান্টিকতা!

ব্রহ্মদা তো বলেই খালাস।

যে-জায়গাটা আমরা স্নানের জন্য বেছেছি, তার একটু ওদিকে চমৎকার কজওয়ে, ছোটো ছোটো নুড়ি সাজিয়ে তৈরি। কজওয়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলস্রোত। সেই কজওয়ে ওপারের মানুষজনের যাতায়াতের পথ। একজন লোক ওপারে এসে সাইকেলখানা কাঁধে নিয়ে এক হাঁটু জলের ভেতর দিয়ে পার হয়ে এল দিব্যি। তীব্র জলের তোড়ে একবার পা ফসকালে আর খুঁজে পাওয়া যেত না তাকে। কিন্তু তারা এমনই অভ্যস্ত এই চলাচলে যে পা ফসকাবে না। পার হওয়ার কৃৎকৌশল এরকমই। ওপারের মেয়েরাও নাকি এভাবে পার হয়! এই যাতায়াত অবশ্য ফেয়ার ওয়েদারে। বর্ষায় জল অনেক বেড়ে যায়, কেউটে তখন অজগর, তখন আর পার হওয়া যায় না। এক-দেড় মাইল ঘুরে অন্যদিক দিয়ে পার হতে হয় খেয়ায়। আরও নীচের দিকে। বৃষ্টি বেশি হলে কখনও আঁধারপাছু গাঁয়ে জল ঢুকে বন্যার মতো পরিস্থিতি।

যে-লোকটা সাইকেল কাঁধে পার হল অনায়াস ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞাসা করি নিবাস কোথায়! লোকটা পাহাড়ের ও-পাশে থাকে, গাঁ কুসুমপুর। কুসুমপুর! সে তো রূপকথার দেশ। তাকে অমনি ভক্তি করতে শুরু করি। যে-গাঁয়ে এখনও যাইনি তার বাসিন্দাদের সম্পর্কে এক নিবিড় কৌতূহল। পাহাড়ের ও-পাশে আরও কয়েকটা ছোটো ছোটো গাঁ। সবই পাহাড়তলির তকমা গায়ে এঁটে আমাকে রোমাঞ্চিত করে। ওরা গরু-মহিষ-ভেড়া পোষে। পাহাড়তলির গাঁয়ে প্রচুর থইথই সবুজ ঘাস। পশুপালনের অবাধ সুবিধে। ব্রহ্মদাকে বললাম, একদিন কুসুমপুর যাবেন?

ব্রহ্মদা ততক্ষণে স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছে। বোতামহীন টি-শার্ট খুলতে শুরু করেছেন একটা বিশাল, ভাস্কর্যের মতো চেহারার বোলডারের পাশে দাঁড়িয়ে। বোলডারটিতে রঁদ্যার থেকে সামান্য কারিকুরি কম। সামর্থ্য থাকলে বোলডারটা সঙ্গে নিয়ে যেতাম। তবে চারপাশে এত ভাস্কর্য যে কুড়িয়ে কলকাতা ফিরতে গেলে গোটা কয়েক ট্রাক ভাড়া করতে হবে। এখানে নিসর্গ এমনই কারুকার্যময় যে সবই নিজের ড্রয়িংরুমে রাখতে ইচ্ছে হয়। আর সেই কারণেই এখানে এসে একদিনেই এই পাহাড়তলির বসতির প্রেমে পড়ে গেছি। এখনও সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখা হয়নি, তবু মনে হচ্ছে এমন শান্ত নিরিবিলি জায়গা, সব সাত-পাঁচে-না-থাকা মানুষেরই পছন্দসই ।

হঠাৎ ব্রহ্মদার দিকে ফিরে তাকিয়ে আমি তাজ্জব। পুরো উদোম হয়ে, সমস্ত জামাকাপড় সেই প্রায়-রঁদ্যার উপরে গুছিয়ে রেখে জলের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার দিকে চেয়ে বললেন, নাও বিল্ব, চটপট করো।

আমার দু-চোখ বিস্ময়ে ওতপ্রোত দেখে হেসে বললেন, এখানে এমন নিঃসাড় প্রকৃতির কাছে কোনও আবরণ মানায় না । ফ্রিডম টু লিভ...

ব্রহ্মদাকে জরুরি অবস্থার ভূত তাড়িয়ে ফিরছে সারাক্ষণ। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ...

তবুও আমার শেষ আবরণ, জাঙ্গিয়াটা খোলা হল না, আস্তে আস্তে এগিয়ে তীব্র স্রোতের মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে দাঁড়ালাম টাল সামলে।

ব্রহ্মদা হো হো করে হেসে ওঠেন। বিল্ব, তোমার কি ওই পাথর নুড়িগুলোর কাছে লজ্জা? তা হলে ওপারে ওই দিকটায় চেয়ে দ্যাখো, তা হলে আর লজ্জা পাবে না। দ্যাখো, এখানে দেশের জরুরি অবস্থা জারি করা নেই। সবাই বাঁচার আনন্দে বাঁচে।

ব্রহ্মদার আঙুল অনুসরণ করে দেখি ওপারে, ঠিক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে স্নান করতে নেমেছে একদঙ্গল মেয়ে। হয়তো কুসুমপুরের, কিংবা হয়তো অন্য কোনও পাহাড়ি গাঁয়ের। এতটা দূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝতে পারছি ওদের কোমরে একটা ঘাগরা ছাড়া আপাতত শরীরে আর কিছু নেই। বুড়াবালং-এর তীব্র জলধারার মতোই উচ্ছ্বাসে উল্লাসে লাস্যে গড়িয়ে পড়ছে একে অন্যের গায়ে। পাহাড়ি নুড়ি কিংবা বোলডার আঁকড়ে ধরে পা দাপিয়ে সাঁতার কাটছে কী অনিবার্য সাবলীলতায়। তাদের শরীরের মোচড় ও বিভঙ্গ এই মুহূর্তে পল রুবেন্সের নারীদেহ। খবর পেলে হয়তো কলকাতা থেকে রং আর তুলি নিয়ে ছুটে আসত তাবত পৃথিবীর চিত্রকররা।

বুকজলে নামতেই ব্রহ্মদা সাবধান করে দিলেন, ও-দিকে বেশি তাকিয়ো না বিশ্ব, নুড়ি থেকে তোমার আঙুল ফসকে যেতে পারে।

সত্যিই বুড়াবালং-এর জল তখন আমার সমস্ত শরীর ধরে টান মারছে। একবার হাত ফসকালে যে-কোনও ক্ষুদ্র নুড়ি পাথরেও মাথাটা আছড়ে ভাঙতে পারে চিরচির। আমি থমকে গেছি, কিন্তু ব্রহ্মদা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে ভেসে যাচ্ছেন মাঝ-নদী বরাবর, তারপর আরও এগোচ্ছেন দেখে আশঙ্কা হয়, হয়তো ব্রহ্মদা ওইভাবে মেয়েগুলোর কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

চেঁচিয়ে ডাকলাম, ব্রহ্মদা, আর যাবেন না। বলতে বলতে আমার হাত সত্যিই ফসকাল, আর একটা ভল্ট খাওয়ার পর, কয়েক ঢোক জল খেয়ে, বেশ খানিকটা দূরে একটা পাথরের খাঁজে এসে আটকে পড়ে, পিঠে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে মনে হল একটা পাঁজর বুঝি দশ টুকরো হয়ে ভেঙে গেল চকিতে। কিছুক্ষণের জন্য সংবিৎ হারালাম যেন।

ব্রহ্মদা দ্রুত নুড়ি আর বোলডার বেয়ে বেয়ে চলে এলেন আমার কাছে। কিনারে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না, তবু চোটটা জোর নয়।

ব্রহ্মদা বললেন, ভাগ্যিস ওই মেয়েগুলো তোমার এই বীরত্ব দেখতে পায়নি। তা হলে হেসে কুটিপাটি যেত এতক্ষণ। দ্যাখো, কী চমৎকার স্রোতের সঙ্গে চু-কিত-কিত খেলছে ওরা।

নিজের আহাম্মুকিতে তখন মাথা নিচু। পাহাড়ি মেয়ে তো পাহাড়িই। তাদের সঙ্গে কলকাত্তাইয়া বাবুদের তুলনা কীসের! বুড়াবালং-এর স্রোতের মতোই ওরা তীব্র ও লাস্যময়ী। অবলীলায় এক বোলডার থেকে আর এক বোল্ডারে লাফ দিয়ে, শরীর ভাসিয়ে ধরে ফেলছে অন্য বোল্ডার। আলটপকা হাত ফসকায় না এদের। জলের শব্দের সঙ্গে হাসির ঝরনাও ভাসিয়ে দিচ্ছে আমাদের কানে।

স্নান শেষে আবার তিন মাইল চড়াই-উতরাই পথে হেঁটে বাড়ি ফেরার পর পৃথ্বীরাজের মায়ের লাঞ্চ। আজ খিদের চোটে অমৃতের স্বাদ তপসের ফ্রাইয়ে।

খাওয়ার পর সারা দুপুর দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন ব্রহ্মদা। পর পর অনেকগুলো চিঠি। বিকেলে আবার চা। একটু ঘোরাঘুরি। তারপর আবার সন্ধের পর চিঠি। লিখতে লিখতে অনেক রাত। তার মধ্যে এসে গেল নেপালের হোটেল থেকে ভাত মাছ তরকারি।

খাওয়া ঠিক শেষ হয়েছে, এমন সময় শ্রীমান নেপালের আবির্ভাব। ব্রহ্মদা খবরাখবর নিচ্ছিলেন বাংরিপোসির। ল অ্যান্ড অর্ডার প্রসঙ্গেই বেশি আলোচনা চলে, কেন না ব্রহ্মদা জানতে চায় পুলিশের আনাগোনা এদিকে হচ্ছে কি না। কাল বিকেলে নাকি পুলিশ এসেছিল বাংরিপোসি বাজারে। নেপাল জানায় নওলদহ থেকে একটা মেয়ে নাকি হঠাৎ উধাও। পুলিশ তারই খোঁজে এসেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করছিল সবাইকে। সম্ভবত পাশের গাঁয়ের এক যুবকের সঙ্গেই সে পালিয়ে গেছে বলে সবার ধারণা। কারণ সেদিনই পাশের গাঁয়ের লক্ষ্মণ নামের একটি যুবক কাজের খোঁজে রওনা দিয়েছে কেওনঝাড়ের দিকে। দুই আর দুইয়ে চার।

নেপালের হোটেলে সাইনবোর্ড দেখে পুলিশ অফিসার তো অবাক।

খুব ভোরে, পৃথিবী ভালো করে ফরসা হওয়ার আগেই স্টোভ জ্বেলে ব্রহ্মদা, র-টি বানিয়ে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। পাতিলেবুর গন্ধে মেটে ঘর ভরপুর। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে দু-জনে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছি আঁধারপাহু গাঁয়ের নিরিবিলি ঘরটিতে। পাহাড়-ভেজা উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে এমন উষ্ণ র-টি কিছুক্ষণের জন্য রাজা করে দেয় আমাদের। এই মুহূর্তে আমরা আর কলকাতার বাধাবন্ধনের মধ্যে নেই, গাড়ি ও মানুষের জ্যামজটের কবলে নেই। ব্রাহ্মণী হাঁস হয়ে ক-দিন ভিনদেশের জলে শরীর ডুবিয়ে বসে আছি। ব্রহ্মদা অবশ্য বসে নেই, এর মধ্যেই কাজে নেমে গেছেন। কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন। কাজ বলতে বেশ কয়েকটি চিঠি লেখা। চিঠিগুলো লিখে আমাকে বলেছিলেন খামের মধ্যে ভরে ঠিকানা লিখতে। কাজটা করতে বেশ শিহরন হচ্ছিল শরীরে। জরুরি অবস্থার মধ্যে যে-রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে বাস করতে হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল আমারও। সরকারি চাকরি করি, লিখে তো বলা যাবে না। অন্তত ব্রহ্মদার কাজে কিছু সহায়তা করলে মনের স্বস্তি।

কলকাতায় এসব কাজ এত নির্বিঘ্নে করা যেত না। কলকাতায় ব্রহ্মদাকে কেউ না কেউ ধরিয়ে দিত নিশ্চিত। কিংবা পুলিশ ব্রহ্মদার ডেরার হদিশ পেয়ে যেত কোনওভাবে।

ব্রহ্মদার এই আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার আরও একটা কারণ কলকাতার কোলাহল। মাঝেমধ্যে বলেন, বুঝলে বিশ্ব, একনাগাড় কোলাহলের মধ্যে থেকে মরচে ধরে গেছে আমাদের শরীরের সব যন্ত্রপাতিতে, এখন সেই মরচে খসিয়ে ঝকঝকে করে তুলতে হবে আঁধারপাহু গাঁয়ের হাওয়ায়।

চায়ের স্বাদে শরীর ভেজানোর পর আমিই প্রস্তাব দিই, চিঠিগুলো ডাকে ফেলতে হবে তো?

ব্রহ্মদা বললেন, ঠিকই বলেছ। কিন্তু এক ঢিলে দুই চড়ুই মারার পক্ষপাতী আমি। পোস্ট অফিস এখান থেকে দু-কিলোমিটার। যাওয়ার পথে দেখতে পাবে একটা পুকুর খোঁড়া হচ্ছে। ওখানে প্রচুর গেরিমাটি উঠছে আগের বারে দেখে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে গেরিমাটি তুলে নিয়ে এলে কিছু হস্তশিল্প করা যায় দুপুরের দিকে। একদম টেরাকোটার মতো দেখাবে। কেমন প্রস্তাবটা?

— চমৎকার। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। এবার আর একটা নতুন পথ, সোজা পশ্চিমমুখো, এ-পথ দিয়ে একবেলা হাঁটলে নিশ্চয় দূর সবুজরেখ-দেওয়া নেদাম পাহাড়ে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু আমাদের গন্তব্য পোস্ট অফিস।

পোশাক বদলে আমরা দু-জন বেরিয়ে পড়ি পোস্ট অফিসের উদ্দেশে। দুপাশে ধান-কাটা মাঠ। কোনও কোনও প্লটে এখনও না-কাটা হলুদ ধানখেত। নুয়ে পড়েছে ধানের শিষ। কোনও কারণে ধান কাটা বাকি রয়ে গেছে এখনও। হয়তো কাটা হবে না আর। কিংবা আর ক-দিন পরেই আশেপাশের কোনও গাঁয়ের মানুষ আসবে ধান কাটতে। আরও কিছুটা পরে এরকমই পড়ে থাকা প্লটে ধান কাটার দৃশ্য। ধান কাটার কাজে যে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই তার নজির এখানে। এক ধানখেতের পুরো সোনারঙের ফসল কাটছে শুধু মেয়েরা। শীতের শেষে ঘরে

উঠবে। মেয়েরাও তাদের বলিষ্ঠ কবজির মোচড়ে কেটে গোছ করে তুলছেপাকা ধান। গাছকোমর করে বাঁধা শাড়ির বাঁধন ছাপিয়ে উপচে পড়ছে তাদের যৌবন। কলকাতার নাগরিক, এ-হেন দৃশ্যে যে মোহিত হবে তাতে অবাক হওয়ার কি!

আমি ভাবছিলাম আমাদের রাজ্যে যেমন লেভি প্রথা আছে, এখানেও আছে কি না! আমাদের রাজ্যে যারা লেভি-ডিফল্টার, মানে যারা বড়ো ডিফল্টার, জরুরি অবস্থায় তাদের সবাইকে মিসায় ঢুকিয়ে দেওয়ার হুকুম হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ধান ফলানো যাবে, কিন্তু ধান গোলায় রাখা যাবে না। নিজের জমির ধান দিয়ে দিতে হবে সরকারকে, কম দামে। বাজারের তুলনায় অর্ধেক দামে। বাজারে যেখানে একশো কুড়ি কি তিরিশ টাকা কুইন্টাল, সরকারি দাম তিয়াত্তর টাকা কুইন্টাল। গাঁয়ের মানুষের তো আর কোনও রুজিরোজগার নেই। তারা নিজের খেতের ধান বিক্রি করে সারা বছরের সংসার খরচ যোগায়। ছেলেমেয়ের স্কুলের খরচ জোগায়। মেয়ের বিয়ের খরচ জোগায়। তারা তিয়াত্তর টাকা দরে ধান দিতে যাবে কেন সরকারকে! কিন্তু না দিতে চাইলেই মিসা।

M.I.S.A. নামের চার অক্ষরের শব্দটা এখন গাঁয়ে গাঁয়ে বিভীষিকা।

এখানেও কি সেই চার অক্ষরের শব্দটা কালাপাহাড়ের মতো ঘুরছে ক্ষমতাসীন পার্টির লোকদের মুখে মুখে! কী জানি!

কিন্তু এখন আমাদের ধান কাটা দেখার সময় নেই। ব্রহ্মদা আমাকে নিয়ে চললেন পাহাড়ের দিকে। বাংরিপোসির পোস্ট অফিস হয়তো কাছে। কিন্তু ব্রহ্মদা ইচ্ছে করে দূরের পোস্ট অফিসে নিয়ে গেলেন আমাকে। কারণটা না-বোঝার কিছু নেই। বাংরিপোসিকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছেন ব্রহ্মদা তার একটাই কারণ। জায়গাটা বড়ো বলে প্রশাসনের উপস্থিতি আছে সেখানে। থানা খুব বেশি দূরে নয়। সেখানে বারুদের গন্ধ। ব্রহ্মদা এখন বড়ো বারুদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাইফেলের বারুদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী সেই কলম।

যেতে যেতে গাছে গাছে পলাশ ফুলের রাশি। পথে ঝরে আছে পলাশের ছিন্ন লাল পাপড়ি। গোটা পথে আবিরের ছড়াছড়ি। আমি পলাশ বাঁচিয়ে পা ফেলি। পলাশ মাড়াতে কীরকম কষ্ট হয়।

প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর পিচ রাস্তার মুখোমুখি আমরা। জায়গাটার নাম পাথারন। ছোট্ট গঞ্জ, বাংরিপোসির চেয়েও এক সাইজ ছোটো। সেই গঞ্জের শেষে, মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা টালির ছাউনি দেওয়া পোস্ট অফিস। দু-জনে এতখানি রোদ্দুর উজিয়ে ভিতরে ঢুকতেই টাকমাথা এক প্রায়-প্রৌঢ় উল্লাসে ডগোমগো, আপ ফির আয়া?

ব্রহ্মদার সঙ্গে যেন কতকালের আলাপ।

ব্রহ্মদা একগাল হেসে বসে পড়লেন তাঁর পাশে রাখা টুলটায়। দূরে একটা মোড়া দেখে আমাকে বললেন, বসে পড়ো বিশ্ব। গাঁয়ের পোস্ট অফিস এরকমই হয়। পাঁড়েজি খুব ভালো মানুষ।

বলেই বললেন, পাঁড়েজি, এ হল বিশ্ব। তরুণ কবি। বাংলায় কবিতা লেখে।

আমার পেশার পরিচয় না দিয়ে ব্রহ্মদা যে কবি বলে পরিচিত করালেন তাতে আমি যারপরনাই উল্লসিত। যদিও কবি হিসেবে আমার তেমন খ্যাতি হয়নি এখনও, তবু কোনও

একদিন নিশ্চয় হবে এই ভেবে খাতার পর খাতা কবিতা লিখে চলেছি নিয়ম করে। বন্ধুদের সঙ্গে তুমুল তর্ক করি কফি হাউসের টেবিলে ব্রাউন রঙের ফিউশন ঠোঁটে নিয়ে। কবিরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এই আপ্তবাক্য আউড়ে, আরামের ঢেকুর তুলি ফিউশনের কাপ শেষ করে।

কবি শুনে পাঁড়েজির চোখে এক অন্য আবহাওয়া। ভারী খুশি হয়ে বললেন, এ তো বহুত খুশি কা বাত হ্যায়।

এর মধ্যে আমার দুটো কবিতার বইও যে প্রকাশিত হয়েছে তা আর বলা হল না। পাঁড়েজি ততক্ষণে চোখ রেখেছেন ব্রহ্মদার চোখে, চিট্‌ঠি ভেজনা পড়েগা?

ব্রহ্মদা তাঁর সেই ভুবনভোলানো হাসির টুকরো পাঁড়েজিকে উপহার দিয়ে শার্টের পকেট থেকে বার করলেন খামগুলো। মোটা মোটা খাম। ভিতরে যথেষ্ট বারুদ ঠেসে পোরা। ব্রহ্মদা জানেন, আমিও উপলব্ধি করছি, এর উত্তরে আরও মোটা মোটা খাম ফিরে আসবে কয়েকদিন পর।

পাঁড়েজি তৎক্ষণাৎ খামগুলো টেনে নিলেন কাছে, এক-একটা খাম হাতে নিয়ে ওজন করলেন মনে মনে, তারপর টেবিলের উপর রাখা পোস্ট অফিসের সেই বিখ্যাত শিলমোহরটা তুলে নিয়ে জোরে শব্দ করে ছাপ দিলেন খামটার উপরে। পাঁচটা খাম, পাঁচটাকেই ছাপ-কণ্টকিত করে সরিয়ে রাখলেন পাশেই জমা করা অন্য চিঠিপত্তরের গোছার মধ্যে। জানালেন ডাক-হরকরা এসে পৌঁছবে একটু পরেই। সে এসেই ডাক নিয়ে চলে যাবে বিশয়ী।

বিশয়ী হয়ে ডাক চলে যাবে আরও নানা ঠেক পার হয়ে কলকাতা। যাদের উদ্দেশে চিঠিগুলো পাঠানো হল তাঁরা সবাই যে লেখা পাঠাবেন তা নাও হতে পারে। অনেকেই জেলের ঘানি টানতে ইচ্ছুক হবেন না। সবাই তো আর নিতাইকিশোর ঘোষ নন। কেউ পাঠালেও পাঠাবেন ছদ্মনামে। মতামতের জন্য সম্পাদকই দায়ী।

ব্রহ্মদা একাই সমস্ত লেখার দায়িত্ব নিতে রাজি। মানুষটার অনেক কিছুই গোলমেলে ঠেকত আমার কাছে। কিন্তু জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যেভাবে লড়ে যাচ্ছেন, জনমত গড়ে তুলতে চাইছেন তা এক আশ্চর্য সাহস। যিনি সমুদ্রে নৌকো চালিয়ে ভারতসাগর পাড়ি দিতে মনস্থ করেন তাঁর কাছে মৃত্যুও পায়ের ভৃত্য।

পোস্ট মাস্টার মানুষটিকে লক্ষ করছিলাম ভারী শান্তশিষ্ট। চোখের কোণে জমে আছে এক টুকরো লাজুক বিষণ্ণতা। ব্রহ্মদার কাছেই শুনছিলাম পাঁড়েজির জীবনের ট্র্যাজেডি। বছর বারো আগে খুবই সামান্য কারণে উপরঅলা ক্রুদ্ধ হন তাঁর কোনও গাফিলতিতে। উপরঅলা বিরূপ হলে পৃথিবীর যাবতীয় অধস্তনদের যা দশা হয়, দু-দিনের নোটিসে তাঁকে বদলি হয়ে আসতে হয় পাথারনে। তারপর শুরু হয়েছে পৃথিবীর আর এক যক্ষের নির্বাসনপর্ব। এখান থেকে তাঁর বাড়ি এত দূরে যে, বছরে খুব বেশি হলে দু-বার যেতে পারেন তাঁর বউ-ছেলে-মেয়েকে দেখতে। ব্রহ্মদাকে এই নির্বাসনে বন্ধু হিসেবে পেয়ে তাঁর মনে হয়েছে এই মানুষটাই হতে পারেন তাঁর পরিত্রাতা। বারবার তাঁকে বললেন, আপনি দেখুন না কলকাতায় জি. পি. ও.- তে বলে আমাকে রাঁচি বদলি করে দেওয়া যায় কি না!

আমি ব্রহ্মদার দিকে তাকাই। তাঁকে কলকাতার লোক জানে একজন দুঁদে সাংবাদিক হিসেবে। মাঝেমধ্যে কড়া পোস্ট-এডিটোরিয়াল লিখে শাসকশ্রেণিকে বেশ বিপদে ফেলেন।

কী জানি, পাঁড়েজিকে তিনি কোনও ভাবে বদলি করে দিতে পারেন কি না! কিন্তু করে দিতে পারলে ভালো হত। মহান কবি কালিদাস পৃথিবীর যাবতীয় যক্ষদের সম্পর্কে দুর্বলতা সৃষ্টি করে গেছেন মানুষের মনে।

ব্রহ্মদা এর আগেও হয়তো আশ্বাসবাণী জুগিয়েছেন পাঁড়েজিকে। এবার বললেন, কোশিস করতা হ্যায়।

পাঁড়েজির আগ্রহী মুখের দিকে তাকিয়ে সেই উপচানো হাসি ছুঁড়ে দিলেন ব্রহ্মদা। তারপর বেরিয়ে এলেন শ্লথ পায়ে। বাইরে বেরোতেই একজন মাঝবয়সী লোককে দেখা গেল পোস্ট অফিসে ঢুকতে। ব্রহ্মদা তাকে দেখেই আবার ফিরে দাঁড়ালেন। অর্জুন, আমার চিঠি আছে আজ। পাঁড়েজিকে দিয়ে এসেছি। নিয়ে যেয়ো।

অর্জুন নামের লোকটি হাসল মিষ্টি করে।

ব্রহ্মদার পৃথিবী আমার সামনে উন্মোচিত হচ্ছে একটু একটু করে। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালীন কত মানুষের সঙ্গেই যে পরিচিত হয়েছেন ব্রহ্মদা! কলকাতা থেকে বেরিয়ে এসে এই পাহাড়তলির দেশে একটা আলাদা সংসার পেতে দিব্যি আছেন এ ক-মাস। কী জানি, আরও কতদিন থাকতে হবে। যতদিন না ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। ধরা পড়লে অবশ্য মাথার উপর পাঁচশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলতে থাকবে সারাক্ষণ। তা ছাড়াও আরও কী শাস্তি হবে কে জানে! এ-দেশের সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত করে জারি করেছেন গ্রেফতারি পরোয়ানা।

কিন্তু কয়েকদিন ব্রহ্মদার সঙ্গে বাস করতে গিয়ে আমার যা মনে হচ্ছিল — কলকাতায় যে-ব্রহ্মদাকে চিনতাম, এখানে যেন তিনি বাস করছেন না, করছেন অন্য কেউ। এক অন্য পরিচয়ে। তাঁর এখানে এক নতুন সত্তা। তাঁর হাতে রং-তুলি নেই, থাকলেও তা নিতান্ত অ্যামেচারিশ, কিন্তু তিনি এখানে আর্টিস্ট। আর সেই আর্টিস্ট সত্তা ধরে রাখতে তাঁকে প্রতি মুহূর্তে রচনা করতে হচ্ছে নানান ছবি। সবই মনে মনে আঁকছেন, আর উপহার দিয়ে চলেছেন একে-ওকে।

ফেরার পথে অন্যদিকে বাঁক নিই, কেন না সেই পুকুরটার অবস্থান এদিকে। মস্ত পুকুরটা কাটা হচ্ছে বহু শ্রমিকের পরিশ্রমে। তার কিনারে টাল হয়ে আছে যে-মাটি তার রং দেখে বিস্মিত হই। একেই তা হলে বলে গেরিমাটি! গেরুয়া রঙের মাটি এর আগে কখনও দেখিনি। সেই মাটি দু-হাতে বোঝাই করে ফিরতে থাকি আগের পথে। চোখেমুখে রাজ্য জয় করার মৌজ। ব্রহ্মদা পুতুল গড়ে নিয়ে যাবে কলকাতা। শুকোলে নাকি একদম টেরাকোটা।

হঠাৎ পথের মধ্যে সেই খেতটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে যাই যেখানে ধান কাটছিল গাঁয়ের মেয়েরা। কাটা ধান গোছ করে বিড়ে করে বেঁধে সাজিয়ে রাখছে থরে থরে। শহরে তো এরকম দৃশ্য দেখার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মেয়েদের ধান কাটা দেখি। একবার নিচু হয়ে ধান কাটে, পরক্ষণে উঁচু হয়ে সেই ধান রেখে দেয় পাশে গোছ করে।

আমাদের দেখে কালো চেহারার একটা মেয়ে ধানকাটা ফেলে এগিয়ে এল। কাল বাংরিপোসির বাজারে একে দেখেছি চাল বিক্রি করছিল। হেসে বলল, আর্টিস্ট, কবে এলে?

— কাল সকালে। কেমন আছ, পার্বতী?

— ভালো। তুমি?

বলে মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। কী আশ্চর্য, ব্রহ্মদাকে এরাও চিনে ফেলেছে গত ক-মাসে! তবে আমাকে দেখে সবাই একটু অবাক। কী জানি, অ্যাপেনডিক্সকে কেউ পছন্দ করছে কি না!

— ভালো। এ হল বিশ্ব। কবি। কবিতা লেখে কলকাতার কাগজে।

কবিতা ব্যাপারটা তার মাথার উপর দিয়ে ট্যান হয়ে বেরিয়ে গেল নিশ্চয়ই। ট্যান মানে ট্যানজেন্ট। এ-কালের ছেলেমেয়েরা কলেজে ব্যবহার করে কোড হিসেবে।

— ঘুরতে বেরিয়েছ? মেয়েটার কথা হিন্দি-ওড়িয়া মেশানো। বাংলার টানও আছে। এরা নাবাল খাটতে যায় নানা দেশে। তাই সব ভাষারই কিছু মিশেল দিতে জানে সংলাপে। যদি পুরো ওড়িয়া বললে আমরা না বুঝি, তাই।

ব্রহ্মদার সেই ভুবনভোলানো হাসি, হুঁ, যাব নেদাম পাহাড়।

—হাই বাপ, সে তো একবেলার পথ। পৌঁছোতে সন্ধে। মেয়েটা চোখ কপালে তোলে। তা খালি হাতে যেয়ো না। চিতা আছে ওখানে।

বলেই হাত বাড়াল, সিগারেট আছে তোমার কাছে?

কেউই সিগারেট খাই নে। ব্রহ্মদা বললেন, ওই যাহ্, একদম ভুলে গেছি। ঠিক আছে, কাল বাজারে তোমাকে এক প্যাকেট সিগারেট প্রেজেন্ট করব। তবে আজ না হয় নেদাম না-ই গেলাম। একদিন তোমার সঙ্গে যাব। আমাদের নেদাম পাহাড়ের পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তুমি হবে আমাদের শেরপা।

মেয়েটা কী বুঝল কে জানে, ফিক করে হাসল। পরক্ষণে আঁচলের খুঁট খুলে একটা বিড়ি বার করে ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলল, নেদাম পাহাড়ে একবার ছোটোবেলায় গিয়েছিলাম বাপের সঙ্গে। পাহাড়ের নীচে জঙ্গলে ভালো মধু হয়। টইটম্বুর মৌচাক। সেই মধুর কি সোয়াদ! পাহাড়িফুলের গন্ধ খুব মিঠে হয়। আর বুনো। তখন মধুর ব্যবসা ছিল আমাদের।

— এখন নেই?

আলের উপর ঘাসের জাজিমে পা ছড়িয়ে বসে পড়েছি দু-জনে। পার্বতীর গল্প শুনতে শুনতে আমি টেরাকোটার কারুকার্য করা মেয়েগুলোর শরীরের নাড়াচাড়া দেখছি। পাহাড়ের উপরে শহর বিশয়ীতে ওদের দোকান আছে। আগে বিক্রি হত মধু, এখন ছোটোখাটো হোটেল করেছে ওরা। যাতায়াতের পথে গাড়ি থামিয়ে লোকজন খায় ভাত ডাল তরকারি। কখনও মাছ। দিশি মুরগির মাংস। মাছ সব সময় মেলে না। পার্বতীর ভাই দেখাশুনা করে হোটেলটা। এখানে ওদের পনেরো-ষোলো বিঘে ধানের জমি। আশ্চর্য, তবু পার্বতী বাজারে গিয়ে চাল বিক্রি করে।

— তা মধুর ব্যবসা উঠে গেল কেন?

পার্বতীর গল্প তখন নিবিষ্ট করছে আমাদের। পাহাড়তলির মানুষদের গল্প আস্তে আস্তে জন্ম দিচ্ছে এক অন্য পৃথিবীর। যে-পৃথিবীতে আমাদের যাতায়াত থাকে না। যে-পৃথিবী অন্য রকম। পার্বতীর বাবা নাবালডিহির সাঁওতালদের নিয়ে যেত নেদাম পাহাড়। ওরাই মধু ভাঙত। নেদাম পাহাড়ে তো জীবজন্তু আছে, তাই সাঁওতাল ছাড়া যাওয়া যেত না। ওরা দরকার হলে

টাঙি দিয়ে চিতার পেট ফালা করে দিতে পারে। কাঁচা পাতা লাঠির ডগায় বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, তাতেই সব মৌমাছি পালিয়ে যায়। ভাঁড়ের পর ভাঁড় বোঝাই হত পাহাড়ে। সেই ভাঁড় দল বেঁধে নেমে আসত নীচে অপেক্ষারত গরুর গাড়ির কাছে। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে মধু আসত পার্বতীদের বাড়িতে। তা এভাবে বেশ ক-বছর মজুর হিসেবে কাজ করার পর সাঁওতালরা বুঝল আসলে জঙ্গলের মধু তাদেরই। পার্বতীর বাবা কেবল তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করছে। তারপর একদিন বাবা তাদের নিয়ে গেল, আর ফেরেনি। তারপর একদিন সাঁওতালরা নিজেরাই গরুর গাড়িতে মধু বোঝাই করে ফিরে এসে বিশয়ীতে গিয়ে বিক্রি করে দিল। আমাদের বলল চিতাবাঘে নিয়েছে বাবাকে। কিন্তু যেভাবে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে মধু নিয়ে গেল ওরা, তাতে বুঝতে পারলাম, ওরাই বাবাকে নেদাম পাহাড়ে রেখে এসেছে।

অবাক হয়ে শুনছিলাম। সিমলিপাল রেঞ্জের অনেক রহস্যের এও একটা। গায়ের ভেতরটা শিরশির করতে শুরু করে। পার্বতীর বিড়ি ততক্ষণে শেষ। বিড়ির টুকরো ছুড়ে ফেলে দিতেই দেখি ওর চোখের কোণে জল।

কিন্তু ওর নিজের জীবন! সে-প্রসঙ্গ তুলতেই পার্বতীর সেই গল্পও মন খারাপ করে দেওয়ার। বাবা ওকে বিয়ে দিয়েছিলেন লেখাপড়া জানা ছেলে দেখে। কিন্তু ছ-মাস যেতে না যেতে তারা বলল এ-বউ ভালো না। পার্বতী সেই যে ফিরে এসেছে তাঁর গাঁয়ে, তারপর এই খেতি নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে বাকি জীবন। সে এখন ভাইয়ের হোটেলের ভালো-মন্দ নিয়ে সারাক্ষণ ভাবনা করে।

যতদূর চোখ পড়ে কেবল কাটা ধানখেতের দৃশ্য। হলুদ ছোপ ছোপ ল্যান্ডস্কেপ। পাহাড়ের কোণ পর্যন্ত এরকম দৃশ্য। অন্যদিকে দু-একটা বসতি, বড়ো বড়ো শাল ও কেঁদ গাছ। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে খড়ের চালের অংশ চোখে পড়ে।

— পার্বতী, একদিন আমরা দু-জনে বিশয়ী গিয়ে তোমার ভাইয়ের হোটেলে ভাত আর দিশি মুরগির ঝোল খেয়ে আসব।

খুব খুশি হল পার্বতী, বলল, আমার বাড়ি কাছেই, যাবে? চলো না?

ব্রহ্মদা হাসল, আজ থাক। কয়েকটা পুতুল গড়ব দুপুরে। ছবি আঁকব।

এতক্ষণে পার্বতী কাজের কথায় আসে। নেপালকে যে-রকম সাইনবোর্ড করে দিয়েছ, আমার ভাইয়ের হোটেলের জন্য ও-রকম একটা করে এনে দিতে হবে কলকাতা থেকে।

ব্রহ্মদা বিব্রত। কলকাতা থেকে একটা সাইনবোর্ড বয়ে আনার যে কী ঝকমারি তা পার্বতী জানে না। আমি জানি।

ব্রহ্মদার দ্বিধা চোখ এড়াল না পার্বতীর। তক্ষুনি জানাল সাইনবোর্ড আঁকার যাবতীয় খরচাপাতি বহন করবে তার ভাই। তার ভাইয়ের নাম বাসুদেব। সাইনবোর্ডে তার ভাইয়ের নাম যেন খোদাই করা থাকে এই তার পরবর্তী আর্জি। আমি ব্রহ্মদার কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করি, আন্ডারগ্রাউন্ডে এসেও কী যে টানাপোড়েনের মধ্যে থাকতে হয়! বাংরিপোসির হোটেলে যদি মেদিনীপুর-মেড সাইনবোর্ড শোভিত হয়, কেন বিশয়ীর হোটেলেও তা শোভিত হবে না!

সাইনবোর্ডের ব্যাপারটা বেশ চাউর হয়ে গিয়েছে তল্লাটে। নেপালের দোকানে এখন অ্যারিস্টোক্রেসি এসেছে। খদ্দেরের ভিড় বেশি। তাই দেখে গোটা এলাকায় একই সঙ্গে উল্লাস, ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ব্রহ্মদা বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার আসার সময় দুটো সাইনবোর্ড লিখিয়ে আনতে হবে। একটা তোমার ভাইয়ের, আর একটা মহেন্দ্রর।

ঘাসের জাজিম ফেলে আমরা দেবদূতের মতো উঠে আসি রাস্তায়। হঠাৎ এমন পাহাড়তলির গ্রামে মেদিনীপুর থেকে এক আর্টিস্ট এসে পৌঁছোনোয় তার কাছ থেকে সুবিধে পেতে চাইছে যার যেমন সম্ভব। লাল কাঁকরের পথ বেয়ে খানিকটা হাঁটি। পিছন থেকে ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে দুলকি চালে একটা জোয়ান মেয়ে এসে আমাদের ধরে ফেলল। আমাদের পিছন থেকে দ্রুতপায়ে এসে চলে যাচ্ছিল অতিক্রম করে। অদ্ভুত কায়দায় ওদের শরীর দোলে ধানের আঁটি বইবার সময়। ছিপনৌকো যেমন চলে উজান স্রোত বেয়ে। না-হাঁটা, না-দৌড়োনো এমন অদ্ভুত ছন্দে চলা। আমাদের পেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ব্রহ্মদা পা চালাল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, নতুন ধান উঠছে, কবে উৎসব হচ্ছে তোমাদের?

মেয়েটা তার গতিবেগ থামিয়ে দিল, তবু তার সঙ্গে তাল রাখতে রীতিমতো জোরে হাঁটতে হচ্ছে আমাদের। ধানের আঁটি মাথায় তুললে এমন দুলকি চাল আসে। মেয়েটির দারুণ ফিগার, রং মাজা হলেও হিন্দি সিনেমার নায়িকারাও লজ্জা পেয়ে যাবে। লাল কালো ডুরে শাড়িতে বাঘিনীর মতো লাগছে। দুলকি চালে চলতে চলতেই বলল, আর উৎসব! সবার ধান তো উঠে গেছে। শুধু আমাদেরটাই যা বাকি ছিল।

— কেন, বাকি ছিল কেন?

— মামলা করে আটকে রেখেছিল আমাদের মাঠ।

আমার মাথায় মিসা শব্দটা পাক খাচ্ছিল বারবার। মা জরুরি দেবীর কৃপায় পশ্চিমবঙ্গের গাঁয়ে গাঁয়ে মিসা শব্দটা এখন কালাপাহাড়ের মতো ঘুরছে। কিন্তু এরা যদি শব্দটা না জেনে থাকে তবে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে সাবালক করে দেওয়াটা ঠিক হবে না।

বলি, তবু তোমাদের ঘরে তো এই প্রথম ধান। নবান্ন একটা করাই উচিত। বেটার লেট দ্যান নেভার।

শেষ বাক্যটা অবশ্য বললাম না মেয়েটাকে। ভাববে, বাবুরা গ্রামে এসে গালাগাল দিচ্ছে। বরং বললাম, তোমাদের বাড়ি নবান্ন হলে বোলো, নেমন্তন্ন খাব।

৬

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর ব্রহ্মদা বললেন, বিশ্ব, আজ আমি পত্রিকার জন্য সম্পাদকীয় লিখব। তারপর একটা গল্প। লেখা দুটো আজকেই শেষ করতে হবে। কাল ডাকে পাঠাব যাতে প্রেস খুব দ্রুত কম্পোজ শুরু করে দিতে পারে। অতএব তোমাকে আজ একদম সময় দিতে পারব না। প্লিজ। এ-সময়টা তুমি একটা ঘুম দিয়ে নিতে পারো ঘরে।

আমি জানি ব্রহ্মদা লেখার সময়ে খুব সিরিয়াস। কাউকেই পাত্তা দেন না তখন। নিবিষ্ট হয়ে লিখে যান পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা।

— আমাকে কেন সময় দেবেন? আপনার পত্রিকার কাজ সবচেয়ে আগে। আমি তো এখানে আপনার অ্যাপেনডিক্স।

— না, অ্যাপেনডিক্স কেন হবে! বরং এক কাজ করো। তুমি কয়েকটা কবিতা লেখো এ ক-দিনে। এ-রকম হারিয়ে যাওয়ার পরিবেশে নিশ্চয় তোমার কলমে উসখুস করছে কবিতার লাইন। লিখে ফ্যালো। আমি 'শহর'-এ ছাপব।

— আমার কবিতা 'শহর'-এ ছাপবেন? কিন্তু বললেন তো 'শহর' এবারও বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লেখা হবে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সবই।

ব্রহ্মদা কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার পিছনে জানলা দিয়ে নেদাম পাহাড় পর্যন্ত। চোখের তারা নড়ছে না। তারপর বললেন, কিছু সরল কবিতাই লেখো না। সরল ভাষায়ও তো বলা যায় 'আমার নিজের কথা বলতে দাও'। সেই কবিতাই ছাপব।

কিছুক্ষণ ব্রহ্মদার কথায় ঠিক প্রত্যয় হয় না আমার। আমি কবি হিসেবে এখনও অ্যাপ্রেনটিস। এখন পড়ছিই বেশি। লিখছি কম। লেখার মতো যথেষ্ট ম্যাচিউরিটি আসেনি বলেই আমার ধারণা। জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দে পড়ার পর কবিতা লেখার সাহস কোথায়! যা লিখছি কোনওটাই পাতে দেওয়ার নয়। বলি, না ব্রহ্মদা, আমার কবিতা ছাপা হলে পত্রিকার সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে।

— ঠিক আছে লেখা শুরু করো। একটা কবিতা শেষ হলেই আমাকে দেখাবে। তবে হ্যাঁ, কবিতা সেন্সর করার গুরুমশাই যারা, তারা কয়েকটি শব্দ খুঁজে পেয়েছেন যা কবিতায় দেখলেই তাঁরা কেটে দিচ্ছেন।

— যেমন?

— যেমন আগুন। যেমন বারুদ। যেমন বিদ্রোহ। যেমন বিপ্লব। যেমন...

— সে কী! যদি নারী বিদ্রোহ করে পুরুষের বিরুদ্ধে, সেই কবিতাতেও বিদ্রোহ ব্যবহার করা চলবে না?

— একেবারেই না। থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে সেন্সরের শান দেওয়া কাঁচি, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কেটে বাদ দিয়ে দেবে শব্দগুলো।

— তাতে কবিতার মানে যদি বদলে যায় তাও?

— তাও। শোনো তা হলে। সেন্সরের এমনই মহিমা যে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া নিষেধ। আকাশবাণীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের সম্প্রচার চলবে না। মহাত্মা গান্ধী সম্পাদিত 'হরিজন' অথবা 'ইয়ং ইন্ডিয়া' থেকে কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্ধৃতি দেওয়া নিষেধ।

— সে কী!

সেন্সরের এত কাণ্ড আমার কানে আসেনি। আসবেই বা কী করে! কোনও খবরই তো প্রকাশ পাচ্ছে না সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়!

— এখনও তো ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছোইনি, মাই ডিয়ার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পিতৃদেব লিখিত আত্মজীবনীর কয়েকটি অংশও ব্যবহার করা যাবে না উদ্ধৃতি হিসেবে।

— সে কী! আমার সামনে পিসার হেলানো টাওয়ার উল্টে পড়তে বাকি থাকে।

ব্রহ্মদা খবরের কাগজের ফ্রি-ল্যান্স রাইটার। তিনি যতটা ভিতরের খবর দিতে পারবেন, আর কেউ না। কিন্তু বিষয়টি আমাকে মুখোমুখি নিয়ে গেল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্যারাডক্সের। বাবার আত্মজীবনীও যিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন তিনি সত্যিই একজন অমনিপটেন্ট, একজন ঈশ্বর।

— নাও, তুমিও লিখতে বোসো।

— কবিতা লেখো বললেই কি কবিতা লেখা যায়!

এটি আমারই লেখা একটি কবিতার লাইন। এই এক পঙ্‌ক্তি ডায়েরিতে লিখে ফেলে রেখেছি বহুকাল। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দেখা মেলেনি বলে প্রথম পঙ্‌ক্তি সেই থেকে অনাথ হয়ে পড়ে আছে ডায়েরির পৃষ্ঠায়।

বললাম, দাঁড়ান, কবিতা লিখতে গেলে তার একটা প্রস্তুতি লাগে তো! আমি কিছুক্ষণ ঘুরে আসি আঁধারপান্থ জায়গাটা। ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চয়ই কয়েকটা লাইন অমনি এসে ভর করবে কলমের ডগায়।

— ঠিক আছে। প্রস্তুতি নাও।

বলে ব্রহ্মদা আর কথা দীর্ঘায়ত না করে বসে পড়লেন খাতা আর কলম নিয়ে। পাশে বড়ো শালগাছটার নীচে একটা হাতখানেক উঁচু কাঠের বাক্সকে টেবিল বানিয়ে নিয়েছেন ব্রহ্মদা। মাটিতে বসে লিখতে শুরু করলেন। সামনে সিমলিপাল রেঞ্জের অসাধারণ দৃশ্য। এখানে জরুরি অবস্থার কালো হাতের প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। নেই, তবু জরুরি অবস্থার সেই কালো হাত ক্রমশ বিশাল হয়ে পিছু পিছু ঘুরছে ব্রহ্মদার। এবার নির্ঘাত একটা দারুণ গল্প বেরোবে।

দুপুরে ঘুম আবার একেবারেই সহ্য হয় না আমার। বাইরে বেরিয়ে তো আরও নয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আউটিং-এ বেরিয়ে দেখেছি তারা কেবল গেলাস গেলাস মদ খাবে আর ডাকবাংলোয় শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে। মানুষজনের সঙ্গে মেশার কথা মনে থাকে না কারও। তা হলে তাদের আউটিং-এ যাওয়া কেন, ঘরে শুয়ে ঘুমুলেই তো হয়।

লেখা শেষ হলে ব্রহ্মদা সন্ধেয়, আমাকে নিয়ে একটা নতুন জায়গায় যাবে বলেছে। কোথায় বলেনি। কিন্তু এখানকার অনেক আশ্চর্য জায়গার একটি। অতএব এই দুপুর-সন্ধের অবসরটুকু একটু টই-টই করা যাক। শীতের দুপুরে গা-সওয়া রোদ। চমৎকার লাগছে।

অতএব কবিতার ভাবনা মাথায় নিয়ে ঘুরতে বেরোই।

সম্পন্ন পরিবার বলতে খুব একটা বেশি নেই আঁধারপান্থ-এ। পাকা বাড়ি বলতে একটি। অবশ্য মাটির দু-একটা বড়োসড়ো আটচালাও আছে। একটু ঠাহর করলেই বোঝা যায় ঘরগুলোতে এক অদ্ভুত ভিন্ন ধরনের ছাঁচ। এ-গাঁয়ের একমাত্র পাকাবাড়ির মালিক এ-গাঁওয়ের মোড়ল-মাতব্বর বিশেষ। বাংরিপোসির বাজারের মধ্যে একটা বড়ো মুদিখানার দোকান আছে মোড়লের। সুতরাং নানান টাটকা খবর এসে পৌঁছোয় এই গাঁও-এর বাজারে রোজ রোজ। মোড়ল তার দোকানে বসেই গাঁয়ের ও বাইরের খবর জোগাড় করে। গাঁয়ের ভিতরে লাল কাঁকরের এলোমেলো পথ মাড়াতে মাড়াতে ক্রমশ জঙ্গলের দিকে সেঁধোই। একেবারে আন্‌কা

জায়গা, ব্রহ্মদা সঙ্গে না থাকলে এভাবে এসে বাসা বেঁধে থাকা আমার সাহসে কুলোত না বোধহয়। ব্রহ্মদা ভালো পি.আর. করতে পারে। সামান্য ক-দিনেই সমস্ত গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কেমন আত্মীয়তা পাতিয়েছেন। কলেজে পড়তে ব্যবহার করতাম পি.আর. শব্দটা। পাবলিক রিলেশনে সবাই পোক্ত নয়।

আজ সকালেই দু-জন লোক তাদের সমস্যা পকেটে পুরে চলে এসেছিল ব্রহ্মদার কাছে। একজন তার সম্বলপুরের আত্মীয়কে চিঠি লিখতে চায়। সঙ্গে পোস্টকার্ড এনেছে, তাকে চিঠি লিখে দিতে হবে। ব্রহ্মদা বেশ বিপদেই পড়লেন কেন না তার চিঠি লিখতে হবে ওড়িয়া ভাষায়। হিন্দি হলেও তবু কথা ছিল। কিন্তু ওড়িয়া তো আমাদের কাছে হিব্রু বা ল্যাটিন। লোকটি ভাবতেই পারছিল না একজন আর্টিস্ট যাকে তারা পড়া-লিখা লোক বলে জানে সে একটা চিঠি লিখতে অপারগ। তাকে বিষয়টা বোঝানোই যাচ্ছিল না কোনওমতে। বলছিল, 'তুমি লিখে দিবে না তাই বলো।' শেষে ব্রহ্মদা তার কাছ থেকে চিঠির বিষয় জেনে আর আত্মীয়র ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে আমরা কাল পোস্ট অফিসে যাব। তোমার আত্মীয়কে চিঠি লিখে ওখানে ফেলে আসবখনে।' লোকটি তাতেই বেজায় খুশি।

অন্য লোকটি এসেছিল তার বিবাহিত মেয়েকে নিয়ে। বছর তিরিশ বয়স মেয়েটির। ছোট্ট চেহারা বলে বাইশ-তেইশের আদল মুখে। তাকে বিয়ে দিয়েছিল কম বয়সেই। তার জামাই কাজ করে গিরিডির একটা পাথর ফ্যাক্টরিতে। আগে মাসে মাসে টাকা পাঠাত, ঘরে আসত বছরে একবার। গত দু-বছর আর আসে না। টাকাও না। ব্রহ্মদা মেদিনীপুরের লোক, তিনি কি গিরিডি থেকে অনন্ত রাউতের খবর নিয়ে আসতে পারেন?

কে অনন্ত রাউত তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা থাকার কথা নেই আমাদের। কিন্তু ব্রহ্মদা এ-গাঁয়ের সর্ব-সমস্যা-নিবারক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। তাঁকে গিরিডির সেই পাথর ফ্যাক্টরির ঠিকানা নিতেই হল, পরের বার আঁধারপাহু গাঁয়ে আসার আগে খবর নিয়ে আসবেন বলে।

এই সব সমস্যার মধ্যেই ব্রহ্মদাকে লিখতে বসতে হয়েছে সম্পাদকীয় ও ছোটোগল্প।

বোহেমিয়ানদের মতো ঘুরতে ঘুরতে কতদূর সেঁধিয়েছি বুঝতে পারিনি। সরু মেটে পথে একটা জঙ্গলের বাঁক পেরোতেই পা দুটো একটু কেঁপে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কাপালিক ফের শক্তসমর্থ হয়ে বুনো ঝোপের ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরোলো। সেদিন অতটা ঠাহর হয়নি। আজ দেখি তার জটাজুট, রুদ্রাক্ষের মালায় ভরা বিশাল শরীর। লাল শালুর কাপড় পরনে। আমার দিকে এমনভাবে চাইছে যেন এই মুহূর্তে ভস্ম করে ফেলবে আমাকে। বুকের ভেতর এক লক্ষ ধক ধক শব্দ শুনতে পেলেও হঠাৎ একটা শহুরে সাহস ভর করল আমার মগজে। দুম করে কলারটা তুলে দিয়ে হাতের আস্তিন গুটোতে গুটোতে তার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাই। মুখে এমন একটা ভাব করলাম যেন, ওহে কাপালিক, এই শর্মা নবকুমারকে এখনও চেনোনি, একদিন দেবো বলির টিলা ফুটো করে। অমনি হুড়মুড়িয়ে পড়বে আছড়ে।

অনেকটা পথ ঘুরে, নাক বেড় দিয়ে কান ধরে বাড়ি ফিরি। ওই জঙ্গুলে রাস্তাটায় আর একা যেতে সাহস হল না। সেদিন ওদের বাড়িতে একটা মস্ত বড়ো খাঁড়া ঝুলতে দেখে এসেছি। ন্যাড়া আর ক-বার বেলতলায় যায়! বাড়ি ফিরে দেখি তখনও ঘাসের উপর বসে ব্রহ্মদা লিখে

যাচ্ছেন। অনেক বাতিল লেখা-পৃষ্ঠা ছড়িয়ে আছে শুকনো শালপাতার ভিড়ে। লেখার সময় ব্রহ্মদার চোখে যেন ফসফরাস জ্বলে। অনেকগুলো লেখা স্লিপ পাশে জমা হয়ে গেছে। আমি আবির্ভূত হয়ে বললাম, কাপালিকের হাত থেকে আজ জোর বেঁচে গেছি।

নাকে নেমে আসা চশমা সোজা করে ব্রহ্মদা বললেন, দেখা হল নাকি? কী বলল? সেই ভরের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে, না এখনও চালাচ্ছে?

বললাম, লোকটা খুব ডেঞ্জারাস কিন্তু। আমাদের উপর খুব নজর রেখেছে।

— তুমি কি আঁধারপাহু গাঁয়ে এসে থ্রিলারের সন্ধান পেয়েছ!

বলে ব্রহ্মদা ততক্ষণে ডুবে গিয়েছেন তাঁর লেখায়।

— একদিন লোকটার নাকে ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দেবো।

কথাটা এবার মনে মনেই বলি। বেশি বিরক্ত করা ঠিক হবে না ব্রহ্মদাকে।

অতএব আমি কিছুক্ষণ একা একা নিজের সঙ্গে রাগারাগি করি। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বসাই কাপালিকের ভূমিকায়। তাঁর এক হাতে খাঁড়া। তিনি যাবতীয় বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ফ্রিডম অফ স্পিচকে বলি দিচ্ছেন নির্বিচারে।

এ-রকম ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে অবশেষে কবিতার খাতাটা বাগিয়ে বসে পড়ি চত্বরের একপাশে। এখন কিছুক্ষণ আমাকে বিরাজ করতে হবে কবিতার অলৌকিক পরিমণ্ডলে। একটা আঁকশি নিয়ে বেরোতে হবে জুতসই শব্দের খোঁজে। কিংবা শব্দ খুঁজতে গিয়ে হয়তো পেয়েই গেলাম একটা লাগসই পঙ্‌ক্তি। এক-একটা করে পঙ্‌ক্তি লিখে তা গুঁজে রাখি কোনওটা পকেটে, কোনওটা কানের গোড়ায় একটা আধ-খাওয়া বিড়ির মতো, কোনওটা মগজে, কোনওটা ঠোঁটের ডগায়। তারপর পঙ্‌ক্তিগুলো একটা একটা করে বার করে বেশ জম্পেশ করে জোড়া দিলেই তো কবিতা।

কিন্তু ব্রহ্মদা যেমন বললেন সেরকম, মানে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কবিতা লিখব! আমি একটা বিশুদ্ধ সরকারি চাকরি করি। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়। শুনেছি প্রধানত তাঁরই পরামর্শে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জারি করেছেন এই সাংঘাতিক জরুরি অবস্থা। একজন সরকারি কর্মচারী হয়ে যদি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কবিতা লিখি তা হলে চাকরি 'নট' হওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ছাপোষা বাড়ির ছেলে, বহু কষ্টে পরীক্ষা-টরিক্ষা দিয়ে চাকরিটা জোগাড় করা গেছে, এখন চাকরিটা খোয়ালে কী খাব পরবর্তী দিনগুলিতে।

খুব ঝামেলার বিষয় নিঃসন্দেহে। পরক্ষণে এও মনে হল, আমি কি চাকরি করার জন্য জন্মেছি! একজন বিশুদ্ধ কবি হওয়ার জন্যই আমার এবারের জন্ম। এখনও পর্যন্ত যা লিখেছি তাতে পুরো কবি না হলেও আমি বাংলা-সাহিত্যের একজন সিকি কবি। কিছু দুর্বল, কিছু সবল কবিতা লিটল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে এ ক-বছরে। দু-একজন আধা কবি তো বেশ পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন মাঝেমধ্যে, 'চালিয়ে যাও। বেশ লিখছ।' এখন সেই আমি, একজন সিকি কবি, 'শহর'-এর মতো বিখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনের এই বিতর্কিত সংখ্যায় যদি একগুচ্ছ কবিতা লিখি তা হলে আমার নামেও ওয়ারেন্ট জারি হবে, আমিও আঁধারপাহু গাঁয়ের মতো কোনও গাঁয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকব, কলকাতায় আমার কবিতা নিয়ে, তার চেয়েও বেশি আমার সাহস নিয়ে আলোচনা চলবে সর্বত্র। চাকরি গেলে তা নিয়েও আলোচনা চলবে,

বলবে, 'কবিতা লিখে শহিদ হল বিশ্ব!' তারপর আমার খ্যাতি নিয়ে আর কোনও ভাবনা নেই। আজকাল নেগেটিভ খ্যাতিই আসল খ্যাতি। অন্তত, দ্রুত খ্যাতি পেতে গেলে নেগেটিভ খ্যাতিই সম্বল। আর একবার খ্যাতি পেয়ে গেলে আমার কবিতার বই বিক্রি বেড়ে যাবে হু হু করে। তখন চাকরির প্রয়োজন হবে না। বই বিক্রির রয়ালটি থেকেই ভরণপোষণ। একজন কবি-যশোপ্রার্থীর ভো এরকমটাই কাম্য। রয়ালটি থেকে সংসার চালানোর মতো বিখ্যাত হওয়া।

অতএব কবিতার খাতাটি সামনে মেলে কলমটি চাগিয়ে ধরে প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই লিখে ফেলি:

কবিতা লিখতে পারেন, তবে তাতে একটুও 'আগুন' থাকবে না...

এই পর্যন্ত লিখে নতুন সাইকেল চড়ার মতো বেশ উৎসাহিত বোধ করি। প্যাডেল ঘোরাতে থাকি বাঁইবাঁই করে। হ্যান্ডেল ধরে থাকি। একটু টাল খেলেই সপাটে পপাত ধরণীতলে তা বুঝেও পরবর্তী পঙ্‌ক্তিটি বেশ তরতরিয়ে এসে যায় ডট পেনের ডগায়:

যদি কোথাও এক-আধ ছিটে 'বারুদ' থাকে তাও সযত্নে পরিহার করবেন...

দুটি পঙ্‌ক্তি এমন তরতরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ায় আমি অনুভব করি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আমার ভিতরে একটা প্রতিবাদ ছিলই, ব্রহ্মদার সংস্পর্শে তাতে আরও ঘৃতাহুতি হয়েছে। সেই মুহূর্তে আমার কবিতার সুদৃশ্য ডায়েরিতে এক আউন্স পুরীষ খসে পড়ল উপর থেকে। নিঃসন্দেহে কোনও পক্ষীশ্যালকের বিষ্ঠা। অতঃপর আমি চারপাশের শালগাছের গুঁড়ি বেয়ে চোখকে উঠতে দিই মগডালে। কোথাও এই ঘন দুপুরে সূর্যালোক দেখা যায় না। ছায়া ছায়া লাগছে বটে, কিন্তু তাতে এই শীত-উত্তীর্ণ দুপুরে কোথাও উত্তাপ নেই। অদৃশ্য শ্যালকটি কোথায়, কোন নিরীহ শালপাতার অন্তরালে সুখে কালাতিপাত করছে তা দু-চোখে অনেক দূরবীক্ষণ লাগিয়েও ঠাহর হয় না। যে-ক্রোধ এতক্ষণ ধরে ধোঁয়া উদগীরণ করছিল তা এখন জ্বলে উঠতে চাইছে আগুন হয়ে। ডট পেনের ঝাঁকিতে তাকেও থামিয়ে দিতে এগোই। কিছু বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিতেই তাকেও নিরস্ত করি পলকে। তাতে যা দাঁড়ায় — লিখি:

এও জেনে রাখবেন কবিতায় 'ক্রোধ' ত্যাগ করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয়
যদি কখনও কোনও পঙ্‌ক্তি একটুও 'বিদ্রোহ' করতে চায়
তাও কিন্তু সমূলে উৎপাটিত করতে হবে...

আমার মগজ তখন আর এ-জগতে বিরাজ করছে না। ও-পাশে ব্রহ্মদা বিলীন হয়ে গেছেন এক অন্য জগতে। সেই জগতের দোরগোড়ায় পৌঁছোতে আমি অতঃপর একটুও না-থেমে লিখে ফেলি বাকি কবিতাটা। লাইনগুলো এসে যায় একের পর এক। ভিতরে যে-আগুন জ্বলছিল তা আছড়ে পড়ে ডায়েরির পৃষ্ঠায়। আমার ভিতর কেউ যেন বলতে থাকে, কেন আমাদের মুখ চেপে বন্ধ করে রাখবে? আমরা যখন হাতে কলম ধরি, তার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে তাতে কারও সেন্সর করার অধিকার নেই।

এভাবেই একবুক রাগ নিয়ে যখন লেখাটা শেষ করি আমি উপলব্ধি করি প্রায় অনিবার্যভাবে একটা রাগী লেখা তৈরি হয়ে গেল শাদা পৃষ্ঠার ক্যানভাসে। কবিতা লেখার পরমুহূর্তে তার একটা নাম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আজও হল। ব্রহ্মদাকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছিল লেখাটা। কিন্তু ব্রহ্মদা এমনই নিবিষ্ট তাঁর জগতে তাঁর দিকে এখন তাকানোও নিষেধ। অতএব কবিতাটার নামকরণ নিজে নিজেই করে ফেলি। সেটি উপুড় করে ধরি কবিতার মাথায় ছাতার মতো। নাম দিই — 'শুনুন এখন জরুরি অবস্থা।'

শেষমেশ এরকম দাঁড়ায় পুরো কবিতাটা :

শুনুন, এখন জরুরি অবস্থা
কবিতা লিখতে পারেন, তবে তাতে একটুও 'আগুন' থাকবে না
যদি কোথাও এক-আধ ছিটে 'বারুদ' থাকে তাও সযত্নে পরিহার করবেন
এও জেনে রাখবেন কবিতায় 'ক্রোধ' ত্যাগ করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয়
যদি কখনও কোনও পঙ্‌ক্তি একটুও 'বিদ্রোহ' করতে চায়
তাও কিন্তু সমূলে উৎপাটিত করতে হবে
এমনকী নীল আকাশের কোথাও এক টুকরো 'সিঁদুরে মেঘ' থাকলে
তা অচিরেই হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর
সেই বেয়াদব মেঘে আপনি একটু শাদা রং দিয়ে নির্বিষ করে তুলবেন, স্যার
নইলে — নইলে আমি বলে রাখছি হলফ করে
কবিতাটা কিছুতেই ছাপার অক্ষরের মুখ দেখতে পারবে না
এই তো কয়েকদিন আগে
এক নামীদামি কবি তাঁর কবিতায় এরকমই নানা শব্দ লিখেছিলেন বেশ কায়দা করে
শব্দগুলো আমরা কেটেকুটে তবেই পড়তে দিয়েছি মানুষকে
কারণ স্যার, এখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে
আমরা সরল-সোজা লোক
বেশি ঝামেলা পছন্দ করি না
একটু সমঝে চলাই এখন দেশের রীতি।

এরকম আগুন-ঝরানো মুহূর্তে পৃথ্বীরাজের মা এল স্বয়ংসিদ্ধার ভঙ্গিতে। তার দুই হাতে দুটো ভরভরন্ত ডাব। একেবারে কেটে ডাবের মুখে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে এই দুপুরে মাথা ঠাণ্ডা করতে। সকালে বেলের মোরব্বা খাইয়েছিল। এখন কচি লেওয়া-সহ মিষ্টি জল। বেশ হাইজিনিক ব্যাপার-স্যাপার চলছে এখানে। ব্রহ্মদা বেশ সুপ্রসন্ন মুখে হাত বাড়িয়ে নিলেন ডাবটা। ওড়িশার ডাব বিখ্যাত, তা কোথায় কোন জেনারেল নলেজের পৃষ্ঠায় পড়েছি যেন। ঢকঢক করে নিঃশেষ করে খোল দুটো ফিরিয়ে দিতেই বললাম, কবে আবার পাতালকোঁড় খাওয়াবে বলো তো?

পৃথ্বীরাজের মা মুখ ভার করে যা বলল তার অর্থ, নেপাল তো আমাকে রান্নার সুযোগই দিচ্ছে না। বলে, 'তোমার রান্না মুখে দেওয়া যায় না!' সত্যি নাকি আর্টিস্টবাবু?

কোনও রাঁধুনিকে তার রান্না খারাপ বলার মতো আহাম্মুকি ব্রহ্মদা করবেন না তা নিশ্চিত। ইতস্তত করে বললেন, তা নয় দিদি, আসলে নেপাল চায় তার দোকানের খদ্দের হই আমরা। একেই তো সাইনবোর্ড লাগিয়েছে তার দোকানে, তার উপর আর্টিস্টবাবু তার দোকানেই খায় এ-কথা চাউর হলে তার বিক্রি আরও বাড়বে বলল। ঠিক আছে, আবার একদিন তোমার রান্না খাওয়া যাবেখন।

যারপরনাই উল্লসিত হেসে পৃথ্বীরাজের মা চলে গেল খালি ডাব হাতে নিয়ে। তার বাড়িতেই আমাদের থাকা যখন, রাগানো চলে না। আপাতত উনিই আমাদের লোকাল গার্জেন বা কেয়ার-টেকার। 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।' এই বিভুঁয়ে এসে দিব্যি মানিয়ে গেছি মাত্র ক-টা দিনের মধ্যে। মনেই হচ্ছে না আগে এখানে কখনও আসিনি। নতুন মানুষকে চিনতে বেরিয়ে এখন মনে হচ্ছে এরা সব পশ্চিমবাংলারই পাড়াগাঁর চেনা মানুষজন. শুধু অন্য ভাষায় কথা বলে এই যা।

বিকেলের পর লেখায় ইতি দিয়ে ব্রহ্মদা বললেন, চলো বিল্ব, তখন যেমন বলেছিলাম এবার সেই অভিযানে যাওয়া যাক।

আমি তো তখন থেকে অপেক্ষা করছি ব্রহ্মদার ডাকের অপেক্ষায়। কবিতা পরে দেখানো যাবে। তার জন্য পড়ে আছে আঁধারপাছের গোটা রাত।

৭

একটা হাফ-সোয়েটারসহ বাইরের সাজে সেজে বেরিয়ে পড়ি কলম্বাসের পায়ের ছাপ ফেলে। বড়ো রাস্তা পেরিয়ে একটা নতুন সার্পেন্টাইল পথে ব্রহ্মদা নিয়ে চলল আমাকে। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে, হাতে টর্চলাইট নেই। ব্রহ্মদার মতে হাতে টর্চলাইট থাকলে অন্ধকারটা উপভোগ করা যায় না। লোডশেডিং না-হলে কলকাতায় অন্ধকার নামক বস্তুটি দুষ্প্রাপ্য। অন্ধকারে পথ চলার একটা শ্রীকান্তসুলভ আনন্দ আছে। তা ছাড়া শীত এখনও তার রাজত্ব কায়েম রেখেছে। পৃথিবীর তাবত সাপেরা জড়ভরত হয়ে ইঁদুরের গর্তে ঘুমোতে গিয়েছে এখন, ঘুম ভাঙতে এখনও ঢের দেরি, অতএব নিশাচরের মতো মাইল মাইল হাঁটতে বাধা কোথায়।

দু-পাশে নুয়ে পড়েছে বনতুলসীর ঝোপ, ডুম জ্বলছে লাল-নীল, কিন্তু তাতে আলো নেই, রহস্য আছে। সরু রাস্তা অনেকটা পেরিয়ে তবে গাঁও। বেশ কিছুটা দূর এখনও।পথ সুনসান। কোথায় চলেছি আমরা, তা এখনও খোলসা করে বলছেন না ব্রহ্মদা। একটু এগিয়ে দু-পাশে মস্ত শালগাছ। তাতে অন্ধকার ছলছল। কাছে কয়েকটা বড়ো শিরীষ আর অর্জুন। তারপর গাঁও। অন্ধকার ঝাঁপাতেই ছোটো ছোটো ল্যাম্পো জ্বালিয়ে যে-যার ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছে লোকজন। দু-পাশে সবগুলোই গরিব বাড়ি বলে মনে হল। দু-একটা প্লাস্টার-না-করা ইটের বাড়ি। মাঝেমাঝে ঝোপজঙ্গল। চলতে চলতে ব্রহ্মদা তার নতুন পরিকল্পনার কথা বলছিলেন। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কীভাবে জনমত গঠন করা যায়। নতুন 'শহর' কীভাবে ছাপা হবে, কোথায় ছাপা হবে? কোনও প্রেস যখন ছাপতে চাইছে না পুলিশের ভয়ে, তখন ছাপা হলেও কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সর্বত্র।

এমন ভাবাভাবির ফুরসতে একটা বড়ো মাটির বাড়ির সামনে এসে স্টপেজ দিই দু-জনে। ব্রহ্মদা গম্ভীর গলায় রায় দিলেন, 'এই হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে পবিত্র মন্দির।' এই

গম্ভীর ঘোষণায় স্বভাবতই আমি আরও দুনো কৌতূহলী। অন্ধকারেও ঠাহর হয় উঠোনে একটা চমৎকার তুলসীমঞ্চ, বাড়ির ডানদিকে খাটো চেহারার দু-তিনটে শালগাছ। উঠোন পেরোলে একফালি বারান্দা। সেখানে বেঞ্চিতে বসে জনা দশ-বারো লোক ঘটি থেকে ঢকঢক করে আলগোছে কিছু খাচ্ছে। কথা বলছে, তবে ফিসফিসিয়ে। ব্রহ্মদাও ফিসফিস করে বললেন, দ্যাখো বিল্ব, চরণামৃত।

চরণামৃত তো হাতের তেলোয় নিয়ে খায়, এভাবে ঢকঢক করে ...

তক্ষুনি নাকের লতিতে মিষ্টি ঝাঁজওলা গন্ধ ধাক্কা দিতেই নড়েচড়ে যায় ভাবনার ভিত। গন্ধটা চেনা, অথচ ঠিক চেনা নয়। মিষ্টি গন্ধটা মাথা ঝিমঝিম করায়। কীসের গন্ধ এটা!

ঠিক মতো ভাবার আগেই ব্রহ্মদার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি আচমকা। ল্যাম্পোর আলো জ্বলছে মৃদু, ঘরে সরঞ্জাম তেমন কিছু নেই, কিন্তু ঘরে সৌরভ ছড়িয়ে বসে আছেন চমৎকার এক দেবী। জ্যান্ত।

ব্রহ্মদাকে দেখেই দেবী তার ধবধবে দাঁত মেলে হাসল, সেই বাংলা-ওড়িয়া মেশানো ঢঙে, আরে, আর্টিস্টবাবু, তুমি আবার এসেছ?

ব্রহ্মদা হাসলেন, এবার একা নয়, সঙ্গে আমার এক বন্ধু আছে।

আমার ভিতরে চলকে উঠছিল তাজমহল। কৌতূহল ও ভালো লাগার এক মিশ্র রসায়ন। এ, কোন মন্দিরে নিয়ে এলেন আমাকে ব্রহ্মদা। এমন রূপসী মেয়ে বারিপদা জেলার এক গণ্ডগাঁয়ে কেন ফুটে আছে নক্ষত্রের মতো! পোশাক খুবই সাধারণ, দারিদ্র্য ছুঁই-ছুঁই। তবু তার চোখমুখের জৌলুস, দারিদ্র্য ছাপিয়ে কেমন আশ্চর্য অভিজাত।

বারান্দায় বসা লোকগুলোর একজন খালি ঘটি হাতে নিয়ে ভিতরে এসে বলল, আর এক ঘটি।

তার গলার স্বর বোধহয় একটু চড়া ছিল, তাতে মেয়েটা চটে গেল বেশ। বসে বসেই চেঁচাল, অ্যাই এখানে আর নয়। বাড়ি যাও।

লোকটার ঠিক যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মেয়েটার ধমকে ঘটিটা তার কাছে জিম্মা দিয়ে বেরিয়ে যায় দ্রুত। তার পালানো দেখে ধারণা হল, লোকটা যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছে আর একটা চেয়ে। সবটাই কেমন রহস্যময়।

— বিল্ব, এর নাম ঝুমুর। এই আস্তানার মালকিন।

ব্রহ্মদার কথায় কী করব বুঝতে পারি না। নতুন কারও সঙ্গে আলাপ করলে নমস্কার করার যে-প্রথা তা যেন ঠিক মানায় না এখানে। এটা কীরকম মন্দির, কোথায় পূজা হয় তার কিছুই খোলসা হয় না আমার মগজে। এই মেয়েটি কি তবে এখানকার দেবদাসী! কিন্তু এর চোখে দেবদাসীর সেই চাঞ্চল্য কোথায়, এ তো মানস সরোবর।

ঝুমুর তার ভরাট চোখ তুলে বলল, আজকেও পাত্তর আনোনি!

ব্রহ্মদা তার সেই ভুবন ভাসানো হাসি ছুঁড়ে দিল মেয়েটির দিকে। মন্দিরে ভক্ত এসেছে চরণামৃতের খোঁজে, তার জন্য পাত্র আনতে হবে কেন?

— তোমার কথাবার্তা খুব ফাজিল। জানো, এখানকার সবাই আমাকে ভীষণ ভয় পায়?

— আমরা তো ভিনদেশি লোক, ভয়ডর আমাদের প্রাণে নেই। নেদাম পাহাড়ের বন-চিতার সঙ্গে আমার দোস্তি, তা জানো তুমি। তুমি তো নেহাত ঝুমুর।

ব্রহ্মদা এমনভাবে বলল যে ঝুমুর হেসে ফেলল।

বলল, তা ঠিক। আগেরবার যেভাবে এই ঘরের মধ্যে ঝগড়ুকে থাপ্পড় মেরেছিলে, তাতেই ঠাহর হয়েছিল তোমার কলজে খুব শক্ত।

— ঝগড়ু যে তোমার সঙ্গে মশকরা করছিল, তাতেই রাগ হয়ে গেল। ঝুমুরকে মুগ্ধ হয়ে দেখা যায়, মশকরা করা চলে না।

ঠিক তাই, ব্রহ্মদার ভাবনা আমার সঙ্গে জোড় খেয়ে যাচ্ছে। নচেৎ ঝুমুরের ডোরাকাটা ঘাগরা, ছিট ছিট ব্লাউজ আর ভরাট শরীর দেখেও আমার একটুও ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়নি এখনও! ঋষির মতো মুখ আমার।

একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এতক্ষণ চারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঘরের ভিতর, এবার ঝামরে পড়ল নাকে। ঝুমুর তার ভিতরের ঘর থেকে বার করে আনল একটা সবুজ রঙের চমৎকার বোতল, ভিতরে তরল পদার্থ, হাসিতে ঝিকঝিকে হয়ে বলল, এটাই তোমার ভালো লাগবে মনে হয়। তুমি এসেছ আগে জানতে পারলে ভালো করে বানিয়ে রাখতাম।

ব্রহ্মদা পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে ঝুমুরের হাতে দিল। বলল, ঠিক আছে, আবার তিনদিন পরে আসব। এক নম্বর জিনিস আনবে।

ঝুমুর একগাল হেসে মাথা নাড়ে। ওর চোখ দুটো কেন যেন মনে হচ্ছিল একটু ব্যথাতুর। আমরা চলে আসার সময় আরও বিষণ্ণ। চরণামৃতের ঝাঁঝালো গন্ধ সঙ্গে নিয়ে আমরা আবার অন্ধকারে লীন হই।

— ব্রহ্মদা তোমার মন্দিরের দেবী কি সত্যিই পাথরের ?

— না বিম্ব, ওর অনেক কষ্ট। ওদের বাস কুসুমপুর পাহাড়ের ওপারে। কাঠের তৈরি ঘর। ওর স্বামী খুব মেহনতি মানুষ ছিল, পাহাড়ের ওপরে তৃণভূমিতে শুয়োর চরাতে চরাতে বড়ো হয়, তারপর বাংরিপোসিতে মহুয়ার ঠেক তৈরি করে পয়সার মুখ দেখে। বেশ রমরমে ব্যবসা ছিল। পুলিশ সেই ঠেক ভেঙে দেয় বেআইনি বলে। সেই ধাক্কায় তার স্ট্রোক হয়। এখন সে পঙ্গু হয়ে কুসুমপুরের বাড়িতে। চিকিৎসার জন্য প্রচুর খরচ। ঝুমুর নতুন ঠেক করেছে আঁধারপাছে। তাকে বেঁচে থাকতে হবে তো! এখন ঝুমুরই দেখাশোনা করে ব্যবসা। রোজ বিকেলে এতটা পথ হেঁটে আসে, রাত পর্যন্ত থাকে, বাড়ি ফেরে অনেক রাতে। কখনও এখানেও রাত কাটিয়ে যায় একলা। কিন্তু আশ্চর্য, এখানে ওই মেয়েটার নামে কোনও খারাপ কথা শোনা যায় না।

বললাম, যার চোখ দুটো মানস সরোবরের মতো স্থির, তাকে অপবাদ দেয় কার সাধ্য?

ঘরে ফিরে ল্যাম্পো জ্বালা হল। পৃথ্বীরাজের মায়ের কাছ থেকে দুটো কলাই-এর গেলাস এনে তাতে সবুজ বোতলের তরল পদার্থ ঢাললেন ব্রহ্মদা। এই হল কুসুমপুরের পাহাড়ের মহুয়াফুল থেকে তৈরি পানীয়। আমার ধারণা এর স্বাদ পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ পানীয়ের চেয়ে ভালো। এসো আজ রাতে আমরা দু-জন দু-জনের স্বাস্থ্যপান করি।

বহুক্ষণ আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ব্রহ্মদা পানীয়ের খোঁজেই করেছেন এতটা পরিশ্রম। আঁধারপাছের গাঁয়ে একা থাকা কি সম্ভব পানীয় ছাড়া! আমার পানীয়ে অভ্যেস নেই। কিন্তু ব্রহ্মদা বললেন, মহুয়া মদ নয়। চরিত্র খারাপ হবে না। খেয়ে নাও।

গেলাসে চুমুক দেবার পর শিরশির করে উঠল আমার সমস্ত শরীর।

মহুয়ার জাদু প্রভাবে এ-রাত হল আগের রাতের চেয়ে দীর্ঘায়িত। ঘুম ভাঙল যখন, রোদ্দুর থইথই করছে মেটে ঘরের দাওয়ায়। ব্রহ্মদা আগেই উঠে পড়ে উঠোনে গিয়ে ইমপ্রোভাইজড টেবিল বানিয়ে লিখতে বসে গেছেন বুঁদ হয়ে। এর নাম সিনসিয়ারিটি। স্কুল-কলেজের ছাত্রের মতো ভোরে উঠে লেখেন এখনও। আমি হাই তুলে ভাবছি আমিও কি ব্রহ্মদার মতো লিখতে বসে যাব। একটা কবিতা সবে লেখা হয়েছে, দ্বিতীয় কবিতা শুরু করলেই হয়।

না কি আঁধারপাছ গাঁয়ে টহল দিয়ে আসব একঝলক, তাতে কিছু কবিতার পঙ্‌ক্তি আঁকশিতে উঠে আসতেও পারে। কিন্তু এই কবিতাগুলো তো আর ফুল, পাতা, গাছ ইত্যাদি প্রকৃতি-বিষয়ক হবে না। হবে ক্রোধের কবিতা। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে উদগীরণ করতে হবে শরীর ও মনের যাবতীয় ক্রোধ।

ব্রহ্মদার কাছে শুনছিলাম এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সফদর জঙ্গ রোডের বাড়ির সামনের রাস্তায় রোজই সারাদিন ধরে দফায় দফায় লোক এনে ভর্তি করা হত ট্রাকে করে। তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দেন জ্বালাময়ী ভাষায়। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত মিউনিসিপ্যালিটির দুধের গাড়ি। অনেকেই সেই গাড়ি থেকে বিনা পয়সায় দুধ খেতে পেত। তাদের বলতে হত, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ। জজসাহেব মুর্দাবাদ।

সেই জজসাহেবের কুশপুত্তলিকা কতবার যে পোড়ানো হয়েছে!

কথাগুলো ভাবতে শুরু করতেই অমনি কিছু পঙ্‌ক্তি ভিতরে উসকোতে শুরু করে। রাজার কথামতো না চললেই প্রজার কপালে ভারি দুর্দশা। জজসাহেব বলে কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর উপর দিয়ে রেহাই হচ্ছে। অন্য কেউ হলে হয়তো এতদিনে গর্দান যেত।

এমন ভাবনার মধ্যেই কোনও অদৃশ্য জাদুকর আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়:

হ্যাঁ বললে হ্যাঁ বলবি, না বললে না
এর বাইরে থাকুক মত আমি তা চাই না...

দু-লাইন লেখার পর বেশ একটা গাঢ় উল্লাস শরীরে ও মনে উথলোতে থাকে ভোরের পাহাড়-ভেজা হাওয়ায়। সরকারি চাকরির যে কী অপরিসীম হ্যাপা তা চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই বুঝতে পারছি হাড়ে হাড়ে। একটা অদৃশ্য শৃঙ্খল এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো থাকে সারা শরীরে, এক অদৃশ্য আতঙ্ক তাড়া করতে থাকে পিছন থেকে যে, কোনও মুহূর্তে স্বস্তি থাকে না। শুধু আশঙ্কা কখন সরকারি নিয়ম না মেনে এক ঘোরতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে পড়ি।

এর পরেই হুড়মুড় করে আরও কিছু পঙ্‌ক্তি ভর করে কলমের ডগায়। একটা নামও ঠিক করে ফেলি লেখাটার। অতঃপর যে বস্তুটি নড়েচড়ে ওঠে খাতার পৃষ্ঠায় তা এ-রকম :

হ্যাঁ বললে হ্যাঁ বলবি, না বললে না
এর বাইরে থাকুক মত আমি তা চাই না
সরকারের চাকর যখন চাকর হয়েই রইবি

হাসতে বললে হাসবি এবং গাইতে বললে গাইবি
নিজের মত থাকলে তাকে দে রেখে দে গোরে
কখনও তোকে রাজা করব কখনও ফের বোড়ে।

কবিতাটা লিখে মনে মনে বেশ অহংকার হয়। এই কবিতা প্রকাশিত হলে বেশ হইচই পড়ে যাবে কলকাতায়। আমার খ্যাতি হবে তিনগুণ। এক্ষুনি ব্রহ্মদাকে দেখানো দরকার লেখা দুটো। কিন্তু কাকে দেখাব! ব্রহ্মদা তো এখন সাত বাঁও লেখার তলায়। নিশ্চয় শিকড় হয়ে গেছে পায়ে। টেনে তুললেও তোলা যাবে না এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

তা হলে এখন আমার কী করণীয়! আবারও কি একটা আঁকশি নিয়ে বেরোব কবিতা কল্পনালতার সন্ধানে। লাগসই পঙ্‌ক্তি খুঁজে পেলে ডিঙি মেরে নামিয়ে নিয়ে আসব আঁকশির মাথায়! ব্রহ্মদাকে একগুচ্ছ কবিতা লিখে চোখের সামনে এক নবম আশ্চর্য-ফুল দেখিয়ে দেবো!

তখনই হঠাৎ সাত হাত লেখার তলা থেকে লেপ সরিয়ে জেগে উঠলেন ব্রহ্মদা। আমাকে দেখে অচেনার মতো চোখে বললেন, কী ব্যাপার, তুমি!

আমার আশঙ্কা হল ব্রহ্মদা আমাকে ঠিক চিনেও যেন চিনছেন না। ব্রহ্মদার পরবর্তী ডায়লগ অন্যরকম। বললেন, চা খাওয়া হয়নি তোমার?

অভিমানে ঠোঁট ফোলাতে ইচ্ছে হয় বাচ্চাদের মতো। বলি, কী করে হবে? আপনি তো লুকিয়ে ছিলেন গল্পের ভাঁজে।

— যা বলেছ। এখন ভাঁজ খুললে তার ভিতর থেকে মুক্তো বেরোবে, না ফক্কা বেরোবে তা কে জানে!

কিন্তু ততক্ষণে আমার কৃতিত্ব ব্রহ্মদাকে দেখানোর জন্য উশখুশ করছে আমার ডায়েরি। তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠা দুটো খুলে মেলে ধরি তাঁর অবাক চোখের সামনে। ব্রহ্মদা প্রথমে বিস্মিত, পরে ভ্রূকুঞ্চিত, শেষে দোদুল্যমান মস্তক। বললেন, একটু স্ট্রেট হয়ে গেল না লেখা দুটো!

— স্ট্রেট!

— হ্যাঁ। তুমি একটা সরকারি চাকরি করো। এরকম সরাসরি তুমি আক্রমণ করতে পারো না। বরং এমন কবিতা লেখো যা সেন্সরবাবুদের মগজে ঢুকবে না। একটু রহস্যের তুলি ছোঁয়াও কলমের কালিতে। একটু আড়াল রেখে বলো। কবিতা যে-রকম হয়ে থাকে আর কি। কবিতা-রানির মাথা ঘোমটা কিংবা বোরখায় ঢেকে দাও।

ব্রহ্মদা যেন আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে চাইছেন নানাভাবে কবিতাকে ব্যাখ্যা করে। আমি অতএব পুনর্বার আঁকশি নিয়ে বেরোব সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু তার আগেই ব্রহ্মদা তাঁর বিখ্যাত র-টি নিয়ে হাজির দুটি কাপে। সেই পাতিলেবুর গন্ধে ঘর ও মন উচাটন।

সেই চা শেষ না হতেই রোদ্দুরে আক্রান্ত সকালবেলায় মহেন্দ্রের আগমন। মহেন্দ্র কি তার সাইনবোর্ডের আবদারটি ঝালিয়ে নিতে এসেছে আবার! কিন্তু না, আজ ওর দর্জির দোকান বন্ধ, তাই ছুটির দিনে নিশ্চয়ই কিছু অভিনব প্রস্তাব আছে তার। বলল, চলুন, সন্ধের পর আদিবাসীপাড়ায় আজ উৎসব হবে, দেখব। একশো রকম মজা আছে।

আদিবাসীপাড়া সেই নওলদহে। এখান থেকে একটা গাঁও পেরিয়ে তবে ওদের বাস। আদিবাসী বিষয়ে আমার বরাবরের অনুরাগ। কাল সন্ধেয় এক গাঁয়ে সাঁওতালি গানের সুর

আর মাদলের দ্রিদিম দ্রিদিম শুনে চমকে উঠেছিলাম। ব্রহ্মদার কাছে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছিলাম সাঁওতাল পাড়ার কথা। শুনেই ইচ্ছে হয়েছিল ওড়িশার সাঁওতালদের দেখার। এমন সময় মহেন্দ্র খবর নিয়ে এল আদিবাসী উৎসবের। কাকতালীয় নিমন্ত্রণ। তবে সাঁওতালপাড়ায় নয়, অন্য গাঁয়ে।

— ঠিক আছে মহেন্দ্র, সন্ধের পর এসো। আমরা এখন পোস্ট অফিসে বেরোব।

দু-দিনে ব্রহ্মদার গল্প ও সম্পাদকীয় লেখা শেষ। এখন লেখা দুটি কলকাতায় রওনা করিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম পাথারনের উদ্দেশে।

আজ নতুন রাস্তায়। গাঁয়ের ভিতর কত যে রাঙামাটির পথ হেলেদুলে সেঁধিয়ে গেছে এক-একদিকে, তারপর আবার জোড় লেগেছে সামনে কোথাও তা আবিষ্কার করা এক আশ্চর্য রোমাঞ্চ। রাস্তার পাশে পাশে বুনো কুল, কেঁদগাছ। কেঁদগাছ আমি এখানেই প্রথম দেখি। লাল মাটির রাস্তা, ধুলো নেই। কোথাও কিছুটা বালির ভাব, পাথরকুচি মেশানো। বাংরিপোসি থেকে এতটা ভিতরে এই গাঁয়ের এত বৈচিত্র্য যে, তাকে আবিষ্কার, পরে পুনরাবিষ্কার সবই এক অভিনব অভিজ্ঞতা। কিছু পরে পলাশের হুড়োহুড়ি। লাল পাপড়ি ছড়িয়ে আছে লাল কাঁকরের উপর। বহু পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে গেছে পলাশের লাল পাপড়িরা। দেখে কষ্ট হচ্ছিল বেশ। যে-পাপড়িরা তখনও অক্ষত, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে ডিঙি মেরে হাঁটতে সচেষ্ট হই।

আঁধারপাহ্ন গাঁয়ের সীমানা পেরোবার পর ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে পথ, পাথুরে উঁচুনিচু জায়গা, বোধহয় তাই ফসল হয় না। মাঠের মাঝে মাঝে এক-একটা তালগাছ প্রহরীর ভূমিকায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পারে না বলে তাদের চারদিকে চোখ। বাকি মাঠ ধু ধু। কোথায় যেন শুনেছিলাম এ-রকম জায়গার নাম টাঁড়। ফাঁকা, সুনসান। এই সকালে বেশ রাজকীয় লাগছে হাঁটতে।

বহুদূরের পথ পার হয়ে আবার আগের রাস্তায়। পাথারনের পথ চিনতে পারি। কালকের মতো সেই যক্ষের সঙ্গে আর একবার দেখা, কুশল বিনিময়, পাঁড়েজির কাতর প্রার্থনা বদলির জন্য। ব্রহ্মদা মোটা মোটা খাম তুলে দিলেন পাঁড়েজির হাতে। পাঁড়েজি সেই খামগুলির ওজন অনুভব করে বললেন, আর্টিস্টবাবু, আপনি ক-দিন আঁধারপাহ্ন গাঁয়ে এসে বিবির জন্য এমন ভারী ভারী খাম পাঠাচ্ছেন, তা হলে আমার কথা একবার ভাবুন।

ব্রহ্মদা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন বড়ো করে। পাঁড়েজি যদি ভেবে থাকেন এই খামগুলো প্রেমপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা হলে বাঁচোয়া। কিন্তু পরক্ষণে পাঁড়েজি বললেন, আপনি নেপালের জন্য সাইনবোর্ড এঁকে দিয়েছেন?

ব্রহ্মদা লাজুক গলায় বললেন, ও তেমন কিছু না।

ব্রহ্মদার মতো আমিও ভাবলাম পাঁড়েজি তাঁর পোস্ট অফিসের জন্যও একটি সাইনবোর্ড এঁকে দিতে বলবেন হয়তো। একটা সাইনবোর্ড এঁকে এনে যা চাহিদা হয়েছে ব্রহ্মদার, তাতে তাঁকে আর্টিস্ট হতেই হবে এর পর। কিন্তু পাঁড়েজি বললেন অন্য কথা। বললেন, কাল বাংরিপোসি বাজারে পুলিশের একজন অফিসার জানতে চাইছিল, কে এঁকে এনেছে সাইনবোর্ডটা, নিশ্চয় কলকাতার কোনও আর্টিস্টের আঁকা।

ব্রহ্মদার মুখে চকিতে খেলা করে গেল আশঙ্কার স্পটলাইট। সাইনবোর্ডের উপর পুলিশের চোখ পড়তে পারে, সেই সাইনবোর্ডের উৎস কলকাতা, এ-রকম ভাবনা এর আগে একবারও ভাবেননি ব্রহ্মদা। কিন্তু পুলিশের চোখ অন্য রকম। তারা শুধু কলকাতার গন্ধ পেয়েই নিশ্চুপ থাকবে তা আশা করা আহাম্মুকি। ঠিক তার পরের প্রশ্ন যা অনিবার্য দোলায় তাদের মনে উত্থাপিত হবে, কেন একজন আর্টিস্ট কলকাতার সুখ-শান্তির তোয়াক্কা না করে আঁধারপাহু নামের এক অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছেন দীর্ঘকাল!

খামগুলো পাঁড়েজির জিম্মায় রেখে দু-জনে বেরিয়ে আসি পথে। ফেরার পথে দু-জনেই কয়েক মিনিট শোকপ্রকাশের মতো নীরবতা পালন করি। শোকপালনের নীরবতা সর্বকালেই দীর্ঘ হয়ে থাকে। এক মিনিট সময়ও যে কী দীর্ঘ কী বিরক্তিকর তা শোকবার্তা পড়ার পর মাথা হেঁট করে মেঝের দিকে তাকিয়ে অনুভব করা যায়। নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করা কখন বার্তাপাঠক বলবেন, হ্যাঁ। এবার বসতে পারেন।

সে-রকমই কিছুক্ষণ মৌন। এক সময় যেতে যেতে ব্রহ্মদা বললেন, বিশ্ব, হাওয়া খারাপ।

ইতস্তত করে বলি, ওড়িশার পুলিশ কি কলকাতার পত্রিকার কথা জানবে!

যদিও আমি বুঝতে পারছি ব্রহ্মদার আশঙ্কা টায়ে টায়ে সত্যি।

— নাও পড়তে পারে। তবে কলকাতার পুলিশ যখন কোনও ওয়ারেন্টির খোঁজে হুলিয়া জারি করে, তারা পাশের রাজ্যগুলোতেও রেড-অ্যালার্ট পাঠায়।

কিছুক্ষণ আবার নীরবতা পালন করি। তারপর, কী করবেন তা হলে?

— ভালো করে খবর নিই। দরকার হলে আন্ডারগ্রাউন্ডের ঠিকানা বদলাতে হতে পারে।

তার মানে আবার সেই অনিশ্চয়তা। নতুন জায়গায় ঠাঁই খুঁজে থিতু হওয়া যে ভারি সুকঠিন — হিমালয়ান টাস্ক-এর মতো দুরূহ তা এখানে না এলে উপলব্ধিতে কুলোত না। এখানে বেশ জমিয়ে সংসার করছেন ব্রহ্মদা। নতুন কোনও গাঁয়ে যাবেন এরপর!

সেদিন দুপুরে খেতে খেতে ব্রহ্মদা বললেন, নেপাল বাড়ি এলে তার কাছ থেকে কায়দা করে খবরটা বাজিয়ে দেখতে হবে। পুলিশের চোখ সহজ চোখ নয়। তারা সরলরেখাকেও বাঁকা বলে ধরে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। শেষে সাইনবোর্ড বয়ে আনাটাই ব্লান্ডার হল!

গোয়েন্দা গল্পে এ-রকমটাই পড়া যায় বটে। অপরাধী একটা না একটা ক্লু রেখে যাবেই গোয়েন্দার চোখে। একজন রাষ্ট্রদ্রোহী দীর্ঘকাল পুলিশের চোখে ম্যাজিক-লাঠি ছুঁইয়ে আর্টিস্ট সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-দেশেরই কোথাও, বিশেষত এই জরুরি অবস্থায়, ত্রাসের দিনগুলিতে এটা বোধহয় বেশ বাড়াবাড়ি।

খাওয়ার পর খবর দেওয়া হল নেপালকে। নেপাল যেন একেবারেই আঁচ না করতে পারে এমন ভঙ্গিতে কথার সূত্রপাত ব্রহ্মদার। নানা কথার মারপ্যাঁচে নেপালকে ধরাশায়ী করে ব্রহ্মদা যে কাহিনী উদ্ধার করলেন তা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে মরমে প্রবেশ করতে শুরু করল ব্রহ্মদার। পুলিশের একটি দল, সেই উধাও হওয়া মেয়েটির খোঁজে বাংরিপোসিতে আসছে ঘন ঘন। একজন পুলিশ অফিসার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছিলেন ব্রহ্মদার কথা। কী ছবি আঁকেন, কবে থেকে এখানে থাকছেন, এর আগে কবে কবে এসে থেকে গেছেন, সারাদিন কী করেন ইত্যাদি খবর জানতে চাইছিলেন বাংরিপোসি বাজারের লোকজনের কাছে। এমনকী

ব্রহ্মদা যে পাথারন পোস্ট অফিসে চিঠি পোস্ট করতে যান তাও বলেছে নেপালরা। কেন বাংরিপোসিতে নয়, কেন পাথারনে তা জানতে চাইছিল পুলিশ। নেপালরা সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। সেটাই বাস্তব।

ব্রহ্মদার কপালে বলিরেখার ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে। কিন্তু মুখে সেই বিখ্যাত হাসিটা ঝুলিয়ে রেখে বললেন, বাহ্, তোমাদের পুলিশ অফিসারের ছবি আঁকা সম্পর্কে বেশ উৎসাহ আছে, কী বলো?

নেপাল কিছু না বুঝে বলল, পুলিশ অফিসার বলছিলেন একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন।

— তাই নাকি, সে তো ভালো খবর। তবে আমার কয়েকটা ছবি আঁকা বাকি আছে। আরও অন্তত তিনদিন লাগবে ছবিগুলো শেষ করতে। তারপর আসতে বোলো। আমিও খুশি হব তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে।

নেপাল চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করতে থাকেন ব্রহ্মদা। হয়তো মনে মনে ভেঁজে নিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম। তিনদিনের মধ্যেই তাঁর যা কিছু কাজ বাকি আছে, সেই কাজ শেষ করে ফেলতে হবে এ-রকমই ভাবছিলেন নিশ্চয়।

৯

সেদিন দুপুরে ব্রহ্মদা তাঁর ব্যাগ থেকে একগুচ্ছ কাগজ বার করে তাতে নিবিষ্ট হলেন পড়িমড়ি করে। যেন তাঁর বকেয়া কাজ খুব দ্রুত শেষ করতে হবে, না করতে পারলেই মহা সর্বনাশ এমনই কপালের বলিরেখার প্রকাশ। আমি একা একা বহুক্ষণ আঁধারপাহু গাঁয়ের নীলনির্জন দুপুরের মাহাত্ম্য অনুধাবন করি। কখনও একটা আঁকশি নিয়ে ছুঁড়ে দিই শালগাছের জড়াজড়ি করে রোদ খেতে থাকা পাতা লক্ষ্য করে, যদি কোনও রহস্যময় পঙ্‌ক্তি ধরা দেয় ডটপেনের ডগায়। 'তুমি দেবী দুর্গতিনাশিনী' না লিখে 'তুমি দেবী দুর্গতিদায়িনী' বলে জরুরি অবস্থার দেবীর উদ্দেশে একটি স্তোত্র লিখতে উৎসাহিত হয়ে পড়ি সহসা। কিছুক্ষণ পরে অন্য একটি ধোঁয়া ধোঁয়া পঙ্‌ক্তিও লাফ দিয়ে আসে মগজে। লিখে ফেলি, 'রক্তচক্ষু ছুড়ে তুমি আমার জিহ্বা উপড়ে নিয়েছ, দেবী।'

আরও কয়েকটা পঙ্‌ক্তি চারপাশে উড়তে থাকে পাখা মেলে। ধরব বলে আঁকশি নিয়ে ঢুঁড়তে বেরোই। শালগাছের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে এগোতে থাকি লাল কাঁকরের পথে। মহেন্দ্রর বাড়ি একটু ও-দিকে। আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে এল খালি গা গামছায় ঢেকে।

এ-কথা সে-কথার পর মহেন্দ্র জানায় রাতে ওর বউয়ের সঙ্গে দারুণ মনোমালিন্য। কলহপ্রিয় বউয়ের কল্যাণে ওর মনটা খারাপ। কেন তা জানতে চাইতেই বলে, তার বউয়ের ধারণা মহেন্দ্র অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সত্যি সত্যি তোমার কোনও আশনাই হয়নি তো!

মহেন্দ্র জিব কেটে বলল, দিব্যি করছি, কখনও না। আসলে একটা খারাপ হাওয়া এসেছে। তার জন্যে ওই সব নানান ঝামেলা।

কৌতূহলী হয়ে উঠি, খারাপ হাওয়া... কীরকম?

একেবারে সরলরেখার মতো সাদাসিধে ছেলে মহেন্দ্র, চোখে-মুখে খসে পড়া শালপাতার চাউনি। সারাদিন ওর মেসিনটা নিয়ে খুটখাট শব্দ তুলে সেলাই করে। তাতেই ওর সংসার চলে যায় টুকটাক। অন্য সাতে-পাঁচে থাকে কি না তা ওই জানে। বলল, ওই যে চালের আড়তের মহাজন হঠাৎ রাতের বেলা ঘরে ফিরতে গিয়ে ভিরমি খেয়ে মরে গেল, সেই তখন থেকে। ওই শালবন দিয়ে তো কত লোক রাতের বেলা হেঁটে গেছে, কারোর কিছু হয়নি, হঠাৎ মহাজন চোখ উল্টে একেবারে অক্কা! কী দেখেছিল কে জানে! তারপর থেকে ও-রকম চলছে। পাশের গাঁয়ে রামু মোড়লের তিনমাসের ছেলেটা মুখে গাঁজলা তুলে মরে গেল। আবার পাহাড়ের ওপরে ভেড়ার মড়ক লাগে ক-মাস আগে।

— এসব তো এমনিও হতে পারে। হাওয়া খারাপ হয়েছে তোমাকে কে বলল?

— আমাকে বলবে কেন! এ তো গাঁয়ের সবাই জানে। তান্ত্রিক ঠাকুর বলেছে।

— তান্ত্রিক! থমকে যাই কয়েক স্তব্ধ মুহূর্ত। তান্ত্রিকের কথা গাঁ-সুদ্ধ সবাই বিশ্বাস করে। লোকটা এ-তল্লাটের মানুষজনকে একেবারে জাদু করে রেখেছে। যে-কোনও বিপদ এলেই সবাই তান্ত্রিকের কাছে যায় উদ্ধার পেতে। হেসে বললাম, তা মহেন্দ্র, তোমার এই দাম্পত্যকলহ সেই খারাপ হাওয়ায় হয়েছে কে বলল? তান্ত্রিকঠাকুর নাকি ?

—নাহ্, একটু ইতস্তত করে মহেন্দ্র বলল, আমার মনে হচ্ছে। আজকাল রোজ রোজ ঝগড়া হয়। বউটাও কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। ছ-আট মাস আগেও এমনটা ছিল না। তা ছাড়া সারা গাঁয়েই তো কত ঝুটঝামেলা বেঁধে গেছে!

সব দেশেই অজ-গাঁয়ের দিকে অশরীরী মানুষের চলাফেরা একটু বেশি। ব্রহ্মদা ক-দিন আগে বলেছিলেন কথার ফুরসতে। এখানকার গাঁয়ের মানুষজনের ধারণাও একই রকম। দূরের কোনও একটা পাহাড়ে এক অশরীরী আত্মা আছে, তার নিশ্বাস কখনও ভেসে আসে এসব গাঁয়ে, তখনই এক-একটা অঘটন ঘটে গাঁয়ের মানুষজনের। এক-একদিন পাহাড় থেকে অদ্ভুত ডাক ভেসে আসে। কখনও লাল আলো জ্বলতে দেখেছে অনেকে। অথচ সে-সব পাহাড়ে মানুষজনের অস্তিত্ব বলতে গেলে নেই। তান্ত্রিক ঠাকুর কখনও মাদুলি ধারণ করবার নিদান দেন এসব বিষ-নিশ্বাস থেকে উদ্ধার পেতে। তবে এবার নাকি ভীষণ একটা অশুভ হাওয়া ঘোরাফেরা করছে গাঁয়ে।

মহেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা গিয়ে পড়েছি টাঁড়ে। টাঁড় পেরিয়ে আমরা একটা গাঁয়ে ঢুকে পড়েছি, সূর্য এখন তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। বসন্তের রোদ্দুর গায়ে আঁচড় কাটছে। দু-একটা বাচ্চাকে দেখে মনে হল, এখানেও কিছু আদিবাসী থাকে। তবে গ্রামটা ফাঁকা ফাঁকা। মহেন্দ্র বলল, এ-গাঁয়ের অনেকেই নওলদহে গেছে — উৎসব দেখতে ও যোগ দিতে।

ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করি, মহেন্দ্র, সত্যি সত্যি তোমার কোথাও আশনাই নেই?

আশনাই শব্দটা ওর খুব পছন্দ হয়।

— দিব্যি করছি, কখনও না।

— আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার বউকে আমি বুঝিয়ে বলব। তা হলে আর ঝগড়া হবে না।

সন্ধের সময় তার সঙ্গে সাঁওতাল পাড়ায় যাব উৎসবে যোগ দিতে, আপাতত ঘরে ফেরা। ফিরে দেখি ব্রহ্মদা লেখা শেষ করে গেরিমাটি দিয়ে কারুকাজ করছেন বেশ নিবিষ্ট হয়ে। এক

আশ্চর্য ত্রিভঙ্গ শরীর রূপ পাচ্ছে আঙুলের ছোটো ছোটো মোচড়ে। এ-রকম বহুক্ষণ নড়াচড়া করছে ক-টা আঙুল। মানুষের আঙুলের, কী যে শক্তি তা উপলব্ধি করা যায় সেতারের বা সরোদের সুরে, কিংবা ভাস্কর্যের গড়ে ওঠার মুহূর্তে।

আমাদের দেখে বললেন, কী আবিষ্কার হল আজ?

বলি, খারাপ হাওয়া। এমন পাহাড়তলির গাঁয়ের হাওয়াও খারাপ হয় তা জেনে ভারী অবাক হচ্ছি। এখানে তো বিশুদ্ধতম হাওয়ারা বাস করে এতদিন জানতাম।

মহেন্দ্র চলে যাওয়ার পর খারাপ হাওয়ার কেরামতি বিবৃত করি ব্রহ্মদার কাছে। ব্রহ্মদাকে চিন্তিত দেখায়, কেন না এসব তল্লাটে হাওয়া খারাপ হলে বহু অঘটন ঘটে। সবই মনুষ্যসৃষ্ট। তাতে কোনও দৈবশক্তি বা অলৌকিকতা নেই।

সারাদিনে শুধু কিছু ভাস্কর্য তৈরিতেই মন দিলেন ব্রহ্মদা তা নয়। লিখলেন কিছু চিঠি। তাতে পরবর্তী আন্ডারগ্রাউন্ডের কথাও থাকল। এরপর অন্য কোথাও ঠাঁই খুঁজবেন তারই প্রস্তুতি চলছে। এমন বেশ কয়েকবার ঠাঁই বদল করতে হল এ ক-মাসে তা বলছিলেন একটু একটু করে। আমি হঠাৎই কিছুটা মশকরার স্বরেই বললাম, আমি জানতাম আপনি অকুতোভয়। এখন দেখছি পুলিশকে বেশ ভয় পাচ্ছেন! পুলিশকে ভয় পাচ্ছেন কেন?

ব্রহ্মদা হো হো করে হেসে উঠে আঁধারপাহ্ন গাঁয়ের হাওয়ায় কিছু কাঁপন ধরিয়ে দিলেন। তারপর একটু পজ দিয়ে বললেন, আসলে কী জানো। অ্যারেস্ট হয়ে জেলের ভাত খেতে পারি অনায়াসে। কিন্তু নিতাইকিশোর ঘোষ বা তরুণ সেনগুপ্তের কথা ভাবো। এ-রকম আগুনে-কলমও ভোঁতা করে দিতে পেরেছে সরকার। আর সরকার তো তাই চান। সব প্রতিবাদমনস্ক বুদ্ধিজীবীকে জেলে পুরে রাখতে পারলেই তো জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আর কেউ কথা বলতে পারবে না। এক আমিই যা বাইরে থেকে কিছু প্রস্তুতি নিতে পারছি। মানুষকে তো বোঝানোরও দরকার। কোনওভাবে জানাতে হবে কথাগুলো। সংবাদপত্রের কলমচিদের কলমের ডগায় নিরোধ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে একটি স্ফুলিঙ্গও না প্রসব করতে পারে তারা। ফলে যা ইচ্ছে তাই হচ্ছে দেশে।

ঠিকই বলেছেন ব্রহ্মদা।

সেদিন দুপুরে পোস্ট অফিসের দিকে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। একটা ভারী খাম আসার কথা ডাকে। কলকাতায় থাকাকালীন ব্রহ্মদার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল নিতাইকিশোর ঘোষের, তার জেরে আসবে এই লেখাটা। নিতাইকিশোর ঘোষ জেলে বসেই লিখবেন, তারপর কোনওভাবে পাচার করে দেবেন বাই পোস্ট। সেই খাম আসবে পাথারন পোস্ট অফিসের ঠিকানায়।

কিন্তু কোনও খাম আসেনি। উপরন্তু পাঁড়েজি যা জানালেন ঠারেঠোরে, (গাঁয়ের কয়েকজন লোক তখন পোস্ট অফিসে এসেছে চিঠি পাঠাতে, তাদের কান বাঁচিয়ে) কাল সন্ধের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একজন পুলিশ অফিসারের। তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন আর্টিস্টবাবু রোজ পোস্ট অফিসে কেন আসেন। পাঁড়েজি তাদের বলেছেন আর্টিস্ট রোজই একটা করে চিঠি লেখেন তাঁর বউকে। পুলিশ অফিসার তাতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আর্টিস্ট তা হলে কোন কার্যকারণে পড়ে আছেন এত দূরে। পাঁড়েজি জানিয়েছেন, আর্টিস্ট একটা বড়ো আঁকার

একেবারে সরলরেখার মতো সাদাসিধে ছেলে মহেন্দ্র, চোখে-মুখে খসে পড়া শালপাতার চাউনি। সারাদিন ওর মেসিনটা নিয়ে খুটখাট শব্দ তুলে সেলাই করে। তাতেই ওর সংসার চলে যায় টুকটাক। অন্য সাতে-পাঁচে থাকে কি না তা ওই জানে। বলল, ওই যে চালের আড়তের মহাজন হঠাৎ রাতের বেলা ঘরে ফিরতে গিয়ে ভিরমি খেয়ে মরে গেল, সেই তখন থেকে। ওই শালবন দিয়ে তো কত লোক রাতের বেলা হেঁটে গেছে, কারোর কিছু হয়নি, হঠাৎ মহাজন চোখ উল্টে একেবারে অক্কা! কী দেখেছিল কে জানে! তারপর থেকে ও-রকম চলছে। পাশের গাঁয়ে রামু মোড়লের তিনমাসের ছেলেটা মুখে গাঁজলা তুলে মরে গেল। আবার পাহাড়ের ওপরে ভেড়ার মড়ক লাগে ক-মাস আগে।

— এসব তো এমনিও হতে পারে। হাওয়া খারাপ হয়েছে তোমাকে কে বলল?

— আমাকে বলবে কেন! এ তো গাঁয়ের সবাই জানে। তান্ত্রিক ঠাকুর বলেছে।

— তান্ত্রিক! থমকে যাই কয়েক স্তব্ধ মুহূর্ত। তান্ত্রিকের কথা গাঁ-সুদ্ধ সবাই বিশ্বাস করে। লোকটা এ-তল্লাটের মানুষজনকে একেবারে জাদু করে রেখেছে। যে-কোনও বিপদ এলেই সবাই তান্ত্রিকের কাছে যায় উদ্ধার পেতে। হেসে বললাম, তা মহেন্দ্র, তোমার এই দাম্পত্যকলহ সেই খারাপ হাওয়ায় হয়েছে কে বলল? তান্ত্রিকঠাকুর নাকি ?

—নাহ্, একটু ইতস্তত করে মহেন্দ্র বলল, আমার মনে হচ্ছে। আজকাল রোজ রোজ ঝগড়া হয়। বউটাও কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। ছ-আট মাস আগেও এমনটা ছিল না। তা ছাড়া সারা গাঁয়েই তো কত ঝুটঝামেলা বেঁধে গেছে!

সব দেশেই অজ-গাঁয়ের দিকে অশরীরী মানুষের চলাফেরা একটু বেশি। ব্রহ্মদা ক-দিন আগে বলেছিলেন কথার ফুরসতে। এখানকার গাঁয়ের মানুষজনের ধারণাও একই রকম। দূরের কোনও একটা পাহাড়ে এক অশরীরী আত্মা আছে, তার নিশ্বাস কখনও ভেসে আসে এসব গাঁয়ে, তখনই এক-একটা অঘটন ঘটে গাঁয়ের মানুষজনের। এক-একদিন পাহাড় থেকে অদ্ভুত ডাক ভেসে আসে। কখনও লাল আলো জ্বলতে দেখেছে অনেকে। অথচ সে-সব পাহাড়ে মানুষজনের অস্তিত্ব বলতে গেলে নেই। তান্ত্রিক ঠাকুর কখনও মাদুলি ধারণ করবার নিদান দেন এসব বিষ-নিশ্বাস থেকে উদ্ধার পেতে। তবে এবার নাকি ভীষণ একটা অশুভ হাওয়া ঘোরাফেরা করছে গাঁয়ে।

মহেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা গিয়ে পড়েছি টাঁড়ে। টাঁড় পেরিয়ে আমরা একটা গাঁয়ে ঢুকে পড়েছি, সূর্য এখন তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। বসন্তের রোদ্দুর গায়ে আঁচড় কাটছে। দু-একটা বাচ্চাকে দেখে মনে হল, এখানেও কিছু আদিবাসী থাকে। তবে গ্রামটা ফাঁকা ফাঁকা। মহেন্দ্র বলল, এ-গাঁয়ের অনেকেই নওলদহে গেছে — উৎসব দেখতে ও যোগ দিতে।

ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করি, মহেন্দ্র, সত্যি সত্যি তোমার কোথাও আশনাই নেই?

আশনাই শব্দটা ওর খুব পছন্দ হয়।

— দিব্যি করছি, কখনও না।

— আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার বউকে আমি বুঝিয়ে বলব। তা হলে আর ঝগড়া হবে না।

সন্ধের সময় তার সঙ্গে সাঁওতাল পাড়ায় যাব উৎসবে যোগ দিতে, আপাতত ঘরে ফেরা। ফিরে দেখি ব্রহ্মদা লেখা শেষ করে গেরিমাটি দিয়ে কারুকাজ করছেন বেশ নিবিষ্ট হয়ে। এক

আশ্চর্য ত্রিভঙ্গ শরীর রূপ পাচ্ছে আঙুলের ছোটো ছোটো মোচড়ে। এ-রকম বহুক্ষণ নড়াচড়া করছে ক-টা আঙুল। মানুষের আঙুলের, কী যে শক্তি তা উপলব্ধি করা যায় সেতারের বা সরোদের সুরে, কিংবা ভাস্কর্যের গড়ে ওঠার মুহূর্তে।

আমাদের দেখে বললেন, কী আবিষ্কার হল আজ?

বলি, খারাপ হাওয়া। এমন পাহাড়তলির গাঁয়ের হাওয়াও খারাপ হয় তা জেনে ভারী অবাক হচ্ছি। এখানে তো বিশুদ্ধতম হাওয়ারা বাস করে এতদিন জানতাম।

মহেন্দ্র চলে যাওয়ার পর খারাপ হাওয়ার কেরামতি বিবৃত করি ব্রহ্মদার কাছে। ব্রহ্মদাকে চিন্তিত দেখায়, কেন না এসব তল্লাটে হাওয়া খারাপ হলে বহু অঘটন ঘটে। সবই মনুষ্যসৃষ্ট। তাতে কোনও দৈবশক্তি বা অলৌকিকতা নেই।

সারাদিনে শুধু কিছু ভাস্কর্য তৈরিতেই মন দিলেন ব্রহ্মদা তা নয়। লিখলেন কিছু চিঠি। তাতে পরবর্তী আন্ডারগ্রাউন্ডের কথাও থাকল। এরপর অন্য কোথাও ঠাঁই খুঁজবেন তারই প্রস্তুতি চলছে। এমন বেশ কয়েকবার ঠাঁই বদল করতে হল এ ক-মাসে তা বলছিলেন একটু একটু করে। আমি হঠাৎই কিছুটা মশকরার স্বরেই বললাম, আমি জানতাম আপনি অকুতোভয়। এখন দেখছি পুলিশকে বেশ ভয় পাচ্ছেন! পুলিশকে ভয় পাচ্ছেন কেন?

ব্রহ্মদা হো হো করে হেসে উঠে আঁধারপাছু গাঁয়ের হাওয়ায় কিছু কাঁপন ধরিয়ে দিলেন। তারপর একটু পজ দিয়ে বললেন, আসলে কী জানো। অ্যারেস্ট হয়ে জেলের ভাত খেতে পারি অনায়াসে। কিন্তু নিতাইকিশোর ঘোষ বা তরুণ সেনগুপ্তের কথা ভাবো। এ-রকম আগুনে-কলমও ভোঁতা করে দিতে পেরেছে সরকার। আর সরকার তো তাই চান। সব প্রতিবাদমনস্ক বুদ্ধিজীবীকে জেলে পুরে রাখতে পারলেই তো জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আর কেউ কথা বলতে পারবে না। এক আমিই যা বাইরে থেকে কিছু প্রস্তুতি নিতে পারছি। মানুষকে তো বোঝানোরও দরকার। কোনওভাবে জানাতে হবে কথাগুলো। সংবাদপত্রের কলমচিদের কলমের ডগায় নিরোধ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে একটি স্ফুলিঙ্গও না প্রসব করতে পারে তারা। ফলে যা ইচ্ছে তাই হচ্ছে দেশে।

ঠিকই বলেছেন ব্রহ্মদা।

সেদিন দুপুরে পোস্ট অফিসের দিকে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। একটা ভারী খাম আসার কথা ডাকে। কলকাতায় থাকাকালীন ব্রহ্মদার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল নিতাইকিশোর ঘোষের, তার জেরে আসবে এই লেখাটা। নিতাইকিশোর ঘোষ জেলে বসেই লিখবেন, তারপর কোনওভাবে পাচার করে দেবেন বাই পোস্ট। সেই খাম আসবে পাথারন পোস্ট অফিসের ঠিকানায়।

কিন্তু কোনও খাম আসেনি। উপরন্তু পাঁড়েজি যা জানালেন ঠারেঠোরে, (গাঁয়ের কয়েকজন লোক তখন পোস্ট অফিসে এসেছে চিঠি পাঠাতে, তাদের কান বাঁচিয়ে) কাল সন্ধের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একজন পুলিশ অফিসারের। তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন আর্টিস্টবাবু রোজ পোস্ট অফিসে কেন আসেন। পাঁড়েজি তাদের বলেছেন আর্টিস্ট রোজই একটা করে চিঠি লেখেন তাঁর বউকে। পুলিশ অফিসার তাতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আর্টিস্ট তা হলে কোন কার্যকারণে পড়ে আছেন এত দূরে। পাঁড়েজি জানিয়েছেন, আর্টিস্ট একটা বড়ো আঁকার

কাজ পেয়েছেন। সেটি এখানকার পাহাড়ের ছবি আঁকার কাজ। সেই কারণেই দেশ ছেড়ে এতদূরে এসে কষ্ট মাখছেন সারা শরীরে। পুলিশ অফিসার তখন আর্টিস্টের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইছিলেন কায়দা করে। কিন্তু পাঁড়েজি জানিয়েছেন, কে কাকে কোথায় চিঠি লিখল তার কোনও রেকর্ড থাকে না পোস্ট অফিসে। অতএব ঠিকানাও থাকে না।

ব্রহ্মদার বলিরেখার ভাঁজ দীর্ঘতর হতে থাকে। পাঁড়েজি কিছু বুঝেছেন কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি যে ব্রহ্মদাকে বাঁচাতে চাইছেন তা স্পষ্ট তাঁর কথা থেকে।

সন্ধেবেলা পর্যন্ত আমাদের কেটে গেল আঁধারপাহ্ন গাঁ থেকে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটতে। সত্যিই কোনও বিপদ আছে কি না, সে-বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ নই। দু-জন বাইরের লোক ডেরা বেঁধে আছে এই পাহাড়তলির গাঁয়ে কী উদ্দেশে তা পুলিশের মনে উথল দিয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।

সন্ধেয় মহেন্দ্র চলে এল আদিবাসীপাড়ায় নিয়ে যাবে বলে। পোশাক বদলে চলতে শুরু করি কাঁকুরে পথ দিয়ে। সন্ধের পর এক খাবলা অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে হাঁটতে থাকি তিনজনে। পা ফেলি জোরে জোরে। ব্রহ্মদার গলায় গুনগুন গান। বোধহয় প্ল্যান করছেন কিছু। ব্রহ্মদার গানের সঙ্গে প্ল্যান অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

গাঁ ছাড়িয়ে আমরা ততক্ষণে আর এক টাঁড়ে। সন্ধে চুঁইয়ে নামে ওড়িশার এক নিত্যনির্জন তল্লাটে। হয়তো ছ-টা সাড়ে ছ-টা। কতটা রাস্তা এলাম জানি না, কিন্তু এক-দেড় ঘন্টা ধরে হাঁটছি। আঁধারপাহ্ন থেকে সবচেয়ে কাছে যে-পাহাড়টা আমাদের নজরে পড়ত, তার কাছাকাছি এগোচ্ছি আমরা। সবুজ গাছপালা শুরু হয়ে গেছে পথের দু-পাশে। দু-একটা ঝুপড়ি। পাহাড়তলির টিপিকাল ছবি। কতবার ভেবেছি এমন একটা গাঁয়ে আসব, রাত কাটাব। আজ একেবারে সশরীরে। পুরো আদিবাসী গ্রাম। কেউ পাহাড়ে হরিণ মারে, শুয়োর মারে, তার মাংস বিশয়ী কি বাংরিপোসিতে গিয়ে বিক্রি করে আসে। শহর থেকে ফড়েরা এসে হরিণের চামড়া কিনে নিয়ে যায়। কেউ ভাঁড় ভাঁড় মধু চালান করে শহরে, শুকনো মৌচাক বিক্রি করে, বেশিরভাগ লোকই চাষবাস নিয়ে থাকে। হয়তো ভাগচাষ।

এবার দূর থেকে কিছু কোলাহল শোনা গেল। মাদল বাজছে দ্রিমি দ্রিমি। পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি বেশ চমৎকার শোনাচ্ছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে বাঁশিরও। আর অদ্ভুত সুরের গান। এর আগে রেডিয়োতে সাঁওতালি গান শুনেছি, এবার আর এক আদিবাসীদের গান ওদের স্বকণ্ঠে। মহেন্দ্র বলছে এরা সাঁওতাল নয়। এমন জঙ্গলের পরিবেশে, পাহাড়তলির ঝুপড়ির মধ্যে এক নতুন আদিবাসী গান শোনা অকল্পনীয়। তাও ফরমায়েসি নয়।

কিছুক্ষণ পর সামান্য জ্যোৎস্নার আলো। তাতেই রহস্যে ভরপুর চরাচর। দু-পাশে বুনোগাছ, এসব গাছ আমাদের ওদিকে চোখে পড়ে না। দুটো ঘন-নীল রঙের পাখি, গলায় টিয়ার মতো লাল দাগ। আমাদের দেখে হুশ করে উড়ে গেল। এবার বসতি শুরু হয়েছে, সব বাড়িই প্রায় জঙ্গলের ডালপালা কেটে শক্ত বেড়ায় তৈরি। আকারে ছোটো। গোল আকারের দরজা, ভিতরে ঢুকতে গেলে প্রায় হামাগুড়ি দিতে হবে। সার সার এ-রকম অনেক ঝুপড়ি। ভিতরে পার্টিশান আছে কি না কে জানে! ওর ভিতরে কোথায় শোয়, কীভাবে ঘরকন্না করে, কীভাবে বাচ্চার জন্ম দেয়, এসব খবর সভ্যতার মানুষ খুব একটা রাখে না। একটা জীবন, আদিবাসী হয়ে জন্ম নিয়ে পরখ করে দেখতে ইচ্ছে করে এদের মুক্ত জীবনযাপন।

স্পটে পৌঁছোতে দেখি, সে-এক এলাহি ব্যাপার। অনেকটা ফাঁকা জায়গা। জঙ্গলের মধ্যে সবুজ-লাল পটভূমিকায় শক্ত পাথুরে মাটির উপরে নাচ-গান। হ্যাজাক জ্বলছে অনেকগুলো। রাতকে দিন করে ফেলেছে হ্যাজাকের কারচুপিতে। একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাঁ। একটা মস্ত শালগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে ঠাকুরের থান। হয়তো মারাংবুরুর মতো কোনও দেবতা। কিংবা জোহার আরার মতো। তার সামনে শয়ে শয়ে লোক নাচছে। পুরুষরা বেশ উদ্দাম, মেয়েরা অপেক্ষাকৃত সারিবদ্ধ ও শান্ত। যেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা মুখোমুখি, সেখানে নাচ একটু বেপরোয়া। মেয়েদের হাত পাশের মেয়েদের কোমরে জড়িয়ে নাচছে সার সার। ভিড় ঠেলে আরও একটু এগোই, মুরগি জবাই হচ্ছে ওখানে। সে-এক বীভৎস দৃশ্য। মুরগির গলা কেটে, সেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোনো ধড় ঠোঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে চুষছে দু-তিনজন। বোধহয় প্রচুর হাঁড়িয়া মহুয়া পান করে টালমাটাল। সবারই প্রায় মত্ত অবস্থা। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমার চেনা। একজন বয়স্ক লোক আমাদের ভিনদেশি দেখে মহেন্দ্রকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল কীসব।

উৎসব দেখতে জড়ো হয়েছে আশেপাশের গাঁয়ের অনেক লোক। তারা একদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা পাহাড় ঘেঁষে অন্যদিকে দাঁড়াই। এমন উদ্দাম ব্যাকরণ-না-মানা নাচের আসর আমি কখনও দেখিনি।

— ব্রহ্মদা, তোমার সঙ্গে আসা সার্থক।

ব্রহ্মদা বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আজ কীসের পরব। তাতে কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। কাটা মুরগিগুলোর পালক ছাড়াচ্ছে ক-টা অল্পবয়সী আদিবাসী ছেলে। সারা রাত ধরে মুরগি রান্না হবে আজ, তার জন্যে ভিড় বেশি। সবাই কিছু না কিছু পাবে।

আমরা ভিড় ছেড়ে একটু তফাতে চলে যাই। রক্তে মাখামাখি সাঁওতালগুলো বেশ উন্মত্ত হয়ে নাচছে। পালক ওড়াচ্ছে মুঠো মুঠো। যেন ফুলের পাপড়ি ওড়াচ্ছে আনন্দে। জঙ্গলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে গিয়ে থমকাতেই হয়, কেন না একটা কোড়া আর কুড়ি চলে এসেছিল জঙ্গলের ধারে আড়াল খুঁজে আশনাই করতে। আশনাই চলাকালীন আমাদের আবির্ভাব। না কি প্রাদুর্ভাব!

আমাদের দেখে ওরা দুটিতে লজ্জা পেয়ে যায়। আমরাও। মেয়েটা গায়ের আঁচল তুলে নেয় বুকে। ছেলেটা হাসতে হাসতে আমাদের কাছে এল। লাজুক চাউনি। মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, ভিনদেশি ?

— বাঙালি, মহেন্দ্র জবাব দেয়, এখন আঁধারপাহ্ন।

বাংলার লোক শুনে ওরা অবাক। কৌতূহল চোখে মাখিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে আমাদের দিকে। ব্রহ্মদা কখন সিগারেট কিনেছিল জানি না, ছেলেটার দিকে একটা বাড়িয়ে দিতে তার মুখে এক লক্ষ খুশির ফুলঝুরি। ছেলেটির পরনে ছোট্ট এক টুকরো কাপড়, মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। পাহাড়ের মতো স্বাস্থ্য। সিগারেটে সুখটান দিয়ে, কোড়া এবার তার কুড়িকে ডাকল হাতছানি দিয়ে। কুড়ি এতক্ষণ লজ্জা পাচ্ছিল, এবার ভয় আর কৌতূহল মুখে মাখো মাখো করে নিয়ে এগিয়ে এল আমাদের দেখে। বাংলার লোক শুনে সেও আমাদের দেখল। চোখে সম্ভ্রম। কিন্তু আমার বিবেকে দংশন। কোথায় ঝোপের আড়ালে গিয়ে প্রেমিক

প্রেমিকা এতক্ষণ মন খুলে (কিংবা শরীর খুলে) একটু প্রেম করবে, তা না আমরা কোথাকার ভিনদেশি লোক এসে জ্বালাতন।

কোড়া-কুড়ি দুটো অবশ্য ভালোই, আমাদের ডেকে নিয়ে গেল পাশেই একটা ঝুপড়ির কাছে। বাইরে কাঠের মাচান, সেখানেই বসতে বলল। চাউনিতে কোনও সংকোচ নেই। কোন ঝুপড়িতেই প্রায় লোকজন নেই এখন। নিরিবিলিতে গল্প করতে পেয়ে আমরাও প্রবল খুশি। রাত দুপুর হয়ে যাচ্ছে। মহেন্দ্র ইশারায় জানাল, ঘরে ফিরতে হবে তাকে। নইলে তার বউ তুলকালাম করবে খুব। সাঁওতালপাড়ায় এসেছে শুনলে আরও রাগ। কিন্তু মহেন্দ্রের আবার সাঁওতাল পাড়ায় আসার খুব শখ।

কোড়াটির নাম জেনে নিই, বুধন। বুধন বলল, উৎসবের দিন এসেছ যখন মাংস খেয়ে যেতে হবে। খেতেই হবে।

— উৎসব কীসের আজ, ব্রহ্মদা এবার ফুরসত পেয়ে জানতে চাইল।

বুধন হাসল, বলল, সে অন্য ব্যাপার।

ছেলেটা চেপে যাচ্ছে তা তার বলার ভঙ্গি দেখে অনুমান করি। আবার জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, ব্রহ্মদা আস্তে বলল, বেশি চাপাচাপি কোরো না।

অনেকক্ষণ হেঁটে গলার টাগরা তখন তেষ্টায় শুকনো। ব্রহ্মদা কী ভাবছেন কে জানে! হাঁড়িয়া খাবে নাকি! হাঁড়িয়া তো মহুয়ার মতো নয়, খুব বোঁটকা গন্ধ। আমার দ্বারা হবে না। না হয় অদিবাসী হবই না এ-জীবনে।

এক গেলাস জল চাইতে মেয়েটা ঝুপড়ির ভিতর সেঁধিয়ে গেল দ্রুত।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর আমি বুধনকে জানালাম তার প্রেমিকা বেশ সুন্দরীই। তার খোঁপায় বনতুলসীর ফুলে আলো ছড়াচ্ছে রাতের অন্ধকারে। শুনে ও লজ্জা লজ্জা মুখ করে হেসে বলল, কমলি খুব ভালো মেয়ে। ঝঞ্ঝাট করে না।

— এটা নিশ্চয় কমলিদের ঘর? তা তোমার ঘর কোন্ দিকে?

বুধনের মুখ থেকে যে-উত্তর পাওয়া গেল তা আমাদের তাজ্জব করে, কেন না আমাদের সমাজের অঙ্কটা এদের থেকে আলাদা। আরও দু-তিনটে গাঁয়ের পর বুধনদের গাঁ। ও এক বছর আগে এই গাঁয়ে এসেছে কমলিদের বাড়িতে মজুর খাটতে। ওর এই খাটুনির টাকা কমলির বাবার কাছে জমা হচ্ছে। তিন বছর খাটুনি শেষ হলে কমলির সঙ্গে বিয়ের পণের টাকা জোগাড় হবে তার। তারপর বিয়ে হবে ওদের। ওদের সমাজে নাকি এই নিয়ম। পাত্রকে এভাবে খেটে পণের টাকা জোগাড় করতে হয়।

নিয়মটা আমার কাছে মনে হয় বেশ লাগসই। বিয়ের আগে এই তিন বছর প্রেম-প্রেম খেলাটা এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। বিয়ে হলেই তো খেল খতম। বুধনের নিশ্চয় এই খাটুনি এক অভিনব রোমাঞ্চ। প্রেমিকার জন্যে হাজার মাইল পথ হেঁটে যাওয়া যায়। সিসিফাসের মতো এক বিশাল পাথরখণ্ড গড়িয়ে তোলা যায় উঁচু পাহাড়ের মাথায়। লেবার খাটা তো কোনও ব্যাপারই নয়।

এর মধ্যে জল নিয়ে ফিরে এল কমলি। না, গেলাসে নয়, গেলাসের কনসেপ্ট বোধহয় এদের গাঁয়ে নেই। ওর হাতে পোড়ামাটির গাড়ুর মতো একটা পাত্র। কমলিকে এবার ভালো

করে চাক্ষুষ করি। একেবারে পাথর কেটে বানানো শরীর। চোখ দুটোয় একটা শান্ত আকর্ষণ। তাকালেই মনে হয় আমাকেও ভালোবাসবে। গলায় ও হাতে কালো পুঁতির মালা। কানে রুপোরঙের রিং। গাছকোমর করে বাঁধা কমলারঙের শাড়ি।

বললাম, কতক্ষণ হবে তোমাদের এ-উৎসব?

বুধন বলল, তা সারা রাত। যতক্ষণ না সবাই ক্লান্ত হয়ে পরবে। সন্ধে থেকে আরও প্রচুর হাঁড়িয়া খাবে সকলে। মহুয়াও খাবে। নাচ হবে, আরও গান হবে।

—তা হলে তো আজ এই গাঁয়ে রাতে থেকে যেতে হয়। এ-রকম তো সবসময় হয় না।

মজা করেই বলেছি, তবু ব্রহ্মদা সিরিয়াসলি ধরে নিয়ে হেসে ঘাড় নাড়লেন, না আমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না। রাতে ওদের জীবন হয়তো আরও উদ্দাম হবে। অনেক আদিবাসীদের উৎসবে তা হয়ও। ওদের এই উৎসবে কোনও ভিনদেশিকে ওরা পছন্দ নাও করতে পারে।

বুধন ছেলেটিকে তো আমার বেশ ভালোই লাগছে। নরম আর লাজুক। তবু অ্যাপ্রেন্টিস প্রেমিক তো, প্রেমিকার সামনে নিজেকে যথাসম্ভব স্মার্ট ও বিনয়ী দেখাতে চাইছে।

চুপি চুপি জানতে চাই কমলির কাছে, পাত্র হিসেবে বুধন কেমন?

ফিক করে হেসে ফেলল ও। যা বলল তার মানে দাঁড়ায় ভীষণ দুষ্টু।

সব কথা মগজে এন্ট্রি দিতে পারছিলাম না, মহেন্দ্র এ-ক্ষেত্রে দোভাষীর কাজ করছিল ফ্রি-তে।

কমলির মুখের প্রকাশভঙ্গি একজন চিরকালীন প্রেমিকার। জুলিয়েট কিংবা লায়লার মতো। কলকাতার যে-কোনও তরুণীও ঠিক এ-রকম কৌতুক করেই খোঁচা দেয় তার প্রেমিক সম্পর্কে। বুধনকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের বিয়ে হতে তো তা হলে এখনও ঢের দেরি, এতে কষ্ট হয় না?

কমলি মুখে ভঙ্গি করে বলে, কষ্ট কীসের! রোজই তো আমাদের দেখা হয়।

বুধন বলল, কী করা যাবে, আমাদের সমাজের যে এটাই নিয়ম।

— সবাইকে এভাবে বিয়ে করতে হয়?

— না, অনেকে কুড়িটাকে নিয়ে পালিয়ে যায় দূরদেশে। সে-ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি থাকে। ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি। না ধরা পড়লে ভিনদেশে গিয়ে না-খেয়ে কাটাতে হয়। কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে অবশ্য অসুবিধে নেই।

কমলি ফিক করে হেসে বলল, আমার মা-বাবাই তো পালিয়ে এসে এই গাঁয়ে বাসা বেঁধেছিল।

— তা এ-গাঁয়ের লোক কিছু অপরাধ নেয়নি ?

— নেবে কেন! বাবা যে মস্ত বড়ো শিকারি, খুব ডাকাবুকো। আসার পথে দু-জনে তিনটে বড়ো বড়ো শোর (শুয়োর) মেরে এনেছিল যে। দু-দিন ধরে এ-পাড়ায় মহা ধুমধাম।

তা হলে এও এক ধরনের ঘুষ। কমলির বাবা সমস্ত গাঁয়ের লোককে বশ করে জায়গা করে নিয়েছে এই গাঁয়ে। কিন্তু বুধন বা কমলি তা চায় না। তারা এই বিপুল অন্ধকারে দু-চোখে জ্যোৎস্না জ্বালিয়ে একটু একটু করে বলছিল তাদের রূপকথার গল্প। দুটো বছর এভাবেই কেটে গেছে, দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে যাবে ঠিক। তারপর ওরা দু-জনে এই

গাঁয়ের একপ্রান্তে ঘর বাঁধবে। বুধনও আর ওর নিজের গাঁয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নয়। ওদের যখন ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়, সবার চোখে ধুলো দিয়ে ওরা জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে। সুখদুঃখ, ভালোবাসার কথা বলে। ভালোবাসে।

কমলি হঠাৎই খিলখিল হেসে বলল, কোন্‌দিন চিতার মুখে পড়ব আমরা। যা গভীরে চলে যাই!

বুধনও নাকি খুব ডাকাবুকো। তার প্রমাণ রাখতে বিশ বছরের জোয়ানটা উরুতে চাপড় দিয়ে বলে ওঠে, চিতা এলেই হল! সঙ্গে কাঁড় থাকে না! এক টানে গলাটা উপড়ে ফেলব উদের।

কথায় কথায় রাত বেড়ে যায়। কী কথা তখনও বাকি? উঠতে যাব, কমলি আর বুধন কিছুতেই ছাড়তে চায় না আমাদের। বলে মাংস রান্না হলে খেয়ে যেতে হবে। শেষে অনেক বলে কয়ে, আরেকদিন ওদের বাড়ি নিমন্ত্রিত হব, এমন গাঢ় আশ্বাস দিয়ে আমরা আবার আঁধারপাছের পথ ধরি। তখন জ্যোৎস্না উঠেছে জমজম করে। চাঁদের এক খাবলা মাংস ঠুকরে নিতে আসছে শাদা মেঘের দল।

ব্রহ্মদা কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলছিলেন না, কী যেন গভীর হয়ে ভাবছিলেন। এমন মাঝে মাঝে হয়। হয়তো এখানকার ডেরা তুলে দিয়ে নতুন ডেরা বাঁধার কথা। আগামী দিনগুলোর অনিশ্চয়তার কথা। পুলিশের আনাগোনার কথা। এইপাহাড়তলির গাঁয়ের চিতাকে ভয় পায় না ব্রহ্মদা। বুনো হাতিকেও ভয় পায় না। ভয় পায় জরুরি দেবীর পুলিশকে। মাথার উপর পাঁচশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বেলে ঘুমোতে হবে সেই ভয় পায় না ব্রহ্মদা। শুধু তাঁর আশঙ্কা পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করতে পারবেন না।

আমি কথা বলেই যাচ্ছি মহেন্দ্রর সঙ্গে। জানতে চাইছি এই আদিবাসী জীবনের গূঢ় জীবনযাপনের কোনও গোপন কথা। ব্রহ্মদা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলল, আচ্ছা বিশ্ব, এখানকার তহশিলদারের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?

আমি বিষয়টা ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করি, কেন, ব্রহ্মদা?

—পাহাড়চূড়ায় এক খণ্ড জমি কেনার ব্যাপারে। সেই যে আলোচনা হল এখানে পাহাড়ের মাথায় জমি কিনে একটা স্বপ্নের বাড়ি করে সেখানে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো। এমার্জেন্সির কালো হাত ছুঁতে পারবে না কোনওদিন।

ব্রহ্মদার মনে সেই একই অশান্তি বিজবিজ করছে সারাক্ষণ। কিছুক্ষণ পরেই বললেন, বিশ্ব, কাল সকালেই জমির ব্যাপারটা ফাইনাল করতে যাব। কী বলো?

১০

বোধহয় কাল রাতে হাঁটার ক্লান্তি ছিল শরীরে, অথবা পাহাড়ি হাওয়ায় এক দীর্ঘ ভাতঘুম, পৃথ্বীরাজের মায়ের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদ্দুর টাটাচ্ছে গোটা আঁধারপাছে। ব্রহ্মদা অনেক আগেই উঠে প্রাত্যহিক ব্যায়ামহ সেরে নিচ্ছেন। ডন বৈঠক সারছেন রিচুয়ালের মতো। সে-জন্যই ওঁর এত প্রাণশক্তি, শরীর এখনও মজবুত। সব সময়ই টগবগ করে ফুটছেন। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় দেখেছি কখনও কড়া রোদ্দুর মাথায় নিয়ে হেঁটে যান মাইলের পর

মাইল, কখনও হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ছুটতে শুরু করলেন শরীরের ম্যাজম্যাজানি কাটাবার জন্য। কখনও সারাদিন না খেয়েই রইলেন।

এভাবেই হঠাৎ একদিন ঠিক করেছিলেন আর জুতো পরবেন না, চামড়াগুলো বড্ড পায়ে ফোটে। কলকাতার পিচ-ঢালা ফুটন্ত রাস্তায় মনের আনন্দে খালি পায়ে হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। এভাবেই গত কয়েক বছর জুতো না পরে। আবার প্রবল শীতে ভোরে উঠে প্রাত্যহিক স্নান শুধু শীতটাকে প্রতি রোমকূপ দিয়ে উপভোগ করার কারণেই। কখনও মনে হয় এ কী অকারণ পাগলামো! কিংবা পাগলামো নয়। কোনও বাঁধনে বাঁধা না পড়ার কারণেই এমন এলোমেলো হওয়া। এই ব্রহ্মদাই লেখার সময়, পত্রিকা প্রকাশের সময়, কোনও গভীর কথাবার্তার সময় প্রবল সিরিয়াস।

ঘুম-ভাঙা আমাকে দেখে ব্রহ্মদা বললেন, শুনেছ বিশ্ব, কাল গাঁয়ের ভেতর একটা চিতা ঢুকেছিল।

— সে কী ! আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।

— হ্যাঁ, একটা বাছুর পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগও রেখে গেছে তার অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য।

— কোথায়?

— এই তো, এই গাঁয়েরই প্রান্তে, এখান থেকে খুব বেশিদূর নয়।

— ওই দেখুন, আপনাকে কতবার বলছি দরজা খুলে না শুতে।

আবার সেই ভুবন জুড়ানো হাসি ব্রহ্মদার, এ-রকম দু-জন পালোয়ান পাশাপাশি শুয়ে আছে দেখলে কোনও চিতার কি সাহস হবে ছুঁয়ে দেখবার?

এরপর আর কোনও কথা কি মানায়!

সকাল থেকেই ব্রহ্মদা ভাবছেন এখান থেকে ডেরা তোলা হবে কীভাবে! তেমন লাগেজ তো নেই যে টেম্পো ডাকতে হবে! যেমন এসেছিলেন ভারহীন, তেমনই চলে যাবেন ভারমুক্ত। ক্যানভাসটাও ইতিমধ্যে ভরে উঠেছে আরও একটু। পাহাড়ের কোলে কিছু শাদা বকের ওড়াউড়ি। জলার ধারে কিছু নীলচে ঝোপ। তবু শেষ হয়নি আঁকা। হয়তো আরও কিছুদিন সময় পেলে আঁকাটা শেষ হত।

কিন্তু হবে না। পুলিশের আনাগোনা শোনা যাচ্ছে এর ওর মুখে। তারা হয়তো ওয়াচ করছে বাঙালি আর্টিস্টের আনাগোনা। হয়তো কলকাতায় টেলিযোগে খবর নিচ্ছে এ-রকম কোনও আর্টিস্ট আছে কি না যিনি বিপজ্জনক! একমুখ দাড়ি। খালি পায়ে হাঁটে।

জরুরি দেবীর কালো হাত তা হলে সেঁধিয়েছে এখানেও! দিব্যি নিরিবিলি গাঁ, রোদে পিঠ পেতে বসে তাপ নেয় শরীরে। দু-বেলা খেতে পাওয়াই যাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বিলাসিতা। জরুরি অবস্থার নামই শোনেনি কেউ। সেখানেও নিস্তার নেই।

সেদিন পোস্ট অফিসে গিয়ে একটা মোটা খাম পেতে ব্রহ্মদার মুখে কী উল্লাস। সঙ্গে কয়েকটা চিঠি। পাঁড়েজি বেশ লুকিয়ে সেগুলো চালান করলেন ব্রহ্মদার হাতে। বললেন, পুলিশ এসে খবর নিচ্ছিল কী ধরনের চিঠি যায়। কোনও চিঠি আসে কি না। পাঁড়েজি কথা বলছিলেন ফিসফিসিয়ে। কিছু হয়তো আঁচ করেছেন এ ক-দিনে। তাঁর নিজের একটা প্রয়োজন

আছেই ব্রহ্মদার কাছে। হয়তো তাই সাহায্য করছেন যাতে পুলিশের নজর না পড়ে ডাকে আসা চিঠিগুলোর উপর। তিনি অবশ্য আন্দাজও করেছেন ব্রহ্মদা কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে এখানে এসে আছেন কষ্ট করে। সেই প্রয়োজনটা সর্বজনীন। তাঁকে একগুচ্ছ হাসি ও কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়ে আমরা ফিরে চলি আঁধারপাছের পথে।

বিকেল হয়ে আসার আগেই আকাশে কালো মেঘ হঠাৎই, নোটিস ছাড়াই। স্যাঁতস্যাঁত করছে আবহাওয়া। শীত-শীত করছে তবু আলোয়ান গায়ে দিইনি। ব্রহ্মদা খুব বেশি গরম কাপড়ের ব্যবহার পছন্দ করেন না। অতি শীতেও একটা বুক-খোলা বুশশার্ট পরা। শীতও নাকি এনজয় করতে জানতে হয়। আমাকেও কি প্রভাবিত করছে আইডিয়াটা! কত মানুষই তো শীতের কাপড় গায়ে দেয় না। যদিও, পায় না তাই দেয় না। কিন্তু তারাও তো জীবনযাপন করছে যেভাবেই হোক। আমরাও বা কেন পারব না। ছোটোবেলায় আমার ঠাকুরদা বলতেন, 'শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাও তাহাই সয়।'

বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তেই দেখি সামনে অনেকটা পথ বাকি আঁধারপাছে পৌঁছোতে। বড়ো বড়ো ফোঁটা। নেমে আসছে মিসাইলের মতো। ডাহা ভেজা আজ বরাতে। গরু ভেজা, মহিষ ভেজা যাই হোক না কেন। সেই সঙ্গে প্রখর শীতে কাঁপন দিয়ে ওঠে শরীরে। হঠাৎ খেয়াল হয় সামনেই পার্বতীদের বাড়ি। খুব করে, আত্মীয়ের মতো যেতে বলেছিল ভিনদেশি মেয়েটি। ব্রহ্মদাকে বলি, চলুন, পার্বতীদের বাড়ি গেলে ভেজার হাত থেকে রেহাই।

—কেন, বৃষ্টিতে ভিজতে কী আরাম! কেমন বল্লমের মতো ফুঁড়ছে গালের চোয়াল, বলো?

—তবু এই ফুরসতে পার্বতীর বাড়িতে যাওয়ার একটা ছুতো হয়।

—তুমি যাও। পাহাড়তলির মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে এসো। আমি ততক্ষণে বৃষ্টিতে ভিজি। পরে যাচ্ছি।

তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে শুরু করলেন ব্রহ্মদা। এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাচ্ছে দাড়িভর্তি গাল।

আমি পায়ে পায়ে পার্বতীর বাড়ির দিকে। কিন্তু যেতে হল না, যার কাছে যাওয়া সেই পার্বতী বসে আছে একটা ছোটোখাটো দিঘির পাড়ে। একটা শেডের মতো আছে, তারই নীচে। মাছ পাহারা দেওয়ার শেড কি এটা! বৃষ্টি জাঁকিয়ে আসছে সে-খেয়াল নেই পাহাড়তলির মেয়ের। দূর থেকে সে-দৃশ্য দেখে পৌঁছোই তার কাছে। দেখি তারও বৃষ্টিবোধ নেই। শীতবোধ নেই।

আমাদের দেখেই চমকে উঠল, ঝিকিয়ে উঠল ঠোঁটের ভিতর দাঁতগুলো। চুল এলো, ভরাট শরীর। বলল, ভিনদেশি বাবু, কী মনে করে এ-গাঁয়ে? শীত করছে না?

— না, তোমারও তো শীত নেই শরীরে। কী ব্যাপার?

— যাকে স্বামীতে নেয় না তার আবার শীত কীসের!

কিছুক্ষণ মৌন থাকি আমরা। পার্বতীকে তো কোনও রিলিফ দিতে পারব না।

— এভাবে একলা বসে আছ আনমনে, কী হয়েছে তোমার?

— কী আর হবে! একা বসে মাঝেমধ্যে জীবনটাকে উল্টেপাল্টে দেখি। কাটাছেঁড়া করি।

এ-যে দার্শনিকের কথা! এমন অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েও দর্শন জানে!

— কী পেলে এতক্ষণে?

— ভাবছিলাম আমাকে বোধহয় মানুষরা পছন্দ করে না।

— যদি আমার পছন্দ হয় তোমাকে? সাহস করে বলে ফেলি।

শুনে খিলখিল করে হাসল পার্বতী। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, হাসিতে সমস্ত শরীর কাঁপছে ওর। খানিক পর হাসি থামিয়ে বলল, শহুরে মানুষদের আমি চিনি। আমার বিয়ে তো শহরে হয়েছিল। বাবুরা খুব পটাতে পারে। ভালোবাসে না।

পার্বতীকে তার অনাথ জীবনই দার্শনিক করে তুলেছে দিনে দিনে। তেইশ-চব্বিশের মেয়ে পৃথিবীর প্রতারক মানুষদের চিনে ফেলেছে যন্ত্রণায় চুরচুর হতে হতে। ওর আর দোষ কি, পৃথিবীর মানুষ তো ওকে স্বস্তি পেতে দেয়নি।

আমি অবশ্য প্রতারণা করতে চাইনি। হয়তো কৌতূহল ছিল ভিনদেশি মেয়ের সঙ্গে একটু মশকরা করতে। কিন্তু বিধ্বস্ত মনে মশকরা বাসা বাঁধে না।

ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে গেছে। বিকেলের রং এমনই মেঘে ঢেকে গেছে যে, ধারণা হচ্ছে সন্ধে ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। পার্বতীর সঙ্গে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। কিছুক্ষণ কথাই খুঁজে পাই না কেন যেন। তারপর পার্বতীই হঠাৎ হেসে উঠে বলল, বাবু কি আমার উপর রাগ করলেন?

অতঃপর পার্বতী সহজ হয়ে তার গাঁয়ের গল্প বলে। কবে একবার এই গাঁয়ে একটা বন-চিতা পাহাড় থেকে নেমে খুব অত্যাচার করছিল, দু-তিনটে গরু-মহিষ দু-তিনদিনে সাবাড় হয়। শেষে কোন দূর দেশ থেকে একজন বন্দুকধারী এসে গাঁয়ে টং বেঁধে বসে গুলি করে মারে বাঘটাকে। কয়েকদিন কী যে ভয় ঘুরছিল গাঁয়ে। আবার কবে একবার নেদাম পাহাড় থেকে একটা লাল আলো এসে ওদের ধানখেতে ঘুরত রোজ রোজ। গাঁয়ের লোক কত মানত করেও তাড়াতে পারেনি লাল আলোটাকে। শেষে এক গুনিন এসে তাড়াতে পারল। আবার কবে একবার একটা সাহেব আর মেম এসে ক-দিন বাস করেছিল ওদের গাঁয়ে। তাদের হাতে-গলায় কেবল ক্যামেরা। একবার সাহেব, একবার মেম ফটফট ছবি তোলে। পার্বতীরও একটা ছবি তুলে নিয়ে গেছে তারা।

ওড়িশার এক গাঁয়ের মেয়ের কাছ থেকে এমন ছোটো ছোটো স্কেচ উঠে আসছিল কী অবলীলায়। শুনতে ভালোই লাগছিল এমন আঁধার হয়ে ওঠা বিকেলে। এও মনে উসকে উঠছিল, কেন যে এমন সুন্দর মেয়েটাকে ওর স্বামী নেয় না!

এক শরীর বৃষ্টি নিয়ে ব্রহ্মদা হঠাৎ এসে হাজির, হেসে বললেন, কী বিল্ব, পার্বতীর সঙ্গে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করবে নাকি!

আমিও হেসে উঠে পড়ি তৎক্ষণাৎ। পার্বতী ব্রহ্মদার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলে, খুব ভিজলে যা হোক। এরপর বিভুঁয়ে এসে জ্বর বাধাবে নাকি?

ভিজে চুপচুপ ব্রহ্মদা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল জ্বরটা। জ্বর হলে তুমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, সেই ভরসায় এত ভিজলাম, পার্বতী।

সেদিন সন্ধেয় ঘরে ফিরে জামাপ্যান্ট বদলে ব্রহ্মদা বসলেন কলকাতা থেকে আসা মোটা খাম খুলে তার পৃষ্ঠায় নিবিষ্ট হতে। ল্যাম্পোর আলোয় কেমন তেজালো দেখাচ্ছে ব্রহ্মদাকে।

তাঁর মুখের উপর লাল আলোর শিখা তাঁকে আরও তেজস্বী করে তুলছে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় কী এক দারুণ বরাভয়ের কথা লেখা আছে যা পড়তে গিয়ে বড়ো বড়ো শ্বাস নিচ্ছেন বিভুঁয়ে এসে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা মানুষটা। আমি উসখুস করছিলাম লেখাটা পড়তে। কিন্তু না, এখন নয়, যতক্ষণ না ব্রহ্মদার পড়া শেষ হয়, অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণ।

কিন্তু লেখাটা পড়া শেষ হলেও আমার কপালে পড়া জুটল না। ব্রহ্মদা অমনি লেখাটার পৃষ্ঠায় সম্পাদনা করতে বসলেন। রাত ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ। লেখাটির প্রতিটি লাইন পড়ছেন, আর যেখানে প্রয়োজন কলম ছোঁয়াচ্ছেন সম্পাদক। কখনও বানান ঠিক করছেন, কখনও প্যারাগ্রাফের শুরুতে নির্দেশ দিচ্ছেন কত পয়েন্টে ছাপা হবে। কখনও একটা শব্দ কেটে বসিয়ে দিচ্ছেন আরও লাগসই কোনও শব্দ।

এমন চলল অনেক রাত পর্যন্ত, যতক্ষণ না নেপাল এসে দিয়ে গেল শালপাতায় মোড়া রাতের খাবার।

১১

সকালে দাঁতন ছিল না বলে বাবলা বা নিম ডালের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি ডাল-ভাঙা গাঁয়ের পথে। ব্রাশ বা টুথপেস্ট আনতে পারিনি। ব্রহ্মদা বলেছিলেন, গাঁয়ে গিয়ে শহুরেপনা চলবে না। ওখানে যথেষ্ট নিমের ডাল।

তা হলে র-টিই বা কেন, এই গূঢ় ভাবনাটা আমি আর উসকিয়ে দিইনি ব্রহ্মদাকে। তা হলে হয়তো হাঁড়িয়া খেতে বলবে দু-বেলা।

প্রথম দিনেই যা নিমডাল স্টক করে নিয়েছিলাম, তাতেই এ ক-দিন। আজ আবার স্টক করতে পথে।

ব্রহ্মদা অবশ্য বললেন, বোধহয় আর এক-দু-দিন থাকতে দেবে এ-গাঁয়ে। স্টক করে লাভ নেই বিল্ব। পুলিশ যে-কোনও মুহূর্তে এসে যেতে পারে।

নতুন জায়গা, আমার কোনও ক্লান্তি লাগে না হাঁটায়। মাইলের পর মাইল এভাবেই হেঁটে যেতে পারি নিমডালের খোঁজে। পথের দু-পাশে সোঁদা গন্ধওলা বনতুলসী, নিশিন্দা ও বাজবরণের ঝোপ। বাবলার সন্ধান পাওয়া গেল না বহু চেষ্টায়।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর বুঝতে পারি বুড়াবালং নদীর দিকে এগোচ্ছি আমরা। দূরে ধানখেত দেখা যাচ্ছে। হলুদ রঙে জেল্লা দিচ্ছে মাঠ। বুড়াবালং-এর স্রোত তীব্র শব্দে আমাকে জানিয়ে দিল নদীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। চারপাশে ঘিরে রয়েছে সিমলিপাল রেঞ্জ। নীল পাহাড়ের শ্রেণি তার চূড়া তীক্ষ্ণ করে ডাকছে অনর্গল।

হঠাৎ কীসের শব্দ হতে দেখি দূরে হেঁটে আসছে এক ভরভরন্ত যুবতী, হাঁটছে তরতর করে। তার চলন ঠিক কাশফুলের হইহই করে নড়াচড়ার মতো। কাছে আসতেই অবাক হই, এ যে ঝুমুর। সেই আঁটো চেহারা, অথচ চোখ দুটো শান্ত সায়রের মতো।

আমাকে দেখে ও-ও অবাক, আ রে বাবু, তোমরা এখানে ?

— তুমি কোথায় চললে, ঝুমুর। সেই সন্ধের পর আজ তোমাকে এখানে কেমন বেমানান লাগছে।

খিলখিল করে হেসে উঠল বুড়াবালং-এর জল, সেই হাসি যা বুকে কাঁপন ধরায়। বলল, কেন গো?

— তোমাকে আধো-অন্ধকারে সেদিন খুব রহস্যময়ী লাগছিল। এখন আর তোমার চারপাশে সেই রহস্য নেই।

ব্রহ্মদা কবিতা করে বললেন, 'দিনের সব তারাই থাকে রাতের আলোর গভীরে।'

ঝুমুর কিছু না বুঝে বলল, তবু যদি আমার সব জানতে তোমরা!

ব্রহ্মদার দিকে তাকাই। আমাকে একটু একটু করে ঝুমুরের কথা শুনিয়েছেন সেদিন। সে-কথা চাপা দিতে বলি, এদিকে কোথায় যাচ্ছ, ঝুমুর?

— আমার ঘর তো কুসুমপুর। দূরে ও-ই পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয়।

— ইস্, অত দূর থেকে রোজ আঁধারপাছু আসতে হয়!

কথা বলতে বলতে তুমুল গতিতে হাঁটছে ঝুমুর। একেবারে খাঁটি অর্থে পাহাড়ি মেয়ে। কিন্তু ওর পোশাক-আশাক সভ্যতা-ছোঁয়া। সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ। পায়ে ফটর ফটর চটি। ওই দূর পাহাড়েও কী আশ্চর্য চারিয়ে গিয়েছে সভ্যতা! আসলে এমন একটা ব্যবসার সঙ্গে ঝুমুর ওতপ্রোত যে, সভ্যতা ওর রক্তের মধ্যে না সেঁধিয়ে যাবে কোথায়!

তবু অন্য কোনও মেয়ের চেয়ে ঝুমুর অন্যরকম। ঝুমুরের মধ্যে একটা তীব্র আকর্ষণ, কিন্তু পুরুষকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতাও তার মধ্যে প্রবল। একলা যুবতী আঁধারপাছে মহুয়ার ব্যবসা চালায়, রাতে একা ফিরে যায় এতদূর। কাল অনেক রাতে আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ঘরে ফিরতে পারেনি। এ-রকম মাঝেমধ্যে আঁধারপাছে থাকতে হয় তাকে। ব্রহ্মদা বলছিল তবু ওর নামে কোনও কেচ্ছা ছড়ায় না বাজারে ।

— আমাদের তোমাদের গাঁয়ে নিয়ে যাবে, ঝুমুর? ব্রহ্মদা যেন মজা করেই বললেন।

ও রাজি হয় তক্ষুনি। কেন নিয়ে যাব না! কিন্তু পাহাড়তলির আর পাঁচটা গাঁয়ের মতোই কুসুমপুর। পাহাড়ি ঝুপড়ি দেখতে কি তোমাদের ভালো লাগবে! খুব গরিব মানুষ সবাই ।

— গাঁয়ের বেশিরভাগ মানুষই তো গরিব, ঝুমুর। আঁধারপাছু গ্রামেও তো কত মানুষের দুঃখ।

ব্রহ্মদা তাকান আমার দিকে। যাবে নাকি, বিল্ব?

সকাল অনেকখানি রোদ মেখেছে সারা গায়ে। আমি তো যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি প্রথম দিন থেকে। পাহাড়ের ওপারের দেশ আমার চোখে এক রূপকথা। ঝুমুর সেই রূপকথার দেশের মেয়ে। তাকে একদিন দেখেই কী মোহময় লাগছিল সে-রাতে।

সেই রূপকথা কি একটু ভেঙেছে এখন, এই মুহূর্তে, তাকে ব্যাগ হাতে নিয়ে ফিরতে দেখে!

হাঁটছি পা চালিয়ে। সামনে বুড়াবালং-এর কজওয়ে। জল হাঁটু ছাড়িয়ে তীব্রস্রোত। ব্রহ্মদা হুড়হুড় করে নেমে যান জলের মধ্যে। লাফাতে লাফাতে কত দূর! আমি কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াই ।

ঝুমুর তাগিদ দেয়, থামলে কেন?

অসহায়ভাবে ওর দিকে তাকাতে ও হেসে ওঠে। অনেক দূরে পিছন ফিরে হাসছেন ব্রহ্মদা।

— রোজ দু-বার এই কজওয়ে পার হতে হয় আমাকে, এসো, আমার হাত ধরো।

বলতে বলতে আমার হাতে নরম হাতের চাপ পড়ে। এক ব্রহ্মদা ছাড়া চারদিকে কেউ কোথাও নেই। এর মধ্যে এক যুবতী মেয়ে অবলীলায় আমার হাত ধরে টানতে টানতে জলে নামাল।

— দাঁড়াও, প্যান্ট গুটিয়ে নিই।

ঝুমুরের এক হাতে একটা ব্যাগ, বেশ চেকনাই-দেয়া, ভিতরে কিছু তরিতরকারি থাকতে পারে। অন্য হাতে আমাকে সাপটে ধরে কজওয়ের ওপর দিয়ে চলেছে তরতর করে। রূপকথা এখন উল্টো খাতে বইছে। রাজকন্যা উদ্ধার করছে রাজপুত্রকে।

আমার পায়ের নীচে পর পর দুটো নুড়ি স্লিপ করে বেরিয়ে গেল। আর একটু হলেই ঝুমুরের শরীরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম আর কী! টাল সামলে নিয়ে বলি, কী ডেঞ্জারাস!

এক হাঁটু স্রোতে ঝুমুরের শাড়ি ভিজছে, তার মধ্যেই খিলখিল করে হেসে উঠল, তুমি তো পুরুষমানুষ, না কি রে বাবা!

উত্তরটা অন্য রকম দিতে পারলে ভালো হত। বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, ঝুমুর, তোমার এই স্পর্শটুকুর জন্যই হয়তো আমার এই মুহূর্তে অসহায় হয়ে ওঠা, বুড়াবালং-এর জলের মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু বলা হয় না। তা হলে ঝুমুর আমার হাত ছেড়ে দেবে নিশ্চিত। তাতে আমার পা স্লিপ করতে পারে। ঝুমুর ধরে থাকলে তা হবে না। হড়কালেও দু-জন সুদ্ধ ভেসে যাব বুড়াবালং-এর জলে। সে বরং ভালো।

একসময় সত্যিই বুড়াবালং পার হয়ে এলাম। রাজকন্যা জয় করার মতো বুড়াবালং জয় করা হল আমার। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত শাড়ি ভিজে সপসপ করছে ঝুমুরের। ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, চলো, এখনও ঢের পথ বাকি।

সামনেই পাহাড়। টিলার চেয়ে অনেকটা বড়ো সাইজের। তার গা বেয়ে পায়ে চলা সরু পথ। ডাকঘরের অমল, এ-রকমই পাহাড় পেরিয়ে রূপকথার মতো একটা দেশে যাওয়ার কথা কতদিন ভেবেছিল। তার যাওয়া হয়নি। তার অসমাপ্ত জার্নি এখন আমাদের পায়ে বর্তেছে। হাঁটছি সেই রূপকথার দেশের উদ্দেশে।

ব্রহ্মদা আমাদের অপেক্ষায় না থেকে জোরে জোরে পা চালিয়ে পেরোচ্ছে পাহাড়। আমি এখন ঝুমুরের পাশাপাশি কুসুমপুরের পথে। পাহাড়ি খাদ পাশে নিয়ে হাঁটতে কী চমৎকারই না লাগে। তেমন গভীর খাদ নয়, তবু সেদিকে পা বাড়ালেই মৃত্যু অপেক্ষা করছে হাঁ করে। এর মধ্যে দু-জন গাঁয়ের লোক পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, কৌতূহলীর দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। ঝুমুরকেও দেখল এক ঝলক। ভিনদেশি মানুষ নিয়ে কেন ফিরছে ঝুমুর!

— আচ্ছা ঝুমুর, তোমার সঙ্গে গেলে তোমার গাঁয়ের লোক কিছু ভাববে না?

ঝুমুরের ঠোঁটের গোড়ায় মুচকি হাসি। বলে, আমার গাঁয়ের লোক আমাকে চেনে। তা ছাড়া যখন দোকান চালিয়ে সংসার চালাতে হবে, তখন কেউ কিছু ভাবলে আর উপায় কী! যার স্বামী পঙ্গু, তাকে তো অনেক কিছু সইতেই হবে।

আমি তো জানি ঝুমুরকে বেশ লড়াই করতে হয়। লড়াকু মেয়েদের এত কিছু ভাবলে চলবে না।

— এই যে-রাতে ফিরতে পারো না, এর জন্যেও তো অনেক রকম অসুবিধে হয়?

— তা তো হয়ই। আমার মেয়ে তো সাত বছরের। সে-ই দেখভাল করে বাবাকে। সাত বছরেই সে সংসারের কত দায়িত্ব নেয়।

— ঠিকই, ঝঞ্ঝাটে পড়লে মানুষ তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠে।

পাহাড়ি পথ বেয়ে ক্রমশ উপরে উঠছি, অনেকটা পৃথিবী চলে আসে চোখের নাগালে। পাহাড়ের ঢালে দেখা যায় ছোট্ট একটি বসতি। দূর থেকে কেমন অদ্ভুত দেখায়। শান্ত, নিরিবিলি গ্রাম, সকালের রোদ পোহাচ্ছে।

কিছুটা ওঠার পর আবার ঢালু। নেমে চলেছি ঢাল বেয়ে। নিমেষে চোখের আড়ালে চলে যায় কুসুমপুর গ্রাম। তারপর আবার চড়াই। এখনই হাঁপ ধরে যাচ্ছে আমার। অথচ ঝুমুর কেমন সাবলীল। পালকের মতো ওর শরীর। উঠছে নামছে হাওয়ার ছন্দে। পাহাড়ি পথে হেঁটে হেঁটে এদের ফুসফুসে হাওয়া ধরে অপর্যাপ্ত। একটু পরেই ঝুমুর নিজেই বলল, এই যে এত রাতে ঘরে ফিরি। গাঁয়ের লোক প্রথম প্রথম কত রকম ইঙ্গিত করত। কত লোক পিছনে ধাওয়া করত। ক-বছর আগে একটা লোক আমার হাত ধরে টানাটানি করেছিল, আমি গরম সাঁড়াশি দিয়ে তার শরীর থেকে দশ টুকরো মাংস তুলে নিয়েছিলাম।

শুনে শিউরে উঠি। দেখে ঝুমুরকে খুবই শান্ত বলে মনে হয়। কিন্তু শান্ত মেয়েরা সময়ে দুর্দান্ত হয়ে ওঠে যখন নারীত্ব বিপন্ন হয়।

অনেকটা চড়াই হেঁটে এসে বেশ হাঁপাচ্ছিলাম। উঁচুতে এসে পৃথিবীটাকে আরও বড়ো দেখি। পিছন ফিরে দেখতে পাই ছোট্ট গ্রাম আঁধারপাহু। তার ও-পাশে বাংরিপোসি আরও ছোটো। তার পেট চিরে ন্যাশনাল হাইওয়ে শুয়ে আছে সুনসান। ছোটোখাটো কয়েকটা পাকা বাড়ি নজরে পড়ছে যা চলার পথে দেখিনি।

কুসুমপুরে পৌঁছতে তখনও দেরি, উঠে এসেছি পাহাড়ের মগডালে। অনুভব করি চারপাশে ফনফনে রোদ্দুর ফুঁড়ছে চামড়া। উপরে পৌঁছে গেলে পাহাড়কে আর পাহাড় মনে হয় না, সমতলভূমির মতো চেহারা, ঘাসে সবুজ। দু-একটা মাঝারি সাইজের গাছও। কীভাবে পাথরের বুকে এমন ঘাস বা গাছপালা জন্মায় তা এক বিস্ময়। পরক্ষণে মনে হয় বিস্ময় কীসের! চার তলা বাড়ির ছাদেও তো বিশাল অশথগাছ ডালপালা ছড়িয়ে সংসার পাতে।

গাছ আর ঘাসের সেই সংসার পার হয়ে নামতে থাকি ঢাল বেয়ে। পাহাড়ের উপরেও যেমন, ঢালেও প্রচুর, নানা রঙের ভেড়া, ছাগল আর গরুর পাল চরছে সবুজ ঘাসে মুখ ডুবিয়ে। সবাই নিশ্চিন্ত, কারও কোনও এমার্জেন্সি নেই। একটু পরেই কুসুমপুর।

পাহাড়ের ঢাল থেকেই শুরু হয়ে যায় ছোটো ছোটো ঘর। পাথরের টুকরো সাজিয়ে দেওয়াল, উপরে গাছের বাকল জাতীয় কোনও জিনিস দিয়ে দো-চালা ছাউনি। এখানেও যেখানে সবুজ ঘাস, সেখানে মাঠে চরছে ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ। এ যে দেখি একটা বিশাল পশুচারণক্ষেত্র! জীবনযাপনের উপায় হিসেবে এদের পশুপালনের জীবিকা। ঝুমুর জানাল, কুসুমপুর থেকে কত দুধ যায় বারিপদার নানা শহরে।

জায়গাটা বেশ চমৎকার, কিন্তু সে বোধহয় আমরা একদিন এসেছি বলে। এখানে জীবনযাপন ঢের ঢের কঠিন। কিংবা হয়তো তা নয়। এখানকার মানুষের কাছে এইটেই

স্বাভাবিক বেঁচে থাকা। বাংরিপোসি বা আঁধারপাহ্নের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, কিন্তু আমার কাছে কুসুমপুরের রোমাঞ্চ তার চেয়েও বেশি। ব্রহ্মদার কাছে এখানেই এক টুকরো পাহাড় কিনে আন্ডারগ্রাউন্ডের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিই।

ব্রহ্মদা হেসে বললেন, তাতেও রেহাই নেই, বিশ্ব। পাহাড় পেরিয়ে এমার্জেন্সির হাত এখানেও হানা দেবে নিশ্চিত।

ঝুমুরদের ঝুপড়ি এ-রকমই একটা পাহাড়ের ঢালে। বেশ বড়োসড়ো। ঝুপড়ি বললে হাসবে অন্য ঝুপড়িরা। তবে নিচু দেওয়াল। দেওয়াল সেই পাথরের চাঁইয়ের, ছাউনিতে গাছের বাকল।

ওদের ঝুপড়ির মধ্যে নিয়ে গেল আমাদের। ওদের বাড়িটাই বোধহয় এ-গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল। পরিসর অনেক বেশি। তবে বসার ঘর বলে কিছু থাকে না এদের। ঢুকেই শোওয়ার ঘর। ঝুমুরের স্বামী শুয়ে আছে একপাশের একটি চৌকিতে। আমাদের দেখে মুখে একরাশ সংশয় মেখে উঠে বসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কাঁপতে থাকে হাত-পা-শরীর। গোঁ গোঁ শব্দ বেরোয় মুখ দিয়ে। কিছু গাঁজলাও। চোখে ফুটে বেরোচ্ছে ক্রোধ ও অসহায়তার রসায়ন। বোধহয় আমরা কারা, সে-বিষয়ে তার সন্দেহ, ভয়। কিন্তু তার কিছু করণীয় নেই বলে পরক্ষণেই কেমন নির্জীব হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়।

ঝুমুরের স্বামীর হাত-পা সব অবশ। প্যারালিসিসের কেস। মুখ দিয়ে পরিষ্কার কথাও বলতে পারে না, জিব জড়িয়ে যায়। এ-হেন স্বামী ঝুমুরের—দেখে কষ্ট হয়। তাই ঝুমুরের চোখ দুটো এমন বিষণ্ণ সারাক্ষণ। তাদের শোওয়ার ঘরের ও-পাশে আরও একটা ঘর। সেখানে আছেন একজন বৃদ্ধা, দুটি কিশোরী, একটি বালক। সেটি ঝুমুরের তা না বলে দিলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিশোরী দুটি তার ভাসুরের। ওদের মা-বাবা কেউ নেই। বাপকে চিতায় খেয়েছে, সে মধুর খোঁজে পাহাড়ি জঙ্গলে গিয়েছিল। মা মরেছে অসুখে। এই সব গাঁ-ঘরে জন্মায় প্রচুর, মরেও তেমন। ডাক্তার বলতে বাংরিপোসিতে। এ-দিকে দু-তিনজন কোয়াক।

তবু এত বড়ো পশুচারণক্ষেত্র, এত মহিষ, ভেড়া, ছাগল, তবু এত গরিব কেন ওরা!

আমাদের চা করে দিয়ে ঝুমুর শোনাল সেই রূপকথার দেশের গল্প। এই যে এত এত পশু, তার একটাও এই গ্রামবাসীদের নয়। বাংরিপোসি, বিশয়ী, আরও আরও জায়গা থেকে ওজনদার মানুষেরা এখানে এসে পালতে দিয়ে যায় গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া। কুসুমপুরের মানুষ ওদের কেয়ারটেকার মাত্র। এর বিনিময়ে ওরা মালিকদের কাছ থেকে মাসে মাসে টাকা পায়। প্রতিদিন এই গাঁও থেকে টিন টিন দুধ চলে যায় শহরে। মাংস বা ভেড়ার লোমের উৎসও এই গাঁ।

শুনতে শুনতে রূপকথা ভাঙতে থাকে আমার ভিতর। যা কিছু দূরের, তা-ই সুন্দর। দূরের ঘাস সব সময়েই সবুজ। পাহাড়তলির গাঁয়ের দৃশ্য দূর থেকে দেখে চমৎকার লাগে আমাদের, কিন্তু তার রঙের মধ্যে মেশানো থাকে এক্সটরশন। সত্যিই গরিব এখানকার লোকজন। অথচ কিছু মূলধন হলেই এরা স্বাবলম্বী হতে পারত, তার পরিবর্তে এরা মহাজনের ভার বয়ে বেড়াচ্ছে মাত্র।

ঝুমুর এই গাঁয়ে লড়াই করে এত বড়ো সংসার নিজের আয়ে চালায়। অন্য কোনও নারী হলে সব ভেসে যেত বুড়াবালং-এর জলে। ভাসুরের কিশোরী মেয়ে দুটি ওকে সাহায্য করে।

বিকেলের দিকে ওরা পাহাড়ের খাদের দিকে চলে যায়, মহুয়াফুল পেড়ে আনে। কিন্তু শুধু মহুয়াফুলেই তো হয় না। তার রস ছেঁকে সারা দুপুর ধরে এই বৃদ্ধা, যে কিনা ওর শাশুড়ি, তাদের সহযোগিতায় এক পাতন প্রক্রিয়া চালায়। দিশি পদ্ধতিতে তৈরি করে বলে ওদের মহুয়ার মদে এত স্বাদ। শহরে তৈরি হলে এর সঙ্গে ভেজাল মেশানো হত।

ওদের ঘরের পাশেই একটা বড়ো কেঁদগাছ, ছায়ায় সারাক্ষণ ভরে থাকে ওদের উঠোন। তারই নীচে উঁচু পাথরের চাঙ দু-তিনটে, টুলের মতো দিব্যি বসা যায়। কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলাম কেঁদগাছের ঠাণ্ডা ছায়ায়। পাহাড়ের উপরে বলে ঠাণ্ডাটা বেশি। খুব যত্ন করল ঝুমুর। বারবার বলছিল দুপুরে খেয়ে যেতে। আমরা রাজি না হওয়ায় ক-টা হাতে গড়া রুটি, মেটে-আলুর তরকারি, খেসারির ডাল খাইয়ে দিল। শেষে ছাগলের টাটকা গরম দুধ। আপাতত এই দিয়ে লাঞ্চপর্ব শেষ।

কিশোরী মেয়ে দুটো কিন্তু ঘেঁষলই না আমাদের কাছে। সভ্যতাকে ওদের বড়ো ভয়। দূর থেকে দেখতে থাকে দু-চোখে লজ্জা আর কৌতূহল মেশামিশি করে। এদের কাছে শহর বলতে বাংরিপোসি। টাউন বলতে বিশয়ী কিংবা বারিপদা। তবুও ভিনদেশি পুরুষের প্রতি একটা স্বাভাবিক লজ্জাবোধ এক চমৎকার লাবণ্য এনেছে ওদের চোখে-মুখে।

ঝুমুরের স্বামীকে দেখে কষ্টই হচ্ছিল, যদিও আমাদের দিকে তাকাচ্ছে বেশ কঠিন চোখে। অসহায় স্বামী তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনও পুরুষ দেখলে আগুন খাওয়ার মতো অভিব্যক্তি করবেই। হয়তো ভাবছে, ঝুমুরের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক আছে কি না!

ব্রহ্মদা বলল, এখানে পাহাড়ের উপর জমি কিনতে পাওয়া যায়, ঝুমুর?

ঝুমুর অবাক হয়, ও মা, কেন?

— তোমাদের গাঁয়ের ধারে একখণ্ড জমি কিনে ঘর বাঁধবার ইচ্ছে আছে। এমন চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বহুদিন দেখিনি।

ঝুমুর হাসে, বাবু, আপনারা একদিনের জন্য আসেন তো। তাই ভালো লাগে। যারা পাহাড়ের উপরে রোজদিন বসবাস করে, তারা বেঁচে থাকে খুব কষ্ট করে। আমার তো কতদিনের ইচ্ছে বাংরিপোসি বা আঁধারপাহ্নে জমি কিনে ঘর করি। কিন্তু অত টাকা কোথায়?

কিন্তু ওখানে মহুয়া গাছ পাওয়া যাবে কি?

ঝুমুর মাথা নাড়ে, না।

মহুয়া না পেলে তার বেঁচে থাকাই তো অনিশ্চিত।

বিকেল হতেই আবার ঝুমুরের সঙ্গে কুসুমপুরের পাহাড় থেকে নেমে আসি। অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল পাহাড়ের বাসিন্দাদের জীবনযাপন দেখার। দেখা হল, কিন্তু রূপকথাটা ততক্ষণে ভেঙে চুরমার।

আগুনের মধ্যে বাস করেও কীভাবে ঝুমুর বরফ-ঠাণ্ডা থাকে তা বুঝতে আর অসুবিধে হয় না।

১২

আঁধারপাহ্নে ফিরে এসে দেখি গোটা গাঁ লন্ডভন্ড। পুলিশ এসেছিল কী কারণে যেন। বাড়ি বাড়ি টহল দিয়ে কী যেন খুঁজেছে অতর্কিতে। আমাদের ডেরাও এসে দেখে গেছে দরজা

পেরিয়ে। ব্রহ্মদা কোনওদিনই দরজা বন্ধ করে যায় না। আজও খোলা ছিল দরজা। তার মধ্যে ঢুকে ব্রহ্মদার আঁকা ছবিটা দেখেছে নিরিখ করে। আধখানা আঁকা ছবি দেখে কী বুঝেছে শিল্পরসিক পুলিশ, কে জানে!

ব্রহ্মদা যেন কিছুই হয়নি এমন প্রবল নিরাসক্ত চোখে তাকালেন পৃথ্বীরাজের মায়ের দিকে, যিনি এতক্ষণ সাতকাহন করে শোনাচ্ছিলেন পুলিশের হানা দেওয়ার রোমহর্ষক কাহিনী। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কি রাতের দিকে আবার আসবে? তা হলে ওদের জন্য কিছু মিষ্টি এনে রাখি।

কথাটা ইয়ার্কির ছলেই বলেছেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজের মা খুবই সিরিয়াস মুখ করে বলল, মনে হয় আসবে না। আমি তো বলেছি, বাবুরা কোথায় না কোথায় ঘুরতে বেরিয়েছে, ফিরতে কত রাত হয় কে জানে! তোমরা কাল সকালে এসো।

—বাহ্, পৃথ্বীরাজের মা, তোমার হেডে বুদ্ধি ভরপুর। এখন তা হলে ভালো করে এক কাপ র-টি খাই, কী বলো? তুমিও এক কাপ খাবে নাকি, পৃথ্বীরাজের মা?

পৃথ্বীরাজের মা ব্যস্ত হয়ে বলল, না না। পুলিশ দেখে আমার বলে কী ভয়! এখনও বুকের ভিতর কাঁপছে।

পৃথ্বীরাজের মা চলে গেলে ব্রহ্মদা এবার কাজের কথা পাড়লেন। বিশ্ব, কী বুঝলে?

চটপট বলে ফেলি, কাল ভোর হওয়ার আগেই এখানকার পাততাড়ি গোটাতে হবে।

— ঠিক। কলকাতার বাস ধরতে হবে, কিন্তু বাংরিপোসিতে ওটা চলবে না। হেঁটে কলকাতার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাংরিপোসির পরের স্টপেজে ধরতে হবে বাস।

— সে তো অনেক পথ!

— কী আর করা! ব্রহ্মদা সেই হাসিটা আর একবার হাসলেন যা বিলিয়ে থাকেন মুড়ি-মুড়কির মতো।

কিন্তু সন্ধের দিকে আরও যে-খবরটি আমাদের বিস্মিত করল তা ঝুমুরের পানশালায় পুলিশি অভিযানের কথা। পানশালাটা বেআইনি এই অপরাধে বিপুল ভাঙচুর করেছে ঝুমুরের যাবতীয় অস্তিত্ব। সংবাদটিতে আমরাই ভাঙচুর হয়ে যাই কিছুক্ষণ। কে জানে, ঝুমুরের পানশালায় আমরা মহুয়া আনতে যাই তা পুলিশ জেনে ফেলার ফলেই হয়তো সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে তার উপর। হতে পারে, না-ও পারে।

কিছুটা সময় ঝুমুরের পানশালার উদ্দেশে নিবেদন করে তারপর ব্রহ্মদা বলে উঠলেন, নাও বিশ্ব, গুছিয়ে ফ্যালো তোমার ঘর-গেরস্থালি।

ঢাউস ব্যাগটা সঙ্গে আনলেও প্রয়োজন হয়নি তেমন। কিটব্যাগটা ভরে ফেলি পলক না ফেলতে। ব্রহ্মদার সংসার তো নেই বললেই হয়। ঘুম সে-রাতে হওয়ার কথা নয়। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল পুলিশ গভীর রাতে রেইড করবে আমাদের আস্তানা। ব্রহ্মদার সঙ্গে আমার কপালেও অশেষ দুঃখ।

কিন্তু কী কারণে যেন চোখ ভেঙে এল গভীর, গভীরতর ঘুম। সারাদিনে কম হাঁটাহাঁটি তো হয়নি!

সে-রাতেই প্রবল গোলমালে চোখ থেকে ঘুম-পরী হাওয়া। লাফিয়ে উঠে বসে বলি, ব্রহ্মদা, নিশ্চয় পুলিশ।

ব্রহ্মদাও ধড়মড় করে জেগে যায়, বললেন, পুলিশ!

ভালো করে কান পাতি বাইরের কোলাহলে। ঠিক রাত নেই তখন। ভোর হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত। কুয়াশার মতো সাদা রেণু ঢুকে পড়ছে আঁধার ফাটিয়ে। ঢোল-কাঁসির শব্দে জেগে উঠছে গোটা পাহাড়তলি। সারা গাঁয়ে বেশ চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি দু-জনেই। দাওয়ায় বেরিয়ে দেখি ভোরের সামান্য আলোর মধ্যে ছোটাছুটি করছে সবাই। কারও কারও হাতে মশালের আলো।

কী ব্যাপার জানতে বেরিয়ে এলে, দেখা হল নেপালের সঙ্গে। তার মুখ উত্তেজনায় থরথর। জোরে চেঁচিয়ে সবাইকে যেতে বলছে ধানখেতে।

যে-সব ধানখেতে এখনও ফসল আছে সেখানে বুনো হাতিরা নেমেছে দল বেঁধে। সব লন্ডভন্ড করে ফেলছে। যা খাচ্ছে, নষ্ট করছে তার বহুগুণ। এই মুহূর্তে ওদের না তাড়াতে পারলে সমূহ ক্ষতি। ফসল পেলে ভালো, না-পেলে খুব ভয়ংকর। এরপর গাঁয়ের মধ্যেও ঢুকে পড়বে তছনছ করতে।

দু-জনেই পায়ে পায়ে গাঁ পেরিয়ে মাঠের দিকে যাই। সে-এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রায় গোটা পঁচিশ-তিরিশ হাতি একসঙ্গে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। সমস্ত মাঠ ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। প্রায় কোনও খেতেই ধান নেই এখন। যে দু-একটা প্লটে আছে উপড়াচ্ছে শুঁড় দিয়ে। যাকে বলে পাকা ধানে মই দেওয়া। চারপাশ থেকে গাঁয়ের মানুষ ঢোল-কাঁসির শব্দে তাড়াবার চেষ্টা করছে ওদের, যাতে ওরা আবার পাহাড়ের দিকে ফিরে যায়। লাল মশালের আলো নিয়ে তাড়া করবার চেষ্টা করছে কেউ কেউ। ভয়ও পাচ্ছে বেশি এগোতে। বুনো হাতি রেগে তাড়া করলে ছুটে পার পাওয়া যাবে না।

এতসব শব্দ, আগুন দেখেও বুনো হাতির দল কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন। নির্বিবাদে ধানের শিষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে পুরে দিচ্ছে মুখের ভিতর। পায়ের চাপে দলাই-মলাই হচ্ছে পুরন্ত ধানখেত। গাঁ থেকে শুনতে পাচ্ছি কান্নার রোল। ধান নষ্ট হওয়ার কান্নার সঙ্গে মিলমিশ হচ্ছে গাঁয়ে ঢোকার আতঙ্কের কান্না। কিন্তু এ-মুহূর্তে মশাল নিয়ে তাড়া করা ছাড়া কারোরই কিছু করার নেই। সমস্ত গাঁয়ের মানুষের ভাগ্য এখন হাতিদের মরজির উপর নির্ভরশীল।

প্রায় ঘন্টাখানেকের চেষ্টায়, মশালের আলোর ঘূর্ণনে, ঢোল ও কাঁসির শব্দে বুনো হাতির দলকে তাড়ানো গেল মাঠ থেকে। তখন গোটা গ্রাম এসে হাজির ধানখেতের চারপাশে। অনেকেরই চোখে-মুখে ত্রাস আর উল্লাসে মাখামাখি। পাড়ার মেয়ে বউরা চোখ মুছছে এখনও।

যে-রকম দল বেঁধে হাতিরা নেমে এসেছিল পাহাড় থেকে নীচে, গোলমাল শুনে তেমনই সার বেঁধে পাহাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল হেলেদুলে। সমস্ত ব্যাপারটাই তখন গাঁ-বাসীর কাছে দুঃস্বপ্ন।

ততক্ষণে ফরসা হয়ে এসেছে পাহাড়তলির আকাশ। মেয়ে বউরা ঘরে ফিরে গেল যে-যার। পুরুষরা দল বেঁধে মাঠে নামল কার ধানের কতটা ক্ষতি হয়েছে তার জরিপ করতে।

ব্রহ্মদা আর আমি ঘরে ফিরে এলাম একবুক ভাবনা নিয়ে। শরীরে সামান্য অবসাদ, তবু এখনই বেরিয়ে পড়ার প্ল্যাটিনাম সময়।

গাঁয়ের সবাই যখন হাতির ভাবনা নিয়ে জাবর কাটছে এক এক দলে ভাগ হয়ে গিয়ে, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে আমি আর ব্রহ্মদা হাঁটা শুরু করি ভোরের কুয়াশা সরিয়ে। মাত্র কয়েকদিন

এই নতুন গাঁয়ে বাসা বেঁধে কী আশ্চর্য মমতা মাখিয়ে ফেলেছি মনের কোনও গহন কোণে। লাল কাঁকরের পথ পেরিয়ে যাওয়ার সময় একবারের জন্য পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি। কিছু অত্যাশ্চর্য মুহূর্ত আমাকে উপহার দিয়েছে এই পাহাড়তলির গাঁ। কিছু মুখ সঙ্গী হয়েছে আমার স্মৃতিতে। কিছু মানুষ চলতে শুরু করেছে আমার পাশে পাশে।

এই তো সেদিন এসে বাস থেকে নেমেছিলাম বাংরিপোসিতে। আবিষ্কার করতে এসেছিলাম পাহাড়তলির রূপকথা। এই ক-দিনে কম রূপকথা তো জমা হয়নি! কম রূপকথা ভাঙেওনি। কয়েকদিন আগে যাদের চিনতামও না, তারা যেন এখন আমার পরমাত্মীয়।

তাদের ছেড়ে যেতে কষ্টই হচ্ছিল। তবু পৃথিবীটা তো এ-রকমই।

অনেক অচেনা পথ পার হয়ে তবে হাইওয়ের সন্ধান মেলে। ব্রহ্মদা বাসের সময়-সারণী জানেন। সেই মতো অপেক্ষা করতে থাকি দূরপাল্লার বাসের জন্য। ব্রহ্মদা গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছেন। জিজ্ঞাসা করতেই শুনি, কী জানি, পাঁড়েজি আমার চিঠিগুলোর কী গতি করতে পারবেন!

আমি ব্রহ্মদার মুখের দিকে চোখ রাখি। আর কি কখনও আঁধারপাছে আসা হবে! হয়তো হবে, হয়তো হবে না! ব্রহ্মদার কাজ এখনও শেষ হয়নি। তার জন্য আরও বহুবার আসবেন এ-রকমই এক ভোরে দূরপাল্লার বাসে উঠে।

বাস আসতে দেরিই করল আজ। ভারী ব্যাগটা সামলে কিটব্যাগ হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ি ভিতরে। কপালগুণে দুটো সিটও পাওয়া গেল পাশাপাশি। বেশ জুত করে বসতেই ব্রহ্মদার দিকে হাত বাড়াই। মোটা খামটা পাঁড়েজি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে কী আছে তা দেখা ও পড়ার জন্য মুখিয়ে আছি। কিন্তু ফুরসত হচ্ছিল না। ক-দিন কী এক ঘোরের মধ্যে কেটে গেল! এক অচিন দেশে বেড়াতে এসে যে আশ্চর্য অভিজ্ঞতায় আপ্লুত হলাম তা বর্ণনীয় নয়। অনুভব করার। বোধের জগতে তা দেওয়ার।

ব্রহ্মদা হেসে তাঁর প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে বার করে দিলেন খামটা। বেশ ওজনদার খাম। খুলে চোখ পাততেই বুঝি লেখাটা আরও ওজনদার। কাগজের তাড়াটায় বেশ অতি-ব্যবহারের চিহ্ন। পাশ থেকে ব্রহ্মদা বললেন, জেলে বসে লেখা তো। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে সেলের মধ্যে লিখতে হয়েছে নিরিবিলিতে, যাতে পাশের লোকও না জানতে পারে লেখার বিষয়। নিতাইকিশোর ঘোষ একজন সাংবাদিক-কাম-লেখক। তিনি হয়তো গল্প লিখছেন, কিংবা ডায়েরি, এই ভেবে তাঁকে রেহাই দিয়েছে সহ-কয়েদিরা। লেখা শেষ হলে সেটি অতি সুকৌশলে জেলের গরাদ পার করতে হয়েছে নিতাইদাকে। ধরা পড়লেই লেখা বাজেয়াপ্ত। লেখককেও মুখোমুখি হতে হবে আরও কঠিন শাস্তির। অতএব বুঝতেই পারছ লেখাটা প্রায় অমূল্য।

সেই মূল্যবান লেখাটার পৃষ্ঠায় পলকে নিবিষ্ট করি নিজেকে।

নিতাইকিশোর ঘোষ লিখছেন:

> পাঁচ মাস আগে অক্টোবরের এক ভোরে পুলিশ হঠাৎই আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে। আমাকে নিয়ে রাখে কারাগারের দমবন্ধ পরিবেশে। কোনও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখানো হয়নি আমাকে। বলা হয়েছে মিসা নামে এক কুখ্যাত

> আইনে সাজা হয়েছে আমার। যে-আইনে বলার প্রয়োজন নেই কী আমার অপরাধ। শুধু এ-টুকুই জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে আটক করা হয়েছে আমাকে। বিনা বিচারে যতদিন খুশি জেলের মধ্যে রাখা যাবে আমাকে। আমি কোনও বিচার চাইতে পারব না।
>
> স্বাধীন ভারতে এ-রকম সাজা হওয়ার কথা আমরা কখনও ভাবিনি। সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে আমার, বা আপনার, বা কোটি কোটি দেশবাসীর মৌলিক অধিকারের গল্প। সেই গল্প বুকের মধ্যে ভরে ঘুমোতে যেতাম আমরা। আর ভরসা পেতাম বেঁচে থাকার। হঠাৎই রাষ্ট্রপতি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেড়ে নিয়েছেন সেই গল্পটা। আমাদের প্রত্যেকের বুকটাই এখন ধু ধু ফাঁকা। প্রতিদিনই চলছে মিসা নামের অপশাসনটির প্রয়োগ।
>
> আমার সঙ্গে যারা জেলবন্দি তাদের কেউই জানে না, তারা স্বাধীন ভারতে কী অপরাধে বন্দি হয়ে আছে দীর্ঘকাল। কবে মুক্তি পাবে তাও জানে না। সরকারের কাছে আপনাদের কারও মূল্যই একটা ছেঁড়া জুতোর চাইতে বেশি নয়। যখন খুশি জেলে ঢুকিয়ে বলা হবে আপনি বন্দি। আপনি কোনও আদালতে এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে বিচার চাইতে পারবেন না।
>
> জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে, জনসাধারণের মৌলিক অধিকার হরণ করে, প্রধানমন্ত্রী কোন লক্ষ্যে পৌঁছোতে চাইছেন তা আমি অন্তত বুঝতে পারছি না। তবে তিনি যে এক ভয়ংকর আগুন নিয়ে খেলছেন সে-বিষয়ে জনগণ অবহিত। বেশিরভাগ মানুষই এই অপশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। ভাবছেন, কিছু বললেই তাঁকে মিসায় ঢুকিয়ে দেওয়া হবে জেলে। একজন বিশিষ্ট কবি রেডিয়োতে কবিতা পড়তে গেলে তাঁকে বলা হয়, এই কবিতাটা আপনি পড়তে পারবেন না। তিনি প্রতিবাদ না করে, সেটি না পড়ে অন্য একটি নিরীহ কবিতা পড়ে রেহাই পেয়েছেন। অনেক বুদ্ধিজীবীই এই কৌশল নিয়েছেন যাতে জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে নিরাপদে থাকা যায়। কিন্তু এভাবে তো দিনের পর দিন চলতে পারে না।
>
> আসুন, আপনি জেগে উঠুন। প্রতিবাদ জানান মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজে রাষ্ট্রের এই অগ্রণী ভূমিকার। প্রতিবাদ করে বলুন, এই ভারতে আমরা বেঁচে থাকতে চাই না...

আমি একমনে পড়ে যেতে থাকি বিশাল প্রতিবাদপত্রের এক-একটি পৃষ্ঠা, আর শরীরের ভিতর কী এক অস্বস্তি কাজ করতে থাকে সারাটা পথ। ব্রহ্মদা, যাঁর সঙ্গে কথা বললেই মনে হয় পৃথিবীকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন, তিনিও কেমন বিষণ্ণ। হয়তো ফেলে আসা আঁধারপাছের কথা মনে করে। বিশেষ করে ঝুমুরের পানশালাটি পুলিশ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এই সংবাদে আমরা স্তম্ভিত। পাঁড়েজিও ভয় পেয়ে গিয়েছেন পুলিশি আনাগোনায়। হয়তো, ব্রহ্মদা দিয়েছেন এই অপরাধে, নেপালের হোটেলের সাইনবোর্ডটিও বাজেয়াপ্ত করে নেবে পুলিশ।

কিংবা ব্রহ্মদার এই থম হয়ে থাকা হয়তো প্রকাশিতব্য পত্রিকার কারণেও। পরের সংখ্যা 'শহর' কোথায় ছাপা হবে, কীভাবে ছাপা হবে, তা ভেবে চলেছেন গভীর মনোনিবেশে।

সেদিন বলছিলেন, কোনও প্রেসই রাজি হচ্ছে না ছাপতে। প্রেসের নাম ছাপা হবে না তা বলা সত্ত্বেও বলছে, 'না'। টাইপ ফেস দেখে চিনে ফেলবে কোন প্রেসে ছাপা।

প্লাস্টিকের ব্যাগে একগুচ্ছ পাণ্ডুলিপি নিয়ে এমনই ফিরতি যাত্রা ব্রহ্মদার। শুধু যে প্রেসের সমস্যা তাই নয়। প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ক-জন লেখকই বা লিখতে রাজি হলেন! অধিকাংশ চিঠিরই কোনও উত্তর আসেনি। কেউ কেউ ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়েছেন। জেলে ঢুকলে মাথার উপর পাঁচশো পাওয়ারের আলো জ্বলতে থাকবে সারাক্ষণ এই চিত্রকল্পটাই অনেককে নীরব থাকতে বাধ্য করেছে।

দূরপাল্লার বাসটা তখন ক্রমশ কলকাতার দিকে এগোচ্ছে। ব্রহ্মদা নিশ্চয়ই চোখ বুঁজে ছক কাটছেন এবার কোন রূপকথার ভিতর অন্তরিন হয়ে শেষ করবেন বাকি কাজ।

সুব্রত সেনগুপ্ত

স্টেশনে দুটো প্ল্যাটফর্ম। এক নম্বর আর দু-নম্বর। একটা আপ ট্রেনের, অন্যটায় আসে ডাউন ট্রেন। শ্রীকান্ত এক নম্বরের একটা বেঞ্চির এক কোণে বসে আছে। বসে আছে অকারণে। তার কোথাও পৌঁছোনোর তাগিদ নেই। ইচ্ছে বা উদ্দেশ্যও নেই, কারণ আজ সে হঠাৎ ছুটি পেয়েছে। কিছু করার নেই। ছুটি নিয়ে কী করতে হয়, কী করা যায় সে জানে না। না জেনে, আর কী করা যায় বুঝতে না পেরে সে এখানে এই বেঞ্চির এই কোণায় বসে আছে। বেঞ্চির অন্যপ্রান্তে বসে আছেন এক মহিলা। চোখাচোখির ভয়ে সে একবারও তাকায়নি, ফলে মহিলার মুখটা দেখা হয়নি। সে এখানে অনেকক্ষণ বসে আছে। মহিলা বসে আছেন সে আসার আগে থেকে। এর মধ্যে অনেক ট্রেন এসেছে, চলেও গেছে। তার মানে এই মহিলাও এখানে এসে বসে আছেন অকারণে। তার মতোই কোথাও পৌঁছোনোর উদ্দেশ্য ছাড়াই। তারও যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু আশেপাশের আরো অনেক মানুষ-মানুষী ট্রেন আসার ঘোষণা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ট্রেনে আসতে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। যারা ট্রেন থেকে নামতে চায় তাদের ব্যস্ততা, যারা উঠতে চায় তাদের ব্যস্ততা। ট্রেন এলেই গোটা প্ল্যাটফর্ম ব্যস্ত হয়ে উঠছে। ছুটির দিনেও দক্ষিণের দিকে গিয়েছিল কিছু মানুষ, তারা ফিরে আসছে। এখান থেকে যায়নি এমন বহু মানুষও দক্ষিণ থেকে আসছে। তারা এখানে পৌঁছোতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই মহিলারও পৌঁছোনোর কোনো জায়গা নেই। এক মহিলার এভাবে প্ল্যাটফর্মে এসে বসা, বসে থাকার অর্থ কী? কে জানে? তা ছাড়া ওঁকে নিয়ে শ্রীকান্তর ভাবারই বা দরকার কী? এখানে প্ল্যাটফর্মে এত চরিত্র, এত লোকের চলাফেরা, ভঙ্গি, ছোটো ছোটো ঘটনা বা অণু ঘটনা সবই দেখার মতো। এই তো এই কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে, এক নারী ও পুরুষ। তাদের সঙ্গে এক শিশু। শিশু তার মায়ের একটা হাত আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাবা তাকে কাছে ডাকছে, তাকে স্পর্শ করতে চাইছে, আদর করতে চাইছে। দু-হাত বাড়িয়ে ডাকছে। কিন্তু শিশু যাবে না। তার মা তাকে বাবার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বলছে, যা না, বাবা ডাকছে। বাবা চকলেট দেবে।

তবু যাচ্ছে না শিশু। ঠেলে দিলে আবার লাফিয়ে এসে মায়ের হাত আরো শক্ত করে ধরছে। মায়ের কথায় বিরক্তি — এরকম করিস কেন, বাবা ডাকছে। — বলছে কিন্তু মুখে তার বিজয়িনীর হাসি, তৃপ্তি। ছেলে মা-কে ছাড়বে না কিছুতেই। — এ-সবই দেখছে শ্রীকান্ত।

রেল লাইনের ওপারে ডাউন ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরত্বের জন্য সংকোচ কম। ওকে খুঁটিয়ে দেখা যায়। এক পুরুষ দেখছে টের পেয়ে সে-মেয়েটি যেন দেখা দিতে আরো এগিয়ে আসে। ওর পরনে সালোয়ার কামিজ। হালকা নীল রঙের। মুখশ্রী মন্দ না। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। মেয়েটি বেশ লম্বা। দীর্ঘ দুই পায়ের ওপর ও দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ওপর স্পষ্ট দুই স্তন। সুগঠিত, ওড়নার আবরণহীন। এও বিজয়িনী। ও জানে, পুরুষরা ওকে দেখতে বাধ্য।... হঠাৎ মেয়েটিকে আড়াল করে ডাউন ট্রেন এসে দাঁড়ায়। নির্দিষ্ট সময় থেমে ট্রেন চলে যায়। ট্রেন চলে গেলে দেখা যায়, মেয়েটি আর নেই। ভারতীয় রেল

ওকে নিয়ে চলে গেছে। যেন খাঁ-খাঁ করছে ওদিকের প্ল্যাটফর্ম। ওরকম স্তনের ভার নিয়ে মেয়েটি ট্রেনে উঠল... ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে না তো... কে বলতে পারে? কে পারে? শ্রীকান্ত পারে না। ওদিকে কে একজন কখন এসে বসে পড়েছে বেঞ্চির কোণায় বসে থাকা মহিলা আর তার মাঝখানে। অন্য মেয়েটির দিক এতক্ষণ চোখ ও মন থাকায় সে আগে খেয়াল করেনি।

হঠাৎ কান্নার মতো শব্দ কানে এল শ্রীকান্তর। নতুন আসা লোকটি আর আগের মহিলা কথা বলছে। বলছে নিচু স্বরে। সব শব্দ ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। তার মধ্যে মহিলার কথাগুলো শোনাচ্ছে চাপা কান্নার মতো। শ্রীকান্তর ওদের কথা শোনার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মহিলার গলায়, বুকে এত কান্না কেন? চেষ্টা ছাড়াই শ্রীকান্তর কান ওদিকে চলে যাচ্ছে।

বোঝা যাচ্ছে, এরা আগে থেকে পরিচিত। মহিলা এতক্ষণ এই লোকটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রলোক এখানে আচমকা এসে পড়েছেন, হঠাৎ দেখা হয়েছে ওদের— তা মনে হয় না। ওদের মধ্যে কী সম্পর্ক — শ্রীকান্তর জানা নেই। তবে ভদ্রলোক হঠাৎ এসে থাকলে ভদ্রমহিলা এখানে এতক্ষণ ধরে বসে আছেন কেন, কার জন্য বসে আছেন? আগে থেকে কথা না থাকলে ভদ্রলোকই বা এসেই মহিলার পাশে বসে পড়বেন কেন? ওদের সম্পর্ক যাই হোক, মনে হয় খুব দূরের নয়। তা না হলে মহিলা ওভাবে প্রায় কেঁদে কেঁদে কথা বলবেন কেন?

মহিলা বলছেন— কীভাবে চলছে, কীভাবে চালাচ্ছি... কী যে অবস্থা...

ভদ্রলোক কিছু একটা বললেন, বেশি শব্দ ব্যয় না করে। কিন্তু কী বললেন তা বোঝা গেল না। মহিলা আবার বললেন— সেদিন বৃষ্টি হল। তার মধ্যে... ঘরে থেকেও একেবারে ভিজে গেছি।

শ্রীকান্তর মধ্যে, অচেনা এই মহিলা সম্পর্কে কেমন একটা সহানুভূতি তৈরি হচ্ছে আর কেন কে জানে, ভদ্রলোক সম্পর্কে একটা রাগ। তার কেমন মনে হচ্ছে, মহিলা যদি সত্যিই দুর্দশায় পড়ে থাকেন, তার জন্য দায়ী এই লোকটি। দুর্দশায় পড়ার জন্য দায়ী না হলেও মহিলাকে উদ্ধার করার উপায় ও ক্ষমতা হয়তো এই লোকটিরই আছে। কিন্তু সে-ক্ষমতা সে প্রয়োগ করছে না। শ্রীকান্ত মনে মনে হাসার চেষ্টা করে। এভাবে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো মানে হয় না। সে এই দু-জনের সম্পর্কে তো কিছু জানে না। কিছুই জানে না। তবে এ-কথা ঠিক, মহিলা কাঁদছেন। ওই বয়েসের এক মহিলা কেন কাঁদবেন, খুব কষ্ট না হলে? খুব অসহায় বোধ না করলে? আর এই লোকটির কাছেই বা কষ্টের কথা বলছেন কেন, বললে কোনো উপায় হতে পারে — এ-কথা না ভাবলে?... আচ্ছা, ওরা দেখা করার জন্য এই প্ল্যাটফর্মই বা বেছে নিয়েছে কেন? লোকটা কি এখানে ট্রেনে এসেছে? — ওর আসাটা তো দেখা হয়নি। ও কীভাবে ঠিক কখন এসেছে, শ্রীকান্ত জানে না। হতে পারে, মহিলা এখানে কাছেই কোথাও থাকেন, আর লোকটি অন্য কোনো স্টেশন থেকে এসেছে।... হতে পারে, না হতেও পারে। এরা কে কোথায় থাকে, কীভাবে এখানে এসেছে সেটা বড়ো কথা নয়। এই স্ত্রীলোকটি ক্লিষ্ট, যে-কোনো কারণেই হোক অসহায়, সম্ভবত ওই লোকটির ওপর, কিছুটা হলেও নির্ভরশীল। কিন্তু লোকটির ভূমিকা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ও কি দায়িত্ব অস্বীকার

করতে চাইছে, না ভাবছে, ভেবে দেখছে, কী করা যায়? — শ্রীকান্ত কী করে বুঝবে, কী ঘটছে, কী ঘটতে চলেছে? কিন্তু... কিন্তু সে কী করতে পারে, তার কী করা উচিত? না, শ্রীকান্ত বুঝতে পারছে না।... কীই-বা করতে পারে সে। যদি জানাও যায়, মহিলা সত্যি বিপন্ন আর তার জন্য দায়ী ওই লোকটি। সে কী করতে পারে? লোকটিকে বাধ্য করতে পারে সে? বলতে পারে — আপনি আপনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। এই মহিলা অসহায়। আপনার ওপর নির্ভর করে আছেন, তাঁর ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।

কিন্তু শ্রীকান্ত এ-সব কথা বলবে কোন অধিকারে? তার কিছু বলার সুযোগ কোথায়? প্রথমত, সে পুরো ব্যাপারটা... পুরো কেন, সে ব্যাপারটার কিছুই জানে না। সে এদের দু-জনেরই অপরিচিত। হঠাৎ মাঝখান থেকে কিছু বলতে গেলে শুধু এই লোকটি কেন, মহিলাও হয়তো ভালোভাবে নেবেন না। তা ছাড়া এই দু-জনের সম্পর্কটা কী, তা তো সে জানে না। লোকটি যদি মহিলার স্বামী বা প্রেমিক হন, তবে ওর কাছে মহিলার যা প্রত্যাশা, তা শুধু এই লোকটিই মেটাতে পারে। অন্য কারো কিছু করার সাধ্য নেই। মাঝখান থেকে সে নাক গলাতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তার নাক গলানো ওরা মেনে নেবেই বা কেন? আর যদি লোকটি স্বামী বা প্রেমিক নাও হয়, সে যদি বলে, আপনি কেন নাক নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, আপনি তো কিছুই জানেন না। অথবা এ-কথাও বলতে পারে, এত যখন দরদ, আপনি নিজেই ওর একটা ব্যবস্থা করুন না?

শ্রীকান্ত কী ব্যবস্থা করবে, কী করতে পারে সে?— তার কোনো ক্ষমতাই নেই। কারো জন্য সে কিছু করতে পারে না। নিজের জন্যই পারে না, অন্যের কথা কী বলার আছে?— এই যে এক অন্ধ ভিখারি প্ল্যাটফর্মের ও-পাশ থেকে এ-পাশে, আবার এ-পাশ থেকে ও-পাশে হেঁটে যাচ্ছে; অনবরত হাঁটছে। একটা হাত পাতা। মুখে কোনো কথা নেই। বেশিরভাগ লোকই তার সেই পাতা-হাতে পয়সা দিচ্ছে না, ওর দিকে কেউ তাকাচ্ছেও না — শ্রীকান্ত তার কী করতে পারে? সে বড়োজোর একটা টাকা সেই শীর্ণ হাতে রাখতে পারে।

এদিকে আবার আসছে একটা ট্রেন। সুদূর দক্ষিণ থেকে। মানুষ আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যখন ট্রেন আসে, প্ল্যাটফর্মের কারো মন আর কোনোদিকে থাকে না। সবার চিন্তায় তখন শুধু ট্রেন। সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে ট্রেন ঢুকছে। ঢুকছে লম্বা বিরাট শরীর নিয়ে। শরীরের মধ্যে শরীর নিয়ে। বাতাসে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে। সমস্ত শব্দ চাপা দিয়ে শব্দ তুলে। ভাবান্তর নেই শুধু ওইসব স্টলের লোকদের। চা-বিস্কুটের, পত্রিকা-বইয়ের, পান-সিগারেটের স্টলের লোকেরা খদ্দের, সম্ভাব্য খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ততা শিকড়-বাকড়ের দোকানেও। নানা গ্রহকে শান্ত করার নানা শিকড় নিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আছে একটি ছেলে। গ্রহশান্তির জন্য কোন পাথরের বদলে কোন শিকড় ধারণ করতে হবে লেখা আছে লাল, নীল, কালো, ছোটো-বড়ো হরফে। উপযুক্ত শিকড়ের সন্ধানে জুটেছে কয়েকজন। এরা হতাশ, না আশাবাদী?

শ্রীকান্ত যেখানে বসে আছে তার পেছনদিকে বসে আছে কিছু পরিচারিকা-শ্রেণীর স্ত্রীলোক। তারা আলোচনা করছে, যে-সব বাড়িতে তারা কাজ করে, সে-সব বাড়ির লোকদের ব্যবহার নিয়ে। মুখে পান এবং থুতু মেশানো রস নিয়ে একজন থেমে থেমে বলার চেষ্টা করছে, সে একবার তার মালকিনকে কীভাবে জব্দ করেছে। নাকিসুরে, দুর্বল গলায় আরেকজন বলছে, সে কতবার কতভাবে ঠকেছে। বিনা পারিশ্রমিকে তাকে কীভাবে খাটিয়ে নেয়া হচ্ছে।...

শ্রীকান্ত শুনছে। শুনছে শুধু। তার কিছু করার নেই। শিকড় যারা কিনছে, তাদের গিয়ে সে যদি বলে, এ-সব বুজরুকি — এদের দিয়ে পয়সা নষ্ট করবেন না — দোকানি তার ওপর খেপে যাবে। ওর পোষা লোকজন থাকতে পারে; হামলা করতে পারে তারা; খদ্দেররাও তার কথায় কান দেবে না। পেছনে বসা যে নারী, শোষণের কথা বলছে, সে বা তার শোষক তাকে গুরুত্ব দেবে না। ওই অন্ধ ভিখারিকে সে কী বলবে, কী বলার আছে তার? আর... আর... আর সেই মহিলা — যিনি একটু আগে এক পুরুষের সামনে কাঁদছিলেন — আরে, কোথায় গেল ওরা? কখন গেল? কোথায়? চলে যাওয়া মানে কি ওদের সমস্যা মিটে গেছে? চলে যাওয়ার মানে কি ওদের সমস্যা মেটার নয়? শ্রীকান্ত জানে না শ্রীকান্ত কিছু জানে না।

এদিকে ট্রেন আসছে। যাচ্ছে। এলে প্ল্যাটফর্ম চঞ্চল হয়ে উঠছে। চলে গেলেই শান্ত। লোক চলে যাচ্ছে। অন্য লোক আসছে। আবার লোক চলে যাচ্ছে। আবার নতুন লোক আসছে। নিয়মমাফিক আসছে ট্রেন। নিয়মমাফিক চলে যাচ্ছে। কেউ থাকতে আসেনি। কিছু থাকতে আসেনি। যাচ্ছে, সব চলে যাচ্ছে। ক্রমাগত চলে যাচ্ছে। খোল-করতাল বাজিয়ে একদল লোক গান গাইতে গাইতে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তাদের গানের শব্দ চাপা দিয়ে উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে। ট্রেন আসছে এদিকেও। উঠে পড়ল শ্রীকান্ত। এদিকের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন পৌঁছোনোর আগেই সে প্ল্যাটফর্ম পেছনে ফেলে হাঁটতে লাগল।

With best compliments from

DEY'S MEDICAL (U.P.) PRIVATE LIMITED

REGISTERED OFFICE
2/B, Beli Road, Allahabad-211 002

FACTORY
Karchana, Allahabad - 211 010

ADMINISTRATIVE OFFICE
17, Collin Lane, Kolkata-700 016

MANUFACTURERS OF DRUGS AND COSMETICS

Price : Rs. 80
Vol. : 26 No. : 1

BIVAV
Special Autumn Issue
JULY 2004 - SEP 2004
OCT 2004 - DEC 2004
PUBLISHED IN OCT 2004
ISSN 0970-1885

Reg. No. : 30017/76
92nd Issue

Space donated by

A Well Wisher